কবিবর স্বর্গীয়

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা

১১।১২ গ্রে ষ্ট্রীট, নূতন কলিকাতা যন্ত্রে

শ্রীগণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৬

মুখবন্ধ।

বহুদিনের কথা—যখন নবজীবন মাসিকপত্র প্রচারিত হইত, তখন একবার আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয় ঐ পত্রে কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের একটী সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "ঈশ্বর গুপ্ত খাঁটী বাঙ্গালী কবি—খাঁটী বাঙ্গালীর খাঁটী ভাত, ডাল, তরকারী।" তিনি প্রতিভার শিখায় বৈদেশিক রসের পাক করিয়া কাব্য সৃষ্টি করেন নাই। বাঙ্গলার অন্য আধুনিক কবি প্রতিভাবান্ হইলেও তাঁহারা ইংরাজীভাবে—পাশ্চাত্যভাবে মুগ্ধ ও বিহ্বল। ঈশ্বর গুপ্তের সময় ইংরেজী লেখাপড়ার এত অধিক প্রচলন ছিল না। বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক পাশ্চাত্য-ভাবে—পাশ্চাত্য-রসে এত অধিক বিমূঢ় ছিল না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়—ঈশ্বর গুপ্তের লেখায়, ঈশ্বর গুপ্তের প্রতিভা-প্রভায় নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক বাঙ্গালীত্ব বিকাশ হইয়াছে। তিনি খাঁটী বাঙ্গালীর শেষ কবি।

ঈশ্বর গুপ্তের রচনা-ভঙ্গিমায়, শব্দ-প্রয়োগে, অলঙ্কার-বিন্যাসে অনেকটা ভারতচন্দ্রের ভাব ও ভঙ্গী পাওয়া যায়। তেমনি পদলালিত্য, তেমনি রসপ্রাচুর্য্য, তেমনি শব্দাড়ম্বর। ভারতচন্দ্র এবং ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গলা পদ্য-সাহিত্যের আদিগুরু বলিলেও দোষ হয় না। কবিকঙ্কণে প্রাদেশিকতা আছে, কালিদাস ও কৃত্তিবাসের অপ্রচলিত ভাব ও ভাষার প্রয়োগ আছে, ভারতচন্দ্রে এবং ঈশ্বর গুপ্তে তাহা অতি বিরল। ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রদেশের সর্ব্বসময়ের কবি। এখনও বাঙ্গলায় খাঁটী বাঙ্গালীর অভাব নাই, সংখ্যায় খাঁটী বাঙ্গালী অত্যধিক; খাঁটী বাঙ্গালী আধুনিক কবিগণের কাব্যরস ষোল আনা উপভোগ করিতে পারেন না, কেন না, উহাতে বৈদেশিকতার তীব্রতা আছে। কিন্তু সুদূর শ্রীহট্ট হইতে মালদহ পর্য্যন্ত, জলপাইগুড়ির কোণ হইতে হিজ্‌লী পর্য্যন্ত সকল প্রদেশের সাধারণ বাঙ্গলা-নবীশ বাঙ্গালী ঈশ্বর গুপ্তকে বুঝিতে পারেন, ঈশ্বর গুপ্তের ভাবে মুগ্ধ হইতে পারেন।

এতাদৃশ সর্ব্বদেশের, সর্ব্বজনের কবি ঈশ্বর গুপ্তের আদর করা কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য। ঈশ্বর গুপ্তের আদর না করিলে বাঙ্গালী বাঙ্গালী নামের গ্লানি করিবেন। ঈশ্বর গুপ্তের ন্যায় অনায়াসে পয়ার লিখিতে বোধ হয়, আজকাল কোন বাঙ্গালীই পারেন না। ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা আমরা ভুলিতে পারিব না, কেন না, ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা বাঙ্গালীর বাঙ্গলা ভাষা। আমরা তাই জনসমাজে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার নূতন সংস্করণ প্রচার করিলাম। এবার যাহা প্রকাশিত হইল, এমনি বৃহৎ পাঁচ খণ্ড পুস্তক প্রকাশিত হইলে তবে গুপ্ত কবির সকল পদ্য-রচনা বর্ত্তমান বাঙ্গালীর হস্তগত হয়। বসুমতীর উপহার দিবার জন্য এত বড় বৃহৎ ব্যাপারের ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া আমরা একেবারে উঠিতে পারি না। তাই এবার এই খণ্ড গ্রাহকগণের করে দিয়া আমাদের বিশ্বাস, ঈশ্বর গুপ্তের পরিচয় বাঙ্গালী পাঠক ভাল করিয়া পাইলে ভবিষ্যতে তাঁহার কাব্যের প্রচার-ব্যাপারে অন্য কাহাকেও কষ্ট পাইতে হইবে না। বাঙ্গলা দেশে এখন গুণজ্ঞ ও রসজ্ঞ ব্যক্তির অভাব নাই। একবার তাঁহারা গুপ্ত কবির অদ্ভুত কাব্য-রসের আস্বাদ পাইলে নিজেরাই কবিকীর্ত্তি বজায় রাখিবার জন্য উদ্‌যোগী হইবেন, আমাদের ভরসা আছে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে মুদ্রণকার্য্য করিবার জন্য আমরা চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই। আশা আছে, গ্রাহক ও পাঠকগণ আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়া সুখী করিবেন কিমধিকমিতি।

বসুমতী আফিস।
১৫ই আশ্বিন, ১৩০৬ সাল।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন।

সূচিপত্র।

সূচিপত্র সমাপ্ত।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী।

পারমার্থিক ও নৈতিক।

প্রণাম তোমায়।

প্রভাকর প্রভাতে, প্রভাতে মনোলোভা।
দেখিতে সুন্দর অতি, জগতের শোভা॥
আকাশের অকস্মাৎ, আর এক ভাব।
হয় দৃষ্ট নব সৃষ্ট, সুখদ স্বভাব॥
তরুণ তপন হয়ে, তরল তামস।
লোহিত লাবণ্য হেরি, মোহিত মানস॥
ক্রমে ক্রমে সে ভাবের, হয় ভাবান্তর।
খরতর কর কর, হন দিবাকর॥
ক্রমেতে ক্রমের হ্রাস, পশ্চিমেতে গতি।
দিন যত গত তত, দীন দিনপতি॥
পরিশেষে পুনর্ব্বার, ঘোর অন্ধকার।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার॥
এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার।
তোমার অনন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার?
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার॥
প্রফুল্লিত কত ফুল, বন উপবনে।
শত শত শতদল, শোভা করে বনে॥
কুসুমের বাস ছেড়ে, কুসুমের বাস।
বায়ুভরে এসে করে, নাসিকায় বাস॥
মধুভরে টলটল, ঢলঢল রূপ।
আস্ত ভস্ম হাস্য তায়, দৃশ্য অপরূপ॥
মাঝে মাঝে যত দ্বিজ, নিজ নিজ দলে!
রস খায় যশ গায়, বসে পুষ্পদলে॥
শরীর পতন করে, ধন্য তার ক্রিয়া।
বাঁচায় অসংখ্য জীব, মকরন্দ দিয়া॥
ক্ষণপরে সেই শোভা, নাহি থাকে তার।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার॥
এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার।
তোমার অনন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার?
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার॥
নয়নেতে হেরি এই, বিরূপ আভাস।
শ্বেতময় সমুদয়, অমল আকাশ॥
পুন দেখি নব নব, অসম্ভব সব।
শ্বেত, পীত, নীল, রক্ত, কৃষ্ণবর্ণ নভ॥
আরবার দেখি তার, নাহি সেই রূপ।
সজল জলদজালে, জগৎ বিরূপ॥
নয়নের লজ্জা দেয়, অন্ধকাররাশি।
তাই দেখে মাঝে মাঝে, চপলার হাসি॥
সে সময় মনে মনে, ভাবি এই ভাব।
স্বভাবের সেই ভাব, হবে না অভাব॥
ক্ষণপরে চেয়ে দেখি, সকলি বিকার।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার॥
এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার।
তোমার অনন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার?

এই দেখি এই আছে, এই নাই আর।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার॥
এই আমি, এই আছি, এই অবয়ব।
এই রূপ এই রস, এই আছে সব॥
এই হস্ত, এই পদ এই আছে সব।
এই এই আর নেই, পরে এই শব॥
এই ভ্রাতা, এই পুত্র, এই পরিবার।
এই হাস্য, এই সুখ, এই হাহাকার॥
এই ভাব এই শক্তি, এই বিলোকন।
এই চিন্তা, এই শক্তি, এই বুদ্ধি মন॥
এই মেধা এই যত্ন, এই অনুমান।
এই তুমি এই আমি, এই অভিমান।
ক্ষণপরে আমি কোথা, কেবা আর কার?
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার॥
এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার।
তোমার অনন্ত লীলা বুঝে সাধ্য কার?
এই দেখি এই আছে এই নাই আর।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার॥

প্রার্থনা।

এত দিন বেঁচে আছি, তোমার কৃপায়।
হই হই করিতেছি, ভবের সভায়॥
যে পথে চলাও আমি, সেই পথে চলি।
যেরূপ বলাও তুমি, সেইরূপ বলি॥
আমি বলি, আমি চলি, সাধ্য কিছু নাই।
চলাও, বলাও তুমি, চলি, বলি তাই॥
বল্ বল্ তব বল, সেই বলে বলী।
বল্ বল্ তব বল, সেই বলে বলি॥
স্ববলে এ বল তুমি, যখন হরিবে।
আমি তুমি বলাবলি, কে আর করিবে॥
আছি আমি, আর আমি রহিব না মোলে।
যে তুমি সে তুমি রবে, আমি যাব চলে॥
কি হইব, কোথা যাব, কি বলিতে পারি।
মিশাবে জলধিজল, জলধির বারি॥
আছে সব হবে শব, যাবে সব চুকে।
আমি এসে আমি আর, বলিব না মুখে॥
ভ্রমেতে কহিবে সব, করি হাহাকার।
ঘুচিল নশ্বর দেহ, ঈশ্বর তোমার॥
নশ্বর ঈশ্বর আমি, বুঝাইব কায়।
ঈশ্বর যাবার নয়, ঈশ্বর কি যায়?
ছিল গুপ্ত, হলো গুপ্ত, গুপ্ত কোথা আছে।
সকলি হইল গুপ্ত, ঈশ্বরের কাছে॥
তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যক্ত কভু নও।
কেমনে করিব ব্যক্ত, ব্যক্ত যদি হও?
থাকে গুপ্ত, গুপ্ত থাক, ব্যক্তে নাহি ফল।
কমলে পড়িবে শেষ, কমলের জল॥
ততদিন আছি আমি, যতদিন থাকি।
আমার জানিয়া তুমি, তোমারেই ডাকি॥
তোমার করুণা বিনা, সুখ কিসে হবে?
তুমি যদি সুখী কর, সুখ পাব তবে॥
সন্তোষের ধন ভরা, ভবের ভাণ্ডারে।
তুমি যদি নাহি দেও, কে লইতে পারে?
দিয়েছ, হয়েছে তায় সুখের সংযোগ।
সুখেতে করেছি কত সুভোগ সম্ভোগ॥
যোগ ভোগ দুই ইচ্ছা, সকলের মনে।
ভোগ ভোগ, যোগ যোগ, হইবে কেমনে॥
ভোগে যেন কর্ম্মভোগ, ভুগিতে না হয়।
যোগে যেন অনুযোগ, কখন না রয়॥
কিরূপে মনের ভাব, করিব প্রকট।
বলিবার কিছু নাই, তোমার নিকট॥
চলিবার বলিবার, শেষ হলো সব।
বলে করে একেবারে হলেম নীরব॥

প্রার্থনা।

ধরে মানুষের দেহ, মানুষে করিয়ে স্নেহ,
মিছা কাল করিলাম বই।
স্বরূপে মানুষ কই, এমন মানুষ কই?
আমিতো মানুষ নিজে নই॥

কোথা বিভু বিশ্বকর, আমায় করিয়া নর,
বেদনা দিতেছ কেন আর ?
কর দেখি উপদেশ, কেন দিলে রাগ দ্বেষ ?
কেন দিলে দম্ভ অহঙ্কার ?
তুমি নাথ ইচ্ছাময়, কর যাহা ইচ্ছা হয়,
ইচ্ছায় চালিছ এ সংসার।
যে কলে চালাও চলি, যে বলে বলাও বলি,
সম্ভাবনা কি আছে আমার ?
যা হোক্ তা হোক্ নাথ, আজ কিবা সুপ্রভাত,
প্রণিপাত চরণে তোমার।
মধুর মধুর ভাব, তুমি তায় আবির্ভাব,
সকলেতে করিছ বিহার ॥
কান্তপ্রিয় এই কান্ত, অরিশান্ত ঋতুকান্ত,
মরি কিবা কান্ত মনোহর।
সুর বলে বলাক্রান্ত, নাশিয়া নিশির ধ্বান্ত,
নিশাকান্ত কান্ত করে কর।
দিগন্ত বিশেষ দায়, প্রভাকর প্রভা পায়,
ক্রমে তার বাড়িছে প্রভাব।
প্রভাকর কর করে প্রভাকর কর করে,
প্রভাকর করের কি ভাব ॥
ডাকে প্রভাকর কর, ওহে প্রভাকর কর,
মনোময় হও দয়াময়।
কেহ নাহি জানে গুপ্ত, বলে হে ঈশ্বর গুপ্ত,
তুমি ব্যক্ত চরাচরময় ॥

মায়া।

বিশ্বরূপ নাট্যশালা, দৃশ্য মনোহর।
শোভিত সুচারু আলো, সূর্য্য শশধর ॥
স্বভাব স্বভাবে লয়ে, সম্পাদনভার।
করিছে সকল সূত্র, হয়ে সূত্রধার ॥
জলধর বাদ্যকর, বাদ্য করে কত।
সমীরণ সঙ্গীত করিছে অবিরত ॥
ছয় কালে ছয় কাল, হয় ছয় রূপ।
রঙ্গভূমে রঙ্গ করে, ভাঁড়ের স্বরূপ ॥
অধিকারী-এক মাত্র, অখিলপালক।
আমরা সকলে তাঁর, যাত্রার বালক ॥
প্রকৃতি-প্রদত্ত সাজ, শরীরেতে লয়ে।
বহুরূপ সঙ সাজি, বহুরূপী হোয়ে ॥
শিশুকালে একরূপ, সহজে সরল।
অখল অপূর্ব্ব ভাব, অবল অচল ॥
সুকোমল কলেবর, অতি সুললিত।
নব নবনীত সম, লাবণ্য গলিত ॥
ফণী, জল, অনলেতে, কিছু নাই ভয়।
নাহি জানে ভাল মন্দ, সদানন্দময় ॥
আইলে যৌবনকাল, আর একরূপ।
নবক সূর্য্যের সম, দীপ্ত হয় রূপ ॥
দিন দিন বৃদ্ধি হয়, শারীরিক বল।
নানারূপ চিন্তা হেতু, মানস চঞ্চল ॥
ইন্দ্রিয়ের সুখ হেতু, কত প্রকরণ।
বহুবিধ অনুষ্ঠান, অর্থের কারণ ॥
পরিশেষ বৃদ্ধকাল, কালের অধীন।
কৃষ্ণপক্ষে শশী প্রায়, দিন দিন ক্ষীণ ॥
আছে চক্ষু কিন্তু তায়, দেখা নাহি যায়।
আছে কর্ণ কিন্তু তায়, শব্দ নাহি ধায় ॥
আছে কর, কিন্তু তাহা না হয় বিস্তার।
আছে পদ, কিন্তু নাই, গতিশক্তি তার ॥
পলিত কুন্তলজাল, গলিত দশন।
ললিত গাত্রের মাংস, স্খলিত বচন ॥
ছিল আগে এই দেহ, সবল সচল।
এখন ধরিল গিরি, স্বভাবে অচল ॥
ওহে জীব ভাল তুমি, রঙ করিয়াছ।
তিন কালে তিন রূপ, সঙ সাজিয়াছ ॥
কেবল কুহকে ভুলে, কৌতুকে দেখাও।
আপনি কৌতুক কিছু, দেখিতে না পাও ॥
ভাল কোরে যাত্রা কর, বুঝে অভিপ্রায় ॥
কর তাই অধিকারী, তুষ্ট হন যায় ॥
যাত্রা কোরে তুমি যাবে, আমি যাব চোলে।
এ যাত্রার শেষ হবে, গঙ্গাযাত্রা হলে ॥

স্থিরভাবে এক খেলা, খেল চিরকাল।
ভাল ভাল ভাল বাজী, জগদিন্দ্রজাল॥
ছায়াবাজী, মায়াবাজী, কত বাজী জোর।
ভাবিলে ভবের বাজী, বাজী হয় ভোর॥
হায় একি অপরূপ, ঈশ্বরের খেলা।
এক ভূতে রক্ষা নাই, পাঁচ ভূতে মেলা।
ভূতে ভূতে যোগাযোগ, ভূতে করে রব।
দেখিয়া ভূতের কাণ্ড, অভিভূত সব॥
ভূতের আকার নাই, বলে কেহ কেহ।
দেখিলাম এ ভূতের, মনোহর দেহ॥
কবে ভূত ছিল ভূত, আবির্ভূত কবে।
পুনরায় এই ভূত, কবে ভূত হবে॥
ভূতের বাসায় থাকো, দেখনাক চেয়ে।
দিবানিশি তোমারে হে, ভূতে অর্পেছে পেয়ে॥
ভূতেআনন্দিত সদা, করিছ বিহার।
অথচ জান না কিছু ভূতের, ব্যাপার॥
কখনো নিগ্রহ করে, কভু করে দয়া।
নাহি মানে রাম নাম, নাহি মানে গয়া॥
এই ভূত করিয়াছে, রামের গঠন।
এই ভূত করিয়াছে, গয়ার সৃজন॥
এই ভূতে রহিয়াছে, বিশ্ব জড়ীভূত।
হলিঘোষ্ট ছাড়া নন, এই পাঁচ ভূত॥
ভূতনাথ ভগবান্, ভূতের আধার।
সর্ব্বভূতে সমভাবে, আবির্ভাব যার॥
ভূত হবে কলেবর, ভূতের সদন।
অতএব ভূতনাথে সদা ভাব মন॥
আসিয়াছ জগতের, মেলা দরশনে।
দেখ দেখ দেখ জীব, যত সাধ মনে॥
কিন্তু এক উপদেশ, কর অবধান।
হাটের হাটের মাঝে, হও সাবধান॥
দেখ যেন মনে কভু, নাহি হয় ভুল।
কোরো না কাচের সহ, কনকের তুল॥
তাঁরে দেখ একবার, যাঁর এই মেলা।
আহ্লাদে মেতো দেখনাক মেলা॥

সাম্য।

সকলেরে জ্ঞান কর, আপনার সম।
তাহাতেই সিদ্ধ হবে, দম আর শম॥
পরিমাণ করি মান, মান রাখ মানে।
সমানে সমানে সব, তবে লোক মানে।
নিজ মান চাই শুধু, কারে নাহি মানি।
সে মানে কে মানে ভাই কিসে হব মানী?
সরলতা কর যদি, সবার সহিত।
তবেই সন্তোষ লাভ সহজে স্বহিত॥
লইতেছ পরধন বিস্তারিয়া কর।
মরণ নিকট অতি, স্মরণ না কর॥
আগে জান অহংকার অহঙ্কার পরে।
পরে পরে পর জ্ঞান না চলিলে পরে॥

স্বয়ম্ভুব মনুর বিশ্বদর্শন।

কোথা হতে আসিয়াছি, কেন জন্ম পাইয়াছি,
কেন বা জীবিত আছি, না হয় নির্ণয়।
এই ছিল অন্ধকার, নাহি ছিল এ প্রকার,
অকস্মাৎ কি আবার, হেরি আলোময়।
মরি মরি আহা আহা, ক্ষণ পূর্ব্বে ছিল যাহা,
এখনি ভাবিলে তাহা মনে হয় ভয়।
মোহজালে জড়ীভূত, ক্ষণে ক্ষণে অবির্ভূত,
যে কাল হয়েছে ভূত, অনুভূত নয়।
এ কি দেখি অপরূপ, আকাশের চারুরূপ,
মুহুর্মুহু নানারূপ হয় আর লয়।
শোভিত বিনোদ বন, কুসুমিত তরুগণ,
কোথা হতে সমীরণ শব্দ তার বয়।
স্বভাবের ভাবভরে, মোহনীর মিষ্ট স্বরে,
নানা রাগে গান করে, বিহঙ্গম চয়।
কিবা শোভা হায় হায় নয়ন যে দিকে চায়,
কেবল দেখিতে পায় সুখের আলয়।
নাসাপথে ঘ্রাণ চলে, শব্দ ধায় শ্রুতিচলে
রসনা কাহার বলে আস্বাদন লয়।

বদনে বচন-বৃষ্টি, কটাক্ষে জগৎ দৃষ্টি;
দেখিয়া এরূপ সৃষ্টি হতেছে বিস্ময়।
বিকল মনের কল, এই মাত্র কোরে বল,
উঠেছিল ক্ষুধানল, জ্বলে অতিশয়।
স্নিগ্ধবারি সহকারে; সুমধুর-ফলাহারে,
জুড়াইল একেবারে, জঠর নিলয়।
কে করিল এই তঞ্চ, কে করিল এই পঞ্চ,
কে দিয়েছে বুদ্ধি মন, কে দিয়েছে ছয়?
কে দিলে আমায় জন্ম, কে দিলে আমায় তনু,
করিলেন এই মনু কোন মহাশয়?
এক ঘরে বহু ঘর, কারিগুরি বহুতর,
যোগাযোগ পরস্পর, দ্বার আছে নয়।
এই কাণ্ড অনিবার্য্য, কেমনে হইল ধার্য্য,
ভাবিয়া ভবের কার্য্য, মোহিত হৃদয়।
উত্তরকারী কেবা আছে, যাই আমি কার কাছে,
পাই আমি কার কাছে, তার পরিচয়?
এই সব চরাচর, পাইয়াছে কলেবর,
জিজ্ঞাসা করিলে পর, কথা নাহি কয়।
শুন ওহে দিবাকর, তিমির বিনাশ কর,
জগতের শোভাকর, তুমি জ্যোতির্ম্ময়।
প্রভাকর প্রিয়তম, মানস গগনে মম,
ঘোরতর ভ্রমতম, কর দেখি ক্ষয়।
নদীনদ অগণন, ওহে বন উপবন,
ওহে ভাই জীবগণ, আছ সমুদয়॥
হয়েছি কাতর অতি, স্বভাবে চঞ্চলমতি,
করি হে সবার প্রতি, বিহিত বিনয়।
আমিতো স্বয়ম্ভু নই, অবশ্যই কৃত হই,
কর্ত্তা কই কর্ত্তা বই, ক্রিয়া নাহি হয়।
মনেতে জেনেছি এই, তোমাদের কর্ত্তা সেই,
আমার নির্ম্মাতা সেই, বিভু বিশ্বময়।
মনোহর এ সংসার, ইচ্ছায় হয়েছে যার,
সেই সর্ব্বমূলাধার, কোন খানে রয়?
প্রকাশ করিয়া ভাই, সবিশেষ বল তাই,
কেমনেতে আমি পাই, তাহার আশ্রয়?

আকার প্রকার তার, হয় বল কি প্রকার;
কিরূপে পাইব তার, পরম প্রণয়?
বল ভাই কি প্রকারে, পূজা করি আমি তাঁরে,
এই মনে বারে বারে, হতেছে সংশয়।
অখিলের অধীশ্বর; গুণাতীত গুণাকর;
কোথা তুমি পরাৎপর, নিত্য নিরাময়।
কিসে পাব দরশন, প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষণ,
ভেবে মন উচাটন, স্থির নাহি রয়।
ভবারণ্যে ভ্রমি একা, দুঃখের না হয় লেখা,
দয়া করি দাও দেখা, দীনদয়াময়!
তোমার স্বজিত হই, তোমা বই কারে কই,
ওহে বিভু তোমা বই, কিছু কিছু নয়।
নাম ধর কৃপাকর, আমায় কৃতার্থ কর,
নিজ জ্ঞান দান কর হইয়ে সদয়।
তোমার স্বরূপ ধ্যান, তোমার স্বরূপ জ্ঞান,
স্থিরভাবে হয় যেন, অন্তরে উদয়।
প্রপন্নে পবিত্র কর, পরিতাপ পরিহর,
প্রণব প্রদান কর, হয়ে মনোময়।
তব প্রেমে হয়ে প্রীত, মুখে গাই এই গীত,
জয় জয় জগদীশ, জগদীশ জয়॥

সংসার-জাঁতা।

চণকাদি শস্যচয়, জাঁতায় পতিত হয়,
বক্রভাবে চক্র ঘুরে তাঁর।
ঘর ঘর ঘন ঘর্ষে, পৃথক পৃথক স্পর্শে,
চূর্ণ হয় দেহ সবাকার।
কিন্তু যেই সেই দণ্ডে, ধরে গিয়া সেই দণ্ডে,
সেই দণ্ডে দণ্ড নাই আর।
মূলের আশ্রয় লয়, পূর্ব্ববৎ স্থূল রয়,
তার দেহে না হয় প্রহার॥
সেইরূপ বিশ্বপাতা, সুচারু সংসার-জাঁতা,
বিনা করে করিয়াধারণ।
নর আদি জন্তুচয়, সমভাবে সমুদয়,
দণ্ডযোগে করেন পেষণ॥

যে জন সুজন হয়, চক্র-মাঝে নাহি রয়,
দণ্ডের নিকটে করে বাস।
দণ্ডী সেই কভু নয়, সুখী হয় অতিশয়,
দণ্ডী তার দণ্ড করে নাশ॥
শুন জীব সবিশেষ, লয়ে কার উপদেশ,
ত্যজিয়াছ আত্ম-অনুরোধ?
সংসার-জাতার ঘায়, যাতনায় প্রাণ যায়,
নাহি তার কিছুমাত্র বোধ?
চক্রে আর কেন রও, আছ জীব শিব হও,
সুখে লও দণ্ডীর আশ্রয়।
স্থিরভাবে এই দণ্ড, সার কর এই দণ্ড,
নাহি রবে কালদণ্ড ভয়॥

সংসার-সমুদ্র।

যেমন ধীবরগণ, করি কর প্রসারণ,
ফেলে জাল সরোবর জলে।
যত মীন দিয়া ঝম্প, তার মাঝে মারে লম্ফ,
তারা সব বদ্ধ হয় কলে॥
ধীবর তাদের ধরি, তখন বিনাশ করি,
পূর্ণ করে আপনার আশা।
ছিন্ন মূর্ত্তি মনোহর, জল ছেড়ে জলচর,
পেটের ভিতরে পান বাসা॥
যে মীন সম্মুখ দিয়া, নতভাবে লয় গিয়া,
জালিকের চরণ শরণ।
মুক্ত হয় অনায়াসে, যুক্ত নয় জালফাসে,
আর তার না হয় মরণ॥
সেইরূপ বিশ্বপাল, পেতেছেন মায়াজাল,
ভীম ভব-জলনিধি-জলে।
পরতত্ব-পরিহত, প্রমত্ত মানব যত,
তার মাঝে নৃত্য করে বলে॥
সেই জীব সমুদয়, জালপাশে ধৃত হয়,
স্থিত নয় ক্ষণকাল সুখে।
দুঃখ সয় অতিশয়, ভ্রমে করি কালক্ষয়,
নীত হয় মরণের মুখে॥

যে জন সুজন হয়, বিভুর শরণ লয়,
বদ্ধ তায় নাহি হয় জালে।
কদম্ব-কুসুম অনু, পুলকে পূরিত তনু,
সুখী সেই ইহ পরকালে॥
অতএব শুন জীব, প্রাপ্ত হবে নিজ শিব,
হইবে অশিব সব গত।
মায়াজাল মুক্ত হও, সত্যের আশ্রয় লও,
ঈশ্বরের হও পদানত॥

সংসার-কানন।

দেখ রে অবোধ জীব, কাল বয়ে যায়।
সংসার-অরণ্যে আসি, কি করিলে হায়!।
কি দেখিলে কি শুনিলে, কি ভাবিলে সার?
কি ফল পাইলে বল, ভ্রমিয়া সংসার?
বনের প্রথম ভাগ, দেখিতে সুন্দর।
শৈশব-সময় নামে, খ্যাত চরাচর॥
নাহিক জঞ্জালজাল কণ্টক কামনা।
পথিক না পায় তাহে বিশেষ যাতনা॥
নব নব তরু চারু পূর্ণ ফুল-ফলে।
মন-মধুকর গুঞ্জে, প্রতি দলে দলে॥
পরিষ্কৃত প্রমোদিত, স্বভাব-সদন।
মধুমল্লিকার বেড়া মোহনীয় বন॥
ষোল বিঘা পরিমিত, ভূমির অন্তরে।
শোভনীয় যৌবনের বন শোভা করে॥
মন্দ মন্দ বহে গন্ধ, মকরন্দভরা।
সৌরভে মাতিয়া ধায়, মানস-ভ্রমরা॥
উড়ে গিয়া বসে কাম-কণ্টক-কাননে।
ফুটেছে কেতকী যথা সুহাস্য আননে॥
মদে মত্ত মধুকর না জানি বিশেষ।
লুব্ধ হেতু ক্ষুব্ধ হয়ে পায় বহু ক্লেশ॥
কলঙ্ক-কণ্টকশ্রেণী অতি তীক্ষ্ণকর।
মুগ্ধ মধুচোর-অঙ্গ করে জর জর॥
তথাপি আসক্ত অলি, তুষ্ট ক্ষুধাভরে।
সরম ভরম ভয় সব তুচ্ছ করে॥

কাল গতে হলে কিছু, প্রবোধ-সঞ্চার।
ক্রমে ভৃঙ্গ পরিহরে, কেতকী বিহার॥
অন্য ফুলে ফুলবধু, তত্ব করে রস।
অন্তেতে ক্রমশ বাড়ে অমৃত অলস॥
ধনাশা-পিপাসা শান্তি, করিবার তরে।
প্রবেশে পাতকপদ্মে, লোভসরোবরে॥
কালকূট সম রস. পান করি তায়।
ক্ষিপ্তপ্রায় অলিরায়, ইতস্তত ধায়॥
ক্রোধ, কুচ্ছ কলহ কার্পণ্য কদাচার।
চাপল্য, চাতুর্য্য পরপীড়া পরদার॥
লালসা লাম্পট্য শাঠ্য চৌর্য্য মিথ্যাকথা।
অনৃত আচার অবিচার নিষ্ঠুরতা॥
ইত্যাদি বিবিধ বৃক্ষ-বল্লি-শাখাদলে।
ভ্রমিছে ভ্রামক ভৃঙ্গ, মধু আশা ছলে॥
কিন্তু সেই পুষ্পরস, দুষ্প, এ সংসারে।
নিবৃত্তি-কাননে আছে, মায়াসিন্ধু-পারে॥
যে বনে বিরাজে জ্ঞানবাপী মনোহর।
মধুর সলিল তাহে, অতি তৃপ্তিকর॥
তরল তরঙ্গে তার, কলিত কমল।
সন্তোষ সুন্দর নাম, নিভা নিরমল॥
সেই তামরসপূর্ণ সুখ-সুধারসে।
বিবেকী মানসভৃঙ্গ. ভুঞ্জে নিরলসে॥
চল ওরে মন মম, সেই রম্য বনে।
কাজ নাই বিষভরা বিষয় কাননে॥
হেররে নিবিড়তর, দুর্গম গহন।
মোহ-অন্ধকারাবৃত ঘোর দরশন॥
অতএব আয় আয় মানস আমার।
নিবৃত্তি-কাননে যাই, মায়ানদী-পার॥

সংসার-সাজঘর।

বাজীকর হয়ে কত, করিতেছ বাজী।
যখন যে সাজ দেও, সেই সাজে সাজি॥
জানিতে না পারি কিছু কি সাজে কি সাজে।
সাজা নয় সাজা চোর তোমার এ সাজে॥
সাজঘরে বোসে তুমি, সাজাইছ কত।
আপনি সাজিয়া সাজ জ্ঞান হই হত॥
সাজ পেয়ে নেচে উঠি, আপনার জাঁকে।
কি ছিলাম কি হলেম, বোধ নাহি থাকে॥
নীলগিরি-চূড়ায় বসিয়া আছি এই।
দেখিতে দেখিতে আর, নীলাচল নেই॥
বুঝিতে না পারি কিছু, ইহার কারণ।
কে আনি ধবলাচলে, করিল স্থাপন?
যে সাজ সেজেছি আগে, সেই সাজ কই?
এই আছি সবল অবল কেন হই?
ভাল ভাল ইন্দ্রজাল, বাজী বটে জোর।
দেখাতে দেখাতে বাজী, বাজী কর ভোর॥
কিছু না দেখিতে পাই, শুধু শুনি গোল।
কে সাজালে এই সাজ, কে বাজালে ঢোল?
কেমন কুহক বাজী, না পাই ভাবিয়া।
অন্তরে লুকাও কোথা, অন্তরে থাকিয়া?
থেকে থেকে উড়ে যাও, পুষে কিসে রাখি।
আমার অন্তরে থেকে, আমারেই ফাঁকি!
ধর ধর করি কিন্তু ধরিতে না পারি।
জানিলাম পোষা নও, মানিলাম হারি॥
তুমি যদি পোষা হয়ে, না মানিলে পোষ।
আমার কি দোষ তায়, আমার কি দোষ?
স্থিররূপে তুমি নাহি, বাস কর মনে।
তুষিতে তোমায় কিসে পুষিব কেমনে?
ডুরী দিয়া বাঁধি যদি ঘটে ঘোর দায়।
শিকল কাটিয়া কর, বিকল আমায়॥

আত্মপর।

নিজ, পর ভেদ করা শক্ত অতিশয়।
যারে বলি সহজ সহজ সেতো নয়॥
মনের তনয় মিত্র মনের ত নয়।
ব্যাধি করি দেহে বাস দেহ করে ক্ষয়।
বনবাসী তরুলতা ঔষধ হইয়া।
জীবের জীবন রাখে, ব্যাধি বিনাশিয়া॥

সৎসঙ্গ।

অসতের সহ নয়, বসতের বিধি।
কাচ সহ বাস করি, নীচ হয় নিধি॥
বসত-বিধান সদা, সতের সহিত।
হয় তায় সমুদয়, অহিত রহিত॥
হিতাহিত সদসৎ, সঙ্গের অধীন।
অসতের সঙ্গগুণে সাধ্য হয় হীন॥
অতি হীন কীট যদি, ফুলে স্থান পায়।
অনায়াসে স্থান পায়, দেবতার পায়॥
পিপীড়ার বাস হলে, বেলের পাতায়।
নাচিয়া বেড়ায় ঘরে, শিবের মাথায়॥
শারী শুক পড়ে যদি, মানুষের স্থলে।
রসনা পবিত্র করি, রাধাকৃষ্ণ বলে॥

গুরু।

গুরু গুরু গুরু গুরু, সকলেই কয়।
গুরু রব গুরু বটে, ফলে গুরু নয়॥
গুণে গুরুলঘু হয়, গুণে গুরু গুরু।
বিচারেতে গুরু লঘু, হয় লঘু গুরু॥
শিষ্যের সম্পদ ছলে যে করে হরণ।
গুরু বলে কিসে তারে, করিব বরণ?
শিষ্যের সন্তাপ যত, যে হরিতে পারে।
গুরুবোধে গুরু বলে; পূজা করি তারে॥

গুণী।

স্বভাবে অবোধ অতি, গুণ নাই যার॥
তার কাছে কোথা আছে, গুণের বিচার?
যে জন আপনি গুণী গুণ সেই জানে।
দেখিয়া গুণীর গুণ, গুরু বলে মানে!
বাজারে পড়িয়ে থাকে, অমূল্য রতন।
চলে যায় চাষা তায়, করিয়া দলন॥
রত্নব্যবসায়ী যেই সেই চিনে হীরে।
যতনে রতন তুলি, রাখে বুক চিরে॥

জ্ঞান উপদেশ মাত্রে পাপ নাহি যায়।
তবে যায় যদি পায়, সার অভিপ্রায়॥
করেছ যে সব দোষ, মনে যাহা আছে।
স্বীকার করিবে সব, ঈশ্বরের কাছে॥
বিমল হইবে তায়, মানসের পুর।
পাপ তাপ যত আছে, সব হবে দূর॥
যে প্রকার বিলোকনে, বৈদ্যের বদন।
কখনই নাহি হয় ব্যাধি-বিমোচন॥
তবে হয় রোগীর রোগের নিবারণ।
যত্ন করি যদি করে ঔষধ-সেবন।
অতএব ভাব জীব কিসে হবে হিত
ব্যাধির বিনাশ হেতু, বিশেষ বিহিত।
জ্ঞানরূপ ঔষধ করিলে ব্যবহার।
পাপ তাপ রোগ ভোগ, থাকিবে না আর॥

শাস্ত্রপাঠ।

লও তুমি যত পার শাস্ত্রের সন্ধান।
হও তুমি পৃথিবীর, পণ্ডিত প্রধান॥
ঈশ্বরের প্রতি যদি, প্রেম নাহি রয়।
যত পড়, যত শুন, কিছু কিছু নয়॥

রূপ ও গুণ।

এ জগতে সুন্দর; যাহা হয়।
গুণ না থাকিলে তার, কিছু কিছু নয়॥
সুবর্ণ সুবর্ণ জিনি, চম্পকের ফুল।
সুদল সুবাসে করে অন্তর আকুল॥
কিন্তু এই দোষ বড়, মধু নাই তার।
এই হেতু অলি তাহে, করে না বিহার॥

জ্ঞানী।

আপনারে জ্ঞানী বলে, দিতে পরিচয়।
সে বড় সহজ নয়, শক্ত অতিশয়॥

যথা অসি মাত্রে কভু, খরধার নয়।
একাঘাতে করে ছেদ, তীক্ষ্ণ যদি হয়॥

গ্রন্থপাঠ।

পুঁথি পাঠ করে কিন্তু, নাহি তায় মন।
কেমনে পাইবে সেই জ্ঞানরূপ ধন?
প্রদীপে না তেল দিয়া, বাতী যদি জ্বালো।
কোথায় প্রতিভা আর, কিসে হবে আলো?

সাধু।

রাগ নাই, দ্বেষ নাই, নাই কোন দোষ।
সোণা আর ধূলিলাভে, সম পরিতোষ॥
কোনরূপে নাহি রাখে, কিছু অভিমান।
সমভাবে দেখে সব আপন সমান॥
অন্তরে ঈশ্বর-চিন্তা, মুখে প্রেমরস।
সাধু সাধু সাধু সেই, গাই তার যশ॥
সাধু সাধু সাধু রব, অনেকেই কয়।
ফলে সে সরল সাধু, অনেকেই নয়॥
যেমন পোস্তের ফুল, সাদা সমুদয়।
কদাচিৎ দুই এক, রক্তবর্ণ হয়॥

কাল।

অপরূপ এক পক্ষী, জীবের না হয় পক্ষী
দুই পক্ষ দুই পক্ষ যার।
জন্ম লাভ প্রতিপদে, পায় পদ প্রতি পদে,
লোকে বলে পদ নাই তার॥
বহুরূপী বিহঙ্গম, ক্ষণে ক্ষণে নানা ক্রম,
বিনা অঙ্গে ধরে অবয়ব।
এলো এই, গেল এই, সেই এই, এই সেই
এই এই নেই নেই রব॥
শূন্যে শূন্যে উড়ে যায়, শূন্যে শূন্যে চোরে খায়,
শূন্যে শূন্যে আয়ু করে শেষ।
দেখা যায়, ওই যায়, আর নাহি ফিরে চায়,
ছিল মীন, এই হলো মেষ॥

এই ভেড়া হয় ষাঁড়, বুকে চড়ে নেড়ে ঘাড়,
ঘাস খেয়ে করিবে চরণ।
মিথুন যখন প্রায়, বিনাশ করিতে তায়,
অনায়াসে করিবে ভক্ষণ॥
দেখে তার মন্দ মত, দন্তাঘাতে দশরথ,
একেবারে করিবে নিধন।
করী অহি নাম ধরি, দশরথে করে করি,
উদরেতে করিছে গ্রহণ॥
পরে এক গুণযুতা, স্বভাবে প্রসূতা-সুতা,
সিংহ প্রাণ করিল হরণ।
একজন দস্যু আসি, মারিয়া তুলার রাশি,
বধিবেক কন্যার জীবন॥
তায় দর্প হবে মিছা, দংশন করিবে বিছা,
বিছা যাবে ধনুকের হাতে।
ধনুর ধরিয়া ছিলে, মকর ফেলিবে গিলে,
মকর মরিবে কুম্ভাঘাতে॥
কুম্ভ জল জলে লীন, পরিশেষে এই মীন,
এই দিন হবে পুনর্ব্বার।
স্বভাবের এই শোভা, এইরূপ মনোলোভা
এই ভাবে হইবে সঞ্চার॥
প্রকৃতির কার্য্য যত, কভু নয় অন্য মত,
এই ভাব এইরূপ সব॥
এই রবে এই ভূমি, এই আমি এই তুমি,
রব কিম্বা রবে এক রব॥
তাই বলি অন্ধ নিশা, তোমারে দেখিয়া কৃশা,
অস্থির হয়েছে মম মন।
এ সুখ কি হবে আর, এ প্রকার সবাকার,
আর কি পাইব দরশন?
বন্ধুর বিচ্ছেদ হবে, তুমি নাহি আর রবে,
রবি সহ এলে পরে অহ।
অতএব বলি তাই, এই এক ভিক্ষা চাই,
স্থিরভাবে রহ রহ রহ॥

শরীর অনিত্য।

জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়।
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয়॥
পাতিয়া বিষম জাল, বৃথা সুখে হর কাল,
শরীর পেয়েছ ভাল, ব্যাধির আলয়।
অনিত্য দেহের আশা, কেবল ভূতের বাসা,
যে আশায় ভবে আসা, তাহে হও লয়॥
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়॥
দেহ গেহ নবদ্বার, তিন স্থান শূন্য তার,
যাহে কর অধিকার পুরস্কার নয়॥
বুঝিয়া নিগূঢ় মর্ম্ম, নীতিমত কর কর্ম্ম,
পরে আছে ধর্ম্মাধর্ম্ম পরীক্ষার ভয়।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়॥
আমি আমি অহঙ্কার, ফলিতার্থ আমি কার,
কহ দেখি আপনার সত্য পরিচয়?
মুদিলে যুগল আঁখি, সকল হইবে ফাঁকি,
তুমি আমি এই বাক্য, কেবা আর কয়।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়॥
তোমার যে কলেবর, কেবল কলের ঘর,
দৃশ্য বটে মনোহর পঞ্চভূতময়।
যখন টুটিবে কল, ছুটিবে সকল বল,
সুখদল হতবল, দুঃখের উদয়।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়॥
নিয়ত তোমার ঘরে, গোপনেতে বাস করে,
বিষম বিক্রম করে পাপ রিপু ছয়
ভ্রম-নিদ্রা পরিহর, জ্ঞান অস্ত্র করে ধর,
রিপুদলে বশ কর মন মহাশয়।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়॥
অনিত্য ভৌতিক দেহ, কার প্রতি কর স্নেহ,
এক ভিন্ন আর কেহ আপনার নয়।
যদবধি থাকে কায়া, জ্ঞান নেত্রে দেখ মায়া,
ত্যজিয়া তাহার ছায়া ছাড় ভ্রমচয়।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়॥
আমি মুখে আমি কই, ফলিতার্থ আমি কই,
আমি যদি আমি নই, মিথ্যা সমুদয়।
দারা পুত্র পরিবার, বল তবে কেবা কার,
মোহযুক্ত এ সংসার ফক্কিকারময়।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়॥
দ্বেষ হিংসা পরিহর, বিবেকের সঙ্গ ধর,
সকলের প্রতি কর, সরল প্রণয়।
রসনারে কর বশ, বিভুগুণামৃত রস,
পান করি লভ যশ হবে কালজয়।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়।
দয়া ধর্ম্ম উপকার, কর নিজ অলঙ্কার,
গলে পর চারুহার বিশেষ বিনয়।
মিছা ধন উপার্জ্জন, ভবে ভাব নিত্যধন,
স্মরণ করহ মন মরন নিশ্চয়।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়॥
এক ভিন্ন নাহি আর, তিনি সংসারে সার,
আত্মারূপে সবাকার হৃদয়ে উদয়।
অনিত্য বিষয় বিত্ত, নিত্যরূপে ভাব নিত্য,
ভক্তিভরে ভজ চিত্ত নিত্য নিরাময়।
জীবন-জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়॥

রোজসই।

অহরহ অহেতু কত গত হয়।
এই অহ এই রহ লোকে এই কয়॥
রাত্রি দিন যুক্ত ভুক্ত কাল সমুদয়॥
দিন রাত্রি আছি আমি মুখে পরিচয়॥
দেখি বটে এই কাল ফলত অদৃষ্ট।
সুখ দুখ ভেদে বলি, আপন অদৃষ্ট॥
প্রপঞ্চ-শরীর পেয়ে, যত দিন রই।
এই কাল এই আমি এই মাত্র কই॥
নাহি জানি কেবা কেবা আমি কেবা হই।
কভু ভাবি আমি আমি কভু আমি নই॥
বই করি স্থিতিকাল খুলে দেহ বই
ভবের খাতায় শুধু করি ঢেরা সই।

বাজিল ছুটীর ঘড়ী, হলো রোজসই।
আর কেন ওহে ভাই, কর হই হই ?
বোঝা গেল সবিশেষ মিছে বোঝা বই।
কার প্রতি ভার দিই, কার ভার বই॥
আমি বলি এই এই তুমি বল ওই।
দেখা যাবে এই ওই, ক্ষণকাল বই॥
কূলে থেকে জল লহ, বলি পই পই।
ডুবিলে মায়ার হ্রদে পাবেনাকো থই॥

কে আমি ?

হে নাথ! আমি আমি, আমি কেন কই হে।
জেনেছি, জেনেছি সখা, আমি আমি নই হে॥
আমি কভু নই আমি, এ আমির তুমি স্বামী,
তবে কেন মিছে, আমি আমি হয়ে রই হে ?
আমি, আমি এই ভাষ, এ যে আমি চিদাভাস,
ভাসেতে মিশাল ভাস, 'আমি' তবে কই হে ?
না জেনে পড়েছি ফাঁদে ছাঁদিয়াছে ঘোর ছাঁদে,
যাতনায় প্রাণ কাঁদে, কিসে মুক্ত হই হে ?
হয়ে গেল যা হবার উপায় ছিল না তার,
বার বার কেন আর করি হই হই হে ?
লেগেছে বিষম ফাঁস, নিজ অস্ত্রে কাটো পাশ,
আশাবাস কর নাশ, বলি পই পই হে।
এমন আর কে আছে, বলিব কাহার কাছে,
আপনি তুলিয়া গাছে, কেড়ে নিলে মই হে।
তরঙ্গ প্রখর অতি, বেগবতী স্রোতস্বতী,
ত্রিবেণীতে তিন ধার, জল তই তই হে।
হও হও অনুকূল, দেও দেও দেও কূল,
অকূল পাথারে পোড়ে পাবনাক থই হে॥
সকলি তো গেল বোঝা, থাকিতে সুপথ সোজা
এ পাপ ভূতের বোঝা, কেন আর বই হে ?
এ দিকে হয়েছি দীন, খেটেছি অনেক দিন,
এখনিই দিন দিন, হলো দিন সই হে॥
মিটে গেল আশাবাই, থেকে আর কাজ নাই,
আপনার দেশে যাই, হয়ে রিপুজয়ী হে।
সমুদ্রের বিম্ব যাহা, সমুদ্রের বস্তু তাহা,
মাটীর নির্ম্মিত ঘট, নহে মাটী বই হে॥
রাখিবে না আমি নাম, ছেড়ে এই পঞ্চ গ্রাম,
আমার যে নিজ ধাম, তাই আমি লই হে।
তুমি বিম্ব প্রভাকর, প্রতিবিম্ব প্রভা হর,
তোমার 'তোমাতে' নাথ লয় 'আমি হই হে।

কে তুমি ?

তুমি কেবা আমি কেবা না পাই সন্ধান!
তোমা ছাড়া আমি হয়ে আমি অভিমান॥
এই তুমি এই আমি, এক যদি হয়।
তুমি তুমি, আমি আমি ভেদ নাহি রয়॥
আমায় জানিলে আমি, আর নাহি দায়।
অহং-কার বোধ হলে অহঙ্কার যায়॥
বল বল তত্ত্বকথা শুনি সবিশেষ।
দেহ দেহ দেহ নাথ, দেহ উপদেশ॥
তুমি আমি এই যদি, হোল নিরূপণ।
তুমি আমি দুই ছাড়া কারে বলি মন ?
কে মন ?—কেমন সেই, সে মন কিরূপ ?
কেমনে জানিব সেই মনের স্বরূপ ?
হায় হায়, কারে আমি সুধাইব আর ?
বুঝিতে না পারি কিছু মনের ব্যাপার॥
তুমি আমি এক ঘরে থাকি দুই জন।
কোথা হতে এ আবার আসিয়াছে মন ?
এক ঘরে বাস বটে কিন্তু একা একা।
গুপ্তভাবে থাক তুমি নাহি দেও দেখা॥
তোমায় না দেখে একে বিষম ব্যাকুল॥
তাহাতে আবার মন করিল আকুল॥
না দেখি না দেখি নাথ, না দেখি তোমায়।
মনের না দেখা পেয়ে ঘটিয়াছে দায়॥
কোন মতে নাহি হয়, বাধা গে আমার'।
এই দেখি এই আছে এই নাই আর॥
বায়ুবৎ গতি করি, কোথা যায় উড়ে ?
কার সাধ্য ধরে তারে ত্রিভুবন ঢুঁড়ে ?

কবে বা এমন হবে মনের মতন।
কেমনে মনের বেগ, করিব বারণ ?
যত দিন এই মন, না হইবে বশ।
তত দিন পাইব না তত্ত্ব-সুধারস॥
মন যদি বশে আসে, তবে কারে ভয় ?
একেবারে করি আমি সমুদয় জয়॥
তখন এরূপ ভেদ, আর নাহি রবে।
দয়াময় নিজে তুমি, মনোময় হবে॥
কর কর কর প্রভু কল্যাণ আমার!
হর হর হর সব, মনের বিকার॥
মনের ঘুচিলে রোগ, ভোগ হবে শেষ।
রহিবে না কাম, ক্রোধ মোহ মদ, দ্বেষ।
দূর হবে অহঙ্কার, আত্ম-অভিমান।
বিবেক বৈরাগ্য দোঁহে, মনে পাবে স্থান!
ভ্রমতম নাশ কর, তপন হইয়া।
রেখ না আপন ভাব, গোপন করিয়া॥

মনের মানুষ।

মনের মানুষ কোথা পাই ?
মানুষ যদ্যপি হবে ভাই!
যাহা বলি কর তবে যাই,
দ্বিপদ হয়েছে যারা, বিপদের হেতু তারা,
জগতে মানুষ কেহ নাই।
মনের মানুষ কোথা পাই ?

মানুষ মানুষ করে সব,
মানুষ মানুষ শুধু রব,
কলে আমি দেখি সব,
মানুষ মানুষ করে সব।

নর সব দেখি একাকার,
কিন্তু নাহি মানে একাকার॥
একাকারে সবার বিকার।
একাকার মিছে ধরে, একাকার নাহি করে,
মনে নাহি ভাবে একাকার।
নয় সব দেখি একাকার॥

ছাড় ছাড় ছাড় মিছা ভেক।
করিয়া জ্ঞানের অভিষেক,
অন্তর বাহির কর এক,
হৃদয়ে পরম ধন, কর মন দরশন,
হও না কমলবনে ভেক।
ছাড় ছাড় ছাড় মিছে ভেক্।

তুমি ত চকোর বট মন,
হয়েছে চাঁদের দরশন,
সুখে কর পীযুষ ভোজন।
এখনি ঘুচাও ক্ষুধা; প্রভাতে চাঁদের সুধা,
চকোর কি পেয়েছে কখন ?
তুমি ত চকোর বট মন॥

বল দেখি কেন এলে ভবে ?
এ ভাবেতে কত দিন রবে ?
কি ছিলে কি শেষে তুমি হবে ?
আসিয়া জনমভূমি, তোমায় চেন না তুমি,
আমায় চিনিবে তবে কবে ?
বল দেখি কেন এলে ভবে ?

কালে আর রহিবে না কেহ,
পেয়েছ যে মনোহর দেহ,
দেহ নয় ভূতের সে গেহ।
বিফল প্রাণের আশা, ভাঙ্গিবে ভূতের বাসা,
মিছামিছি কেন কর স্নেহ ?
কালে আর রহিবে না কেহ।

এখানে দিতেছ কেন ফাকি ?
করি বা কি আর নাহি বাকি ?
প্রাণেরে কেমনে আর রাখি ?
হয়েছি মরণগামী, কোথা তুমি কোথা আমি,
যখন মুদিব আমি আঁখি।
এখনো দিতেছ কেন ফাঁকি ?

নির্গুণ ঈশ্বর।

কাতর কিঙ্কর আমি, তোমার সন্তান।
আমার জনক তুমি, সবার প্রধান॥
বার বার ডাকিতেছি, কোথা ভগবান্।
একবার তাহে তুমি, নাহি দাও কাণ্॥
সর্ব্বদিকে সর্ব্বলোকে, কত কথা কয়।
শ্রবণে সে সব রব, প্রবেশ না হয়॥
হায় হায় কব কায়, ঘটিল কি জ্বালা।
জগতের পিতা হয়ে, তুমি হলে কালা!
মনে সাধ কথা কই, নিকটে আনিয়া।
অধীর হলেম ভেবে, বধির জানিয়া॥
সে ভাবেতে ডাকি, আমি, মনে লয় যেটা।
কাণ্ বুজে কান্ কর, ভাল নয় সেটা॥
কার কাছে দুঃখ আর, করিব প্রকাশ।
কে আর শুনিবে সব, মনের আশ্বাস?
রহিল তোমার এক, কালা পরিবাদ।
কেবল শ্রুতির দোষে, হইল প্রমাদ॥
শ্রুতির হইলে দোষ, স্মৃতি কোথা রয়?
দর্শনে কি হবে আর, কিছু ভাল নয়॥
আবার কি কথা শুনি, প্রকৃতির কাছে।
তোমার নয়নে নাকি, দোষ ধরিয়াছে?
লোচনের দ্বার আর, না হয় মোচন॥
অন্ধ হয়ে পোড়ে আছ, করিয়া শয়ন॥
চারিদিকে আপনার, পরিবার যারা।
অনিবার হাহাকার, করিতেছে তারা॥
তুমি যদি অন্ধ হয়ে, চক্ষু বুজে রবে।
আমাদের দশায় কি, হবে বল তবে?
দৃষ্টিহীন যদি হয়, পিতার নয়ন।
সুতের সন্তাপ তবে, কে করে হরণ?
ত্রিলোকের নেত্র যিনি, নেত্র নাই তাঁর।
কে আছে কাহার কাছে দাঁড়াইব আর?
উঠ উঠ, মিছে কেন, বলি বারে বারে।
জেগে যে ঘুমায় তারে, কে জাগাতে পারে?
অনুভবে বুঝিলাম, কাণা তুমি বটে।
নতুবা কি আমাদের, দুঃখ এত ঘটে?
দর্শনেতে এত যদি না হইত দোষ।
নিয়ত থাকিত পূর্ণ, সন্তোষের কোষ॥
আবার কি সর্ব্বনাশ, হয়েছ অচল।
শুনিয়া আমার শিরে, পড়িছে অচল॥
হয় দৃশ্য এই বিশ্ব, যাহার সম্পদ।
এমন পদের পতি, হারালেন পদ।
চলিবার শক্তি নাকি, কিছু নাই আর?
বিপদ হইলে তুমি, বিপদ আমার।
আপনিই যদি তুমি, পড়েছ বিপদে।
তবে আর সন্তানের, কে রাখিবে পদে?
পদে পদে তব পদে, মন যদি রয়?
আপদ বিপদ তবে, এত কেন হয়?
গোপনেতে পদ রাখা, তোমার কি পদ।
তা হইলে কিসে আমি, পাব বল পদ?
পিতা হয়ে যদি নাহি, পদে দেহ পদ।
তবে আর নাহি দেখি, উদ্ধারের পদ॥
তোমার যে পদ তাহা, আমারি ত পদ।
তবে কেন নাহি দেও, পদের সে পদ?
পদ-দান ভয়ে যদি, না শুনিলে পদ।
তবে কেন বোকে মরি, মিছে ছাড়ি পদ॥
কিন্তু পিতা যে সময়ে ঘটিবে বিপদ।
সে সময়ে পাই যেন, বিপদের পদ॥
শুনিলাম আর এক, কথা ভয়ঙ্কর।
নিজে তুমি ভব-কর কিন্তু নাই কর॥
এই বিশ্ব, যার করে, বিশ্ব করে যেই।
বিশ্বকর বিভু হয়ে, করহীন সেই॥
যে শুনিছে, সে হাসিছে, কারে আর কব?
কেমনে বুঝাব আমি, কর নাই তব॥
বল শুনি সবিশেষ, ওহে গুণাকর।
অকর যদ্যপি তুমি, নাহি ধর কর॥
দিবাকর নিশাকর, দুই করকর।
নিয়ত নিয়মে দেয়, কার করে কর?

বিচার করিলে ফলে, স্থির এই ঘটে।
স্বভাবেই করহীন, কর নাই বটে॥
যখন এ দেহ ভূমি, করনি নিষ্কর।
তখনি জেনেছি তুমি, আপনি নিষ্কর॥
বুঝিতে না পারি পিতা, তোমার এ লীলে।
নিষ্কর হইয়া কেন, নিষ্কর না দিলে?
পাট্টা নিয়া, যে ভূমি, দিয়াছ তুমি নাথ।
পরিমাণ মাত্র তার, সাড়ে তিন হাত॥
তাহাতে অসার মাটী, কাঁটা বনময়।
কেমনে সুশস্য হবে, উর্ব্বরাতো নয়॥
কেবল বাড়িছে ঘন, চাষ হবে কিসে?
অঙ্কুরিত হলে তরু, কাটে কাম-কীটে॥
সুবিচার নাহি কর, হয়ে তুমি রাজা।
কিরূপে বাঁচিবে প্রজা, সদা শুকো হাজা॥
বিপদ আমার পক্ষে, রক্ষে কিসে হয়।
প্রতি কাল, এসে কাল, করে কর লয়॥
কোনরূপে তার কাছে, নাহি চলে ফাঁকি।
জমা জমি কড়া কমি, নাহি রাখে বাকি॥
করি বা কি, তার বাকি, রাখি কোন ভাবে।
আঁখির নিমিষে ধোরে, বেঁধে নিয়ে যাবে॥
পাইয়া তোমার ভূমি, এই ভোগে ভাব।
না হলো সুখের যোগ, কর্ম্মভোগ সার॥
তার হাতে বদ্ধ আছি, হাত নাই যার।
দেখি শেষ কপালেতে, কি হয় আমার।
পড়েছি তোমার হাতে, তুমি হও পর।
মনে ঠিক জানিয়াছি, তুমি নও পর।
দয়াকর দয়া কর, পাতিয়াছি কর।
কর পাত একবার, আমি দিই কর॥
না কর উপুড়হস্ত, গুটাইয়া রাখো।
পেতে কর, পেতে কর, কিছু কাল থাকো॥
আমায় দিয়াছ কর, কর তার লও।
করে লিখি তব গুণ অনুকূল হও।
প্রেম তুলি, তুলি তাতে, ভক্তি-রঙ্গ নিয়া।
হৃদিপটে তব রূপ, রাখিব লিখিয়া॥

মনোময় রূপ ধরি, দরশন দেহ।
তুলি ধরি চিত্র করি, পূর্ণ করি দেহ॥
মনে, হাতে, যাতে পারি, তোমার বিভাস।
অন্তর বাহিরে আমি করিব প্রকাশ॥
শুনিলাম অপরূপ, নাক নাই তব।
সুবাস কুবাস নাহি, হয় অনুভব॥
গন্ধবহে, গন্ধ বলে, কাছে অহরহ।
তুমি তার গন্ধভার, কিছু নাহি লহ॥
তোমার শরীর নাকি, এমনি অবশ।
নিরন্তর করাঘাত, করিছে অবস॥
অবশের দণ্ড খাও, অবস হইয়া।
বায়ুর যাতনা সদা, রোয়েছ সহিয়া॥
ক্ষুরী ধরি, বজ্র বারি, করিছে প্রহার।
শিশির নিয়ত মারে, নিশির নীহার॥
সহজে কোমলকায়, সয় সমুদয়।
এ সকল যাতনায়, যাতনা না হয়॥
পরম মঙ্গলময় তুমি নিজে শিব।
শিবের অশিব শুনে, কাঁদে যত জীব॥
খেলিয়া ভবের খেলা, তুমি হলে কাঁদি।
দেখিয়া তোমার নাট, হাসি আর কাঁদি॥
অভিধান, অভিমান, রাখিয়াছে মুখ।
কিন্তু একি অসম্ভব, নাহি তব মুখ॥
মুখ হয়ে মুখ নাই, বিমুখ হয়েছ।
মূক হয়ে একেবারে, নীরব রয়েছ॥
অজ গজ চারিমুণ্ড, পাঁচমুণ্ড যারা।
নাহি বুঝি মাথামুণ্ড, কি বলেছে তারা॥
শাস্ত্র সব মুখ বোলে, ডাকে কোন্ গুণে।
মুণ্ডপাত হইতেছে মুণ্ড নাই শুনে॥
কহিতে না পার কথা, কি রাখিব নাম।
তুমি হে, আমার বাবা, "হাবা আত্মারাম"॥
তোমার বদনে যদি, না স্বরে বচন।
কেমনে হইবে তবে, কথোপকথন?
আমি যদি কিছু বলি, বুঝে অভিপ্রায়।
ইসেরায় ঘাড় নেড়ে, সায় দিও তায়॥

তুমি তো আপন ভাবে, হইলে বিমুখ।
এই ভিক্ষে দীন সুতে, হয়ো না বিমুখ॥
চরমে পরম পদ, যদি যাই ভুলে।
সে সময়ে একবার, চেয়ো মুখ তুলে॥
তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, কুমার তোমার॥
গুপ্ত হয়ে, গুপ্ত সুতে, ছল কেন কর?
গুপ্ত কায় ব্যক্ত করি, গুপ্ত ভাব হর॥
পিতৃ নামে নাম পেয়ে, উপাধি ধরেছি।
জন্মভূমি জননীর, কোলেতে বসেছি॥
তুমি গুপ্ত, আমি গুপ্ত, গুপ্ত কিছু নয়।
তবে কেন গুপ্তভাবে, ভাব গুপ্ত রয়?
গুপ্তভাবে চিত্রগুপ্ত, চিত্রকরি যবে।
গুপ্ত সুতে, গুপ্ত করি, গুপ্তগৃহে লবে॥
আছি গুপ্ত, পরিশেষে গুপ্ত হব ভবে।
বল দেখি সে সময়ে, গুপ্ত কোথা রবে॥
গুপ্ত হয়ে যখন মুদিব, আমি আঁখি।
তখন এ গুপ্ত সুতে, কিসে দিবে ফাঁকি?

শ্রীমদ্ভাগবত।

"প্রকাশিত পরিদৃশ্য, বিশ্ব চরাচর।"
সমভাবে সদা কাল, সর্ব্বসুগোচর॥
এই জগতে, "সৃষ্টি", "স্থিতি" আর "ক্ষয়"।
নিরূপিত নিয়মিত, যাঁহা হতে হয়॥
সৃজিত পদার্থ সবে, "তিনি" বর্ত্তমান।
সৎ-রূপে হয় তাই, সত্তার প্রমাণ॥
বিস্তারিত না থাকিলে, বিভুর বিভাস।
"অসৎ জগৎ" কভু, হতো না প্রকাশ॥
"অবস্তুতে" নাহি হয়, বস্তুর বিস্তার।
কেমনে করিব তার, সত্তার স্বীকার?
"বন্ধ্যার সন্তান" আর, "আকাশের ফুল।"
কেবল অলীক মাত্র, নাহি তার মূল॥
জগতের জন্মাদির, হেতুমাত্র যিনি।
"সিদ্ধজ্ঞান" স্বতঃ "সত্য" "সর্ব্বগত" তিনি॥
তিনিই "সর্ব্বধন", "সর্ব্বমূলাধার"।
"নিরাধার" "নিরঞ্জন" "নিত্য" "নির্ব্বিকার"॥
বিমোহিত যে "বেদে", বিবিধ বুধগণ।
যে "বেদের" মহিমা না, হয় নিরূপণ॥
"আদি কবি" "বিধাতার" হৃদয়-আকাশে।
যাঁহার করুণাবলে, সে "বেদ" প্রকাশে॥
"তেজ" "জল" "কাচ" এই তিনে পরস্পরে।
"অসত্যে সত্যের ভান, যে প্রকার ধরে॥
"বিকার বিশিষ্ট বোধে" "জলভ্রম" হয়।
বাস্তবিক "অসত্য" সে, সত্য নয় নয়॥
"ত্রিগুণের" সৃষ্টি হেতু, সেরূপ প্রকার॥
"সত্যরূপে" বোধ হয়, অখিল সংসার॥
ফলত "অলীক" এই, মিথ্যা সমুদয়।
একমাত্র "তিনি" বিনা, "সত্য" কিছু নয়॥
"যিনি" হন, আপনার প্রভাবে প্রচার।
"যাঁতে" নাই, কোনরূপ, উপাধি সঞ্চার॥
সে "সত্য" "স্বরূপ" বিকার নাই "যাঁর"।
"পরম পুরুষ" তিনি, ধ্যান করি "তাঁর"॥

পরমার্থ।

প্রীতি যদি রাখ তুমি, জগতের প্রতি।
করিবে তোমায় প্রীতি, জগতের পতি॥
জগতের প্রিয় হও, ব্যবহার-গুণে।
জগৎ বন্ধন কর, ব্যবহার-গুণে॥
যে ভাবে জগতে তুমি, দেখিবে যেরূপ।
জগৎ সে ভাবে তোরে, দেখিবে সেরূপ॥
প্রেম-বলে জগতের, প্রিয় হয় যেই।
জগদীশ পুরুষের, প্রিয় হয় সেই॥
প্রণয় শিখিতে যার, মনে সাধ আছে।
এখনি শিখুক গিয়া, পতঙ্গের কাছে॥
দেখ তার কি প্রকার, প্রণয়ের ধারা।
অনায়াসে অনলে, পুড়িয়া হয় সারা॥
লাফ মেরে ঝাঁপ দিয়া, প্রাণ দেয় সুখে।
একবার আহা উহু, করোনাকো মুখে॥

সহজে কি প্রেম, কোরে, তারে পরি বোকা।
জ্ঞানাগুণে ঝাঁপ দের, দূরে যাক ধোঁকা॥
চিরকাল এক ভাব, বুড়া হয়ে খোকা।
এখনি পুড়িয়া মর, হয়ে প্রেম-পোকা॥
ঘরে ঘরে ফের যদি, ঘরছাড়া হয়ে।
ঘর ছেড়ে কিবা কাজ, থাক ঘর লয়ে॥
পেট নিয়ে দ্বারে দ্বারে, যদি গুণ হাপু।
এমন সন্ন্যাসে তোর, ফল কি রে বাপু?
ঘর ছেড়ে ঘরে ঘরে, না ফিরিতে হয়।
তবে বাপু, ঘর ছাড়া, অনুচিত নয়॥
বসে থাকো এক ঠাঁই, নীরব হইয়া।
চেঁচায়ো না কারো কাছে, পেটে হাত দিয়ে॥
কদিন বাঁচিবে আর, কদিন বাঁচিবে?
এ ভাবে কদিন, আর জীবন যাপিবে?
কদিন ধরিবে আর দেহের এ বল?
কদিন চলিবে আর দেহের এ কল?
কদিন ইন্দ্রিয়গণ রবে আর বশ?
কদিন করিবে ভোগ, বিষয়ের রস?
জীবন জীবনবিম্ব, স্থায়ী কভু নয়।
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই, কখন্ কি হয়॥
শতবর্ষ পরমায়ু, লিপি বিধাতার।
রজনী হরণ করে, অর্দ্ধভাগ তার॥
বাল্য, রোগ, জরা, দুঃখ, বিষম জঞ্জাল।
বিফলে বিনাশ হয়, তার অর্দ্ধকাল॥
তথাপিও অবশিষ্ট, অল্পকাল যাহা।
কলহ দম্পতি-সুখে নষ্ট হয় তাহা॥
তথাপি কিঞ্চিৎকাল, বাকি যাহা হয়।
দলাদলি নিন্দাবাদে, করে তাহা ক্ষয়॥
অহরহ পাপপথে, চলে, দেহ-রথ।
ভ্রমেও ভাবে না জীব, পরমার্থ-পদ॥
গত কাল পুন কিছু, আসিবে না আর।
আসিছে যে কাল, তাহা স্থিত থাকে কার?
বর্ত্তমান কাল শুধু, হিতকর হয়।
করিতে উচিত যাহা, কর এ সময়॥

কেন আর কাল কাট, হেলায় হেলায়।
জীবন করিছ শেষ, খেলায় খেলায়॥
আর কত ঘুরিবে হে, মেলায় মেলায়।
এই বেলা পথ দেখ, বেলায় বেলায়॥
ভূতে করে হাড় গুড়া, ঢেলার ঢেলায়।
জান না কি যাবে প্রাণ, কালের ঠেলায়?
মুক্তি মুক্তি করি সদা, যত নারী নরে।
কথায় বসায়ে হাট, কেনা-বেচা করে॥
কেহ বেচে কেহ কেনে, কেহ করে দান।
সকলেই শুনিতেছে কারো নাহি কাণ॥
সকলেই দেখিতেছে চক্ষু কারো নাই।
কোথা যুক্তি কোথা মুক্তি, ভাবি আমি তাই॥
প্রকৃতি প্রকৃতি পেলে, আকৃতির নাশ।
পাঁচে পাঁচ মিশাইয়া, হয় অপ্রকাশ॥
অবিনাশী আত্মা, এক স্বভাবেই রয়।
বল তবে এ জগতে, মুক্তি কার হয়॥

বিভুর পূজা।

জয় জয় জগদীশ, জগতের সার।
সকলি অসার আর, সকলি অসার॥
ইচ্ছায় করিয়া সৃষ্টি, বিবিধ প্রকার।
ইচ্ছায় করিছ পুন, সকল সংহার॥
ইচ্ছাময় ইচ্ছা তব কে বলিতে পারে।
বর্ণহারে বর্ণিবারে, সদা বর্ণ হারে॥
দেখে তব অসম্ভব, এ ভব-বিভব।
যেরূপে যে ব্যাখ্যা করে, সকলি সম্ভব॥
শিব রূপ, সর্ব্বজীব, সর্ব্বমূলাধার।
আত্মারূপে বিরাজিত, দেহ সবাকার॥
কত ভ্রমে ভ্রমে জীব, তোমার উদ্দেশে।
মিছে চেষ্টা মৃগতৃষ্ণা, প্রাণ যায় শেষে॥
সিন্ধুভরা আছে সুধা, বিন্দু নাহি চায়।
বিষ খেতে বিষধরী, ধরিবারে যায়॥
অমূল্য রতন কণ্ঠে, না করে যতন।
কাচের কারণে করে, শরীরপতন॥

ঘোর ঘন্দ, ভ্রমে অন্ধ অন্ধকার তায়।
নয়ন থাকিতে জীব, দেখিতে না পায়॥
মনোময় তুমি কিন্তু, তোমায় ভুলিয়া।
কত ভাবে কত ভাবে, কল্পনা তুলিয়া॥
করুক ধরুক শিলা, যদি থাকে প্রেম।
তব জ্ঞানে মাটী ধোরে, প্রাপ্ত হবে হেম॥
কি দিয়ে পুজিতে হয়, কেহ নাহি জানে।
গঙ্গাজল বিল্বদল, গন্ধ পুষ্প আনে॥
অরূপ স্বরূপ তুমি, 'কত রূপ' বলে।
তুমি কি জলের বশ, তুষ্ট তুমি ফলে?
যোগ যাগ ভোগ রাগ, ভোগে করি ভর।
আগে ভাগে পূর্ণ করে, আপন উদর॥
খায় থাক যত পারে, অন্ন জল ফল।
তোমাতে থাকিলে মন, তবে পাবে ফল॥
হে নাথ! অনাথনাথ, দীন দয়াময়।
আমি দীন বোধহীন, ক্ষীণ অতিশয়॥
কি ভাবে ভাবিব ভাব, ন পাই ভাবিয়া।
কৃপাকর, কৃপা কর, নিজ জ্ঞান দিয়া॥
জগতে যে কিছু দেখি, সকলি তোমার।
কি দিয়া করিব পূজা, কি আছে আমার॥
তুমি প্রভু আমি দাস, তোমারি হয়েছি।
দিয়েছ, পেয়েছি দেহ, রেখেছ, রয়েছি॥
আমারে করেছ দান, এই দেহভূমি।
তাহাতে দিয়েছ প্রাণ, প্রাণনাথ তুমি॥
আমায় না জেনে 'আমি' আমি আমি কই।
তুমি যদি স্বামী হও, আমি আমি কই॥
আমি আমি নই, ফলে আর কেহ নই।
জগদাত্মা পরমাত্মা, তব সত্তা হই॥
মাটীর নির্ম্মিত ঘট, নহে মাটী বই।
সলিলের বিম্ব আমি, সলিলেই রই॥
যে সময়ে নিজ প্রভা, করিবে হরণ।
পাঁচে পাঁচ মিশাইলে, হইবে মরণ॥
আকাশ রয়েছে এই, ঘটের আগারে।
এই ঘট [illegible] প্রাণ, মৃত্যু বলে [illegible]॥

শূন্য হস্তে পুণ্য পাপ, গণ্য করি লয়।
অথচ জানে না কেহ, মরিলে কি হয়॥
যে হন সে হয় যোগে, বিফল বিচার।
প্রভু হে তোমার প্রতি, প্রণতি আমার॥
দাতার প্রধান তুমি, দয়ার নিদান।
দত্তহারী কেহ নাই, তোমার সমান॥
দিয়ে প্রাণ পুন লহ, করিয়া হরণ।
তথাচ করুণাময়, পতিতপাবন॥
উপকারী দত্তহারী, দেহ কত শিব।
এ ভব-বন্ধন-দায়, মুক্ত হয় জীব॥
যতকাল এই দেহে, থাকিবে জীবন।
ততকাল তোমাতেই, থাকে যেন মন॥
করিতে তোমার পূজা, কোথায় কি পাই।
চারিদিকে চেয়ে দেখি, কোন দ্রব্য নাই॥
প্রেমপুষ্প শ্রদ্ধানীর, ভাববিল্বদল।
সবে মাত্র আছে এই, পূজার সম্বল॥
শরীর নৈবেদ্য মম, উপচার সহ।
সাজায়ে রেখেছি এই, লহ লহ লহ॥
ছয়রিপু দান শেষ, অতি বলবান্।
তোমার নিকটে বিভু, দিব বলিদান॥

ভক্তাধীন।

যে হও, সে হও, তুমি, যে হও সে হও।
ভক্তাধীন ভগবান্ ভক্ত ছাড়া নও॥
ভাবময় ভাবরূপে, অন্তরেই রও।
অন্তর-অন্তর তুমি, কদাচ না হও॥
বাক্যরূপে রসনায়, তুমি কথা কও।
সর্ব্বসহারূপে তুমি, সমুদয় সও॥
ভারী হলে ভবভার, মস্তকেতে বও।
আমি হে কি দিব ভার, বুঝে ভার লও॥
যে হও সে হও তুমি, যে হও সে হও।
ভক্তাধীন ভগবান্, ভক্ত ছাড়া নও॥

আমি

সকলি অসার আর, সকলি অসার।
চিদানন্দ সদানন্দ, একমাত্র সার॥
স্ব স্বরূপ বিশ্বরূপ, তুমি বিশ্বসার।
এ জগতে কেবা জানে, মহিমা তোমার॥
চিন্ময় চৈতন্যরূপ, সর্ব্বমূলাধার।
আত্মারূপে বিরাজিত, দেহে সবাকার॥
স্বভাবে তিমিরময়, অখিল সংসার।
আলোরূপে তব রূপ, হতেছে প্রচার॥
যদি না প্রকাশ পায়, প্রতিভা তোমার।
জগৎ কি হতে পারে, শোভার ভাণ্ডার?
আমি যে হে 'আমি' বলি, সে 'আমি' টী কার।
আমির 'আমিত্ব' তুমি, সে নহে আমার॥
তুমিই বলাও (আমি), বলি বারবার।
তুমি না বলালে (আমি) বলে সাধ্য কার?
এ আমি যাহার (আমি) পুন হলে তার।
বলিতে বলিতে (আমি) (আমি) নাই আর॥
(আমি) যদি (আমি) নই, কে হইবে কার।
অতএব এ সংসার, সব ফক্কিকার॥
সকলি অসার আর, সকলি অসার।
চিদানন্দ সদানন্দ, একমাত্র সার॥

সম্বন্ধ নির্দ্দেশ।

অমঙ্গলে ভরা ধরা, কারো সুখ নাই!
ত্রাহি ত্রাহি, ত্রাহি ত্রাহি, করিছে সবাই॥
শোক তাপ, বিলাপের, বেদনা কেমন?
কাতরে ডাকিছে সবে, করিয়া রোদন॥
তাদের সে রবে তুমি, নাহি দেও কাণ।
শুননাকো কোন কথা, হয়েছ পাষাণ॥
তোমারে ডাকিছে তবু, জ্বোলে পুড়ে মরে।
অভিমানে দুখে তাই, নাই নাই করে॥
নাস্তিক, নাস্তিক আছে, নাহি মানে বেদ।
আস্তিকে নাস্তিক হয়, এই বড় খেদ॥
কর না কুশল দান, বিহিত বিচারে।
তুমিই নাস্তিক করে, তুলেছ সবারে॥
নাস্তিকেরা মেরে ফেলে, বলে নাই নাই।
আছ, আছ, আছ, বলে, আমরা বাঁচাই॥
'নাই' হলে মর তুমি, 'আছ' হলে বাঁচো।
বারবার বলি তাই, আছো আছো আছো॥
কিছুই ত হইত না, তুমি নাহি হলে।
আমরা সবাই আছি, তুমি আছ বলে॥
মনেতে না দেখা পাই, নাহি পাই 'পাঁচে'।
পাচের অতীত ধনে, দেখি আঁচে আচে॥
পাঁচ ছাড়া, আচ্ ছাড়া, এমন যে ধন।
সহজে কি হয়, তার, তত্ত্ব-নিরূপণ?
অস্থিরপঞ্চকে পোড়ে, স্থির নাহি পাই।
মনে যদি তর্ক করি, নাই বুঝি 'নাই'॥
শরীর আড়ষ্ট হয়, নাহি স্বরে ধ্বনি।
ফোপাইয়া কেঁদে উঠি, তখনি অমনি॥
ভয়ঙ্কর সেই ভাব, না হয় গোচর।
কেমন কেমন করে, মনের ভিতর॥
সে সময়ে 'কেহ' যেন, ভিতরে ঢুকিয়া।
ঘোরতর অন্ধকারে, আলো প্রকাশিয়া॥
বলে ওরে, দেখ্ দেখ্, কেন হোস্ জড়।
ঠাস্ কোরে, মনের, গালেতে মারে চড়॥
চড় মেরে নাহি থাকে, কোথা চলে যায়।
সে চড়ে চেতন পেয়ে, করি হায় হায়॥
বাহিরে, ভিতরে আর, নাহি দেখি তারে।
কেমনে সে এসেছিল, গেল কি প্রকারে?
যখন প্রকাশ পায় সে জ্যোতির ছটা।
তখন ভিতরে আর, থাকে নাক ছ-টা,॥
সসাগরা সপ্তদ্বীপ, তব অধিকার।
ছয় ছেড়ে শেষ দ্বীপে, করিছ বিহার॥
পরম পীযূষ তথা, করিতেছ পান।
আপনি আপন স্বরে, ধরিতেছ গান॥
ছয়দ্বীপে ছয় থাকে, সদা যায় দেখা।
তোমার সে নবদ্বীপে, তুমি থাকো একা॥

সেখানেতে নাহি হয়, দ্বয়ের গমন।
কাজেই সহজে তাই, না হয় মিলন॥
অগ্নি, জল, বায়ু আছে, আছে চাকা, কল।
চালাতে জানিনে আমি, হয়েছে অচল॥
অক্ষরে অক্ষরে যোগ, সন্ধান না হয়।
কলের কুলুপ খোলা, শক্ত অতিশয়॥
শেখালে না, শিখি নাই, কে শিখাবে আর।
মিছিমিছি ডাক ছাড়া, ভাবো, যা হবার॥
অধিক ভাবিতে গেলে, বেড়ে যায় বাই।
এখানেও 'তুমি' 'আমি' সেখানেও তাই॥
পিতা বলি, মাতা বলি, বন্ধু আর ভাই।
যখন যা বোলে ডাকি, তুমি নাথ তাই॥
ভাবের অন্যথা ভেদ, কিছুতে না হয়।
যে ভাবে, সে ভাবে, তুমি আছই সদয়॥
তুমি, আমি, উভয়েতে, যে সুপাদ্ হয়।
সে সুপাদ্ কখনই, ঘুচিবার নয়॥
কাণ পেতে শুন শুন, দোহাই দোহাই।
নূতন সম্পর্ক এক, ঘটাইতে চাই॥
নাস্তিকেরা, "নাস্তি" বোলে, করিছে নিধন।
"অস্তি" বোলে, আমি করি, তোমায় স্থাপন॥
তোমার "অস্তিত্ববাদ" করেছি যখন।
পাকাপাকি একখানা করিব তখন॥
জন্ম দিয়ে, "বাপ" তুমি, হয়েছ আমার।
জন্ম দিয়া আমি তবে, কে হব তোমার?
যদ্যপি আদর কর, মনেতে বিচারি।
এ সুপাদে তোমার তো, বাবা হতে পারি॥
বারবার "বাবা" বোলে, ডেকেছি তোমায়।
একবার "বাবা বলে" ডাক না আমায়॥
ছেলের এ আবদারে, আদর তো চাই।
বাপ বোলে ডাকিলে তো, লজ্জা কিছু নাই॥
অধমে বলিতে বাপ, লজ্জা যদি হয়।
যা বলিবে, তাই বল, বিলম্ব না সয়॥
ছেলে বল, দাস বল, বলা কিন্তু চাই।
না বলিলে কোন মতে, ছাড়াছাড়ি নাই॥
ফুটে না বলিতে পার, ভঙ্গী করে কও।
"ওরে বাবা আত্মারাম" হাবা কেন হও॥
যেরূপে জানাতে হয়, সেরূপে জানাও।
যেরূপে মানাতে হয়, সেরূপে মানাও॥

সব ভরপূর।

দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপূর
বাবা সব ভরপূর।
পরিমাণে ধনদানে গৌরব প্রচুর,
বাবা গৌরব প্রচুর॥
পেয়েছ উত্তম দেহ, যোগগুণে মন দেহ,
পরিহরি মোহ স্নেহ, চল সুরপুর॥
যোগযুক্ত অহঙ্কার, করি তায় অলঙ্কার,
করহ ওঁকার সার গর্ব্ব হবে চূর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপূর॥
নিশ্বাস হইলে রোধ, পরিজন হীন বোধ,
কাঁদিবে জনম শোধ, আহা উহু সুর।
মুদিলে নয়ন-পদ্ম, মন-মধুকর সদ্ম,
কৈবল্য কমল-সদ্ম, পাইবে মধুর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপূর॥
সুখ কভু মিথ্যা নয়, যত অনুগত চয়,
শীলতায় বশ হয়, শুন হে চতুর।
বিধাতার সুনির্ম্মাণ, সুখদ সম্ভোগ ভান,
ভোগ যোগে রাখ মান, দুঃখ হবে দূর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপূর॥
সুরা কভু নহে হেয়, সুরজন-উপাদেয়,
রমণীতে সেই পেয়, পান কর শূর।
তাহে প্রজা বৃদ্ধি হয়, প্রজাপতি-প্রথা রয়,
পিতৃ-নাম নহে ক্ষয়, বৃদ্ধি হয় ভূর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপূর॥
পরিজন-স্নেহনিধি, যতনে মিলায় বিধি,
এত নহে মন্দ বিধি, সুখের অঙ্কুর।
ধনধান্যে লক্ষ্মীলাভ, সৌভাগ্যের সুপ্রভাব,

মনোগত এই ভাব, আদেশ মন্থর,
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর॥
আশাই অতুল্য ভোগ, কর্ম্ম হয় যশোযোগ,
এত নহে পাপরোগ, আরাধ্য সাধুর।
সুখের এ কর্ম্মভূমি, পুত্র মিত্র নহে উর্ম্মি,
এ সব ত্যজিয়া তুমি, হইবে ভরপুর॥
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর॥
কুস্তধারী নট মত, হর কাল অবিরত,
গৃহকার্য্যে থাকি রত, ধিয়াও ঠাকুর।
অন্তসময় তব, শ্রুত মাত্র হরি রব,
পার হয়ে ভবার্ণব, যাবে শান্তিপুর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর॥

সব হ্যায় ফাঁক।

দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক,
বাবা সব হ্যায় ফাঁক্।
ধনের গৌরবে কেন মিছা কর জাঁক,
বাবা মিছা কর জাঁক॥

পেয়েছ যে কলেবর, দৃশ্য বটে মনোহর,
মরণ হইলে পর, পুড়ে হবে খাক্।
আমি আমি অহঙ্কার, আমার এ পরিবার,
কোথায় রহিবে আর, আমি আমি বাক্।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক্॥
নিশ্বাস হইলে রুদ্ধ, মৃত্তিকায় দেহ শুদ্ধ,
চারিদিকে হবে শুদ্ধ রোদনের ডাক।
মুদিলে যুগল আঁখি, সকল হইবে ফাকি,
কোথায় রহিবে চাকি, ভেঙ্গে যাবে চাক।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক্॥
মিথ্যা সুখে সদা রত, শত শত অনুগত,
গৌরব করিয়া কত, গোঁপে দেও পাক।
পোষাকের দাম মোটা, জুতা পায়ে এড়িওটা,
কপাল জুড়িয়া ফোঁটা, গোঁজা করে নাক।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক্॥

নারীর কোমল গাত্র, মদনের সুরাপাত্র,
তাহার উপর মাত্র, নয়নের তাক।
বসনে বিচিত্র সাজ, কাঁথায় রঙ্গিল কাজল,
শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ, ঢেকে রাখ টাক।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক্॥
স্নেহ করে পরিজন, সদাই সন্তুষ্ট মন,
সুদে সুদে বাড়ে ধন, কত লাক লাক।
রাখিয়াছে বাপদাদা, ধপ্ ধপ্ বর্ণ শাদা,
সারি সারি তোড়া বাঁধা, পোতে থাকে থাক,
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক্॥
হইয়া আশার বশ, ভ্রমে চাহ মিছা যশ,
বিষয়-বিষের রস, সহে পরিপাক।
তুমি কেবা, কেবা পুত্র, আপনার নাহি কুত্র,
মিছামিছি মায়াসূত্র, শেষ কুম্ভীপাক।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক্॥
চিন্তা কর পরকাল, নিকট বিকট কাল
জীবন ছাড়িবে কোল, না রহিবে কোন বোল,
হরেকৃষ্ণ হরিবোল, এই মাত্র ডাক্।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক্॥

কিছু কিছু নয়।

দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়,
বাবা কিছু কিছু নয়।
নয়ন মুদিলে সব অন্ধকারময়,
বাবা অন্ধকারময়॥
ধন বল জন বল, সহায় সম্পদ বল,
পদ্মদলগত জল, চিহ্ন নাহি রয়।
কারে আমি বলি, আমি যে মরণগামী,
মিছামিছি দিই আমি, আমি পরিচয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥
আগে হও পরিচিত, পরিশেষে পরিমিত,
না হইলে নিজ হিত, পরহিত নয়।
কার বস্তু কেবা লবে, কার বস্তু কার করে,

কেবা কারে দান করে, কেবা দান লয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥
যোগে সদা অনুযোগ, ভোগে মাত্র কর্ম্মভোগ,
তবু পাপ-আশা-রোগ, সাম্য নাহি হয়।
জলে নাহি তেল মিশে, তথাচ না ভাঙ্গে দিশে,
বিষম বিষয়-বিষে, কিসে সুখোদয়!
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥
কি হেতু সংসার সূত্র, কোথা পিতা কোথা পুত্র,
কোথা ছিলে, যাবে কুত্র বল মহাশয়।
না ভাবিয়া পরকাল, আপনার কর কাল,
বৃথা সুখে হর কাল, নাহি কালভয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥
কারিগুরি বহুতর, দৃশ্য বটে মনোহর,
কলে বদ্ধ কলেবর, দেহ যারে কয়!
সে কল বিকল হবে, তুমি নাহি তুমি রবে,
তুমি রব রবে রবে, কবে লোকচয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥
রমণী-বচন মদ, পান মাত্রে গদগদ,
তুচ্ছ করি ব্রহ্মপদ, প্রফুল্লহৃদয়।
অবশেষে বোধশূন্য, স্বভাবে স্বভাব ক্ষুণ্ণ,
কোথা তার থাকে পুণ্য, পাপে হয় লয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥
কারে বল গুড্ডুর, তুমি বটে বাহাদুর,
যত দেখ ভরপুর নয়।
সুখ লাভ করিবার, বস্তু নয় পরিবার,
দুখে কাল হরিবার, হেতু সমুদয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥
হিসাবের পথ সোজা, ঠিকে কেন দেহ গোঁজা,
সহজেই যায় বোঝা ভার বোঝা নয়।
জগ-ভ্রম পরিহরি, মুখে বল হরি হরি,
কৃতান্তকুঞ্জর হরি, হরি দয়াময়॥
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়।
নয়ন মুদিলে সব অন্ধকারময়॥

তত্ত্ব।

মলে কি হে সকলি ফুরায়?

বল বল, নাথ! মলে কি হে, সকলি ফুরায়?
এই জীব আর নাহি, আসে পুনরায়?
এই দেহ এ প্রকারে, নাহি হয় বারে বারে,
কর্ম্মভোগ একেবারে সব ঘুচে যায়।
এই দেখি এই এই, দেখিতে দেখিতে নেই,
এই এই, সেই সেই, শুনি পরস্পর॥
এই সব, এই সব, এইরূপ এই ভব,
কে মরে, কে বেঁচে থাকে বোঝা দায়।
নাম মাত্র ঘটাকাশ, এই জীব চিদাভাস,
ঘটের হইলে নাশ, পাঁচ পাঁচ পায়॥
অবিনাশী চিদাভাস, তার কভু নাহি নাশ,
দেহ-নাশে কেন লোক, করে হায় হায়?
কে মরে কে পায় মুক্তি, বুঝিতে না পারি যুক্তি,
নানাজনে নানা উক্তি, শুনে হাসি পায়॥
এই বলে হলো, হলো এই বলে মলো মলো,
কেবা হলো, কেবা মলো, সুধাইব কায়?
যত নরে পরস্পরে, বিচার বিতর্ক করে,
ঠিক যেন সম্ভাষণ, কালায় কালায়॥
কেহ কয় এই হয়, কেহ কয় নয় নয়,
রূপের প্রসঙ্গ যেন, কাণায় কাণায়।
সার কথা বলি যারে, সেই গালে চড় মারে,
বিচারেতে নাহি হারে, হাসিয়া উড়ায়॥
ডাক ছাড়ে চোটে চোটে, মুখে যেন খই
ফোটে,
কার সাধ্য এঁটে ওঠে, কথার ছটায়।
কত ছাঁদে করি ছাঁদ, বাদী হয়ে তুলে বাদ,
যুক্তিহীন তর্কবাদ, কতই ঘটায়॥
উপাসক এক দল, প্রকাশিয়া বুদ্ধি-বল,
মলে পরে জন্ম নাই, বলিয়া বেড়ায়।
এই কথা ব্যক্ত করে, নরলোক যত মরে,
তাদের সকল আত্মা, ভোগ নাহি পায়॥

THE RAMAKRISHNA MISSION
INSTITUTE OF CULTURE
LIBRARY
৪২৪৫৮

আছে তোলা গাছে ঝোলা, বাতাসে খেতেছে
দোলা,
গগনে ঘুরিয়া সব, এখন খেলায়।
ভবিষ্যতে একদিন হবে তারা ভোগাধীন,
বিচার হইবে শেষ, বিভুর সভায়॥
পুণ্যবান্ লোক যারা, চিরস্বর্গ পাবে তারা,
পাপী রবে চিরকাল নরক-বাসায়।
জন্ম এই হলো সবে, পরে নাহি জন্ম হবে,
এই কথাটী স্থির করে, কে এসে শুনায়!
কবে কোন নরলোক, গিয়ে সেই পরলোক,
ফিরে আসিয়াছে পুন, পুরাতন কায়?
পূর্ব্বজন্মে ছিল যাহা, প্রকাশ করিয়া তাহা,
কেবা সব হৃদয়ের, সংশয় কাটায়?
স্থির যার আছে মন, সেই করে নিরূপণ,
কিছুমাত্র প্রয়োজন নাহি জিজ্ঞাসায়।
জন্ম আর স্থিতি নাশ, স্বভাবেতে সুপ্রকাশ,
বারবার সাক্ষ্য দিয়ে, প্রমাণ দেখায়॥
ভূতের না হয় ধ্বংস, ভূতে ভুক্ত ভূত-অংশ,
সমবেত হয়ে ভূত শরীর গড়ায়।
জড়দেহ ভূতময়, ভূতে হয় ভূতে লয়,
সকলেই অভিভূত, ভূতের খেলায়॥
যদি বলি, দেহ "জড়," "চার্ব্বাকেতে মারে
চড়,"
তখনি চেতন বোলে, যাঠী নিয়ে ধায়।
ভক্তি-রথ টানে নাকো, পরকাল মানে নাকো,
তব তত্ত্ব জানে নাকো, আসিয়া ধরায়॥
তব তত্ত্বী যারা হয়, তাদের পাগল কয়,
অনল নিবাতে চায়, তৃণের শাখায়॥
তৃপ্ত নয় তত্ত্বরসে, রত সদা অপযশে,
নাস্তিক বলিয়া বসে, গায়ের জ্বালায়॥
আত্মার শরীর ধরা, বস্ত্র ছেড়ে বস্ত্র পরা,
জোঁক সব তৃণে তৃণে, যেমন বেড়ায়।
প্রবৃত্তির বশ হয়ে, প্রাক্তনের ক্রিয়া লয়ে,
দেহ-ঘরে ঢোকে জীব, তোমার ইচ্ছায়॥

দেহ-ঘটে আত্মা রন, কিন্তু তিনি দেহ নন,
সচেতন অচেতন, মায়ার মায়ায়।
স্থিতি নাশ, নাশ স্থিতি, সংসারের এই রীতি,
কেমনে কহিব তবে, মলেই ফুরায়?
কেমনে ঘুচিবে রোগ, না হয় সুযোগ-যোগ,
নাশিতে কর্ম্মের ভোগ সম্ভোগ বাড়ায়।
ভোগেতে কি ভোগ ছাড়ে, কর্ম্মেতেই কর্ম্ম
বাড়ে,
ঘুচাতে গায়ের মলা, ধূলা মাখে গায়॥
ঔষধ না খেলে পরে, শরীরে কি রোগ মরে,
কুপথ্যে রোগের নাশ হোয়েছে কোথায়?
বিনা আলোকের ভাস, কিসে হবে তমোনাশ,
অন্ধকার অন্ধকার, কেমনে ঘুচায়?
কাটিতে দড়ার ফাঁসি, অস্ত্রের না করে আশ,
সূতা দিয়ে সেই "ফাঁস" কেবল জড়ায়।
মিছে করি পরিশ্রম, কিছুই হলো না ক্রম
ঘোচে না মনের ভ্রম, অজ্ঞান-দশায়॥
মিথ্যার সত্যের ভান, মনে নাহি পায় স্থান,
তত্ত্ব-নিরূপণ হয়, জ্ঞান-অবস্থায়।
"আমি" যদি "তুমি" হই, আমার বিনাশ
কই,
এ কথাটী কারে কই, কে বলে আমায়?
ছিল শিব, হলো জীব, আছি জীব হব শিব,
এইরূপ জীব শিব, আমায় তোমায়।
পাশভুক্ত হলে জীব, পাশমুক্ত হলে শিব,
জীব ঘুচে শিব হব, কোথা সদুপায়॥
যখন কাটিব ডোর, ঘুচে যাবে কর্ম্মঘোর,
জীব ঘুচে শিব হব, সন্দেহ কি তায়?
যে জীবেতে দয়াময়, তোমার না দয়া হয়,
সেই জীব জীব রয়, শিবত্ব না পায়॥
তুমি কৃপা কর যারে, ত্রিতাপে তরাও তারে,
সেই জীব একেবারে শিব হয়ে যায়।
ফলত তোমায় তাত, কিছু মাত্র নাহি হাত,
নিজ নিজ ভাগ্য ভোগ, করে সমুদায়॥

কর্ম্ম যার যে প্রকার, তব ইচ্ছা সহকার,
সে প্রকার ভোগ তার, ঘটায় ঘটায়।
ক্রিয়াসাক্ষী সচেতন, ফলদাতা সনাতন,
অথচ নির্লেপ তুমি, আকাশের প্রায়॥
নিজ কর্ম্ম উপসর্গ, তাতেই নরক স্বর্গ,
পুণ্য-পাপে সুখ দুখ ভোগায় ভোগায়।
তব তত্ত্বহত যত, প্রবৃত্তির পথে রত,
দুখে সুখে অবিরত দোষ গুণ গায়॥
মরি মরি, আহা আহা, তোমার বিচার যাহা,
কেহই জানে না তাহা, হায় হায় হায়!
কিন্তু নাথ! স্থির জানি, ঘোরতর অভিমানী,
কেবল অধর্ম্ম করে মানব সভায়॥
রিপুপিশাচের মতে, পাপাচার নানা মতে,
তোমার পবিত্র পথে ভ্রমে নাহি ধায়।
এমন যে মূঢ় জন, যদি স্থির করি মন,
ক্ষণকাল চোখ বুজে তোমা পানে চায়॥
মনে মুখে এই কয়, হর মম পাপচয়,
দীনদয়াময় তুমি রয়েছ কোথায়?
কটাক্ষেতে একবার, সে পাপ থাকে না আর,
কর্ম্মপাশ কাটে তার তোমার কৃপায়॥
কিন্তু ওহে দয়াময়, এ বড় সহজ নয়,
অকস্মাৎ এ প্রবৃত্তি কেবা দেয় তায়?
ভিতরের ভাব তাব, সাধ্য কার বুঝিবার,
তবেই বুঝিতে পারি বুঝালে আমায়॥
এ বোঝাতো সোজা নয়, বক্তা হয়ে কেবা কয়,
কে বোঝাবে কে বুঝিবে তব অভিপ্রায়?
বুঝিবার নাহি পুঁজি, কাজ নাই বোঝাবুঝি,
এই বুঝি সোজাসুজি স্থান দেহ পায়॥
তুমি প্রভু আমি দাস, পদ মাত্র অভিলাষ,
ফিরিনেকো আর কোন পদের আশায়।
এই ঘরে ঢুকাইয়া, আছ তুমি লুকাইয়া,
দেখা যদি নাহি দেও কি কাজ দেখায়?
এখন রয়েছি একা, পাবই পাবই দেখা,
চাতকেরে জলধর কদিন ভাঁড়ায়?

পূর্ণিমার নিশি হলে, আপনি টানিবে কোলে,
চকোর চাঁদের সুধা প্রভাতে কি পায়?
যখন সময় হবে, আপনিই কোলে লবে,
আপনিই দেখাইবে বিহিত উপায়।
অঙ্কুর হয়েছে যবে, সময়ে সুফল হবে,
অঙ্কুরে ফলের আশা বৃথায় বৃথায়॥
শুন ওহে মম মূল, হও হও অনুকূল,
যেন নাহি হয় ভুল দশম দশায়।
ভাঙো ভাঙো ভব মেলা, এখন করো না হেলা,
যায় যায় যায় বেলা খেলা হলো সায়॥
পার যেন হই অল্পে, আর যেন কোনো কল্পে,
মায়ার মাতালে গল্পে নাহি পাড়ি সায়।
পূজা হোম জপ মন্ত্র, নাহি জানি বেদ তন্ত্র,
স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুথি প্রকৃতি পড়ায়॥
কখনো পড়িনি শ্রুতি, শেখেছি যুগল শ্রুতি,
শ্রুতির অধীন স্মৃতি স্মৃতি কেবা চায়?
রসনা আচার্য্য হয়, শ্রুতিমূলে সদা কয়,
"জয় জগদীশ জয়" মধুর ভাষায়॥
এই ধ্বনি প্রতিক্ষণ, ধ্বনিধনে ধনী মন,
আপনি আপন ভাবে হাসায় কাঁদায়।
শুনেছি দর্শন ছয়, নয়ন দর্শনদ্বয়,
সমুদয় ব্রহ্মময় নিয়ত দেখায়॥
কাজ নাই দরশন, যাহা করি দরশন,
তাতেই মোহিত মন তব মহিমায়।
ধরা জল বহ্নি, বাত, দিবা নিশি সন্ধ্যা প্রাত,
সকলেই প্রতিভাত তোমার প্রভায়॥
যত কিছু রমণীয়, যত কিছু কমনীয়,
সকলেই শোভনীয় তোমার শোভায়।
প্রভাকর প্রভাকর, তুমি তার প্রভাকর,
নতুবা এ রবি ছবি কোথায় লুকায়॥
এই ভব চরাচর, বটে বটে মনোহর,
কিন্তু নহে স্থিরতর রচিত মায়ায়।
বিবেকী বিবেকে কয়, নিত্য নয় নিত্য
সমুদয় ভুতময় ভুতের মেলায়॥

ভূতাতীত নিরঞ্জন, তুমি মাত্র নিত্যধন,
এ ধনের মদে মত্ত কর হে আমায়।
তোমায় চিনেছে যেই, তোমায় কিনেছে সেই,
না চায় কিছুই আর তোমায় না চায়॥
একেবারে স্থির হয়, কোন কথা নাহি কয়,
যে কি আর ভবঘোরে ঘূরিয়া বেড়ায়?
কিছু আর নাহি চায়, কোনখানে নাহি যায়,
বসে থাকে তব তত্ত্ব-তরুর ছায়ায়॥
সন্তোষের সরোবরে, মগ্ন হয়ে স্নান করে,
নাহি থাকে তৃষ্ণা ক্ষুধা শান্তিসুধা খায়।
সদানন্দ ভাব ধরে, নিত্য সুখে কাম হরে,
কর্ণপাত নাহি করে কাহারো কথায়॥
নিজ ভাবে নিজে গলে, নিজ বোধ-পথে চলে,
দেহ মাত্র গেহ তার বাস করে যায়।
ভেদাভেদ কিছু নাই, সমভাব সব ঠাঁই,
সতত সমান সুখ যথায় তথায়॥
বিকারবিহীন মন, তৃণ দেখে ত্রিভুবন,
কোটি কোটি ইন্দ্র এলে ফিরে নাহি চায়।
মুচি নাই শুচি নাই, তুল্য দেখে সোণা ছাই,
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করে পড়িয়া ধূলায়॥
সে সময়ে তুমি তার, দেহ কর অধিকার,
রাজা হয়ে বসো গিয়ে মনের সভায়।
অন্তরে বিরাজ কর, ধীরেন্দ্রের ধর্ম্ম ধর,
যত সব দুষ্ট চোর ভয়েতে পলায়॥
অভেদে হইয়া এক, কর আত্ম-অভিষেক,
উপসর্গ আদি ভেদ আসিতে না পায়।
বিষম বিপক্ষ যারা, কেমনে আসিবে তারা,
প্রবোধ প্রহরী হয়ে বসে প্রহরায়॥
তুমি ধাতা তুমি পাতা, ফলদাতা তুমি ত্রাতা,
তুমি নাথ সর্ব্বমূলাধার।
সৃজিয়াছ শত শত, অচল সচল যত,
চলাচল অখিল সংসার॥
ভূণ আদি ধরাধর, এই সব চরাচর,
অপরূপ শোভার ভাণ্ডার।

আহা কিবা মরি মরি, স্বভাব স্বভাব ধরি,
দেখাতেছে মহিমা তোমার॥
জলে স্থলে শূন্যোপরে, পরস্পরে সুখে চরে,
সকলেরি সরস-অন্তর।
অহঙ্কার সুরাপানে, মেতে ঘোর অভিমানে,
কেবল অসুখী যত নর॥
বাসনার হয়ে বশ, খেতেছে বিষয়-রস,
পেতেছে তাহাতে কত দুঃখ।
আশা নাহি হয় নাশ, ক্রমে বাড়ে অভিলাষ,
নাহি পায় সত্য-সুখ॥
যত ভোগ বাড়ে যার, তত লোভ বাড়ে তার,
কিছুতেই শেষ নাহি হয়।
কিবা দীন, কিবা ভূপ, সকলেরি একরূপ,
সব ঘরে হাহাকারময়॥
যার যত বাড়ে পদ, তার তত বাড়ে মদ,
মদে পদ স্থির রাখা দায়।
শত লক্ষ কোটীশ্বর, সম্রাট্ ভূপতীশ্বর,
তার পর ব্রহ্মপদ চায়॥
কতই কল্পনা জানে, চন্দ্র চক্র বেঁধে আনে,
শমনেরে করে ছত্রধারী।
স্বর্গ মর্ত্ত্য আদি স্থল, সব দেয় রসাতল,
তোমারে করিয়া আজ্ঞাকারী॥
কখনো এ ভাব ধরে, তোমার তুমিত্ব হরে,
একেবারে মানে না তোমায়।
যে বলে ঈশ্বরো নাস্তি, কেবা তার দেয় শাস্তি,
তুমি কিছু বলনাতো তায়॥
এখন না বল বল, পরে দিবে প্রতিফল,
এ কথাটী বুঝাইব কারে?
এই দেহ অন্তে তার দণ্ড হবে কি প্রকার,
তথ্য তার কে কহিতে পারে?
দুরাচার বলী যত, পরের পীড়নে রত,
প্রকাশিয়া প্রবল প্রতাপ।
নির্দ্দোষ অধীন যারা, তাদের করিছে সারা,
পদে পদে দিয়ে পরিতাপ॥

এক্ষন নিদয় নয়, তাদেরি উন্নত কর,
দণ্ড কিছু দেখিতে না পাই।
মনোদুখে তাই কই, দণ্ডদাতা বিভু কই,
নাই নাই নাই "তুমি" নাই॥
ক্ষণ পরে পুনর্ব্বার, করি এই সুবিচার,
তোমার কৃপার উপদেশে।
যুক্তি আছে স্থির করা, প্রবল পাপের ভরা,
ডোবেই ডোবেই ডোবে শেষে॥
দোষহীন দীনচয়, পীড়া পেয়ে এই কয়,
মুখ ফুটে কিছু কবনাকো।
'ব্যথা পাই যে প্রকার, কর তার প্রতীকার,
হে ঈশ্বর! যদি তুমি থাকো।'
আর্ত্তনাদ শুনে তার, না করিয়া সুবিচার,
তুমি আর কিরূপেতে বাঁচো?
সোয়ে সোয়ে বারে বারে, দণ্ড দেও একেবারে,
আছ আছ আছ তুমি আছো॥
দণ্ডদাতা নাম ধর, দোষী জনে দণ্ড কর,
হর হর, হর পাপভার।
ক্রিয়াসাক্ষী দয়াময়, বিচারে যেমন হয়,
সাধুজনে দেও পুরস্কার॥
'কর্ত্তা নাই কেহ আর, এইরূপ এ সংসার,
নিজে হয় নিজে পায় নাশ।'
এ কথা তো শুনিব না, 'যুক্তি' বোলে গুণিব না,
এখনি করিব উপহাস॥
'স্বভাবে' যদ্যপি হয়, সে 'স্বভাব' অন্য নয়,
সে 'স্বভাব' তুমিইতো হও।
স্বভাবে স্বভাব লয়ে, ধাতা, পাতা ত্রাতা হয়ে,
'কারণরূপেতে সদা' রও॥
আমারে এ সব লোক, আস্তিক, নাস্তিক, কোক,
যে প্রকার ইচ্ছা যার হয়।
আস্ত নাস্তি নাহি জানি, কেবল তোমায় মানি,
তোমাতেই মন যেন রয়॥

প্রাণাধিক প্রিয়তম, হর হর হর ভ্রম,
কর কর কৃপা-বিতরণ।
গুরু বোলে কারে ধরি, কার কাছে শিক্ষা করি,
মানবের ধর্ম্ম-আচরণ?
অনেকেরি কাছে যাই, গুরু না দেখিতে পাই,
মিছেমিছি তর্কবাদ করা।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কিন্তু একি বিপরীত,
ভিতরেতে অভিমান ভরা!
বিদ্যার সে সার মর্ম্ম, নাহি দেখি তার মর্ম্ম,
কর্ম্মে নাই ধর্ম্মের সঞ্চার।
আমি 'স্বামী' বড় কত, চলিবে আমার মত,
বিদ্বানের এই অহঙ্কার!
পৃথিবীর সব ঠাঁই, সমান দেখিতে পাই,
অভিমানে সাধিতেছে ক্রিয়া।
দেশ দেশ দেখ পিতে, ধর্ম্মমত চালাইতে,
দলাদলি করে তোমা নিয়া॥
কত মতে চলিতেছে, কত কথা বলিতেছে,
কত ছলে ছলিতেছে কত
এইরূপ ঘেষাঘেষে, পরস্পর দেশে দেশে,
মতগর্ব্বে সবে অনুরত॥
একের সন্তান হয়ে, একের দোহাই লয়ে,
বিচারেতে বিবাদ বাড়ায়।
তব তত্ত্ব ছোঁবে নাকো, ভিতরেতে ডোবে, নাকো,
ভেসে ভেসে কেবল বেড়ায়॥
ধর্ম্মযুদ্ধে যুদ্ধ করি, পরস্পর অস্ত্র ধরি,
কাটাকাটি এতে ওতে তোতে।
প্রকৃতিরে হাসাতেছে, পৃথিবীরে ভাসাতেছে,
স্বজাতির শোণিতের স্রোতে!
ধর্ম্মের আচার্য্য যারা, এইতো ধার্ম্মিক তারা,
বুঝিলাম ধর্ম্ম আচরণে।
দেখে শুনে সাধু যত, বিরলে হাসিছে কত,
তুমিও হাসিছ মনে মনে॥

সর্ব্বধর্ম্ম ছাড়ে যেই, তোমারেই পায় সেই,
অনুকূল তুমি হও তার।

অহঙ্কার অভিমান, যতক্ষণ বলবান্,
ততক্ষণ তোমার কি পায় ?

শিখে "বিদ্যা অর্থকরী" গৃহস্থের ধর্ম্ম ধরি,
অর্থ এনে চালিব সংসার।

কিরূপেতে অর্থ পাই, বল বল কোথা যাই,
সেতো নয় সহজ ব্যাপার ॥

জানে উপার্জ্জনধারা, বিষয়ী পুরুষ যারা,
অর্থকরী বিদ্যা শিখিয়াছে।

বড় বোলে নিজে জানে, নিজে থাকে নিজ মানে,
কারে নাহি যেতে দেয় কাছে ॥

সভ্য-অভিমানী যারা, মরি কিবা সভ্য তারা,
সভাতল কি কব ব্যাভার ?

কার্য্য করে দেখিয়াছি, পরীক্ষার জানিয়াছি,
সভ্যতাই পাপের ভাণ্ডার ॥

কত কাণ্ড ঘরে ঘরে, ভিতরে সকলি করে,
গোপনে পাপের নাহি ভয়।

চুপি চুপি ব্যবধান, সাবধান সাবধান,
দেখো যেন প্রকাশ না হয় ॥

যারা কিছু সভ্য হন, অনায়াসেই এই কন,
উহু উহু বাপ্ বাপ্ বাপ্।

আড়ালে যা কর ভাই, তাহে কোন পাপ নাই,
প্রকাশ হইলেই বড় পাপ ॥

কোথা নাথ দয়াময়, দেখ দেখ সমুদয়,
মজিল মজিল সব দেশ।

পরস্পর পরস্পরে, পাপাচারে রত করে,
করিয়া মিথ্যার উপদেশ।

দেখিতেছি এই ধরা, ছলনা-চাতুরিভরা,
ন্যায়পথে ধন নাহি আসে।

ন্যায়েতে যে ধন হয়, সে কিছু অধিক নয়,
নির্ব্বাহ না হয় অনায়াসে ॥

বিনা ধনে কি প্রকারে, উদর চলিতে পারে,
পরিবার কিসে থাকে বশ ?

যাই আমি যার বাসে, দুখী বোলে সেই হাসে,
কয় কত বচন কর্কশ ॥

কিঞ্চিৎ ধনের পতি, তারা নয় শান্তমতি,
মানমদে মেতে সদা রয়।

নম্র হয়ে প্রতিক্ষণ, যতই যোগাই মন,
তথাপিও তুষ্ট নাহি হয় ॥

কত উপাসনা করি, কতরূপ ভেক ধরি,
নর প্রভু না হন সদয়।

যে সময়ে চাই টাকা, তখনি বদন বাঁকা,
আর নাহি হেসে কথা কয় ॥

ব্যবসা-বাণিজ্য করি, যদ্যপি উদর ভরি,
বিঘ্ন কত সহজ সে নয়।

ভেবে করিলাম স্থির, কোন মতে সংসারীর,
কিছুতেই সুখ নাহি হয়।

পাইতে রাজার প্রীতি, যদি শিখি রাজনীতি,
রাজনীতি অতি সুকঠিন।

রাজা রন রাজপাটে, ফিরিতেছি হাটে ঘাটে,
আমি নিজে দীন হীন ক্ষীণ ॥

তুমি অতি অপরূপ, সকল ভূপের ভূপ,
দেখিতেছ রাজ-আচরণ।

রাজাদের রাজ্য-পাট, যেন নটুয়ার নাট,
ব্যবহার বেশ্যার মতন ॥

ভূপতির শুভদৃষ্টি, কাণামেঘে যেন বৃষ্টি,
রুষ্টি তুষ্টি পারিনে বুঝিতে।

তোষে কত পোরে আশ, রোষে হয় সর্ব্বনাশ,
নাহি দেয় দেখিতে শুনিতে ॥

লোচন যাহার কাণ, চোখে না দেখিতে পান,
শুনে শুধু করেন বিচার।

ইথে যত হতে পারে, সে কথা কহিব কারে,
মন্ত্রীর চরণে নমস্কার ॥

বচনেতে কার্য্য নাই, রাজদ্বারে অর্থ চাই,
কিসে হয় সংঘটনা তার ?

"মান" আর "অপমান", দ্বারী দুই বলবান্,
রক্ষা করে ভূপতির দ্বার ॥

এই কথা কেহ "মান", থাকে মান, পাবে মান,
এসো এসো, খোলা আছে পুর।
"অপমান" ডেকে কয়, অপমানে থাকে ভয়,
এসোনারে দূর দূর দূর ॥
মানবের অভিমান, কত তার পরিমাণ,
অনুমান কিছুতে না হয়।
কিসেই বা বাড়ে মান, কিসে হয় অপমান,
ব্যবহারে মনে করি স্থির ॥
ধনী আর রাজগণ, কি বলিলে তুষ্ট হন,
নিরূপণ করিতেছি তাই।
মানময় সম্ভাষণ, মহিমার সম্বোধন,
"বিশেষণ" খুঁজে নাহি পাই ॥
তখন যে ভাবে রই, তোমারে হে "সর্ব্বজই"
'তুমি' বোলে, 'তুই' বোলে ডাকি।
যা বলি তাতেই তুষ্ট, কিছুতে না হও রুষ্ট,
মনে কিছু ভয় নাহি রাখি ॥
মানুষের সম্বোধনে, বড় ভয় হয় মনে,
তুমি "তুই" সাধ্য কার কয়?
"মহামান্য গুণমণি, শিরোমণি নৃপমণি"
মহারাজ "বাবু" মহাশয় ॥
যত কর সম্বোধন, তবু নাহি উঠে মন,
বলিব, ভেবে মরি দুখে।
তোমারে হে দয়াময়, যদি বলি "মহাশয়"
বাধো বাধো যেন হয় মুখে ॥
যেখানে দ্বিপদ যত, প্রায় সব এই মত,
দুই এক সাধু লোক যাঁরা।
স্বজাতির দেখে গতি, হয়ে অতি শুদ্ধমতি,
লোকালয় ছেড়েছেন তাঁরা ॥
বান্ধব, কুটুম্বগণ, আর আর নিজ জন,
সুখে রব সকলের সহ।
নাহি সুখ একটুক, দিনে দিনে ঘটে দুখ,
বৃদ্ধি হয় কেবল কলহ ॥
লোকাচারে দেশাচারে, জাতিপ্রথা-ব্যবহারে,
নাহি হয় সত্যের প্রকাশ।

সত্যের হইলে দাস, এ সকল হয় নাশ,
সমাজেতে করে উপহাস ॥
সমাজেতে যদি রই, সভ্য-সভা ছাড়া-হই,
তোমা ছাড়া হতে তবে হয়।
সত্য আর লোকাচার, আলো আর অন্ধকার,
একাধারে কেমনেতে রয়?
যদ্যপি তোমায় স্মরি, সত্যের সাধনা করি,
দেশ ভায় দ্বেষ করে কত।
অনাচারী নিজে যারা, অনাচারা বলে তারা,
হরি হরি ভেবে জ্ঞানহত ॥
স্বভাবে বিকারে মরে, হরি বলে ভাস ধরে,
মিথ্যাময় জগৎ অসৎ।
আপনি অসৎ হয়, সত্যেরে অসৎ কয়,
হায় হায় হায় রে জগৎ!
জগতের এই গতি, নর নহে মহামতি,
সুখ নাহি হয় ধনে জনে।
পূর্ব্বতন সাধু যত, তপস্যায় হয়ে রত,
সাধ করে গিয়াছেন বনে ॥
রাগ দ্বেষ অহঙ্কার, অভিমান পাপাচার,
ধনের বিকার নাই যথা।
বনচর-সঙ্গী হয়ে, কেবল সাধনা লয়ে,
নিত্যসুখে রয়েছেন তথা ॥
সে সাধুর সঙ্গ-যোগ, কপালে হলো না ভোগ,
মিছে কেন নরদেহ ধরি?
যথা যোগী যোগাসনে, গিয়ে আমি সেই বনে,
পশু কিম্বা পাখী হয়ে চরি ॥
ওহে পশু-পক্ষীগণ! শুন মম নিবেদন,
যাতনা সহে না প্রাণে আর!
মানবের দেহ নিয়া, তোদের শরীর দিয়া,
কর রে আমার উপকার ॥
সাধুরে তোরাই সাধু, সাধু সাধু সাধু সাধু,
বিষয়ে না হও ঝালাপালা।
যথা রুচি তথা যাও, যথারুচি খাও দাও,
ভুগিতে না হয় কোন জ্বালা ॥

কুল মান জাতি ধর্ম্ম, নাহি জান কোন কর্ম্ম,
নাহি থাক দলাদলি-ঘোঁটে।
পরকাল নাহি মানো, রাজপীড়া নাহি জানো,
তাই খাও যখন যা জোটে॥
নাহি জান জুয়াখেলা, নাহি জান গুরু চেলা,
নাহি জান মন্ত্র পূজা স্তব।
নাহি জান তোষামোদ, উমেদারী অনুরোধ,
কেবল শিখেছ নিজ রব॥
অভিমান কিছু নাই, এক ভাব সব ঠাঁই,
এক ভাবে থাক চিরদিন।
সদাই আনন্দময়, সুখময়-সদাশয়,
নাহি মানো মৌলিক কুলীন॥
নাহি দেও রাজকর, রাজারে না কর ডর,
ঠেকনিকো রাজনীতি দায়।
দেওনি হাটের কড়ি, খাওনি গুরুর ছড়ি,
নাহি জান ব্যয় আর আয়॥
নাহি চড় গাড়ী ঘোড়া, নাহি পর জামাজোড়া,
নাহি পর বস্ত্র অলঙ্কার।
আপনি না বাবু হও, কাহারে না বাবু কও,
নাহি বও "সে আজ্ঞার" ভার॥
কিছুই বালাই নাই, সম সুখে আছ তাই,
নাহি চাও বালিস মাদুর।
স্বভাবে হয়েছ রাজা, নাহি আর রাজা সাজা,
নাহি কর "হুজুর হুজুর॥"
কেহ নও হাড়ি মুচি, সবাই সমান শুচি,
কখনই না হও মলিন।
ধূলা কাদা কাঁটাবন, তাহাতে প্রফুল্ল মন,
নাহি করে গাত্র ঘিন্ ঘিন্॥
নাহি দান প্রতিগ্রহ, ভোগ কর শুভগ্রহ,
ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেয়ে।
স্থিতি নাশ কি প্রকারে, কি হতেছে এ সংসারে,
একবার দেখোনাকো চেয়ে॥
ই দেখাদেখ,

ভাণ্ডার উদর মাত্র, পূর্ণ ক নই পাত্র,
নাহি জান সঞ্চয় কেমন
পরকুচ্ছা নাহি কর, পরিব নাহি ধর,
নাহি কর লোকাচার-ভয়।
সাধুর খাতক নও, আপনিই সাধু হও,
সদাকাল সদয়-হৃদয়॥
সদাই মনেতে খুসী, নাহি ছোঁও কোশা কুশি,
কুশো হাতে শ্রাদ্ধ নাহি কর।
নাহি লও কোন দুখ, কেবল করিছ সুখ,
বাপ মলে কাচা নাহি পর॥
রবি আর ক্ষিতি গোল, শাস্ত্রে শাস্ত্রে কত গোল,
সে দোষের গোলে নাহি থাকো।
কিছুতেই সংশয় নাই, মীমাংসার হেতু তাই,
গুরু বলে কারে নাহি ডাকো॥
এলে মানবের কাছে, পাপতাপ ঘটে পাছে,
মনে মনে করি এই ত্রাস।
সিদ্ধ-সাধু-যোগী-সহ, বিভু-ধ্যানে অহরহ,
বিরল বিপিনে কর বাস॥
লোকালয়ে এসো নাই, ভাল করিয়াছ ভাই,
এলে পরে প্রমাদ ঘটিত।
মানুষের ব্যবহার, অভিমান অহঙ্কার
হৃদয়ের ভাণ্ডার ভরিত॥
কিন্তু তাই স্তুতি করি, সরল স্বভাব ধরি
সরলতা দেখাও দেখাও।
স্বভাবের ভাব যাহা, বিশেষ করিয়া তাহ
মানুষেরে শেখাও শেখাও॥
তোমাদের আচরণ, সদালাপ সুবচ
জানে না অজ্ঞান নর যত।
হয়ে ঘোর অভিমানী, তাই বলে নীচ প্রা
হাসিব কাঁদিব আর
দম্ভ যার নাহি রয়, মহাপ্রাণী তারে ক
অভিমানী মহাপ্রাণী নহে।
মত্ত হয়ে অহঙ্কারে, কি প্রকা
আপনারে মহাপ্রাণী কহে?

তোমাদের ভগবান্, করেছেন 'যাহা' দান,
তাই নিয়া সুখে কর ভোগ।
ভাব সেই পরপ্রভু, শিখো না শিখো না কভু,
মনেবের অভিমান-রোগ॥
দেখিয়া স্বভাব-ভাব, করিতেছি অনুভাব,
যখন যে ভাব ঘটে ঘটে।
ওহে ভাই বনচর, যদিও না হও নর,
মহৎ তোমরা বটে বুটে॥
ঈশ্বরের "আজ্ঞা' যাহা, তোমরা পালিছ তাহা,
কখনই কর না লঙ্ঘন।
যথাচারী নর যত, হিতাহিত-জ্ঞানহত,
নাহি করে নিয়ম-পালন॥
স্বভাবে শোভিত সবে, স্বভাবেই সুখে রবে,
অভাব না হবে কোন দিন।
আমার এ কলেবর, অভাবে পূরিত ঘর,
আমি নর চিরদিন দীন॥
নর-দেহ,নে রে,নে,রে,তোর দেহ দে রে, দে, রে,
নে রে, নে রে, ঘর,দ্বার, ছাপা।
বিনয়-বচন ধর, দায় হতে মুক্ত কর,
কাণ দেখে হোস্ নে রে খাপা॥
ধোরে মানুষের দেহ, মানুষে করিয়া স্নেহ,
মিছা কাল করিলাম বই।
স্বরূপে মানুষ কই, এমন মানুষ কই,
আমি ত মানুষ নিজে নই॥
কোথা বিভু বিশ্বকর, আমায় করিয়া নর,
বেদনা দিতেছ কেন আর?
কর দেখি উপদেশ, কেন দিলে রাগ দ্বেষ,
কেন দিলে দম্ভ অহঙ্কার?
তুমি নাথ ইচ্ছাময়, কর যাহা ইচ্ছা হয়,
ইচ্ছায় চলিছে এ সংসার।
যে কলে চলাও চলি, যে বলে বলাও বলি,
সম্ভাবনা কি আছে আমার?
কিন্তু নাথ মনে জানি, নর বটে মহাজ্ঞানী,
তাহাতে সংশয় কিবা আছে?

কাম, ক্রোধ,অহঙ্কারে, লোভে যায় ছারেখারে,
এই বড় দোষ ঘটিয়াছে॥
মানবীয় মানসীয়, শক্তি অতি রমণীয়,
হয় তায় অভাব-মোচন।
নানারূপ যুক্তি ধরি, নানাবিধ গ্রন্থ করি,
বস্তুতত্ত্ব করে নিরূপণ॥
ব্যাকরণ, অলঙ্কার, জ্যোতিষাদি কাব্য আর,
আয়ুর্ব্বেদ, নীতি-উপদেশ।
অঙ্ক আদি শত শত, [illegible] বিদ্যা যত,
জ্ঞান আর বিজ্ঞান [illegible]॥
জ্ঞানেতে তোমায় জানে,ভক্তি করি তাই মানে,
জ্ঞানে করে গ্রন্থের রচনা।
রাশি, পক্ষ, গ্রহ, বার, স্থির করি বারবার,
গ্রহণাদি করিছে গণনা॥
কৃষিকার্য্যে দেয় ভোগ, চিকিৎসায় হরে রোগ,
শিল্পকার্য্যে হয় কত ক্রিয়া।
পরস্পর সহকারে, পরস্পর উপকারে,
যায় সব অভাব ঘুচিয়া॥
মানুষের বুদ্ধিবলে, কলে, জলে তরী চলে,
স্থলে কলে চলে বাষ্পরথ॥
তাহাতে কল্যাণ কত, সুখী লোক শত শত,
দূর নহে ছমাসের পথ।
বিলাতে হতেছে যাহা, এখনি এখানে আহা,
তারে তার আসে সমাচার।
ঘটিকাদি ছাপাকল, সকলি বুদ্ধির কল,
বিশেষ কহিব কত আর?
এত গুণে গুণী নর, হসে এত কার্য্যকর,
এত সব কুরি প্রকরণ।
দ্বেষ, দম্ভ কার্য্যদোষে, নাহি থাকে পরিতোষে,
না পায় সুখের আস্বাদন।
ভবসিন্ধু পার হেতু, জ্ঞানরূপ এক [illegible]
মানবে করেছ তুমি দান।
সংসার-সাগর-পার, [illegible]
অক্লেশে [illegible]

হায় হায়, হাহাকার, মুখে রব সবাকার,
জীবিকার সঞ্চার কারণ।
সন্তোষের সমাচার, কেহ নাহি লয় আর,
বৃথা করে জীবনযাপন॥
কৃপা কর কৃপাকর, মানবে মানব কর,
হর হর মনের বিকার।
আমিও মানুষ নই, মানুষে মানুষ কই,
ধরি মানুষের ব্যবহার॥

গৌরব অভাবে সকলি মিথ্যা।

সেই তরু তরু নয় নাহি যার ফল।
সেই লতা লতা নয় নাহি যার দল॥
সেই নদী নদী নয় নাহি যার জল।
সেই সেনা সেনা নয় নাহি যার বল॥
সেই অসি অসি নয় নাহি যার ধার।
সেই ফল ফল নয় নাহি যার তার॥
সেই দেহ দেহ নয় নাহি যার রূপ।
সেই দেশ দেশ নয় নাহি যার ভূপ॥
সেই ফুল ফুল নয় নাহি যার মধু।
সেই নারী নারী নয় নাহি যার বঁধু॥
সেই যোগী যোগী নয় নাহি যার যোগ।
সেই ভোগী ভোগী নয় নাহি যার ভোগ॥
সেই মণি মণি নয় নাহি যার প্রভা।
সেই রূপ রূপ নয় নাহি যার শোভা॥
সেই চাষা চাষা নয় নাহি যার চাষ।
সেই প্রভু প্রভু নয় নাহি যার দাস॥
সেই লেখা লেখা নয় নাহি যার রস।
সেই কবি কবি নয় নাহি যার যশ॥
সেই নেড়া নেড়া নয় নাহি যার ছাব।
সেই গীত গীত নয় নাহি যার ভাব॥
সেই ভূমি ভূমি নয় নাহি যার কর।
সেই গলা গলা নয় নাহি যার স্বর॥
ই মাঠ মাঠ নয় নাহি যার ঘাস।
[illegible] াগ নয় নাহি যার মাস॥
সেই ঢুলী ঢুলী নয় নাহি যার কাঁসী।
সেই মুখ মুখ নয় নাহি যার হাসি॥
সেই রিপু রিপু নয় নাহি যার ক্রোধ।
সেই বুধ বুধ নয় নাহি যার বোধ॥
সেই পাক পাক নয় নাহি যার খেলা।
সেই গুরু গুরু নয় নাহি যার চেলা॥
সেই নট নট নয় নাহি যার নাট।
সেই পোড়ো পোঁড়ো নয় নাহি যার পাঠ॥
সেই ভারী ভারী নয় নাহি যার ভার।
সেই দ্বারী দ্বারী নয় নাহি যার দ্বার॥
সেই গৃহী গৃহী নয় নাহি যার দারা।
সেই মেঘ মেঘ নয় নাহি যার ধারা॥
সেই পথ পথ নয় নাহি যার পথী।
সেই রথ রথ নয় নাহি যার রথী॥
সেই মত মত নয় নাহি যার মতি।
সেই পদ পদ নয় নাহি যার গতি॥
সেই শিশু শিশু নয় নাহি যার মাতা।
সেই ডাল ডাল নয় নাহি যার পাতা।
সেই ফণী ফণী নয় নাহি যার মণি।
সেই পিক পিক নয় নাহি যার ধ্বনি॥
সেই গাভী গাভী নয় নাহি যার ক্ষীর।
সেই মন মন নয় নাহি যার স্থির॥
সেই নর নর নয় নাহি যার মায়া।
সেই ভূত ভূত নয় নাহি যার গয়া॥
সেই ধ্যান ধ্যান নয় নাহি যার ধ্যান।
সেই ধানী ধানী নয় নাহি যার ধান
সেই মানী মানী নয় নাহি যার মান।
সেই ধ্যানী ধ্যানী নয় নাহি যার ধ্যান॥

ঘর গড়িয়া ঘরামী কোথায়?

পাঁচের বাঁধুনী এই নবদ্বার বাস।
এতদিন যাহে আমি করিলাম বাস॥
পড় পড় হইয়াছে নাহি রয় আর।
একে একে ভেঙ্গে চুরে হ'ল চুরমার॥

অকালে বরষা ইথে ভরসা কি আছে।
খুঁটি খসা কাঁচা ঘর কেমনেতে বাঁচে॥
বাঁধন গিয়াছে খসে ছাঁদন ছাড়িয়া।
কাঁছনি বাঁধুনি বৃথা নাড়িয়া নাড়িয়া॥
কাঁদে মন ঘন ঘন শুনে ঘন ডাক্।
যেদিকে চাহিয়া দেখি সে দিকেই ফাঁক্॥
উড়িয়া চালের খড় হয়ে গেল ফাঁকা।
খুঁচি দিয়া কতদিন যাবে আর রাখা॥
পবন পেছন থেকে মারিতেছে ঠেকা।
বংশ হারা হতে হ'ল থাকেনাক ঠেকা॥
যে বংশের ঘর এই সে বংশ কি রয়।
ঘুণ ধরে একে একে হয়ে গেল ক্ষয়॥
হংসবেদী ভেঙ্গে গেল ধ্বংস সব হবে।
অংশে গেল অংশ মিশে বংশ কোথা রবে॥
যখন ঘরামী এসে ঘর গেল গোড়ে।
প্রকৃতি বলিয়াছিল এই যায় পোড়ে॥
না বুঝে তখন ঘরে ঢুকিলাম একা।
এখন সে ঘরামী নাহি কোথা পাই দেখা॥
ঘরামীর ঘর কোথা জানিনে রে ভাই।
মিছামিছি এথা সেথা খুঁজিয়া বেড়াই॥
কেহ যদি দেখা পাও ব'ল তার কাছে।
এ ঘর বজায় রাখে সাধ্য তার আছে॥
একারণ মাড়াবে না আমার এ ভূমি।
ভয় আছে বলি পাছে কি করেছ তুমি॥
এই হেতু মজুরীর কড়ি নাহি লয়।
সোরে দিতে হেরে যাবে মনে আছে ভয়॥
ঘর গোড়ে মজুরী না নিতে আসে আর।
মিছামিছি খেটে গেল ভূতের বেগার॥
বল নাই বলিবার বলি আর কারে।
যে গড়েছে সে ভাঙ্গিলে কে রাখিতে পারে?
যায় যাবে যাক্ ঘর না রয় না রয়।
আর যেন এই ঘরে ঢুকিতে না হয়।

জরা অপেক্ষা মরণ ভাল।

জরা এসে শরীর করেছে অধিকার।
বল করি বাড়িতেছে বিষম বিকার॥
রাখে না রাখে না আর বলের সঞ্চার।
থাকে না থাকে না দেহ থাকে নাকো আর॥
ফুরায়েছে সমুদায় কিছু নাই বাকী।
কেবল অপেক্ষা আছে মুদিতে দু আঁখি॥
তুলিতে না হবে মুখ খুলিতে নয়ন।
আর না উঠিতে হবে করিলে শয়ন॥
কলসী হইল শূন্য দেখে পাই ভয়।
গড়াতে গড়াতে জল কতদিন রয়॥
কলেবর সরোবর করিয়া শোষণ।
কালরূপ নিদাঘেতে খেয়েছে জীবন॥
অহরহ দাহ করে জ্বালিয়া অনল।
জরা হতে মরা ভাল বেঁচে কিবা ফল॥
কি ছিলে কি হলে এসে ভবের ভবনে।
আর বা কি হতে হয় ভাবনাকো মনে॥
হ'ল শেষ ধরে কেশ টানিছে শমন।
উপায় না পাবে আর করিলে গমন॥
এমন অমর আর তখন কি লাগে।
শমন দমন কর গমনের আগে॥
হবে না বিহিত কিছু অজ্ঞানেতে মলে।
হারাবে পরমনিধি জ্ঞানহারা হলে॥
দড়ী দিয়া বাঁধিয়াছে ভাঙ্গিয়াছে রথ।
পরিত্রাণ কিসে পাবে দেখ তার পথ॥
হেলা করে বেলাটুকু কাটায়ো না আর।
ভাঙ্গিয়া অসার খেলা সত্য কর সার॥
ভব-রোগ ঘোর ভোগ নাশ নাই তার।
সত্যরূপ পথ্য হলে হয় প্রতীকার॥
অতএব জীব ভাই আর কেন মজ।
তার তরে ভক্তিরসে ভগবানে ভজ॥
কাল করী অরি হরি, হরি হরি বল।
হরিনাম বল আর পথের সম্বল॥

পরিণামে পরিণামে না থাকিবে ভয়।
শমন দমন হবে গমনসময়॥

আর কিছু চাইনে।

দয়াময় তোমা বিনা আর কিছু চাইনে।
আর কিছু চাইনে॥
তব নাম-সুধা বিনা আর কিছুই খাইনে।
আর কিছু খাইনে॥
তব গুণ-গীত বিনা অন্য গীত গাইনে।
অন্য গীত গাইনে॥
তব প্রেম-পথ বিনা অন্য পথে যাইনে।
অন্য পথে যাইনে॥
তব শ্রদ্ধা-জল বিনা অন্য জলে নাইনে।
অন্য জলে নাইনে॥
তব সুখে সুখ বিনা কিছু সুখ পাইনে।
কিছু সুখ পাইনে॥
তব ভাব-দিক্ ছেড়ে অন্য দিকে ধাইনে।
অন্য দিকে ধাইনে॥
ওহে হরি তোমা ছাড়া কোন দিকে চাইনে।
কোন দিকে চাইনে॥
চিরকাল খেটে মরি নাহি পাই মাইনে।
নাহি পাই মাইনে॥
বিনা মূলে কিনে লবে লিখেছ কি আইনে।
লিখেছ কি আইনে॥

মনের প্রতি উপদেশ।

পরের পাইলে দোষ কোনমতে ছাড় না।
আপন কুনীতি প্রতি নাহি মাত্র তাড়না॥
আত্মছিদ্রে যাও নিদ্রা শাস্ত্রিকথা পাড় না।
বিবেক-ঔষধ কভু চিন্তা-খলে মাড় না॥
শরীর কুযশ-ধূলা কি কারণ ঝাড় না।
করুণা-কুঠারে কেন ক্রোধকাষ্ঠ ফাড় না॥
ললিত-লালস সুখে হও সমু লালনা।
চিত্তপথে চঞ্চলতা হয় তাহে চালনা॥
অলীক আমোদভোগে কখন ত আলো না।
প্রবোধ-প্রদীপ কভু হৃদয়েতে জ্বালো না॥
ইচ্ছায় পতঙ্গপুঞ্জ সদা কর পালনা।
এরূপ কুরীতি তব কদাপিও ভাল না॥
স্বীয় সুখে প্রিয়ভাব পর প্রতি ছলনা।
নিজ-দুখে দ্রব হও পরদুখে গল না॥
আপনার ভাব সদা স্বভাবেতে বল না।
কপটতা হয় তার প্রাণপ্রিয়া ললনা॥
পর-উপকার-পথে ভ্রমেতেও চল না।
হায় তব ভাব, দেখে লজ্জা পায় ফলনা॥
কর্ম্মভয়ে ভীত নও ধর্ম্মভয় জান না।
ইহ সুখে স্বর্গলাভ পরসুখে মান না॥
চরম পরম তত্ত্ব অন্তরেতে আন না।
তত্ত্বমসি-তীরে যেতে তত্ত্বগুণ টান না॥
ভূতগত কার্য্যে পুন দৃষ্টিবাণ হান না।
ভাবী ভয়ঙ্কর বলি ভ্রমেতেও ভাব না॥
দীনের দীনতা দেখি দয়া দান কর না।
কৃপাদানে কৃপণতা কি কারণ হর না॥
চিন্তা-জরে জর পর-চিন্তা-জরে জর না।
বিনয়-বিনোদ-বস্ত্র মানসেতে পর না॥
কি হেতু এসেছ ভবে মনে কেন স্মর না।
উড়ে যায় কালপক্ষী ধর ধর ধর না॥
সন্তোষ-ক্ষীরোদতীরে যাবে কি না যাবে না।
অঞ্জলি পূরিয়া সুধা খাবে না কি খাবে না॥
আহা হেন স্নিগ্ধনীরে নাবে না হে নাবে না।
এমন শীতল জল পাবে না হে পাবে না॥
ক্ষীরোদশায়ীর গুণ গাবে না হে গাবে না।
যে গায় সে আর ভয়ে ভাবে না হে ভাবে না।
কামকুঞ্জে পাপপুষ্প তুলো না হে তুলো না।
কোপের কুবাতাসেতে ফুলো না ফুলো না॥
মোহে মজি মায়া-দ্বার খুলো না খুলো না।
মদরূপ মদালসে ঢুলো না হে ঢুলো না॥
দাম্ভিকতা-দোলমঞ্চে দুলো না হে দুলো না।
শিয়রে ভুজঙ্গকাল ভুলো না হে ভুলো না॥

কদাশা-কুযন্ত্রে পড়ি পাইতেছ যন্ত্রণা।
যারে সুখযন্ত্র ভাব সে ত সুখযন্ত্র না॥
পুনঃ পুনঃ শুনিতেছ মহামোহমন্ত্রণা।
পরসুখ-প্রাপণের এ মন্ত্রণা মন্ত্র না।
সকল কুতন্ত্র তব অন্তরে স্বতন্ত্র না।
নির্বাণের তন্ত্র পর অন্য তন্ত্র তন্ত্র না॥

পাপপথে যেয়ো না।

মন তুমি মনোরথে, চড় নিজ ভাব-রথে,
অভাবীর ভাবপথে ধেয়ো না হে ধেয়ো না।
অকৃতজ্ঞ জন যেই, পরম পামর সেই,
তবু তার অপযশ গেয়ো না গেয়ো না॥
দ্বেষহীন কর দেশ, লোকের যে করে দ্বেষ,
তার কাছে উপদেশ চেয়ো না হে চেয়ো না।
নিরাশারে সঙ্গে লও, স্বভাবে সন্তোষ হও,
অসন্তোষ-কাননেতে যেয়ো না হে যেয়ো না॥
শম-দম-চক্র-কলে, নাশ কর রিপু-দলে,
ডুব দিয়া পাপ-জলে নেয়ো না হে নেয়ো না।
বিষম বিষের জল, কভু নয় সুশীতল,
অধর্ম্ম-বৃক্ষের ফল খেয়ো না হে খেয়ো না॥
দেহ নহে আপনার, মোহ কর পরিহার,
মায়ীর যাতনা আর পেয়ো না হে পেয়ো না।
রসনা পবিত্র করি, জপ কর হরি হরি,
আশানদে পাপতরী বেয়ো না হে বেয়ো না॥

কামনা-ত্যাগে পরমার্থ অন্বেষণ।

ওহে মন-মধুকর এ কি দেখি ভ্রম।
কার ক্রমে ব্যতিক্রম ভ্রমে তুমি ভ্রম॥
ভ্রমিছ বিষয়বনে যেন মত্তকরী।
সঙ্গে করি নিজবধূ ভ্রান্তি-মধুকরী॥
কামনা-কেতকী-ফুলে সৌরভে ভুলিয়া।
গুণ গুণ করিতেছ গুণ বিস্তারিয়া॥
তুমি ভৃঙ্গ অন্তরঙ্গ বলি আমি তাই।
কণ্টকীর পঙ্ক হলে পঙ্ক হবে ভাই॥
অতএব মন-অলি উপদেশ ধর।
পরমার্থ-পদ্মফুলে মধুপান কর॥
সে ফুলের সবিশেষ গুণ কেবা জানে।
যাবে ধন্দ মহানন্দ মকরন্দ-পানে॥

অকারাদ্য ঈশ্বরস্তুতি।

অনাদি অনন্ত অজ অজর অক্ষর।
অক্ষয় অভয় অতি অজয় অমর॥
অনির্ব্বচনীয় অবয়বে অবতার।
অখিল অনাথনাথ অতি চমৎকার॥
অপরূপ অবয়ব নানা অবতারে।
অদ্ভুত অবস্থা অবলম্ব বারে বারে॥
অত্যন্ত অভাব্য ভাব হেরি অবিরত।
অখিলের অধিপতি অতি অভিমত॥
অবিভক্ত ভক্তিযুক্ত অভক্তপ্রভৃতি।
অবগত আছে তব অদ্ভুত প্রকৃতি॥
অত্যন্ত অবোধ আমি অবশ্য অধম।
অপার-মহিমা-সীমা করিতে অক্ষম॥
অবনীতে অবনীত করা ভব ভাব।
অধীন হইতে নাহি হয় অনুভাব॥
অনাথের নাথ ওহে অধমতারণ।
অবশ্য অতর্ক ভাব অলক্ষ্যকারণ॥
অবলীলাক্রমে বহ অবনীর ভার।
অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি সমৃদ্ধি অপার॥
অপূর্ব্ব অভূতপূর্ব্ব অতি মনোহর।
অতুল্য অমূল্য অর্থ অতি অগোচর॥
অনুরূপ অপরূপ অরূপ স্বরূপ।
অবনতজনে অবগত কত রূপ।
অতীন্দ্রিয় অতিপ্রিয় অনন্ত ভূতলে।
অভিব্যাপ্ত অন্তরীক্ষে অতল সুতলে॥
অবিকার অখণ্ডিত অধিকার তব।
অণ্ড মাত্র অবলম্বে অবনীসম্ভব॥
অবিজ্ঞেয় অতিধ্যেয় অমর প্রধান।
অতল-বিতল-অধিষ্ঠাতা অনুমান॥

অনন্ত সৃষ্টির কর্ত্তা অন্ত কেবা পায়।
অমরাদি অবিভূত তোমারি মায়ায়॥
অজ্ঞান অকৃতি প্রভু আমি অতি দীন।
অবেদ্য অভেদ্য ভাব ভাবি অনুদিন॥
অকিঞ্চন হয়ে তব অপ্রমিত গুণে।
অধিক কি দিব অবস্তব্ধ দেখে শুনে॥
অণু হতে অণু তুমি নাহি অনুরূপ।
অথচ অখিলব্যাপ্ত অভিব্যক্ত রূপ॥
অসাধ্য অবাধ্য মুগ্ধ অবিদ্যার বলে।
অবোধে অবেদ্য ভাব বর্ণিবে কি বলে॥
অবহিতভাবে স্তব অভিহিত ভাব।
অতি অল্প বর্ণিলাম করি অনুভাব॥
অধীনের অর্ব্বাচীন অভিপ্রায় যত।
অনুগ্রহ করি অন্ত হও অবগত॥
অবধান অনুমতি হয় এই চাই।
অন্তে যেন রাঙ্গাপায় অব্যাহতি পাই॥

আকারাদ্য ঈশ্বরস্তুতি।

আদিহীন আদিনাথ আদি সবাকার।
আশু শিবকারী আত্মা আপনি আমার॥
আধ্যাত্মিক আদি তাপ আশ্রয় আপদে।
আশ্চর্য্য আরাম আছে আপনার পদে॥
আশ্রিত থাকিয়া আশা নাশা রাঙ্গাপায়।
আশা নাহি পূরে আর আক্ষেপ বাড়ায়॥
আপামর যে রসের পাইয়া আস্বাদ।
আকুল হইয়া আছে আহা কি আহ্লাদ॥
আমা হতে আলোচনা হলো না তাহার।
ইহা হতে আক্ষেপ কি আছে বল আর॥
আকার স্বরূপ কিন্তু নাহিক আকার।
আবার আকারে ব্যাপ্ত আছে সবাকার॥
আশ্চর্য্য আকারে আছ অখিল আকারে।
আদর্শস্বরূপ রূপ আকারে আকারে॥
আকার-আকর তুমি আধিপত্য কত।
অদৃশ্য অথচ আছ আভাসের মত॥

আশাপূরে আপনার করিতে আদর।
আঁখি-যুগে আনন্দাশ্রু ঝরে দর দর॥
আচ্ছাদিত করে ফেল আনন আমার।
আদরের কথা কিছু নাহি সরে আর॥
আপনার আদরেতে আপনি আদৃত।
হও রও আদরের আমোদে আবৃত॥
আমারে আদর কর বলিয়া আমার।
আসন্ন হইল কাল ত্রাশঙ্কা অপার॥
আপনার আসঙ্গে আসীন হয়ে রই।
আশা এই আসা-যাওয়া-হীন যেন হই॥
তুমিই আধেয় বস্তু তুমিই আধার।
তুমিই আচার্য্য সার তুমিই আচার॥
আপনি আনন্দে আছ আপ্লাবিত হয়ে।
আব্রহ্ম আনন্দে মত্ত যে আনন্দ লয়ে॥
আপনিই আখণ্ডল আদি আচ্ছাদক।
আপনি আদ্যন্তকারী সাধক বাধক॥
আকীট পতঙ্গ অঙ্গে আকর্ষণ করি।
আশ্চর্য্য আহ্লাদে আছ আহা মরি মরি॥
তুমি হে আশার ধন আগমাদি কয়।
দেখো হে আমার আশা যেন সিদ্ধ হয়॥
আশা নাশ না হলে সে আশা যায় দূরে।
আশার আশ্রয়ে হয় আসা ঘুরে ঘুরে॥
আশাহীন আরাধনে আশু যে আরাম।
আসানাশা আশা দেন আসি আত্মারাম॥
আশুতোষ আশুতোষ করেন বিধান।
আশার আস্তার আর থাকে না নিদান॥
হে আঢ্য আশ্রয় দেহ এই আশা করি।
আশা-তরী করি ভর যেন আশা তরি॥
আপনার প্রতি আমি আস্থা করি যত।
আশ্চর্য্য আভাষ মনে আবির্ভাব তত॥
আচ্ছন্ন হইতে থাকি আপনার রসে।
আকাঙ্ক্ষা পূরাতে নারি আপনার বশে॥
আদ্যপূর্ব্ব আন্তরিক আছে যে আশ্বাস।
আত্মাতে আসক্ত করি আমার আবাস॥

আত্যন্তিক আক্ষেপ আইসে কত মনে।
আধুনিক আবেদন এই শ্রীচরণে॥
আমরণ আত্মধন আত্মাতে সঁপিয়া।
আপ্যায়িত থাকি যেন আত্মারে জপিয়া॥
আবৃত্তির আশা আর নাই আত্মনাথ।
আমার আমার ভাবে কর হে আঘাত॥
আত্মভাবে আছে মম আস্ফালন ভারী।
আজতো গেল না আমি আমার এ জারী॥
আমি কার কে আমার না পাই আভাষ।
আনন্দে আটখানা হয়ে ভাবি যে আকাশ॥
আশীর্ব্বাদ করো নাথ আছি যত দিন।
আপনার আশ্রয়েতে থাকি হে অধীন॥
তব আধিপত্যে চিত্ত নিত্য মত্ত রয়।
আত্মাসক্তভাবে যেন আয়ুক্ষয় হয়॥

নিদ্রাকালে শঠ উপকারী।

পরের অহিতকারী নীচ যেই খল।
নিজলাভ বিনা শুধু খুঁজে মরে ছল॥
কখন জানে না মনে হিত বলে কারে।
উপকার-লাভ করে পর-অপকারে॥
সদা ভাবে কার কবে কিসে মন্দ হবে।
মুষলের সাজা পায় কুশলের রবে॥
নিয়তই মনে পায় অতিশয় দুখ।
শয়নে ভোজনে নাই কিছুতেই সুখ॥
মিছে আঁখি মুদে থাকে ঘুম যায় চড়ে।
ছটফট্ করে রেতে বিছানায় পড়ে॥
দৈবাধীন চোখে যদি ঘুম এসে তার।
তবেই সে খল করে পর-উপকার॥
জেগে থেকে কেবল অধর্ম্মে কাটে কাল।
যতক্ষণ নিদ্রা যায় ততক্ষণ ভাল॥

বাক্য অপেক্ষা কার্য্য ভাল।

কাজে যদি করা হয় কর তবে তাই।
মিছামিছি মুখে বলে কোন ফল নাই॥
শরদের মিছা মেঘ ডাকডোক্ সার।
ছিটে ফোঁটা নাহি তায় জলের সঞ্চার॥
সেইরূপ মিছা তব মুখে আড়ম্বর।
ফলে যদি না হইল কার্য্য হিতকর॥
তখনি করিবে তাহা যখন যা হয়।
বিলম্ব বিধান তার কোনমতে নয়॥
কল্পনায় কর যদি আলস্য এখন।
কখন হবে না আর সুফল-সাধন॥
অতএব কর ভাই সাধ্য হয় যত।
কল্পনা না হয় যেন রাবণের মত॥

জীবের প্রতি।

কে তুমি, কে তুমি, জীব! কে তুমি তা কও?
যে তুমি যাহার তুমি তার "তুমি" হও॥
দেহে কর আমি বোধ "দেহ" তুমি নও
অংশরূপে হংসরূপে দেহে তুমি রও॥
কে তোমার বহে ভার কার ভার বও?
আমার আমার করি কার ভার লও॥
কিরূপে সৃজিত হয় এই কলেবর॥
মনে কর কিরূপেতে হলে তুমি নর॥
করিছ যে দেহ পেয়ে এত অহঙ্কার।
মিছে স্নেহ, এই দেহ মনে কর কার॥
মনে কর, কোথা তুমি করিতেছ বাস।
মনে কর কিরূপে এ দেহ হবে নাশ?
মনে কর, কে তোমার তুমিই বা কেবা।
আমার বলিয়া তুমি কর কার সেবা॥
দেহেতে অভেদ ভাব একি অপরূপ।
একবার ভাবিলে না আপন স্বরূপ॥
কেবল ভ্রমেতে কর আমার আমার।
অদ্যাবধি আত্মবোধ হলো না তোমার॥
মায়ার কুহকে ভুলে কিছু নও জ্ঞাত।
ভুলিয়াছ পুরাতন সখা "অবিজ্ঞাত"
কেবল দেখিছ স্থূল দ[illegible] [illegible]েশে॥
গেলে না[illegible], ঘাড় হেঁট করি।

মুকুরে নিরখি মুখ সুখ কতরূপ।
মনে মনে অভিমান হয়েছি সুরূপ॥
গলদেশে সূত্র দিয়া সূত্র তায় ভারী।
'ব্রাহ্মণ' হয়েছি বলে কর কত জারী॥
বেদপাঠে পূজা পাও পণ্ডিত হইয়া।
সবে করে সমাদর কুলীন বলিয়া॥
আপনিই ভবে পোড়ে না পাও পাথার।
অথচ লোকেরে কর, ভবনদী পার॥
তিন থাঁই "দড়া" বেঁধে আপনার গলে।
ত্রিলোক বেঁধেছ তুমি কুহকের বলে॥
একেতো মায়ার সূত্রে পড়িয়াছ বাঁধা।
আবার এ সূত্র দেখে লাগিয়াছে ধাঁধা॥
কোথায় সূত্রের গোড়া নিরূপণ নেই।
এক খেয়ে উঠিতেছে কত খেই খেই॥
করিয়াছ আরোহণ অভিমান-রথে।
কেবল করিছ গতি প্রবৃত্তির পথে॥
ছেড়ে তত্ত্ব মদে মত্ত কিসে পাবে পদ।
হারাইলে পূর্ব্বকার সহায় সম্পদ॥
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র চতুষ্টয়।
অভিমান সারমাত্র কিছুই ত নয়॥
"তুমি" কোন বর্ণ নও জাতি তব নাই।
দেহধর্ম্মে অহঙ্কার কেন কর ভাই?
নর নও নারী নও তুমি নও কেউ।
ত্রিগুণসাগরে কেন গুণিতেছ ঢেউ?
তুমি আমি আমি তুমি জেনো এই সার।
তুমি আমি, এক হলে কেবা আর কার?
দেহেতে অভেদ জ্ঞান কর পরিহার।
আমার এ দেহ বোলে ছাড় অহঙ্কার॥
বিচারে তোমার তনু কখনো তো নয়।
ভূতের ভবন এই ভূতে হবে লয়॥
কেবা জড়ীভূত করিল তোমারে?
আদর্শস্বরূপ হও ভূতের ব্যাপারে?
আকার-আকর তুমি অদ্ভুত?
অদৃশ্য অথচ আছ আভাসের মত॥

সকলি ভূতের হাট ভূতের ভবন।
ভূতাতীত ভূতনাথ কররে স্মরণ॥
সাহসে বাঁধিয়া বুক, প্রকৃতির দেখ মুখ,
দূরে যাবে সব দুঃখ, বিষয়ে বিশেষ সুখ,
হয় হয়, হোলো হোলো, না হয়, না হয়, হোলো,
হয় হয়, নয় নয়, মিছে খেদ করো না।
চিরজীবী নহে কেহ, পতন হইবে দেহ,
পেয়েছ ভূতের গেহ, মিছে কেন এত স্নেহ,
থাকে থাকে থাক্ থাক্, যায় যাবে যাক্ যাক্,
থাকে থাক্ যায় যাক্, ভেবে আর মরো না॥
রবে আর কত কাল, কালে হয় গত কাল,
নিকট বিকট কাল, না ভাবিলে মহাকাল,
এই কাল, সেই কাল, কালেই আসিছে কাল,
পাবে কাল, যত কাল, বৃথা কাল হ'র না।
ভুলিয়াছ তব ভাব, ভাবিতেছ ভব-ভাব,
স্বভাবে স্বভাব ভাব, কর নিজ অনুভাব,
কি ভাব, কি ভাব ভাব, কে বুঝে ভাবের ভাব
ভাবে ভাব আবির্ভাব, অভাবেরে ধোরো না॥
মানসবিহারী হংস, তুমি হে তোমার অংশ,
দেহিরূপে অবতংস, নাহিক তোমার ধ্বংস,
মানসের সরোবর, পরিহরি নিরন্তর,
কর কিরে, গুণনীরে, আর তুমি চোরো না॥
ছিলে তুমি অপ্রকাশ, হইলে হে সুপ্রকাশ,
ভাল বাস ভালবাস, পেয়ে বাস কর বাস,
কত আশ অভিলাষ, কত হাস পরিহাস,
শুন ভাষ ধর ভাষ, ভ্রমবাস পোরো না॥
আমি হে ছিলাম একা, পেয়েছি তোমার দেখা,
নাহিক সুখের লেখা, আর কেন হও ভেকা,
ঠেকিয়া হলো না শেখা, দিতেছ জলের রেখা,
দেখো শেষ ভুলে দেশ আর যেন সোরো না॥
অশিবের ধন নও, আছ জীব শিব হও,
শিবরব মুখে কও, শিবের সদনে রও,
কেন হে অশিব লও, অশিবের ভার বও,
বারবার দেহে আর পাপভার ভোরো না॥

সামাজিক।

বড়দিন।

খৃষ্টের জনমদিন, বড়দিন নাম।
বহু সুখে পরিপূর্ণ, কলিকাতা ধাম॥
কেরাণী দেয়ান্ আদি, বড় বড় মেট।
সাহেবের ঘরে ঘরে, পাঠাইতেছে ভেট॥
ভেটকী কমলা আদি, মিছরি বাদাম।
ভাল দেখে কিনে লয়, দিয়ে ভাল দাম॥
এই পর্ব্বে গোরা সর্ব্বে, সুখী অতিশয়।
বাঙ্গালীর বিদিতার্থ, লিখি সমুদয়॥
"কাথলিক" দল সব, প্রেমানন্দে দোলে।
শিশু যীশু গড়ে দেয়, মেরিমার কোলে॥
বিশ্বমাঝে চারুরূপ, দৃশ্য মনোলোভা।
যশোদার কোলে যথা, গোপালের শোভা॥
স্বপ্নযোগে হলো গর্ভ, ব্যক্ত এই শেষে।
ঈশ্বরের পুত্র বোলে, পরিচয় দেশে॥
ও গড্ ও গড্ গড্, লেখে বাইবেলে।
যীশু কি তোমার শিশু, ঔরসের ছেলে?
এ বড় গোপন ভাব, আপন হারায়ে।
বপন করেছে বীজ, স্বপন দেখায়ে॥
নিজের বীজের ফল, যীশু যদি হয়।
দোষের ত নয় তবে, ঘোষের তনয়॥
দিশী কৃষ্ণ, বিলি কৃষ্ণ, এ দেশ ও দেশ।
উভয়ের কার্য্য আছে, বিশেষ বিশেষ॥
বিলাতের ব্রহ্ম যদি, মেরিমার যাদু।
এ দেশের ব্রহ্ম তবে, যশোদার যাদু॥
খুলিয়া পুরাণ গীতা ভাবে ঢোলে ঢোলে।
কব তাঁর সব গুণ, অবতার বোলে॥
কুমারীর গর্ভে শিশু, হয়ে অবতার।
করিলেন পৃথিবীর, পাতকী উদ্ধার॥
বিভুরূপে খ্যাত হন, নানারূপ ছলে।
ভুলালেন রোম দেশ কুহকের বলে॥

ধর্ম্মের বিস্তার করি, দেন উপদেশ।
ভূতরূপী ভগবান্, ঘুঘু আর মেষ॥
শিষ্যগণ সঙ্গে সদা, যুগী জোলা জেলে।
সবে বলে এই প্রভু, ঈশ্বরের ছেলে॥
নাম জারী করিলেন, চেলা সব ঠাঁই।
শিষ্টবেশে দেশে দেশে, ফেরেন গোঁসাই॥
পাপী-পরিত্রাণ হেতু, করুণানিধান।
জুশের ক্রুশের ঘায়ে, ত্যজিলেন প্রাণ॥
তদবধি শিষ্যদের, ভক্তির প্রভাব।
প্রভুপ্রেম প্রাপ্ত হয়ে, কতরূপ ভাব॥
সেরূপ খৃষ্টানগণ, ভাবে ঢল ঢল।
গোরাপ্রেমে মত্ত যথা, নেড়ানেড়ী-দল॥
প্রভুর শোণিত মাংস, কাল্পনিক করি।
আহারে আহ্লাদ পান, যত মিশনরী॥
টেবিল সাজায়ে সব, ভাবে গদগদ।
মাংস বোলে রুটি খান, রক্ত বোলে মদ॥
ভুবন কোরেছে বদ্ধ, কুহকের ডোরে।
হায় রে "কুমারীপুত্র" বলি হারি তোরে।
যে প্রকার খৃষ্টানের, পূর্ব্ব-প্রকরণ।
কাথলিক চর্চ্চে গিয়ে, দেখে এসো মন॥
দেখিলে তাদের ভাব, রাগে মন রোকে।
ধন্যবাদ দিতে হয়, বঙ্গবাসী লোকে॥
ওল্ড এক টেষ্টমেণ্ট, গোল্ডে তায় বাঁধা।
কোল্ড করে মানুষেরে, লাগাইয়া ধাঁধা॥
রিফরম প্রটেষ্টাণ্ট, বিশপের দল।
বড়দিন পেয়ে মুখে, হাস্য খল খল॥
মিলিটরী, সিবিল, বণিক্ আদি যত।
ছুটী পেয়ে ছুটাছুটি, আস্ফালন কত॥
জমকে পোষাক করি, গাড়ী আরোহণে।
চর্চ্চে যান সুরূপসী, শ্রীমতীর সনে॥
বিশপের অগ্রভাগে, ঘাড় হেঁট করি।
ক্ষণমাত্র অবস্থান, টেষ্টমেণ্ট ধরি॥

ভজনা হইলে পর, উঠে দেন ছুট।
সহিস বোলাও বগী, ড্যাম ড্যাম হুট॥
আলয়েতে আগমন, মনের খুসীতে।
অঙ্গুলীর অগ্রভাগ, চুষিতে চুষিতে॥
পরস্পর নিমন্ত্রণ, কতরূপ খানা।
টেবিলের উপরেতে কারিগুরী নানা॥
বেষ্টিত সাহেব সব, বিবিরূপ জালে।
আনন্দের আলাপন, আহারের কালে॥
শক্তি সহ ভক্তিভাবে, ফেরে মাংস মদ।
হাতে হাতে স্বর্গলাভ, প্রাপ্ত ব্রহ্মপদ॥
রসে মত্ত ছেড়ে তত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব-লাভে।
হয়ে প্রীত, নৃত্য-গীত, বিপরীত ভাবে॥
রণবেশী মিলিটরী, যত সব গোরা।
মাঠে ঘাটে, হাটে বাটে মারিতেছে হোরা॥
হুকুম জাহির করে, দাঁড়িয়া দাঁড়িয়া।
বিধির লিবির জাঁক, শিবির গাড়িয়া॥
চোট পাট পোট পাট, আয়োজন কোরে।
শ্রীমতীর শ্রীমুখেতে, আগে দেন ধোরে॥
বড় বড় সাহেবেরা, এইরূপ ভোগে।
পেয়েছেন বড় সুখ, বড়দিন-যোগে॥
ইচ্ছা করে ধন্না পাড়ি, রান্নাঘরে ঢুকে।
বুক হয়ে মুখখানি, লুক্ করি সুখে॥
বিধাতা যদ্যপি করে, গাড়ীর সহিস্।
ভাগে ভাগে ছুটে যাই, পহিস্ পহিস্॥
সাজিয়া কউচম্যান উপরে উঠিয়া।
ঘোড়া জুড়ে উড়ে যাই জুড়ী হাঁকাইয়া॥
আব্রুস পিব্রুস আদি, ডিব্রুস মেণ্ডিস্।
ডিকোষ্টা,ডিরোজা, জোনা, ডিসোজা গমিস্॥
জেসু, নেসু, কেসু আর, টেসুগণ যত।
ঝাঁকে ঝাঁকে মহা জাঁকে চলে শত শত॥
পোরে ড্রেস হন ফ্রেস্ দেখা যায় বেড়ে।
বাঁকাভাবে কথা কন, কালামুখ নেড়ে॥
পুঁইধাড়া টিঙিড়িঙির, করে ভুষ্টিনাশ।
ক্যাম্ সজে নানা রঙ্গে, গরিমা প্রকাশ॥

চুণাগলী অধিবাস, খোলার আলয়।
তাহাতেই কতরূপ, আড়ম্বর হয়॥
ছাড়েন বাঙালী দেখি, বিলাতের বুলী।
লিছু যাও কেলাম্যান্, নেটীব বেঙালী॥
জুতা গোড়ে প্রাণ যায়, করে হেই ঢেই
রুটী বিনা রুপীভাব, কড়ামাত্র নেই॥
বড়দিনে বাবু সেজে, কতরূপ খেই।
জাহাজ হইতে যেন, নামিলেন এই॥
তেঁতুলে বাগদী যেন, ফিরিঙ্গীর ঝাঁক।
বাঁচিনেকো দেখিয়া, তাদের কোতো জাঁক॥
আনাক্যাষ্ট কন্‌বর্ট, গৃহত্যাগী যারা।
কত সুখ যাচিতেছে, নাচিতেছে তারা॥
নীলু, বিলু, কালু, লালু, দলু, হুলু, হিরু।
গমু, খমু, হমু, তমু, হারু, আর ছিরু॥
এদিকে দুঃখের দায়, মনে ঝোলে ফাঁসী।
বাহিরে প্রকাশ করে, চড়কীর হাসি॥
ছেঁড়া পচা কামেজ, তাহায় নাই হাতা।
তাই পোরে বাবু হন, খালি কোরে মাতা॥
ভাঙা এক টেবিলেতে, ডিস্ সাজাইয়া।
যীশু-ভাবে খানা খান, বাহু বাজাইয়া॥
মনে মনে খেদ বড়, কান্না হয় রেতে।
পরমান্ন পিটাপুলি, নাহি পান খেতে॥
যে সকল বাঙ্গালীর, ইংলিস ফ্যাসন।
বড়দিনে তাঁহাদের, সাহেব ধরণ॥
পরস্পর নিমন্ত্রণে, সুখের সঞ্চার।
ইচ্ছাধীন বাগানেতে, আহার বিহার॥
বাবুগণ বাবু নন, নাহি যায় ফেলা।
চুপি চুপি বহুরূপী, লুকাচুরি খেলা॥
বিবি সহ বিলাতীর, যোগাযোগ নানা।
কত শত আয়োজন, ইয়ারের খানা॥
ফ্রেস্-ডিস্-ভরা ডিস, মধ্যে ভাতে ভাত
সে পাত্র সুপাত্র নয়, বিলাতের পাত॥
অখিল ভরিয়া মুখে করে জলসেবা।
খেতে খেতে খেতে উঠে, খেতে পারে কেবা॥

উরি মধ্যে দুঃখিতর, বঙ্গী সব ভেয়ে।
তত্বহত, মত্ত যত, বড়দিন পেয়ে ॥
তেড়া হয়ে তুড়ি মারে, টপ্পা গীত গেয়ে।
গোচে গাচে বাবু হয়, পচা শাল চেয়ে ॥
কোনরূপে পিত্তি রক্ষা, এঁটো কাঁটা খেয়ে।
শুদ্ধ হন ধেনো গাঙে, বেণোজলে নেয়ে ॥
"এ, বি" পড়া ডবি ছেলে, প্রতি ঘরে ঘরে।
সাজায়েছে গাঁদা-গাদা ডেক্সের উপরে ॥
পড়েনিকো উচ্চ পাঠ, শ্লিপ্ মারে তুড়ি।
তাকায় ওদিকে বটে, পাকায় খিচুড়ি ॥
শাসনের ভয়ে নাহি, যায় উপবনে।
পায়েসে আয়েস রাখি, তুষ্ট হ[illegible] মনে ॥
ধনের অভাবে যেই [illegible] দীন হয়।
বড়দিন পেয়ে আজ, বড় দীন নয় ॥
সাহেবের ছড়াছড়ি, জাহ্নবীর জলে।
করিতেছে "বোটরেস," সেলার সকলে ॥
হায় রে সুখের দিন, শোভা কব কায়।
ইংরাজটোলায় গেলে, নয়ন জুড়ায় ॥
প্রতি গেটে গাঁদা-হার, কারিগুরী তাতে।
বিরচিত ছটা চারু, দেবদারু-পাতে ॥
হোটেল-মন্দিরে ঢুকে, দেখিয়া বাহার।
ইচ্ছা হয় হিঁদুয়ানী, রাখিব না আর ॥
জেতে আর কাজ নাই, যীশুগুণ গাই।
খানা স্বহ নানা সুখে, যিবি যদি পাই ॥
চারিদিকে দেখ মন, অতি বেড়ে বেড়ে।
ভোতে মোতে থাকি আয়, হিঁদুয়ানী ছেড়ে ॥
ছেড়ো না ছেড়ো না আর বিপরীত বাণী।
থাকো থাকো থাকো বাপু রাখ হিঁদুয়ানী ॥
এবার কি বড়দিন, বড় দিন আছে ?
আমোদের কাব্য পাঠ, করি কার কাছে ?
কালভেদে কত ভেদ, খেদ করি ভাই।
পূর্ব্বকার লেখা ছেপে, সকলে দেখাই ॥
পরিহাস ছলে ইহে, কাব্য আছে যত।
সে কেবল ব্যঙ্গমাত্র, নহে মনোগত ॥
অতএব কেহ তার, ধরিবে না দোষ।
করিবে করিয়া কৃপা, হও আশুতোষ ॥

বর্ষবিদায়।

ওরে ও চৌষট্টি সাল। সাল নোস্ তুই সাল।
তোরে কেটা বলে কাল্? কাল নোস্ তুই কাল॥
দেখ দেখ এই বর্ষে। কি হয়েছে এই বর্ষে॥
রাজা প্রজা তোর পার্শ্বে। কেহ আর নাহি হর্ষে
সম দশা সবাকার। ঘরে ঘরে হাহাকার॥
হয়ে গেল ছারখার। সবে দেখে অন্ধকার॥
যত সব দুরাচার। করে যত অত্যাচার॥
কাট্ কাট্ মার্ মার্। মুখে রব যার তার॥
বলহীন পরিবার। কারো নাই ঘর দ্বার॥
বৃক্ষতলা করি সার। চক্ষে ফেলে শতধার॥
শত শত সধবার। শাকা খাঁড়ু নাহি আর॥
পতিহীন হয়ে সবে। কাঁদিতেছে হাহারবে॥
অন্ন নাই বস্ত্র নাই। কিসে বাঁচি ভাবি তাই॥
বিদ্যাসাগর নাহি তথা। কে কবে বিয়ের কথা॥
বিয়ে হলে বেঁচে যেতো। সাধ পূরে খেতে পেতো॥
গহনা উঠিত গায। এড়াতো সকল দায়॥
কি করে কপাল পোড়া। বিধাতা নষ্টের গোড়া॥
যায় সব যমপুরে। সাগর অনেক দূরে॥
উজানেতে থাকে তারা। সেই জলের ভাঁটি ধারা॥
সাগরের লোণাজল। রাণ ডাকে কল কল॥
তত দূর নাহি যায়। ত্রিবেণীতে লয় পায়॥
মুক্তবেণী এ ত্রিধারা। মুক্তবেণী-পারে তারা॥
ভবিষ্যতে হতো ভালো। জলিত ভাগ্যের আলো
সত্নপায়ে হলে গতি। পুনরায় পেতো পতি॥
দুষ্ট লোকে করে পাপ। শিষ্ট লোকে প[illegible]
কার ঘাড়ে কার বোঝা। কিছু ন[illegible]
বিধবায় পতি পায়। আ[illegible]
অনুকূলা নন কালী[illegible]
বিলাতের অ[illegible]

ওরে কাল দুরাচার। তোর এই অত্যাচার॥
প্রথমে আইন খুলে। ফের তাহা দিস্ তুলে॥
সাগর ডাগর হয়ে। নাগর নাগরী লয়ে॥
দেখায়ে নূতন ক্রিয়ে। যে কটা দিলেন বিয়ে।
সে বিয়ে কি সিদ্ধ নয়? ফিরে যাবে সমুদয়॥
শত্রু লোক হাসালি। আঁখি-জলে ভাসালি॥
রাগ কোরে যত রাঁড়ে। শাপ দেবে হাড়ে হাড়ে
জান না সতীর শাপে। ত্রিভুবন ভয়ে কাঁপে॥
পেয়ে সাবিত্রীর শাপ। যম বলে বাপ বাপ॥
সব দিকে নষ্ট তুই। ঘাড় ভেঙ্গে পুতে থুই॥
তোর দৃষ্টে শনি ওড়ে। রাহু আর কেতু পোড়ে
চিরজীবী জীব যারা। এখনিই মরে তারা॥
তোরে দেখে পেয়ে ভয়। যম ছাড়ে যমালয়॥
ভাল ভাল-ভাল পয়। সৃষ্টি আর নাহি রয়॥
লক্ষ্মী গিয়েছেন উড়ে। অমঙ্গল দেশ জুড়ে॥
অলক্ষ্মীর আগমনে। সবাই প্রমাদ গণে॥
জিনিষের অগ্নিদর। বাঁচে কিসে দুঃখীনর॥
কি হইল হায় হায়। অনাহারে মারা যায়॥
অকাল হইল শেষে। মহামারী দেশে দেশে॥
বিদ্রোহীরা করে পাপ। ভূপতির মনস্তাপ॥
যারে যারে মর মর। নরকে প্রবেশ কর॥
মন্ত্র পোড়ে ভস্ম ছাই। তোমার বিদায় গাই॥

জড় কোরে পৃথিবীর যত ছেঁড়াচুল।
জড় কোরে পৃথিবীর যত কেশে ফুল॥
তাহাতে মাখানো গেল, ছাই আর কাদা।
ঠাঁই ঠাঁই ডাঁই ডাঁই গোবরের গাদা॥
কড়ি পেয়ে নাপিত, ফিরিয়া বাড়ী বাড়ী।
কাটিয়া পায়ের নখ, করিয়াছে কাঁড়ি॥
পুকুরের পানা আছে, কুকুরের লোম।
শূকরের ল্যাজ কেটে, আনিয়াছে ডোম॥
ছেলে বুড়ো আদি করি, আয় সবে আয়।
লক্ষ্মীছাড়া বছরের, হয়ে গেল সায়॥
রাম্ বল হাঁচিলাম, ঘাম্ এলো গায়।
কুলোর বাতাস দিয়ে, কর রে বিদায়॥

হাবাতে বছর ঐ যায় যায় যায়।
অলক্ষ্মীপিশাচী তার পাছে পাছে যায়॥
ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ওরে পালাও পালাও।
পাঁকাটীর আটি সব, জ্বালাও জ্বালাও॥
উড়ায়ে তুষের ধূম, নৃত্য কর সুখে।
আলাই বালাই দূর মন্ত্র পড় মুখে॥
কাপাসে তুলার বীচি দেও ছড়াইয়া।
শতমুখী-রত্নে দেও, হার গড়াইয়া॥
কাণাকড়ি যত দেও, মানা নাই তায়।
লক্ষ্মীছাড়া বছরের হয়ে গেল সায়॥
রাম বল বাঁচিলাম, ঘাম এলো গায়।
কুলোর বাতাস দিয়ে, কররে বিদায়॥
ও পাড়াতে গাধা আছে, মরে চেঁচাইয়া।
এক পাশে দেও তারে, নজর ধরিয়া॥
সে গাধার ডাক্ আর, শুনা নাহি যায়।
জ্বালাতন সব লোক, গাধার জ্বালায়॥
মস্তক মুড়ায়ে দেও, কিছু নাহি গোল।
আন্ আন্ ছেঁদামালা, ঢাল ঢাল ঘোল॥
বিদায়ী দানেতে ভাই, হয়ো না কাতর।
রাস্তার নালায় আছে, গোলাপ আতর॥
বগল বাজাও সবে, হোগল্-কুড়ায়।
লক্ষ্মীছাড়া বছরের, হয়ে গেল সায়॥
রাম বল, বাঁচিলাম, ঘাম এলো গায়।
কুলোর বাতাস দিয়ে, কর রে বিদায়॥
নিন্দকের দাঁতঘষা, জীবঘষা জল।
খলের খলতারূপ, আধারীয় স্থল॥
বিছুটীর খেৎ দেও, বিছানা করিয়া।
আলকুশী দেও তায়, বালিস ধরিয়া॥
মশারি খাটাইতে আর, হবে না জঞ্জাল।
ঝুলের ঝালর দেয়া, মাকড়সার জাল॥
বস্ত্র দেও জুতো দেও, দেও অলঙ্কার।
আস্তাকুঁড় ঘোরে দেও, করুক আহার॥
পড়িয়ে এড়ে নথানি ফেলে দেয় পায়।
লক্ষ্মীছাড়া বছরের, হয়ে গেল সায়॥

রাম বল, বাঁচিলাম, ঘাম এলো গায়।
ফুলোর বাতাস দিয়ে, কর রে বিদায়॥

পাঁটা।

রসভরা রসময়, রসের ছাগল।
তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল॥
স্বর্গকুঁকী রত্নগর্ভা, জননী তোমার।
উদরে তোমায় ধরে, ধন্য গুণ তার॥
তুমি যার পেটে যাও, সেই পুণ্যবান্।
সাধু সাধু সাধু তুমি, ছাগীর সন্তান॥
ত্রিতাপেতে তরে লোক, তব নাম নিয়া।
বাঁচালে দক্ষের প্রাণ, নিজ মুণ্ড দিয়া॥
চাঁদমুখে চাঁপদাড়ী, গালে নাই গোঁপ।
শৃঙ্গ খাড়া ছাড়া ছাড়া, লোমে লোমে থোপ॥
সে সময়ে অপরূপ, মনোলোভা শোভা।
দৃষ্টিমাত্র নেড়ে গাত্র, কথা কয় বোবা॥
স্বর্গ এক উপসর্গ, ফল তাহে কলা।
দিবানিশি পড়ে থাকি, ধরে তার গলা॥
চারি পায়ে ছাঁদ দিয়া, তুলে রাখি বুকে।
হাতে হাতে স্বর্গ পাই, বোকা গন্ধ শুঁকে॥
শুধু যায় পেট ভরে, পাঁটারাম দাদা।
ভোজনের কালে যদি, কাছে থাকে বাঁধা॥
শাদা কালো কটারূপ, বলি হারি গুণে।
সাত পাত ভাত মারি, ভ্যা ভ্যা রব শুনে॥
মহিমার নাম ধর, শ্রীমহাপ্রসাদ।
তোমার প্রসাদে যায়, সকল বিষাদ॥
জাল দিতে কাল যায়, লাল পড়ে গালে।
কাটনা কামাই হয়, বাটনার কালে॥
ইচ্ছা করে কাঁচা খাই, সমুদয় লয়ে।
হাড়শুদ্ধ গিলে ফেলি, হাড়গিলে হয়ে॥
মজাদাতা অজা তোর কি লিখিব যশ?
যত চুষি তত খুসী, হাড়ে হাড়ে রস॥
গিলে গিলে ঝোল খায়, আহ্লাদেতে মেতে।
তাদের জীবন বৃথা, [illegible]॥

এমন পাঁটার মাস নাহি খায় যারা।
মরে যেন ছাগী-গর্ভে জন্ম লয় তারা॥
দেখিয়া ছাগের গুণ করে অভিমান।
হইলেন বরারূপ নিজে ভগবান্॥
তথাচ যবন হিন্দু করে আপমান।
ইংরাজে কেবল তাঁর রাখিয়াছে মান॥
হোটেলে বিক্রয় হয় নাম ধরে হ্যাম্।
পচাগন্ধে প্রাণ যায় ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যাম্॥
অদ্যাপি শ্রীহরি সেই অভিমান লয়ে।
লুকায়ে আছেন জলে কূর্ম্ম মীন হয়ে॥
কচ্ছপ সে জুজুবুড়ী তারে কেবা যাচে?
মাছে কিছু আছে মান বাঙ্গালীর কাছে॥
কিন্তু মাছ পাঁটার নিকটে কোথা রয়?
দাসদাস তস্য দাস তস্য দাস নয়॥
এক দুই তিন চারি ছেড়ে দেহ ছয়।
পাঁচের করিলে হাতে রিপু রিপু নয়॥
তঞ্চ ছাড়া পঞ্চ সেই অতি পরিপাটী।
বাবু সেজে পাটীর উপরে রাখি পাটী॥
পাত্র হয়ে পাত্র লয়ে ঢোলে মারি চাটি॥
ঝোলমাখা মাস নিয়া চাটি কোরে চাটি॥
টুকি টাকি টুক্‌টুক্ মুখে দিই মেটে।
যত পাই তত খাই সাধ নাহি মেটে॥
ঝোলের সহিত দিলে গোটা গোটা আলু।
লক্ লক্ লোলো লোলো জিব হয় লালু॥
সাবাস্ সাবাস্ রে সাবাসী তোরে অজা।
ত্রিভুবনে তোর কাছে কিছু নাই মজা॥
কোন অংশে বড় নয় কেহ তোর চেয়ে।
এত গুণ ধরিয়াছ পাতা ঘাস খেয়ে॥
মহতের কার্য্য কর গরিবানা চেলে।
না জানি কি হতো আরো ঘৃত ক্ষীর খেলে॥
বিশেষ মহিমা তব কি কব জবানী।
জানেন কিঞ্চিৎ গুণ ভাঁড়ে মা ভবানী॥
মুথায় তিলক ধরে ছাই ভস্ম খেয়ে।
কসাই অনেক ভাল গোঁসায়ের চেয়ে॥

পরম বৈষ্ণবী যিনি দক্ষের দুহিতা।
ছাগ-মাংস-রক্তে তিনি সদাই মোহিতা॥
ছলে এক মন্ত্র বলি বলিদান লয়ে।
খান দেবী পিতৃ-মাতা বিশ্বমাতা হয়ে॥
দক্ষযজ্ঞে প্রাণ ত্যজি খণ্ড খণ্ড হয়ে।
করিলেন ভুষ্টিনাশ কালীঘাটে রয়ে॥
প্রতি কোপে যত পাঁটা বলিদান করে।
দেবী-বরে জন্মে তারা * * ঘরে॥
এক জন্মে মাংস দিয়া আর জন্মে খায়।
কলীর দেবল হয়ে কালী-গুণ গায়॥
প্রণমামি * * তোমার চরণে।
পেটভরে পাঁটা দিও যত যাত্রিগণে॥
প্রণমামি সুখদাত্রী ছাগপ্রসবিনী।
অদ্যাবধি না হইবা কন্যার জননী॥
প্রণমামি কালীঘাট যথা মাতা কালী।
প্রণমামি মুদি-পদে বেচে যারা ডালি॥
ধন্য ধন্য কর্ম্মকার ধন্য তুমি খাঁড়া।
প্রণমামি তব পদে দিয়া গাত্র নাড়া॥
এমন সুখের ছাগে করে যেই দ্বেষ।
তাড়াইব তারে আমি ছাড়াইব দেশ॥
বাছিয়া পাঁটার হাড় গেঁথে তার মালা॥
বানাইব কুঁড়াজালি দিয়া ছাগমালা॥
নামাবলী বহির্ব্বাস নিয়া করতলে।
ভাল করে ছোপাইব রুধিরের জলে
সাজাইব গোঁড়াগণে দিয়া রক্ত-ছাব।
পশু-গন্ধে পশুদের যাবে পশুভাব॥
ফের যদি করে দ্বেষ হয়ে প্রতিবাদী।
ঘুচাব গোঁড়ামী রোগ দিয়া ছাগ্‌নাদী॥
অনুমতি কর ছাগ উদরেতে গিয়া।
অন্তে যেন প্রাণে যায় তব নাম নিয়া॥
[illegible] মুখে বলি গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম-হরি।
পাঁটামাস খেতে খেতে বিছানায় মরি॥
তাহাতেই মুক্তিলাভ মুক্তি নাই আর।
নিতান্ত কৃতান্ত হয় পদানত তার॥

হায় এ কি অপরূপ বিধাতার খেলা।
শুদ্ধ গাত্র কিছুমাত্র নাহি যায় ফেলা॥
লোম তুলি করি তুলি রঙ্গে রঙ্গে ভরি।
শ্রীরাধা-শ্রীকৃষ্ণ-রূপ সুখে চিত্র করি॥
চিত্রকরে চিত্র করে দিয়া সূক্ষ্মরেখা।
দেবমূর্ত্তি অবয়ব সব যায় লেখা॥
নানারূপ যন্ত্র হয় ছাগলের ছালে।
শ্রীহরি-গৌরাঙ্গগুণ বাজে তালে তালে॥
ঢাক কাঁড়া নহবৎ মৃদঙ্গ মাদোল।
তবলা অবলা-প্রিয় ঢোল আর খোল॥
এক চর্ম্মে বহু যন্ত্র বাদ্য তায় কল।
নেড়ানেড়ী গোঁড়াদের ভিক্ষার সম্বল॥
কণ্ঠীধারী প্রেমদাস সেবাদাসী নিয়ে।
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে খঞ্জনী বাজিয়ে॥
সাধ্য কার এক মুখে মহিমা প্রকাশে।
আপনি করেন বাদ্য আপনার নাশে॥
হাড়িকাঠে ফেলে দিই ধরে দুটী ঠ্যাং।
সে সময়ে বাদ্য করে ছ্যাড্যাং ছ্যাড্যাং ছ্যাড্যা
এমন পাঁটার নাম যে রেখেছে বোকা।
নিজে সেই বোকা নয় ঝাড়বংশ বোকা॥
ভ্রমণে যে ভাবোদয় নদনদী-পথে।
রচিলাম ছাগ-গুণ যথা সাধ্যমতে॥
প্রতিদিন প্রাতে উঠি করে শুদ্ধ মন।
ভক্তিভাবে এই পদ্য পড়িবে যে জন॥
বিচিত্র পুষ্পের রথে পাঁটা পাঁটা বলে।
সাতান্ন পুরুষ তার স্বর্গে যাবে চলে॥

তপ্‌সী মাছ।

কষিত কনককান্তি, কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁপ দাড়ী, তপস্বীর প্রায়॥
মানুষের দৃশ্য নও, বাস কর নীরে।
মোহন মণির প্রভা, ননীর শরীরে॥
পাখী নও কিন্তু ধর, মনোহর পাখা।
সুমধুর মিষ্টরস, সর্ব্ব অঙ্গে মাখা॥

একবার রসনার, যে পেয়েছে তার।
আর কিছু মুখে নাহি, ভাল লাগে তার॥
দৃশ্যমাত্র সর্ব্বগাত্র প্রফুল্লিত হয়।
সৌরভে আমোদ করে ত্রিভুবনময়॥
প্রাণে নাহি দেরী সয়, কাঁটা আঁস বাচা।
ইচ্ছা করে একবারে, গালে দিই কাঁচা॥
অপরূপ হেরে রূপ, পুত্রশোক হরে।
মুখে দেওয়া দূরে থাক, গন্ধে পেট ভরে॥
কুড়ি দরে কিনে লই, দেখে তাজা তাজা।
টপাটপ্ খেয়ে ফেলি, ছাঁকাতেলে ভাজা॥
না করে উদরে যেই, তোমায় গ্রহণ।
বৃথায় জীবন তার, বৃথায় জীবন॥
নগরের লোক সব, এই কয় মাস।
তোমার কৃপায় করে, মহাসুখে বাস॥
গুণেতে সবাই কেনা, কেনা করে সব।
কেন কেন, কেনা কেনা কে না করে রব॥
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে হেন আর নেই।
যে দিলে তপস্যা নাম, সাধু সাধু সেই॥
সব গুণে বদ্ধ তব, আছে সর্ব্বজনে।
লোণাজলে বাস কর, এই দুঃখ মনে॥
অমৃত থাকিতে কেন, রুচি হয় বিষে?
নুণ-পোড়া পোড়া জল, ভাল লাগে কিসে?
উলুবেড়ে আলো করে, করিছ বিহার।
নগরের উত্তরেতে গতি নাই আর॥
বেণোগাঙ্গে জোর-ভাঁটা, তাতেই সন্তোষ।
সমুদ্রের জল খেয়ে, বৃদ্ধি কর কোষ॥
জলধি করেছে তব, বহু উপকার।
নুণ খেয়ে গুণ গেয়ে, কাছে থাক তার॥
ক্ষীরোদমথনকালে অপূর্ব্ব ঘটন।
দেবাসুরে ঘোর দ্বন্দ্ব, সুধার কারণ॥
সাগর-সলিলে হয়, বিবাদ বিস্তার।
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি সুধীর সুধার॥
সে সময়ে তুমি মীন, অতি কুতূহলে।
খেয়েছিলে সেই জল, ডাঙ্গার কলে॥

অমৃত ভক্ষণে তাই, এরূপ প্রকার।
সুমধুর আস্বাদন, হয়েছে তোমার॥
এমন অমৃত ফল, ফলিয়াছে জলে।
সাহেবেরা সুখে তাই ম্যাঙ্গোফিস্ বলে॥
ব্যয় হেতু কোনমতে, না হয় কাতর।
খানায় আনায় কত, করি সমাদর॥
ডিস্ ভরে ফিস লয়, মিস বাবা যত।
পিস করে মুখে দিয়ে, কিস খায় কত॥
তাদের পবিত্র পেটে, তুমি কর বাস।
এই কয়মাস আর, নাহি খায় মাস॥
তোমায় অধরে ধরি, বাড়ে কত সুখ।
মাঝে মাঝে সেরীর গেলাসে দেয় মুখ॥
বেচিলার যারা তারা, প্রসাদের তরে।
রান্নাঘরে ধন্না দিয়ে, আয়োজন করে॥
হেসে হেসে ঘেঁসে ঘেঁসে কাছে গিন্না বসে
পেটে হারামের ছুরী মুখভরা রসে॥
টেক ফিস বলে ডিস কাছে দেন ঠেলে।
সশরীরে স্বর্গভোগ এঁটো খেতে পেলে॥
বাঙ্গালীর মত তারা রন্ধন না জানে।
আধ সিদ্ধ করি শুধু টেবিলেতে আনে॥
মসলার গন্ধ গায় কিছুমাত্র নাই।
অঙ্গে করে আলিঙ্গন কমলিনী রাই॥
হাদে রে নিদয় বিধি ধিক্ ধিক্ তোরে।
কি হেতু বেলাক হিঁদু করেছিস্ মোরে?
গোরা হলে হোরা মেরে চড়ে মনোরথে।
টেবিলে যেতেম খেতে ডেবিলের সাতে॥
প্রেমানন্দে পিস করি সুখে খায় মিস
বলিহারি যাই তোরে ওরে ম্যাঙ্গোফিস॥
কিন্তু এক মম মনে এই বড় শোক।
না জানে তোমার গুণ উত্তরের লোক॥
তোমার চরণে করি এই নিবেদন।
কর সবে সমভাবে দয়া বিতরণ॥
গোঁৎ করে সোঁৎ ঠেলে ভাঁটি গাং ছেড়ে
উজানের পথে চল দাড়ী গোঁপ নেড়ে॥

শাঁখ ঘণ্টা বাজাইবে যত মেয়ে ছেলে।
ভিটে বেচে পূজা দিব মিটে জলে গলে ॥
যথা ইচ্ছা তথা থাক মনোহর মীন।
পেটে ভরে খেতে যেন পাই একদিন ॥
তোমার তুলনা নহে কোটিকল্পতরু।
লঘু হয়ে হও তুমি সকলের গুরু ॥
সব ঠাঁই আদর অমান্য নাই কভু।
শুদ্ধ সত্ত্ব ঠিক যেন খড়দার প্রভু ॥
নিরাকার নিত্যানন্দ মীন অবতার।
নিত্য খেলে নিত্যানন্দ লাভ হয় তার ॥
খেতে যদি নাহি পাই, মুখে লই নাম।
প্রণাম তোমার পদে, সহস্র প্রণাম ॥
কত জলে থাক তুমি, নাহি তার লেখা।
তোমায় আমায় হয়, সহজে কি দেখা ?
কতরূপ ভাবসূত্র মানবের মনে।
পেয়েছি তোমায় আমি জেলের কল্যাণে ॥
গাভীন হইলে তুমি রস তায় কত।
রাড়া হলে রাঁড়া সুখ নাহি হয় তত ॥
তোমার ডিমের স্বাদ সুধার সমান।
গণ্ডা গণ্ডা এণ্ডা খেয়ে ঠাণ্ডা করি প্রাণ ॥
প্রসব করিবে যত তবু রবে তাজা।
আমাদের আশীর্ব্বাদে হবেনাকো বাঁজা ॥
জন্ম-এয়ো হও তুমি রসবতী সতী।
পোয়াতীর গর্ভে থেকে হও গর্ভবতী ॥
কোনমতে নাহি মেটে বাসনার ক্ষোভ।
যত পাই তত খাই তবু বাড়ে লোভ ॥
ভেজে খাই ঝোলে দিই কিম্বা দিই ঝালে।
উদর পবিত্র হয় দেবামাত্র গালে॥
আচার ছাড়িয়া যদি আচার মিশাই।
সে আচারে কোনরূপে অনাচার নাই ॥
কুলাচার কেবা ছাড়ে হলে কুলাচার।
আচারে আচারে বাড়ে সকল আচার ॥
যাতে পাই তাতে খাই করি বাজী ভোর।
হায় রে তপস্যা তোর তপস্যার কি জোর।

ঠোঁটকাটা।

ভদ্রকুলে জন্ম লই, ভদ্র নই নিজে।
যবনের সম সদা, জ্ঞান করি দ্বিজে ॥
ভদ্রকর্ম্ম কারে কহে, কিছু নাহি জানি
ধর্ম্মাধর্ম্ম পুণ্য-পাপ, কিছু নাহি মানি ॥
যেখানেতে বাস করি, নিজ আড্ডা গেড়ে।
লজ্জা ভয়ে লজ্জা পায়, সেই দেশ ছেড়ে ॥
বিচার না করি কভু, মান অপমান।
সমাদর অনাদর সকল সমান ॥
পিপে শুদ্ধ পার করে, শুষে খাই রম।
লাঠালাঠি কাটাকাটি, কিসে আমি কম ?
বাবা কিসে আমি কম্ ?

বাজে ঝম্ ঝম্, বাজে ঝম্ ঝম্ ঝম্।
এই দেখ বাজে বাবা, ঝম্ ঝম্ ঝম্ ॥
ক্ষণমাত্র বিবাদ কলহ, নাহি ছাড়ি।
করিয়াছি কারাগার, শ্বশুরের বাড়ী ॥
ইয়ারেরভাবে যদি, তুষ্ট রহে দেল।
তুল্যরূপে জ্ঞান করি, স্বর্গ আর জেল্ ॥
কিছুকাল সাঁচাভাবে, খাঁচায় রহিয়া।
জাহির করিব গুণ, বাহির হইয়া ॥
আমার প্রতাপে ধরা, হইবে অস্থির।
দেখা যাবে বীর হয়, কত বড় বীর ॥
প্রকাশিব নিজ বিদ্যা, মেরে এক দম্।
লাঠালাঠি কাটাকাটি, কিসে আমি কম্ ?
বাবা কিসে আমি কম্ ?

বাজে ঝম্ ঝম্ ঝম্, বাজে ঝম্ ঝম্।
এই দেখ বাজে বাবা, ঝম্ ঝম্ ঝম্ ॥
বয়স বাড়িছে যত, পাকিতেছে কেশ।
ততই ধারণ করি, নটবর-বেশ ॥
গোডিম ভাঙ্গেনি যবে, উঠে নাই গোঁপ।
তখন করেছি আমি, পিতৃ-ভক্তি লোপ ॥
শালগ্রাম ফেলে দিয়া, বেশ্যা আনি ঘরে।
ভার্য্যা তারে বেঁধে দিয়া পদসেবা করে ॥

ক্ষে দেখে চুপমেরে, কাষ্ঠ হন বাবা।
...টু হেল্ ওলড় ফক্স, ড্যাম্ ড্যাম্ হাব্‌য়া॥
আমার বুদ্ধির কেউ, নাহি পায় কম্।
লাঠালাঠি কাটাকাটি, কিসে আমি কম্?
বাবা কিসে আমি কম্?
বাজে ঝম্ ঝম্ ঝম্, বাজে ঝম্ ঝম্ ঝম্।
এই দেখ বাজে বাবা, ঝম্ ঝম্ ঝম্॥
একেতো মোহনমূর্ত্তি, মুখে মিষ্ট মধু।
দম্ দিয়া বার করি, কত কুলবধূ॥
দেশে দেশে মারিয়াছি, বাহাদুরী ঢাক্।
পরযাত্রা ভঙ্গ করি, কেটে নিজ নাক্॥
তটস্থ সকল লোক, দেখে মম ক্রিয়া।
গ্রামের ভিতরে চলি, মধ্যভাগ দিয়া॥
লাগে লাগে লাগে ফের, লাগে লাগে লাগে।
শ্বশুরের বাড়ী থেকে, ফিরে আসি আগে॥
কত মিত্র ধরে মিত্র,সব হবে গম্।
লাঠালাঠি কাটাকাটি, কিসে আমি কম্?
বাবা কিসে আমি কম্?
বাজে ঝম্ ঝম্ ঝম্, বাজে ঝম্ ঝম্ ঝম্।
এই দেখ বাজে বাবা, ঝম্ ঝম্ ঝম্॥

কাণকাটা।

...ভাবে স্থিরচিত্ত নৃত্য করে বীর।
প্রেমভরে যুগল-নয়নে ঝরে নীর॥
...রাসনে করে বীর মহিমা প্রকাশ।
...া টল চল চল খল খল হাস॥
...রিয়া ভক্তের ভঙ্গী ভয়ে কাঁপে যম।
...ঠালাঠি কাটাকাটি কিসে তুমি কম্?
বাবা কিসে তুমি কম্?
...ইট্ লড়েগা ফের কম্ কম্ কম্।
বাবা কম্ কম্ কম্॥
...রী কোরে ছিলে তুমি যত পরিচয়।
...দফাতে কোন অংশে আমি কম নয়॥
কত শত হাতী ঘোড়া গেল রসাতল।
ল্যাজ নেড়ে বলে ভ্যাড়া দেখ্ মোর বল॥
আমার নিকটে তুই নাহি পাস্ কম্।
লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে তুমি কম্?
বাবা কিসে তুমি কম্?
ফাইট্ লড়েগা ফের কম্ কম্ কম্।
বাবা কম্ কম্ কম্॥
বাহাদুরী দেখালাম এক চালি চেলে।
আমি আছি ঠিক বসে তুই গেলি জেলে॥
উপশক্তি প্রসাদেতে উপ... ...রি।
শক্তরূপে রক্ত খেয়ে নাশ করি অরি॥
বিপ্রের রুধির ভাবি ব্রাণ্ডী আর রম।
লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে তুমি কম?
বাবা কিসে তুমি কম্?
ফাইট্ লড়েগা ফের কম্ কম্ কম।
বাবা কম্ কম্ কম্॥
হাসাইলি সব লোক ডুবাইলি নাম।
জীবন বৃথায় তার বামা যারে বাম॥
নিরুপমা মনোরমা গুণধামা বামা।
হৃদয়ে বিরাজ করে তুল্য কেবা আমা?
জয় শব্দে বাজে ভেরী ভম্ ভম্ ভম্।
লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে তুমি কম্?
বাবা কিসে তুমি কম্।
ফাইট্ লড়েগা ফের কম্ কম্ কম্।
বাবা কম্ কম্ কম্॥

তোষামুদে।

তোষামুদে যারা তারা সবাই অসার।
কেবল বেড়ায় খুঁজে আপন্ সুসার॥
তুড়ি মারে টপ্পা গায় টাকা ভেবে সার।
বসে বসে রাশি রাশি 'যে আজ্ঞার' ভার॥
মূলেতে নির্দ্দাত করে পেলে পরে চারা।
বাবুরূপ বৃক্ষের বাড়িয়ে গাছ তারা।

কিসে ভাল কিসে মন্দ নাহি জানে কিছু।
জেলের হাঁড়ির মত ফেরে পিছু পিছু॥
বাগানেতে শশা তোলে পাড়ে পিচ নিচু।
কথায় কথায় কহে জল উঁচু নীচু॥
তখন সেরূপ করে বুঝে অভিপ্রায়
বাবুজী বলেন যাহা তাহে দেয় সায়॥
যত্তপি বলেন বাবু "কেমন গোবিন।
মানুষটী ভাল নয় বামুন নবীন?"
গোবিন বলেন "বাবু তাই বটে বটে।
গুণ জ্ঞান কিছু নাই সে বেটার ঘটে॥
ফোতোজারী করে সেটা মিছে ঘুরে মরে।
বাহিরেতে কোঁচা লম্বা অষ্টরম্ভা ঘরে॥
আপনি আসিতে দেন কে করিবে মানা?
চিরকালে পাজী তারা সব আছে জানা॥"
গোবিনের কথা শুনি শ্রীযুত তখন।
ভঙ্গিমা করিয়া যদি বলেন এমন॥
"গোবিন্দ কি শুন নাই এরূপ প্রকার।
নবীন বনেদী লোক বিদ্যা আছে তার॥
কহিতে বলিতে ভাল অতি সুভাজন।
আচার ব্যাভার সব হিঁদুর মতন॥"
গোবিন কহেন শুনে "হাঁ হাঁ মহাশয়।
বাবু যাহা কহিলেন সত্য সমুদয়॥
চিরকাল মান্য তারা সকলের কাছে।
পাকা ঘর পাকা বাড়ী ধন ভাল আছে॥
যেমন স্বরূপ নিজে গুণ সেইমত।
পারসী ইংরাজী জানে শাস্ত্র জানে কত॥
গোষ্ঠীপতি বটে তারা গাঁয়ের প্রধান।
অকাতরে যারে তারে অন্ন করে দান॥
নবীনের বাড়ী আমি যে সময়ে যাই।
ননী ক্ষীর ছানা কত পেটভোরে খাই॥"
বাবু কন "গোবিন এসেছে এক খোঁড়া।
দুই হাত উঁচু তার সঙ্গে এক ঘোড়া॥"
গোবিন কহেন "বটে দেখিয়াছি তারে।
হায় রে তপস্যা ও আকাশে নাকি উড়ে যেতে পারে॥
পাছে নাহি দয়া হয় হতেছে ভাবনা।
আমি তাহাতে বাবু চড়িতে পাব না?"
এইরূপ যত আছে তোষামুদে-দল।
বাবু কাবু করিবারে করে কত ছল॥
সাক্ষাৎ না করে কেহ সত্যের সহিত।
অধর্ম্মের চর হয়ে করয়ে অহিত॥

বুড়াশিবের স্তুতি।

(মার্শম্যান সাহেবকে বিদায়)

বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্।
কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্॥
শ্রীধাম শ্রীরামপুর কৈলাস-শিখর।
বিশ্বমাঝে অপরূপ দৃশ্য মনোহর॥
কোম্পানীর প্রতিষ্ঠিত তুমি বুড়া-শিব।
তথায় বিরাজ করি তরাতেছ জীব॥
শুভ্রদেহ ভূতনাথ ভোলা মহেশ্বর।
গঙ্গার তরঙ্গ তব মাথার উপর॥
কখনো প্রখর বেগে কভু থম্ থম্।
বম্ বম্ বম্ বব, বম্ বম্ বম্॥
কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্ বব, বম্ বম্ বম্॥
"ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" বৃষভে আরোহণ।
অহঙ্কার-অলঙ্কার ভুজঙ্গ-ভূষণ॥
পক্ষপাত-হাড়মালা সদা সুশোভন।
মিথ্যা, ছল, তোষামোদী ত্রিশূল ধারণ॥
ধূম্রপান ছল তব কাগজের কল।
ঊর্দ্ধভাগে ধক্ ধক্ জ্বলিছে অনল॥
দমে দমে দমবাজী নাহি থাও দম।
বম্ বম্ বম্, বব বম্ বম্ বম্।
কিসে তুমি কম?

বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম্ ভম্ ভম্ ।
বম্ বম্ বম্, বব বম্ বম্ বম্ ॥
টাউন্সেণ্ড রবার্টসন নন্দী ভৃঙ্গী দুটো ।
নিয়ত নিকটে আছে দাঁতে করি কুটো ॥
ছাই-ভস্ম-বিভূষিত এঁটোকাঁটা খায় ।
গালবাদ্য করি সদা বগল বাজায় ॥
"ডেবিল" দুপাশে তারা টেবিল ধরিয়া ।
"এ বিল" হতেছে সুখে তোমায় স্মরিয়া ॥
কাজ ভাল, লাজহীন রাজপ্রিয়তম ।
বম্ বম্ বম্, বব বম্ বম্ বম্ ॥
কিসে তুমি কম ?

বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম্ ভম্ ভম্ ।
বম্ বম্ বম্, বব বম্ বম্ বম্ ॥
লাঞ্ছনার বাঘছাল বঞ্চনার ঝুলী ।
একমুখে পঞ্চানন সাধে বলি শূলী ॥
তিরস্কার পুরস্কার অতুল বিভব ।
নিজ নিন্দা শ্রবণেতে হয়ে থাক শব ॥
কালারূপে কালা তব হৃদয়ে বিহরে ।
সৃষ্টির মড়ার কাঁথা জমা আছে ঘরে ॥
ত্রিভুবন জয় করে তব পরাক্রম ।
বম্ বম্ বম্, বব বম্ বম্ বম্ ॥
কিসে তুমি কম ?

বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম্ ভম্ ভম্ ।
বম্ বম্ বম্, বব বম্ বম্ বম্ ॥
কাউন্সিল কোচের গৃহে বড় সমাদর ।
অনুরক্ত ভক্ত তব যত গবানর ॥
সিবিল শৈবের দল স্তব পাঠ করে ।
হরে হরে বাবাজান বাবাজান হরে ॥
যোড়শোপচারে পূজা ভক্তে করে যোগ ।
মন্দিরে বসিয়া সুখে খাও রাজভোগ ॥
তোমার গুণের কেহ নাহি পায় কম্ ।
বম্ বম্ বম্, বব বম্ বম্ বম্ ॥
কিসে তুমি কম ?

বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম্ ভম্ ভম্ ।
বম্ বম্ বম্, বব বম্ বম্ বম্ ॥
"ধর্ম্মতলা" ধর্ম্মহীন গোহত্যার ধাম ।
"ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" সেরূপ তব নাম ॥
বিশেষ মহিমা আমি কি কহিব আর ।
"ফ্রেণ্ড" হয়ে, ফ্রেণ্ডের খেয়েছ তুমি আর ॥
কত ভাব ধর তুমি কত ভাব ধর ।
রাজায় করিলে খুন গুণ গান কর ॥
ভ্রমিতে অন্যায় পথে কিছু নাহি ভ্রম ।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্ ॥
কিসে তুমি কম ?

বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম্ ভম্ ভম্ ।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম বম্ ।
কালো তুমি শাদা কর শাদা কর কালো ॥
আলো কর অন্ধকারে অন্ধকারে আলো ॥
স্থলেরে আকাশ কর আকাশেরে স্থল ।
জলেরে অনল কর অনলেরে জল ॥
কাঁচারে বানাও পাকা পাকা কর কাঁচা ।
সাঁচারে বানাও ঝুঁটো ঝুটো কর সাঁচা ॥
কাঙ্গালীর দুখদাতা বাঙ্গালীর যম ।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্ ॥
কিসে তুমি কম ?

বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম্ ভম ভম্ ।
বম বম বম বব বম্ বম্ বম্ ॥
শুনিতেছি বাবাজান এই তব পণ ।
সাক্ষ্য দিতে করিতেছ বিলাতে গমন ॥
যোড়করে পশুপতি করি নিবেদন ।
সেখানে করো না গিয়া প্রজার পীড়ন ॥
ভূত প্রেত সঙ্গীগুলি সঙ্গে লয়ে যাও ।
এখানে বসিয়া কেন মাথা আর খাও ?
বাজাই বিদায়ী বাদ্য টম টম টম ।
বম বম বম বব বম বম বম ।
কিসে তুমি কম ?

বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম ভম ভম।
বম বম্ বম বব বম্ বম বম ॥

অনাচার।

কালগুণে এই দেশে বিপরীত সব।
দেখে শুনে মুখে আর নাহি সরে রব ॥
একদিকে দ্বিজ তুষ্ট গোল্লাভোগ দিয়া।
আর দিকে মোল্লা বাসে মুর্গি মাস নিয়া ॥
একদিকে কোশাকুশী আয়োজন নানা।
আর দিকে টেবিলে ডেবিলে খায় খানা ॥
ভূতের সংসারে এই হয়েছে অদ্ভুত।
বুড়া পূজে ভূতনাথ ছোঁড়া পূজে ভূত ॥
পিতা দেয় গলে সূত্র পুত্র ফেলে কেটে।
বাপ পূজে ভগবতী বেটা দেয় পেটে!
বৃদ্ধ ধরে পশুভাব জশুভাব শিশু।
বুড়া বলে রাধাকৃষ্ণ ছোঁড়া বলে যীশু ॥
হাসি পায় কান্না আসে কব আর কাকে?
যায় যায় হিঁদুয়ানী আর নাহি থাকে ॥
ওহে কালি কালরূপ করালবদন।
তোমার রদনযুক্ত মরালবাহন ॥
দেব দেবী কত তুমি করিয়া সংহার।
ভারতের স্বাধীনতা করিলে আহার ॥
কিছু বুঝি নাহি পাও চারিদিক্ চেয়ে
এখন ভরাবে পেট হিন্দুধর্ম্ম খেয়ে?
দোহাই দোহাই কাল শান্তিগুণ ধর।
উঠ উঠ পান লও আচমন কর ॥

বিধবাবিবাহ আইন।

হিন্দুর বিধবার বিয়া আছে অপ্রচার।
বহুকাল হতে যার নাহি ব্যবহার ॥
সে বিষয়ে কৃতাকৃত না করি বিশেষ।
করিলেন একেবারে নিয়ম নির্দ্দেশ ॥
শত শত প্রজা তায় ব্যথা পায় প্রাণে।
তাদের আর্ত্তনাদ নাহি শুনিলেন কাণে ॥
গ্রাণ্ট করি গ্রাণ্টের সকল অভিলাষ।
কালবিল কাল বিল করিলেন পাস ॥
না হইতে শাস্ত্রমতে বিচারের শেষ।
বল করি করিলেন আইন আদেশ ॥
যাহাদের ধর্ম্ম এই আর দেশাচার।
পরস্পর তারা আগে করুক বিচার ॥
বিধি কি অবিধি তারা ঘরেতে বুঝিবে।
যা হয় উচিত তাই শেষেতে করিবে ॥
করিছে আমার ধর্ম্ম আমাতে নির্ভর।
রাজা হয়ে পরধর্ম্মে কেন দেন কর?
আগে ভাগে রাজাদেশ করিতে প্রচার।
এত কেন মাথাব্যথা হইল রাজার?
যদ্যপি বিধান হয় বিধবার বিয়ে।
আপনারা করুক্ আপন দল নিয়ে ॥
যুক্তি আর বিচারেতে যে হয় বিহিত।
দেশেতে চালিত করা তাইতো উচিত ॥
অনিয়মে করি একি নিয়মের ছল।
ভূপতি তাহাতে কেন প্রকাশেন বল?
কোলে কাঁকে ছেলে ঝোলে যে সকল রাঁড়ী।
তাহারা সধবা হবে পোরে শাঁকা শাড়ী।
এ বড় হাসির কথা শুনে লাগে ডর।
কেমন কেমন করে মনের ভিতর ॥
শাস্ত্র নয় যুক্তি নয় হবে কি প্রকারে?
দেশাচারে ব্যবহারে, বাধো বাধো করে ॥
যুক্তি বোলে বিচার করুন্ শত শত।
কোনমতে হইবে না শাস্ত্রের সম্মত ॥
বিবাহ করিয়া তারা পুনর্ভবা হবে।
সতী বোলে সম্বোধন কিসে করি তবে?
বিধবার গর্ভজাত যে হয় সন্তান।
"বৈধ" বোলে কিসে তাঁরা করিবে প্রমাণ?
যে বিষয় সর্ব্ববাদি-সম্মত না হয়।
সে বিষয় সিদ্ধ করা শক্ত অতিশয় ॥

ছলে আর ছলে বলে যত পার কর।
ফলে সে কিছুই নয়, মিছে বোকে মর॥
শ্রীমান্ ধীমান্ নীতি-নির্ম্মাণকারক।
যাঁরা সবে হতে চান বিধবাতারক॥
নতভাবে নিবেদন প্রতি জনে জনে।
আইন-বৃক্ষের ফল ফলিবে কেমনে?
বিধবার বিয়ে দিতে যাহারা উদ্যত।
তার মাঝে বড় বড় লোক আছে যত॥
যারে ইচ্ছা তারে হয় ডাকিয়া আনিয়া।
ঘরেতে বিধবা কত পরিচয় নিয়া॥
গোপনেতে এই কথা বলিবেন তারে।
জননীর বিয়ে দিতে পারে কি না পারে?
যদি পারে তবে তারে বলি বাহাদুর।
এখনি করিলে সব দুঃখ হয় দূর॥
সহজে যদ্যপি হয় এরূপ ব্যাপার।
করিতে হবে না তবে আইন প্রচার॥
যদি কেহ নাহি পারে সাহস ধরিয়া।
বিফল কি ফল তবে আইন করিয়া॥
পরস্পর আড়ম্বর মুখে কত কয়।
কেহ আর মাথা তুলে অগ্রসর নয়॥
গোলেমালে হরিবোল গণ্ডগোল সার।
নাহি হয় ফলোদয় মিছে হাহাকার॥
বাক্যের অভাব নাই বদনভাণ্ডারে।
যত আসে তত বলে কে দুষিবে কারে?
সাহস কোথায় বল প্রতিজ্ঞা কোথায়?
কিছুই না হতে পারে মুখের কথায়॥
মিছামিছি অনুষ্ঠানে মিছে কাল হরা।
মুখে বলা বলা নয় কাজে করা করা॥
সকলেই তুড়ি মারে বুঝে নাকো কেউ।
সীমা ছেড়ে নাহি খেলে সাগরের ঢেউ॥
সাগর যদ্যপি করে সীমার লঙ্ঘন।
তবে বুঝি হতে পারে বিবাহঘটন॥
নচেৎ না দেখি কোন সম্ভাবনা আর।
অকারণে হই হই উপহাস সার॥
কেহ কিছু নাহি করে আপনার ঘরে।
যাবে যাবে যায় শত্রু যাক পরে পরে॥
এখন এরূপ কবে হলে ব্যতিক্রম।
"ফাটায় পোড়েছে কলা গোবিন্দায় নম।"
রাজার কর্ত্তব্য কথা করিতে বর্ণন।
এরূপ লিখিয়া আর নাহি প্রয়োজন॥
এইমাত্র শেষ কথা কহি, নিশ্চয়।
এই বিষয়ে বিধি দে'য়া রাজধর্ম্ম নয়॥
মরুক্ মরুক্ বাদ প্রজায় প্রজায়।
কোন্ কালে রাজার কি হানি আছে তায়?

বিধবাবিবাহ।

বাধিয়াছে দলাদলি লাগিয়াছে গোল।
বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল॥
কত বাদী প্রতিবাদী করে কত রব।
ছেলে বুড়ো আদি করি মাতিয়াছে সব॥
কেহ উঠে শাখাপরে কেহ থাকে মূলে।
করিছে প্রমাণ জড়ো পাঁজি পুঁথি খুলে॥
একদলে যত বুড়ো আর দলে ছোঁড়া।
গোঁড়া হয়ে মাতে সব, দেখেনাকো গোড়া॥
লাফালাফি দাপাদাপি করিতেছে যত।
দুই দলে খাপাখাপি ছাপাছাপি কত॥
বচন রচন করি কত কথা বলে।
ধর্ম্মের বিচার-পথে কেহ নাহি চলে॥
"পরাশর"প্রমাণেতে বিধি বলে কেউ।
কেহ বলে এ যে দেখি সাগরের ঢেউ॥
কোথা বা করিছে লোক শুধু হেউ হেউ।
কোথা বা বাঘের পিছে লাগিয়াছে ফেউ॥
অনেকেই এইমত লতেছে বিধান।
"অক্ষতযোনির" বটে বিবাহ-বিধান॥
কেহ বলে ক্ষতাক্ষত কেবা আর বাছে?
একেবারে তরে যাক যত রাঁড়ী আছে॥
কেহ কহে এই বিধি কেমনে হইবে?

হিঁদুর ঘরের রাঁড়ী সিঁদুর পরিবে।
বুকে ছেলে কাঁকে ছেলে ছেলে কোলে কোলে
তার বিয়ে বিধি নয়, উলু উলু বোলে॥
গিলে গিলে ভাত খায় দাঁত নাই মুখে।
হইয়াছে আঁত খালি হাত চাপা বুকে॥
খাটে যারে নিয়ে যাব, চড়াইয়া খাটে।
শাড়ীপরা চুড়ি হাতে তারে নাকি খাটে?
শুনিয়া বিয়ের নাম "কোনে" সেজে বুড়ী।
কেমনে বলিবে মুখে "থুড়ী থুড়ী থুড়ী"?
পোড়ামুখ পোড়াইয়া কোন্ পোড়ামুখী।
'দুখী' 'সুখী' মেয়ে ফেলে কেঁচে হবে খুকী?
বেটা আছে যার তার বেল গাছ এঁচে।
তুড়ী মেরে থুড়ী বলে সে বসিবে কেঁচে?
গমনের আয়োজন শমনের ঘরে।
বিবাহের সাধ সে কি মনে আর করে?
যেখানে সেথ নে শুনি এই কলরব।
বালার বিবাহ দিতে রাজী আছে সব॥
সকলেই এইরূপে বলাবলি করে।
ছুঁড়ীর কল্যাণে যেন বুড়ী নাহি তরে॥
শরীর পুড়েছে ঝুলে চুলগুলি পাকা।
কে ধরাবে মাছ তারে কে পরাবে শাঁখা?
জ্ঞানহারা হয়ে যাই নাহি পাই ধ্যানে।
কে পাড়িবে 'সংবাপ' মায়ের কল্যাণে?

খল তবু হবে না সরল।

দিনকর যদি হয় পশ্চিমে উদয়।
অমার নিশিতে যদি শশী দৃশ্য হয়॥
বৃদ্ধের যত্তপি হয় যৌবন-সঞ্চার।
মৃত প্রাণী প্রাণ যদি পায় পুনর্ব্বার॥
শিখরীর শিরে যদি ফুটে শতদল।
কখনই খল তবু হবে না সরল॥
হরিদ্রার চারুরূপ যদি হয় কালো।
জোনাকী যত্তপি ধরে চন্দ্রমার আলো॥
লোহায় যত্তপি হয় ফুলের সৌরভ।
কুপুত্রে যত্তপি হয় কুলের গৌরব॥
সুধাবৎ যদি হয় সাপের গরল।
কখনই খল তবু হবে না সরল॥
নয়নের দৃষ্টি গুণ যদি পায় কাণ।
নয়ন যত্তপি পায় নাসিকার ঘ্রাণ॥
নাসায় যত্তপি হয় শ্রবণের যোগ।
চরণে যত্তপি হয়, রসনার ভোগ॥
অগ্নির দাহিকা গুণ যদি পায় জল।
কখনই খল তবু হবে না সরল॥
আকাশের মুখ ফুটে যদি স্বরে বাক।
সুমধুর মিষ্ট রব যদি পায় কাক॥
পরম বৈষ্ণবধর্ম্ম বাঘ যদি ধরে।
ভেক যদি নলিনীর মন বশ করে।
যদি হয় জলবৎ অনল শীতল।
কখনই খল তবু হবে না সরল॥
বানরের লেজ ঘুচে যদি হয় নর।
মহীলতা যদি হয় সর্প বিষধর॥
অঙ্গারের কালো ঘুচে যদি হয় শাদা।
অশ্বসম খরগতি যদি পায় গাধা॥
অমৃত যত্তপি হয় মাখালের ফল।
কখনই খল তবু হবে না সরল॥
চোর যদি সাধু হয় যুধিষ্ঠির প্রায়।
শূকর ছাড়িয়া বিষ্ঠা ক্ষীর যদি খায়॥
বারবধূ যদি হয় সাবিত্রী সমান।
শৃগালে ধরিয়া যন্ত্র যদি করে গান॥
গগনে যত্তপি উঠে ভূতল নিতল।
কখনই খল তবু হবে না সরল॥
আমিষভক্ষণ রোগ যদি ছাড়ে বক।
দারুণ ঠকামী রোগ যদি ছাড়ে ঠক॥
ভাট যদি শ্রাদ্ধবাড়ী তষ্টি নাহি পাড়ে।
আমলার মামলার ঘুস যদি ছাড়ে॥
হাকিম যত্তপি ছাড়ে বিচারের ছল।
কখনই খল তবু হবে না সরল।

ভিক্ষা-বৃত্তি ছাড়ে যদি ব্রাহ্মণ কাঙ্গাল।
স্বভাবেতে সৎ হয় যদ্যপি * * * ॥
ধনেতে লোভীর লোভ যদি নাহি বাড়ে।
পররাজ্যহরা-লোভ রাজা যদি ছাড়ে॥
দলচক্রী বাঙ্গালীরা যদি ছাড়ে দল।
কখনই খল তবু হবে না সরল॥
নিশা যদি দিবা হয় দিবা হয় নিশা।
সুবর্ণ সুবর্ণসম যদি হয় সীসা॥
সুমেরু যদ্যপি উড়ে বায়ুর ব্যজনে।
সিন্ধু যদি শুষ্ক হয় কীটের শোষণে॥
রবি শশী খসি যদি যায় রসাতল।
কখনই খল তবু হবে না সরল॥
লবণ-জলধি যদি সুধাজল ধরে।
নিম্ব যদি মধুময় ফলদান করে॥
ছাতারিয়া যদি শিখে ময়ূরের নাচ।
কষিতকনককান্তি যদি হরে কাচ॥
করী যদি হরি বধে শুঁড়ে করি বল।
কখনই খল তবু হবে না সরল॥

চিত্রকর ও কবি।

চিত্রকর চিত্র করে লবে তুলি তুলি।
কবি সহ তাহার তুলনা কিসে তুলি॥
চিত্রকর দেখে যত বাহ্য অবয়ব।
তুলিতে তুলিয়া রঙ্গ লেখে সেই সব॥
ফলে বিচিত্র চিত্র চিত্র অপরূপ।
কিন্তু তাহে নাহি দেখি প্রকৃতির রূপ॥
চারু বিশ্ব করি দৃশ্য চিত্রকর কবি।
স্বভাবের পটে লেখে স্বভাবের ছবি॥
কিবা দৃশ্য কি অদৃশ্য সকলি প্রকট।
অলিখিত কিছু নাই কবির নিকট॥
ভাব চিন্তা প্রেমরস আদি বহুতর।
সমুদয় চিত্র করে কবি চিত্রকর॥
পটুয়ার চিত্র ক্রমে রূপান্তর হয়।
কবি চিত্র কিবা চিত্র বিনাশের নয়॥
পটুয়ার লেখে কত হাত মুখ পদ।
কবি-চিত্রকর লেখে শুধু মাত্র পদ॥
পদে পদে সেই পদে রয় হাত মুখ।
বিলোকনে বিয়োগীর দূর হয় দুখ॥
কবির বর্ণনে দেখি ঈশ্বরীয় লীলা।
ভাবনীরে মগ্ন করি দ্রব হয় শিলা।
তুল্যরূপে দৃষ্ট হয় ধন আর বন।
ভাবরসে মুগ্ধ করে ভাবুকের মন॥
রসিকজনের আর নাহি থাকে ক্ষুধা।
প্রতিপদে বর্ণে বর্ণে বর্ণে যায় সুধা॥
জগতের মনোহর ধন্য ভাই কবি।
ইচ্ছা হয় হৃদিপটে লিখি তোর ছবি॥

বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা।

যেমন শীতল দেশে চাঁদের কিরণে।
কোনমতে সুখলাভ নাহি হয় মনে॥
উষ্ণদেশে যে প্রকার প্রভাকর কর।
কোনমতে মনের না হয় সুখকর॥
সে প্রকার ঘরে ঘরে যতেক যুবতী।
কোনমতে তুষ্ট নয় পেয়ে বৃদ্ধপতি॥
চুলপাকা দাঁতপড়া দেখে বুড়া ধব।
তরুণীর মনে নাহি জাগে মনোভব॥
ঘৃণা করি ত্যাগ করে ঔষধের প্রায়।
বাপ বাপ বলে তার নিকটে না যায়॥
ধন আর প্রাণ লোভে সকলেই বড়।
বৃদ্ধের যুবতী দারা প্রাণ হতে বড়॥
কাছে কাছে রাখে সদা পেতে আঁখিজাল।
ক্ষণমাত্র নাহি করে চখের আড়াল॥
প্রাচীন কুকুর যথা পেলে পরে হাড়।
রসনার স্বাদ লয় নেড়ে নেড়ে ঘাড়॥
প্রাচীনের সে প্রকার রমণী যুবতী।
শুধুমাত্র সার হয় মুখের ভারতী॥
কথা কয়ে হেসে খেলে যা করিতে পারে।
নাহি ভোগ মিছে যোগ যোগ্য নাহি তারে॥

পতির রতির গতি যুবতী দেখিয়া।
উপযোগে উপভোগে রত হয় গিয়া॥
সে রমণী ধর্ম্মপথে কভু নাহি রয়।
বুড়ো হলে বিয়ে করা বিধি তাই নয়॥
যদ্যপি বিবাহ কর কামগুণ গেয়ে।
গয়াসুরে মনে কর গয়া পানে চেয়ে॥
একে ত রমণীজনে নাহিক বিশ্বাস।
তাহে কেন ডেকে আন নিজ সর্ব্বনাশ॥
নারীর কর্ত্তৃত্ব যদি হয় একবার।
তবে কি সে কোনমতে রক্ষা রাখে আর?
ছল করি কুহকেতে কত খেলা খেলে।
কোথা নারী সতী হয় বুড়ো পতি পেলে?
একে বুড়ো তাহে যদি ধন নাহি রয়।
তবে আর কিছু তার বলিবার নয়॥
জরজর করে মেরে কটু বাক্যবাণ।
নিয়ত গর্জ্জন করে নাগিনী সমান॥
বাপের বাড়ীতে থাকে স্বাধীনের প্রায়।
ইচ্ছামতে মনোরথে যথা তথা যায়॥
যার তার ঘরে করে ভোজন শয়ন।
উপবনে গিয়া করে কুসুম চয়ন॥
ঠারে ঠোরে বলে চলে হেলিয়া হেলিয়া।
সুপুরুষ দেখে থাকে নয়ন মেলিয়া॥
নূতন নূতন ভোগে নিত্য অভিলাষ।
গরু যথা ইচ্ছা করে নব নব ঘাস॥
আগে আগে হাঁটে আর পেছু পানে চায়।
নখেতে মৃত্তিকা খুঁড়ি ধরণী লুটায়॥
বালকে চুম্বন করে তুলিয়া বগোল।
আর কি অসতী নারী বাজাইবে ঢোল॥
ভাল মন্দ কুল শীল কিছুই না বাছে।
সকলেই প্রিয় হয় যারে পায় কাছে॥
পুত্রের পর্য্যায় কেহ হইলে সুন্দর।
স্বরূপ যদ্যপি হয় নিজ সহোদর॥
দৃষ্টিমাত্রে রমণীর * * * হয়।
ফুটিতে না পারে মুখে 'বোবা' হয়ে রয়॥

বাহিরে শীতল্য করে নিরুপায় হলে।
মনে মনে পুড়ে মরে মদন-অনলে॥
পুরুষের ইঙ্গিত পাইলে একবার।
তখনি খুলিয়া দেয় হৃদয়-ভ গুার॥
জুজু করে রাখে তারে আর নাহি ছাড়ে।
পেত্নিনী হইয়া তার জেঁকে বসে ঘাড়ে॥
নারীর সতীত্ব রক্ষা যে কারণে হয়।
তাহার কারণ হয় লজ্জা আর ভয়॥
পিতার অধীনে থাকে বালিকা যখন।
স্বামীর শাসনে থাকে হইলে যৌবন॥
বুড়ো হলে সন্তানের অধীনেতে থাকে।
সে সময়ে ধৈর্য্য ধরে পড়িয়ে বিপাকে॥
মনোমত স্থান আর কোথায় না পায়।
কাজে কাজে ধর্ম্ম রাখে হয়ে নিরুপায়॥
রমণী ঘৃতের ঘট পুরুষ অনল।
অতএব নারী রাখ করিয়া বিরল॥
সুরাচার্য্য শুক্রাচার্য্য এই দুই জনে।
যে শাস্ত্রের উপদেশ বিখ্যাত ভুবনে॥
সে শাস্ত্রের জ্ঞানের কৌশল সমুদয়।
নারীর মনেতে হয় স্বভাবে উদয়॥
কত ছল কত বল কত বুদ্ধি ধরে।
সবদিকে পুরুষেরে জ্ঞানহীন করে॥
কি দেখে 'অবলা' তার দিলে অভিধান।
সবলা কে আছে আর নারীর সমান?
রমণীর স্থিতি নয় বিশ্বাসের স্থানে।
যত পার তত তারে রাখ সাবধানে॥

পৌষ-পার্ব্বণ।

সুখের শিশিরকাল, সুখে পূর্ণ ধরা।
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা॥
ধনুর তনুর শেষ মকরের যোগ।
সন্ধিক্ষণে তিন দিন মহা সুখভোগ॥
মকরসংক্রান্তি-স্নানে জন্মে মহাফল।
মকর মিতিন সই চল্ চল্ চল॥

সারানিশি জাগিয়াছি দেখ সব বাসী।
গঙ্গাজলে গঙ্গাজল অঙ্গ ধুয়ে আসি॥
অতি ভোরে ফুল লয়ে গিয়াছেন মাসী।
একা আমি আসিয়াছি সঙ্গে লয়ে দাসী॥
এসেছি বাপের কাছে ছেলে মেয়ে ফেলে।
রাঁধাবাড়া হবে সব আমি নেয়ে এলে॥
ঘোর ঝাঁক বাজে শাঁক যত সব রামা।
কুটিছে তণ্ডুল সুখে করি ধামা ধামা॥
বাউনি আউনি ঝাড়া পোড়া আখ্যা আর।
মেয়েদের নব শাস্ত্র অশেষ প্রকার॥
তুক্ তাক্ মন্ত্র তন্ত্র কতরূপ খ্যাল্।
পাঁদাড়ে ফুলিছে খ্যাল খ্যাল খ্যাল্ খ্যাল্॥
খোলায় পিটুলী দেন হয়ে অতি শুচি।
ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ হয় ঢাকা দেন মুচি॥
উনুনে ছাউনি করি বাউনি বাঁধিয়া।
চাউনি কর্ত্তার পানে কাঁদুনি কাঁদিয়া॥
চেয়ে দেখ স সারেতে কতগুলি ছেলে।
বল দেখি কি হইবে নয় রেখ চেলে?
ক্ষুদ কুঁড়া গুঁড়া করি কুটিলাম ঢেঁকি।
কেমনে চালাই সব তুমি হলে ঢেঁকি॥
আড় করি পার্ দিতে সিকি গেল গড়ে।
লেখা করি নাহি হয় আধপোয়া গড়ে॥
ছাই করি রাখিলাম অর্দ্ধভাগ কেটে।
হাতে হাতে গেল তিল তিল তিল বেটে॥
ঝোলা গুড় তোলা ছিল শিকের উপরে।
তোলা তোলা খেতে দিয়া ফুরাইল ঘরে॥
পোয়া কাঁচ্চা কি করিবে নহে এক মন।
বাড়ীর লোকের তাহে নহে এক মন॥
একমনে খায় যদি আধ মণে সারি।
একমনে না খাইলে দশ মণে হারি॥
ভাঙ্গামণে পূরোমণ মন যদি খোলে।
পূরোমণে কি হইবে ভাঙ্গা মন হলে॥
তুমি ভাব ঘরে আছে কত মন তোলা।
জান না কি ঘরে আছে কত মণ তোলা॥

কারে বা কহিব আর বোঝা হল দায়।
খুলে দিলে মন কিহে তুলে রাখা যায়?
বিষম দুরন্ত ওটা মেজোবোর বেটা।
কোনমতে শোনেনাকো ছোঁড়া বড় ঠেঁটা॥
না দিলে ধমক্ দেয় দুই চক্ষু রেঙ্গে।
ঘটী বাটি হাঁড়ি কুড়ি সব ফেলে ভেঙ্গে॥
পুলি সব উঠে গেল কিছু নাই ছাঁই।
নারিকেল তেল গুড় ফের সব চাই॥
অদৃষ্টের দোষ সব মিছে দিই গালি।
চর্ব্বণে উঠিয়া গেল পার্ব্বণের চালি॥
আমি লই মোটা চাল সরু চেলে চেলে।
বুঝিতে না পারি তুমি চল কোন্ চেলে॥
এ বাড়ীর মেয়েদের বলিয়াছি খেতে।
নূতন জামাই আজ আসিবেন রেতে॥
তোমার কি ঘর পানে কিছু নাই টান।
হাবাতের হাতে যায় অভাগীর প্রাণ॥
কি বলিব বাপে মায় কেন দিলে বিয়ে।
একদিন সুখ নাই ঘরকন্না নিয়ে॥
কোন দিন না করিলে সংসারের ক্রিয়ে।
দিবানিশি ফেরো শুধু গোঁপে তেল দিয়ে॥
সবে মাত্র দুই গাছা খাড়ু ছিল হাতে।
তাহাও দিয়াছি বাঁধা মেয়েটীর ভাতে॥
সুদে সুদে বেড়ে গেল কে করে খালাস?
বাঁচিবার সাধ নাই মলেই খালাস॥
রাত্রিদিন খেটে মরি এক সন্ধ্যা খেয়ে।
এত জ্বালা সহ্য করি আমি যাই মেয়ে॥
এইরূপ প্রতি ঘরে দৃশ্য মনোহর।
গিন্নীর কাঁড়ুনি হয় কর্ত্তার উপর॥
মাগীদের নাহি আর তিন রাত্রি ঘুম।
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি রন্ধনের ধুম॥
সাবকাশ নাই মাত্র এলোচুল বাঁধে।
ডাল ঝোল মাছ ভাত রাশি রাশি রাঁধে॥
কত তার কাঁচা থাকে কত যায় পুড়ে।
সাধে রাঁধে পরমান্ন নলেনের গুড়ে॥

বধূর রন্ধনে যদি যায় তাহা এঁকে।
শাশুড়ী ননদ কত কথা কয় বেঁকে॥
হ্যালো বউ কি করিলি দেখে মন চটে।
এই রান্না শিখেছিস্ মায়ের নিকটে?
সাতজন্ম ভাত বিনা যদি মরি দুঃখে।
তথাচ এমন রান্না নাহি দিই মুখে॥
বধূর মধুর খনি মুখ-শতদল।
সলিলে ভাসিয়া যায় চক্ষু ছলছল॥
আহা তার হাহাকার বুঝিবার নয়।
ফুটিতে না পারে কিছু মনে মনে রয়॥
ভাগ্যফলে রান্না সব ভাল হয় যাঁর।
ঠ্যাকারেতে মাটীতে পা নাহি পড়ে তাঁর॥
হাসি হাসি মুখখানি অপরূপ আড়া।
বেঁকে বেঁকে যান গিন্নী নথ দিয়ে নাড়া॥
হাঁগো দিদি এই শাক রাঁধিয়াছি রেতে।
মাথা খাও সত্তি বল ভাল লাগে খেতে॥
দিব্বি দিস্ কেন বোন হেন কথা কয়ে।
ষাট্ ষাট্ বেঁচে থাক জন্ম-এয়ো হয়ে॥
পুরুষেরা ভাল সব বলিয়াছে খেয়ে।
ভাল রান্না রেঁধেছিস ধন্য তুই মেয়ে॥
এইরূপ ধূমধাম প্রতি ঘরে ঘরে।
নানামত অনুষ্ঠান আহারের তরে॥
তাজা তাজা ভাজাপুলি ভেজে ভেজে তোলে।
সারি সারি হাঁড়ি হাঁড়ি কাঁড়ি করে কোলে॥
কেহ বা পিটুলি মাখে কেহ কাই গোলে।

* * *

আলু তিল গুড় ক্ষীর নারিকেল আর।
গড়িতেছে পিটেপুলি অশেষ প্রকার॥
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ কুটুম্বের মেলা।
হায় হায় দেশাচার ধন্য তোর খেলা॥
কামিনী যামিনীযোগে শয়নের ঘরে।
স্বামীর খাবার দ্রব্য আয়োজন করে॥
আদরে খাওয়াবে সব মনে সাধ আছে।
ঘেঁসে ঘেঁসে বসে গিয়া আসনের কাছে॥

মাথা খাও, খাও বলি পাতে দেয় পিটে।
না খাইলে বাঁকা মুখে পিটে দেয় পিটে॥
আকুলি বিকুলি কত চুকুলীর লাগী॥
চুকুলি গড়িয়া হন চুকুলীর ভাগী॥
প্রাণে আর নাহি সয় ননদের জ্বালা।
বিষম'খা বাক্যবাণে কাণ হল কালা॥
মেজো বউ মন্দ নয় সেই গোড়ে গোড়।
কুমারের পোনে যেন পোড়ে পোড়ে পোড়॥
মনোদুখে প্রাতে আজ কুটি নাই থোড়।
এখনে রয়েছে তাই কোন্দলের তোড়॥
শাশুড়ী আলাদা রেখে ছাঁই তিন হাঁড়ি।
চুপি চুপি পাঠালেন কন্যাটীর বাড়ী॥
ঠাকুঝির ছেলেগুলো খায় ঠেসে ঠেসে।
আমার গোপাল যেন আসিয়াছে ভেসে॥
মরি মরি ষাট্ ষাট্ কেঁদেছিল রেতে।
বাছা মোর পেট পূরে নাহি পায় খেতে॥
শক্তিভক্তিপরায়ণ হন যেই নর।
তখনি এ সব বাক্যে ভেঙ্গে দেন ঘর॥
উপাদেয় দ্রব্য সব গড়িয়াছে চেলে।
সদ্য হয় কর্ম্ম শেষ গোটা দুই খেলে॥
কামিনী-কুহকে পড়ি খায় যেই ভাবা।
নিজে সেই হাবা নয় হাবা তার বাবা॥
বুকে পিটে গুড়পিটে গুড় পিটে গড়ে।
হিঁদুর দেবতা সম ঠাট্ তায় ধড়ে॥
ভিতরে পূরিয়া ছাঁই আলু দেয় ঢাকা।

* * *

লোভ নাহি থেমে থাকে খাই তাই চোটে॥
পিটে পুলি পেটে যেন ছিটেগুলি ফোটে॥
পায়েসে পিটুলি দিয়া করিয়াছে চুসি।
গৃহিণীর অনুরাগে শুধু তাই চুষি॥
যুবো সব সুবো প্রায় থুবো নাহি নড়ে।
কাছে বসে খায় কোসে রোসে নাহি পড়ে॥
ধন্য ধন্য পল্লীগ্রাম ধন্য সব লোক।
কাহনের হিসাবেতে আহারের ঝোঁক॥

প্রবাসী পুরুষ যত পোষড়ার রবে।
ছুটী নিয়া ছুটাছুটি বাড়ী আসে সবে॥
সহরের কেনা দ্রব্যে বেড়ে যায় জাঁক।
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ মেয়েদের ডাক॥
কর্ত্তাদের গালগল্প গুড়ুক টানিয়া।
কাঁটালের গুঁড়ি প্রায় ভুঁড়ি এলাইয়া॥
দুই পার্শ্বে পরিজন মধ্যে বুড়া বসে।
চিটে গুড় ছিটে দিয়ে পিটে খান কোসে॥
তরুণী রমণী যত একত্র হইয়া।
তামাসা করিছে সুখে জামাই লইয়া॥
আহারের দ্রব্য লয়ে কৌশল কৌতুক।
মাঝে মাঝে হাস্যরবে সুখের যৌতুক॥

ছদ্ম মিশনরী।

ভুজঙ্গ হিংস্রক বটে তারে কিবা ভয়?
মণি মন্ত্র মহৌষধে প্রতীকার হয়॥
মিশনরী রাঙ্গা নাগ দংশে ভাই যারে।
একবারে বিষদাঁতে সেরে ফেলে তারে॥
ব্যাঘ্র ভয়ে ব্যগ্র হই যদি পায় বাগে।
লাঠী অস্ত্র থাকিলে কি ভয় করি বাঘে?
হেদো বনে কেঁদো বাঘ রাঙ্গা মুখ যার।
বাপ্ বাপ্ বুক ফাটে নাম শুনে তার॥
বাগ করা বাঘ আছে হাত দিয়া শিরে।
ধরিয়া ধর্ম্মের গলা নখে ফেলে চিরে॥
ছেলেকালে ছেলেধরা, শুনিয়াছি কাণে।
এখন হইল বোধ বিশেষ প্রমাণে॥
কহিতে মনের খেদ, বুক ফেটে যায়।
মিশনরী ছেলেধরা ছেলে ধরে খায়।
মাতৃমুখে জুজুকথা আছি অবগত।
এই বুঝি সেই জুজু রাঙ্গা মুখ যত॥
চুপ চুপ ছেলে সব হও সাবধান।
কাণ কাটা * * * কেটে নেবে কাণ॥
ঘুমাও ঘুমাও বাপ থাক শান্তভাবে।
বাটা ভরে পান দিব গালভরে খাবে॥
চিনি দিব ক্ষীর দিব দিব গুড়পিটে।
বাপধন বাছা মোর ছেড়নারে ভিটে॥
কি জানি কি ঘটে পাছে বুদ্ধি তোর কাঁচা।
ওখানে জুজুর ভয় যেয়ো না রে বাছা॥
মূর্খ হয়ে ঘরে থাক ধর্ম্মপথ ধরে।
কাজ নাই ইস্কুলেতে লেখা পড়া করে॥
হাদে হে ছেলের বাপ মন্দ বড় কাল।
আপন আপন ছেলে সামাল সামাল॥
মিষ্টভাষী শুভ্রাকার মিশনরী যত।
আমাদের পক্ষে তাঁরা দয়া ধর্ম্মহত॥
পিতার সুখের নিধি তনয়-রতন
কিছু নাহি বুঝে তার মনের মতন॥
শূন্য করি জননীর হৃদয় ভাণ্ডার।
হরণ করিয়া লয় সাধের কুমার॥
যুবতীর বুক চিরে পতি লয় বেড়ে।
বাক্যের কুহক-যোগে যীশুমন্ত্র ছেড়ে॥
কামিনীর কোলশূন্য ক্ষুণ্ণ মন তায়।
এ খেদ কহিব কারে হায় হায় হায়॥
বিদ্যাদান ছল করি মিশনরী ডব।
পাতিয়াছে ভাল এক বিধর্ম্মের টব॥
মধুর বচন ঝাড়ে জানাইয়া লব্।
যীশুমন্ত্রে অভিষিক্ত করে শিশু সব॥
শিশু সবে ত্রাণকর্ত্তা জ্ঞান করে ডবে।
বিপরীত লবে পোড়ে ডুব দেয় টবে॥

ইরাংজী নববর্ষ।

চাঁদ ছিল বাণ ধরি দীপ্তি গেল তার
বিনিময়ে হয় তথা পক্ষের সঞ্চার॥
এই অবনীর করি কত হিতাহিত।
একান্ন একান্নে ছিল সবার সহিত॥
নিরন্ন বায়ান্ন দেব ধরিয়া বিক্রম।
বিলাতীর শকে আসি করিল আশ্রম॥
খ্রীষ্টমতে নববর্ষ অতি মনোহর।
প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ যত শ্বেত নর॥

চারু পরিচ্ছদযুক্ত রম্য কলেবর।
নানা দ্রব্যে সুশোভিত অট্টালিকা ঘর॥
মানমদে বিবি সব হইলেন ফ্রেস।
ফে রেব ফোলোরিস ফুটিকাটা ড্রেস॥
শ্বেত-পদে শিলিপর শোভা তার মাথা।
বিচিত্র বিনোদ-বস্ত্রে গলদেশ ঢাকা॥
চিকন্ চিক্কণী চারু চিকুরের জালে।
ফুলের ফোয়ারা আসি পড়িয়েছে গালে॥
বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে।
আহা তায় রোজ রোজ কত রোজ ফুটে॥
সুপ্রকাশ্য কিবা আস্য মৃদুহাস্যভরা॥
অধরে অমৃত সুধা প্রেমক্ষুধাহরা॥
গোলাবের দলে বিবি গড়িয়াছে চিক্।
অনঙ্গ ভ্রমররূপে মাগে তথা চিক্॥
মনোলোভা,কিবা শোভা আহা মরি মরি।
রিবিণ উড়িছে কত ফর্ ফর্ করি॥
ঢলঢল টলটল বাঁকা ভাব ধোরে।
বিবিজান চলে যান লবে জান করে॥
ধন্য ধন্য ক্ষুদ্র জীব ধন্য তুই মাচি।
তোর মত দুটি দুই পাখা পেলে বাঁচি॥
সুখে ভাসি শুভ্রকান্তি দম্পতি ঘেরিয়া।
ভন্ ভন্ ডাক ছাড়ি বদন হেরিয়া।
উড়ে গিয়ে ফুঁড়ে বসি বগীর উপরে।
সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাই গিরিজার ঘরে॥
খানার টেবিলে বসি করি খুব তুল।
এঁটো করা সেরীর গেলাসে দিই হুল॥
কখনো টেবিলে বসি কভু বসি মুখে।
মাঝে মাঝে ভজে গায় পাখা নাড়ী সুখে॥
নববর্ষ মহাহর্ষ ইংরেজটোলায়।
দেখে আসি ওরে মন আয় আয় আয়॥
শিবের কৈলাসধাম আছে কত দূর।
কোথায় অমরাবতী কোথা স্বর্গপুর॥
সাহেবের ঘরে ঘরে কারিগুরী নানা।
ধরিয়াছে টেবিলেতে অপরূপ খানা॥

বেরিবেষ্ট সেরিবেষ্ট মেরিবেষ্ট যাতে।
আগে ভাগে দেন গিয়া শ্রীমতীর হাতে॥
কট্ কট্ কটাকট্ টক্ টক্ টক্।
ঠুনো ঠুনো ঠুন্ ঠুন্ ঢক্ ঢক ঢক্॥
চুপু চুপু চুপ চুপ্ চপ্ চপ্ চপ্।
সুপু সুপু সুপ্ সুপ্ সপ্ সপ্ সপ্॥
ঠকাস্ ঠকাস্ ঠক্ ঠক্, ফস্ ফস্ ফস্।
কস কস্ টস্ টস, ঘস্ ঘস্ ঘস্॥
হিপ হিপ হোরে হোরে ডাকে হোল ক্লাস।
ডিয়ার ম্যাডাম ইউ টেক দিস্ গ্লাস॥
সুখের শেষের খানা হলে সমাধান।
তারা রারা রারা রারা সুমধুর গান॥
গুড়ু গুড়ু গুম গুম লাফে লাফে তাল।
তারা রারা রারা রারা লালা লালা লাল॥
আয় লোভ চল যাই হোটেলের সপে।
এখনি দেখিতে পাবি কত মজা চপে॥
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি কত শত কেক।
যাত পার কোসে খাও টেক টেক টেক॥
সেরা চেরী বীর ব্রাণ্ডী ওই দেখ ভরা।
একবিন্দু পেটে গেলে ধরা দেখি সরা॥
কারী ডিম আলুকিস ডিসপোরা মাছে।
পেট পূরে খাও লোভ যত সাধ আছে॥
গোরার দঙ্গলে গিয়া কথা কহ হেসে।
ঠেস মেরে বসো গিয়া বিবিদের ঘেঁসে॥
রাঙামুখ দেখে বাবা টেনে লও হাম।
ডোণ্ট ক্যার হিন্দুয়ানী ড্যাম ড্যাম ড্যাম॥
পিঁড়ি পেতে ঝুরো লুসে মিছে ধরি যেম।
মিসে নাহি মিশ খায় কিসে হবে ফেম?
সাড়ীপরা এলো চুল আমাদের মেম।
বেলাক নেটীভ লেডী, সেম সেম সেম!
সিন্দুরের বিন্দু সহ কপালেতে উল্কি।
নসী, জসী, ক্ষেমী, বামা, রামী, শামী, গুল্কি॥
ঘরে থেকে চিরকাল পায় মহাদুখ।
কখন দেখে না পরপুরুষের মুখ।

এইরূপে হিন্দুরামা শুদ্ধাচার রেখে।
না পায় সুখের আলো অন্ধকারে থেকে॥
কোথায় নেটিব লেডী বলি শুন সবে।
পশুর স্বভাবে আর কত কাল রবে?
ধন্য রে বোতলবাসী ধন্য লাল জল।
ধন্য ধন্য বিলাতের সভ্যতার বল॥
দিশী কৃষ্ণ মানিনাকো ঋষিকৃষ্ণ জয়।
মেরিদাতা মেরিসুত বেরিগুড বয়॥
ঈশ্বর-পরম-প্রেম স্পর্শ করে যাকে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম ভেদাভেদ জ্ঞান নাহি থাকে॥
যা থাকে কপালে ভাই টেবিলেতে খাব।
ডুবিয়া ডবের টবে চ্যাপেলেতে যাব॥
কাঁটা ছুরী কাজ নাই কেটে যাবে বাবা।
দুই হাতে পেট ভোরে খাবো থাবা থাবা॥
পাতরে খাব না ভাত গোটুহেল কালো।
হোটেলে টোটেল নাশ সে বরণ ভালো॥
পুরিবে সকল আশা ভেবনারে লোভ।
এখনি সাহেব সেজে রাখিব না ক্ষোভ॥

আনারস।

বন হতে এলো এক টিয়ে মনোহর।
সোণার টোপর শোভে মাথার উপর॥
এমন মোহন মূর্ত্তি দেখিতে না পাই।
অপরূপ চারুরূপ অনুরূপ নাই॥
ঈষৎ শ্যামল রূপ, চক্ষু সব গায়।
নীলকান্ত মণিহার, চাঁদের গলায়॥
সকল নয়ন-মাঝে, রক্ত-আভা আছে।
বোধ হয় রূপসীর চক্ষু উঠিয়াছে॥
ভাবুক স্বভাবে ভাবে, করে অনুরাগ।
বলে ও যে রাঙ্গা নয়, নয়নের রাগ॥
রূপের সহিত গুণ, সমতুল হয়।
সুবাসে আমোদ করে, ত্রিভুবনময়॥
নাহি করে মুখভঙ্গী, কথা নাহি কয়।
সৌরভ-গৌরবে দেয়, নিজ পরিচয়॥

চপলা রূপের কাছে, হয় চমকিত।
দৃষ্টিমাত্র ফুল্ল গাত্র, নেত্র পুলকিত॥
সংশয় হয়েছে দেখে, সকলের মনে।
কে কামিনী, একাকিনী, বাস করে বনে?
লোকে বলে আনারস, আনারস নয়।
আনা রস হলে কেন জানা রস হয়?
তারে তার জানা যায়, রস ষোল আনা।
অরসিক লোক তবু, বলে তারে আনা॥
ফেলিয়া পনর আনা, এক আনা রাখে।
এই হেতু 'আনারস" বলে লোক তাকে॥
অরসিক নাহি করে, রসেতে প্রকাশ।
আনাতেই ষোল আনা, না জানে বিশেষ॥
কোথা বা আনার রস, এ আনার কাছে?
ক্ষুদ্র দামে খেতে পাই, এত টুকি গাছে॥
বেদানা তাহার নাম, দানা যায় ভরা।
কেমনে হইবে সেই, সর্ব্বমনোহরা?
রস যত, যশ তত, বেদানায় আছে।
আমাদের কাছে নয়, ধনীদের কাছে।
এক আধসের থায়, আছে যার ধন।
কুবেরের হলে মন, নাহি পায় মণ॥
মনে মনে কত মণে, আশার উদয়।
ফলে ফলে কোন কালে, মণ নাহি হয়॥
প্রয়োজন নাহি তাঁর, এখানেতে এসে।
মঙ্গল করুন্ তিনি, মঙ্গলের দেশে॥
আমাদের আনারসে, ষোল আনা সুখ।
দরিদ্রের প্রতি তিনি, না হন বিমুখ॥
আনা দরে আনা যায়, কত আনারস।
অনায়াসে করি রসে, ত্রিভুবন বশ॥
ক্ষীরোদ নহ তো তুমি, নহ সুধাকর।
তবে কিসে সুধাভরা, তব কলেবর?
পুণ্যবতী কেবা আছে, তোমার সমান?
মৃত হয়ে লোকেরে অমৃত কর দান॥
পঞ্চানন পঞ্চমুখে নাহি করে সীমা।
এক মুখে কি কহিব তোমার মহিমা?

সে বড় দুখের কথা সুখ যত খেলে।
হাতে হাতে স্বর্গফল হাতে ফল পেলে ॥
কৃপণের কর্ম্ম নয় তোমায় আহার।
ছাড়াবার দোষে সেই নাহি পায় তার ॥
ডাটা বোঁটা নাহি বাছে মনে লোভ ঝোঁকে।
চোক্ শুদ্ধ খেয়ে ফেলে চোকখেকো লোকে ॥
ফলে আমি মিছা কেন নিন্দা করি তায় ?
সাধ পূরে বাদ দিতে বুক ফেটে হায় ॥
ছাল্ ফেলে কাটি কিন্তু চক্ষু ভাসে জলে।
ভয় আছে লোকে পাছে চোক্‌খেকো বলে ॥
লুণ মেখে নেবুরস, রসে যুক্ত করি।
চিন্ময়ী চৈতন্যরূপা চিনি তায় ভরি ॥
টুকি টুকি খেলে পরে, রসে ভরে গাল।
নেচে উঠে নন্দলাল, মুখে পড়ে লাল ॥
একবার যে জন না, পায় তার তার।
সে জন মানুষ নয় বৃথা জন্ম তার ॥
দু ভাই প্রেমের প্রেমী ভ্রান্তিশীল যারা।
তোমার নিগূঢ় রস নাহি পায় তারা ॥
আস্বাদন নাহি জানে পেটভরা খোঁজে।
দুই হাতে থাবা মেরে, নাকে মুখে গোঁজে ॥
রসে রত যেই সেই, রস করে পান।
রসিক-রসনা তার যশ করে গান ॥
বর্ণশ্রেষ্ঠ পঞ্চবিংশ, তাহে অষ্টাদশ।
দুই হলে এক যোগ ধরা করে বশ ॥
তার সহ আনারস ষোল আনা রস।
রসে রসে মিশে গিয়ে সুখে গায় যশ ॥
বুঝহ রসিক জন রসবোধ যার।
সে রসে যে অরসিক রস কোথা তার ?
রসে রসে রস পেয়ে রসে মন রসে।
নাহি জেনে মিছামিছি দোষ দেয় দশে ॥
চরকাল খেয়ে শুধু ছোলা আর আদা।
শাদাচোখো যত সব হয়ে যাক্ শাদা ॥
নন্দনবনেতে ছিলি দেবরাজ-প্রিয়ে।
শচী ছেড়ে সুখে ইন্দ্র ছিল তোরে নিয়ে ॥

বাসবের অঙ্গে সদা করি আলিঙ্গন।
পাইয়াছ সেইরূপ সহস্র লোচন ॥
নানারূপ নবরূপ রসালাপ-যোগে।
দেবগণে ফাঁকি দিয়া ছিলে ইন্দ্রভোগে ॥
দেবতার ইচ্ছা মনে করে সুখভোগ।
কোনমতে না হইল সেই যোগাযোগ ॥
সুরকুল প্রতিকূল পেয়ে পরিতাপ।
ক্রোধাকুল হয়ে শেষে দিলে অভিশাপ ॥
সেই উপসর্গে তুমি, ছেড়ে স্বর্গবাস।
অভিমানে ম্রিয়মাণ বনে কর বাস ॥
আনারস নাম তাই এসে এই ক্ষিতি।
লজ্জায় মলিন মুখ বনে কর স্থিতি ॥
সাধু সাধু সাধু বটে দেব পুরন্দর।
তোমার শাপেতে হলো আমাদের বর ॥
গোপন হইলে কিসে বনে করি বাস।
লুকাবে কেমন করি শরীরের বাস ॥
বাস পেয়ে পূর্ব্বকার বাস গেল জানা।
রস পেয়ে জানা গেল স্বর্গ থেকে আনা ॥
নানা রস-শ্রেষ্ঠা তুমি তোমায় প্রণাম।
জানা রস হয়ে পেলে আনারস নাম ॥
শচীর সপত্নী হয়ে সদা থাক শুচি।
চোখে দেখা দূরে থাক্ গন্ধে হয় রুচি ॥
অরুচির রুচি হয় মুখে দিলে পর।
সাধ করে নিত্য খায়, বেচে বাড়ী-ঘর ॥
তিনলোক জয় করে তব আস্বাদন।
বালকের কাছে তুমি জননীর স্তন ॥
তোমার সমান কোথা আর নাহি আছে।
যুবতী-অধরামৃত যুবকের কাছে ॥
হরিনাম-সুধা তুমি বৃদ্ধের নিকট।
প্রকট-বদনে হাসি দেখিতে বিকট ॥
ত্রিজগতে তব গুণে বাধ্য আছে সব।
বিন্দুরস পান করি প্রাণ পায় শব ॥
অন্তে যেন এই হয় আমার কপালে।
গালে এসে বাস্ করো মরণের কালে ॥

কৌলীন্য।

মিছা কেন কুল নিয়া কর আঁটা-আঁটি ?
এ যে কুল কুল নয় সার মাত্র আটি ॥
কুলের গৌরব কর কোন্ অভিমানে ?
মূলের হইলে দোষ কেবা তারে মানে ?
ঘটকের মুখে শুধু কুলীনের চোপা।
রস নাই যশ কিসে কুল হলে টোপা ?
আদর হইত তবে ভাঙ্গিলে অরুচি।
পোকাধরা সোঁকা ভার দেখে যায় রুচি ॥
অতএব বৃথা এই কুলের আচার।
ইথে নাহি রক্ষা পায় কুলের আচার ॥
কুলের সম্ভ্রম বল করিব কেমনে ?
শতেক বিধবা হয় একের মরণে !
খগলেতে বৃষকাষ্ঠ শক্তিহীন যেই।
কোলের কুমারী লয়ে বিয়া করে সেই !
দুধে দাঁত ভাঙ্গে নাই শিশু নাম যার।
পিতামহী সম নারী দারা হয় তার !
নব নারী তুল্য বিনা কিসে মন তোষে ?
ব্যভিচার হয় শুদ্ধ এই রূপ দোষে ॥
কুলকল্পে নয় রূপ সুলক্ষণ যাহা।
অবশ্য প্রামাণ্য করি শিরোধার্য্য তাহা ॥
নচেৎ যে কুল তাহা দোষের কারণ।
পাপের গৌরব কেন করিছ ধারণ ?
হে বিভু করুণাময় বিনয় আমার।
এ দেশের কুলধর্ম্ম করহ সংহার ॥

স্নানযাত্রা।

গুণে বলি হারি যাই, সাধু সাধু সাধু ভাই,
ধরাবাসী যত ধুতিপরা।
আমাদের এই বঙ্গ, কোন ক্রমে নহে ভঙ্গ,
নানা রাগ-রঙ্গ-রসভরা ॥
বৃষপূর্ণিমার দিবা, অপার আনন্দ কিবা,
মাহেশে সুখের মহামেলা।
স্নানযাত্রা প্রতি বর্ষে, এই দিন মহা হর্ষে,
মেলা পেয়ে করে সবে খেলা ॥
কিবা ধনী কিবা দীন, সবার সুখের দিন,
আয়োজন কত দিন আগে।
সবিশেষ দেখি বেশ, ইচ্ছামত করে বেশ,
যাহার যেমন মনে লাগে ॥
বদ্ধ হয়ে আশাফাঁদে, কত ছাঁদে কত সাধে,
গত নিশি করিয়াছে গত।
মুখে আমোদের রব, অধিক আমোদী সব,
বিশেষত ছোটলোক যত ॥
চরণে বিলাতী জুতি, পরিলেন ধোপ্ ধুতি,
হরিলেন পৈতৃক তসর।
চাঁপাতলা শূন্য করি, যান যত নরহরি,
ঘস্ ঘস্ ঘসর্ ঘসর্ ॥
ঘাটে গিয়া কত চোট, সুখেতে সাজান্ বোট,
বাঁধে কোট তাহার ভিতর।
দলে দলে গলাগলি, দলে দলে দলাদলি,
বলাবলি হয় পরস্পর ॥
ধুতির কিনারা কালা, গলায় পরিয়া মালা,
রোগোখেকো রোগো সব সাজে।
চুল কোরে প্যান্‌চিট্, হয় ফিট্ কত চিট্,
মাঝে মাঝে চিট তার মাঝে ॥
একমাত্র, * * জলধর প্রেমছাত্র,
শত শত আছে তাই ঘেরে।
রঙ্গিনীর ঘোর ঘটা, হেরিয়ে রূপের ছটা,
লক্ষ্মীপ্রিয় পক্ষী যায় হেরে ॥
চোপার কে পারে আর, খোঁপায় ফুলের হার,
কোপায় কথায় হেন কাঠ।
কত হাসে কত ভাষে, ঘূরে ঘূরে চারি পাশে,
একা মাগী লাগেয়েছে হাট ॥
রঙ্গরস ঠারে ঠারে, সাজায় সাজায় তারে,
পুড়ে মরে দৃষ্টিপোড়া বিষে।
মনে এই দুখ লাগে, পড়িয়াছে নানা ভাগে,
গঙ্গালাভ হবে তার কিসে।

যাবার কিঞ্চিৎ আগে, খাবার তল্লাস লাগে,
আবার কে ভূমে দেয় পদ।
আত্র তুলে কত গণ্ডা, কেহ আনে লুচি মণ্ডা,
ষণ্ডা সব ভাবে গদগদ॥
'নোচন্ গিয়াছে ঘর, নক্ষীর হয়েছে জ্বর,
নৈকা চড়ি আমরা সবাই।
লিত্তাই নারাণ ওই, নৈতুন্ ইয়ার সই,
ননসিম্ নবীন্ নবাই॥'
এ ওরে ফর্ম্মাস্ করে, এক জন রাগভরে,
কহিতেছে করি খচো মচো।
বোতলের করি নাম, 'লড়ওম্ মোড় লাম,
লল বওরা নৈবচো নৈবচো॥'
খুলে তরী কত ধূম, ধূম কোরে উঠে ধূম,
দেখে ঘুম করিল শ্রীহরি।
কেহ বলে 'বাবা ভাই, আমি এক গীত গাই,
লাচ তোরা লাগর লাগরী॥'
আর আর নীচজাতি, বাবু হয়ে রতারাতি,
মাতামাতি করে কত রূপ।
ফুলায়ে বুকের ছাতি, যেন নবাবের নাতি,
হাতী কিনে হয়ে বসে ভূপ॥
সম্ভব যেমন যার, ব্যয় করে সে প্রকার,
কেহ কেহ শুদ্ধ হন ধারে।
ধোবার আনন্দময়, পরধনে বাবু হয়,
ভাড়া দিয়া সব কর্ম্ম সারে॥
মাতুল-নন্দন যারা, ধনের কুবের তারা,
জলে স্থলে, জলে শোভা পায়।
জলে উপার্জ্জন কত, সাহা নয় সাহা যত,
সাহালম বাদশার প্রায়॥
হাড়ি মুচি যুগী জোলা, কত বা সেকের পোলা,
ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে চলে।
ঠেলাঠেলি চুলোচুলি, কাঁকে কাঁকে ঝুলোঝুলি,
লোকারণ্য জলে আর স্থলে॥

স্থলে উঠে দেখি চেয়ে, কত মন্দ কত মেয়ে
পথ ছেয়ে গান গেয়ে যায়।
আগে পাছে পাকাপাকি, আঁকাআঁকি তাকাতা
ঝাঁকা ঝাঁকি স্থান নাহি পায়॥
এলে বাড়ী যত রাঁড়ী, কাঁকে করি কেলে হাঁড়ি
হাতে পাখা কাঁটাল মাথায়।
কথা কয় ইলিবিলি, মুখেতে পানের খিলি
গাল বয়ে পিক পড়ে গায়॥
ভদ্র যত মন শাদা, পরস্পর করি চাঁদা
রুচির তরণী লয়ে ভাড়া।
যাহাতে আসক্তি যাঁর, সেই শক্তি সঙ্গে তাঁর
গরবেতে গোঁপে দেন চাড়া॥
যথাশক্তি শক্তি-সেবা, শক্তি বিনা আছে কেবা
শক্তি-ভক্তি সকলের সার।
ভক্তিভাবে যত জীব, শক্তি-যোগে হন শিব
শিব-শক্তি পূজে কেবা আর?
সকলেই ঘোর শাক্ত, কোন ক্রমে নহে ভক্ত
সেইরূপ আচার ব্যাভার।
সহজে সুখের যোগ, রিপুর পঞ্চম ভোগ
আছ তাঁর করে সহকার॥
* * গায়ে গাটী, তবলার মুখে চাটী
পরিপাটী খান কোসে কোসে।
পূর্ণ হলো ইচ্ছা যেটা, স্নান আর দেখে কেটা
স্নান পান এক ঠাঁই বোসে॥
লম্পট যুবক যারা, বাচ কোরে ফেরে তারা
ধীরে ধীরে তীরে চালে ডিঙ্গে॥
যেখানে * *, সেই খানে গায় সারি
কাকের পশ্চাতে যেন ফিঙ্গে।
আমি যে অভাগা অতি, স্বভাবতঃ ক্ষীণমতি
কোন কালে মাহেশ না যাই।
ইচ্ছা হেন থাকে জ্ঞান, করিয়া বিভুর ধ্যান
ঘরে যেন মুক্তিস্নান পাই॥

রসাত্মক কবিতা।

প্রেম-নৈরাশ্য।

যার তরে আকিঞ্চন, করিয়া কাতর মন,
এ অবধি না হইল স্থির।
তাহারে এখনো আর, আশা আছে পাইবার,
আরে মুগ্ধ মানস অধীর॥
পূর্ব্বে যদি দৈবাধীন, দেখা হতো কোন দিন,
উভয়ের হাসিত নয়ন।
এখন হইলে দেখা, নাহি পূর্ব্ব-প্রেমরেখা,
হেট করে বিনোদ-বদন॥
হেরে সে বিমল মুখ, নয়নে উপজে সুখ,
যথা নিশা চাঁদের উদয়ে।
সে সুখদ শশধর, সশঙ্কিত নিরন্তর,
গুরুপরিবাদ-রাহুভয়ে॥
হবে না হবার নয়, মনেতে নিশ্চয় হয়,
তবে কেন মিছে আশা-ভ্রমে।
অধীর মানস মম, হয়েছে বধির সম,
প্রবোধ মানে না কোন ক্রমে॥

প্রেম।

যথার্থ প্রেমের পথে পথিক যে জন।
নির্ম্মল জলের প্রায় স্নিগ্ধ তার মন॥
শুদ্ধভাবে থাকে শুদ্ধ আপনার ভাবে।
প্রিয়জনে প্রিয় ভাবে আপনার ভাবে॥
সরল স্বভাবে পায় সন্তোষের সুখ।
ভ্রমে কভু নাহি দেখে ছলনার মুখ॥
রসের রসিক সেই পরিপূর্ণ রসে।
ভুবন ভুলায় নিজ প্রণয়ের বশে॥
ভাব-তুলি স্নেহে তুলি রঙ্গে রঙ্গ ঘটে।
চিত্ররূপ চিত্র করে হৃদয়ের পটে।
সুখময় শুকপক্ষী ভাল ভালবাসা।
মানস-বৃক্ষেতে তার মনোহর বসা॥
প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষণ অনুরাগ ফলে।
পড়া-পাখী না পড়াতে কত বুলী বলে॥
আঁখির উপরে পাখী পালক নাচায়।
প্রতিপক্ষ প্রীতিপক্ষ বিপক্ষ নাচায়॥
প্রেমের বিহঙ্গ সেই ভালবাসি মনে।
আদরে পুষেছি তারে হৃদয়-সদনে॥
পোষমানা পড়া-পাখী দরিদ্রের ধন।
সাবধানে রাখি কত করিয়া যতন॥
পোড়া লোকে পাপচক্ষে দৃষ্টি করে তারে।
আর আমি কোনমতে দেখাব না কারে॥

প্রণয়ের প্রথম চুম্বন।

প্রণয়-সুখের সার প্রথম চুম্বন।
অপার আনন্দপ্রদ প্রেমিকের ধন॥
আছে বটে অমৃত অমরাবতী-পুরে।
প্রমোদিত করে যাহে যত সব সুরে॥
উথলয় সুখসিন্ধু পানে এক বিন্দু।
তার আশে গ্রাসে রাহু পূর্ণিমার ইন্দু॥
সে ক্ষুধার ক্ষুধা মাত্র নাহি একক্ষণ।
যদি পাই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন॥
অসুরের প্রিয় পেয় সুরারস মাত্র।
রসনা সরস গাত্র পরশিলে পাত্র॥
যার লাগি হলো ধ্বংস যদুবংশগণ।
স্বভাবে অভাব সদা রেবতীরমণ॥
অদ্যাবধি মদ্যমাত্র পানীয় প্রধান।
বিদ্বজ্জন-খাদ্য-মাঝে সদা বিদ্যমান॥
এমন মধুরা সুরা নাহি চায় মন।
যদি পাই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন॥
অমল কমল সম কবিতার শোভা।
ভাবুকের মন তাহে মত্ত মধুলোভা॥

দুগ্ধপানে মুগ্ধ যথা বালকের মন।
কবিতায় তৃপ্ত তথা হয় সর্ব্বজন॥
যাহার প্রসাদে পরিহত পুত্রশোক।
পুলক-আলোক পায় ভাগ্যহীন লোক॥
হেন কবিতার শক্তি নাহি প্রয়োজন।
যদি পাই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন॥
গলকুণ্ড দেশে আছে হীরক-আকর।
রজত-কাঞ্চনময় সুমেরু-শেখর॥
নানা রত্ন পরিপূর্ণ রত্নাকর জলে।
গজমুক্তা মূল্যযুক্তা অনেক সিংহলে॥
কুবের লইয়া যদি এই সমুদয়।
আমারে প্রদান করে হইয়া সদয়॥
ক্ষেপণ করিব দূরে প্রহারি চরণ।
যদি পাই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন॥
তন্ত্র-মন্ত্র-পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রে শুনি।
পুনঃ পুনঃ এই বাক্যে কহে যত মুনি॥
ইহধরা দুখভরা অসার সংসার।
নহেক তিলেক সুখ সুধার সঞ্চার॥
মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম এই স্থলে ঘটে।
নতুবা অযুক্তি হেন কি কারণ ঘটে॥
দেখাইব কত সুখ এ তিন ভুবন।
যদি পাই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন॥
নয়নে নিরখি প্রকটিত পদ্মবন।
সুমধুর গীতশ্রুতি করয়ে শ্রবণ॥
হৃদয়ে আনন্দ-প্রভা হয় সন্দীপন।
সহস্র সহস্র সুখ প্রাপ্ত হয় মন॥
রসনায় রসবারি খরস্রোতে বয়।
শিহরে সর্ব্বাঙ্গ ভঙ্গ দেয় লজ্জাভয়॥
এইরূপ স্বর্গভোগ লভি সর্ব্বক্ষণ।
যদি পাই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন॥

প্রণয়।

বহুদিন যার লাগি, হয়ে প্রেম-অনুরাগী,
আশাপথে আশা ছিল একা।
সদয় হইয়া বিধি, দিয়াছেন সেই নিধি,
গোপনে পেয়েছি তার দেখা॥
নটবর নবরঙ্গী, মনোহর ভাবভঙ্গী,
সঙ্গে তার সঙ্গী নাই কেহ।
স্বভাবে স্বভাববশে, যশোযুক্ত নিজ যশে,
স্নেহরসে পরিপূর্ণ দেহ॥
ভাবের করিয়া সৃষ্টি, প্রতিবাক্যে প্রীতি-বৃষ্টি,
দৃষ্টিমেঘে দামিনী ঝলকে।
কিছু তার নহে বাঁকা, লজ্জার বসন ঢাকা,
নয়নের পলকে পলকে॥
বিম্বাধরে সুধা ক্ষরে, প্রেমিকের ক্ষুধা হরে,
বাক্য শুনি ভ্রান্ত হয়ে মনে।
পিকবর মধুকর, শুনে স্বর জরজর,
নিরন্তর ভ্রমে বনে বনে॥
মনে মনে এই চাই, কোন খানে নাহি যাই,
ক্ষণমাত্র তার সঙ্গ ছেড়ে।
প্রেমভাবে কাছে এসে, ঈষৎ কটাক্ষে হেসে,
একেবারে প্রাণ নিলে কেড়ে॥
থেকে থেকে আড়ে আড়ে,আড়চক্ষে দৃষ্টি ছাড়ে,
ভাব দেখি ত্রিভুবন ভোলে।
চক্ষে শোভা নাহি তুল, অর্দ্ধফোটা পদ্মফুল,
পবনহিল্লোলে যেন দোলে॥
তুলনা তুল না তার, তুলনা কি আছে আর,
সে রূপের নাহি অনুরূপ।
হাস্যভরা আস্যখানি, গলিত অমৃত-বাণী,
ললিত লাবণ্য অপরূপ॥
কলেবর কমনীয়, নহে কাম গণনীয়,
রতির সে রমণীয় নয়।
ভাবে সব ভাবে স্বীয়, স্বভাবে স্বভাবপ্রিয়,
প্রিয় হেরে ম্রিয়মাণ রয়॥
অনুরাগ অভিপ্রায়, স্থিররূপে দীপ্তি পায়,
আশা চায় উভয়ের আশা।
দয়া প্রেম সরলতা, এক ঠাঁই যুক্ত তথা,
হৃদয়েতে মাধুর্য্যের বাসা॥

বুঝে সব অভিমত, মনোমত কত মত,
মনোভাব ব্যক্ত করি মুখে।
বিপক্ষেরে দূষিয়াছে, শোকসিন্ধু শুষিয়াছে,
তুষিয়াছে সন্তোষের সুখে॥
আগে মন ছলিয়াছে, শেষে সত্য বলিয়াছে,
গলিয়াছে স্নেহ-রস নিয়া।
মম ভাবে কাঁদিয়াছে, কত ছাঁদ ছাঁদিয়াছে,
বাঁধিয়াছে প্রেম-ডুরী দিয়া॥
দেখিয়াছি যত ক্ষণ, কত সুখ তত ক্ষণ,
প্রণয়ের নানা ফাঁদ ফেঁদে।
এখন নাহিকো দেখে, কি ফল জীবন রেখে,
থেকে থেকে প্রাণ উঠে কেঁদে॥
আমারে বিনয় করি, দুটী হাতে হাতে ধরি,
দেখা যায় ওই যায় চোলে।
রাহু তার বাক্য আসি, ধৈর্য্যশশী গেল গ্রাসি,
হাসি হাসি আসি আসি বোলে॥
হাসি হাসি আসি বলে, শুনে ভাসি আঁখি-জলে,
এসো এসো কোন্ মুখে বলি।
নিষেধ করিব উঠে, দেখে নাহি মুখ ফুটে,
মনের আগুনে শুদ্ধ জ্বলি॥
তদবধি আমি নই, আমি আর কারে কই,
আমি আমি কব আর কারে?
সে যদি আমার হয়, আমারে আমার কয়,
আমার কহিব আমি তারে॥
সে দিন পাইব কবে, কবে বা মঙ্গল হবে,
অমঙ্গল কপালে আমার।
উদ্দেশে ঔদাস্য লয়ে, চাতকের মত হয়ে
আশাপথ চেয়ে আছি তার॥
সে যখন মনে জাগে, কিছু নাই ভাল লাগে,
ভাবি শুদ্ধ বিরলেতে বসি।
স্থির নহি ক্ষণমাত্র, চিন্তাপূর্ণ চিত্ত পাত্র,
গাত্র হতে অগ্নি পড়ে খসি॥
সে যদি প্রেমিক হয়, প্রেমের দরদ লয়,
দেখে যাবে কিরূপেতে থাকি।
এধার পাইলে দেখা, সুখের না হবে লেখা,
রেখা দিয়া একা কোরে রাখি॥

প্রণয়ের আশা

কত আর রব তার আসা আশা লয়ে?
দিন দিন তনু ক্ষীণ প্রেমাধীন হয়ে॥
সদা যার স্নেহভার শিরে মরি বয়ে।
আমারে কি ভুলাবে সে মিছে কথা কয়ে?
একাকী রোদন করি এক স্থানে রয়ে।
বিরহ-যাতনা আর কত রব সয়ে?
বুঝি তার আশাপথে পরিপূর্ণ সুখ।
কখনো জানে না মনে নিরাশার দুখ॥
এমন না হলে পরে দেখা দিত ফিরে।
আমারে ভাসাবে কেন নিরাশার নীরে?
প্রণয়ের লক্ষ্য সেই করে যার আশা।
সে বুঝি দিয়াছে তারে হৃদয়েতে বাসা॥
আশা দিয়ে বাসা দিয়ে রাখিয়াছে বেঁধে।
আমার ভাবিয়া আমি বৃথা মরি কেঁদে॥
বুঝে না অবোধ মন প্রবোধ না মানে।
আমার বলিয়া তারে নিতান্ত সে জানে॥
সবে তার এক মন এক ঠাঁই বাঁধা।
ভ্রমেতে আমার মনে লাগিয়াছে ধাঁধা।
হোক্ হোক্ তার হোক্ সুখী আমি তাতে।
আমারে ফেলিল কেন নিরাশার হাতে॥
যদি না আসিবে সেই বাঁধাপ্রেম ছেড়ে।
ছলেতে আমার মন কেন নিলে কেড়ে?
যখন বিরলে সেই বোসে রবে একা।
এই কথা বোলো তারে হলে পরে দেখা॥
বিধিমতে তোমার মঙ্গল যেন হয়।
মঙ্গল তোমার পক্ষে এ পক্ষে তো নয়॥
ইঙ্গিতে বলিবে সব যে সুখেতে আছি।
ছাড়া হয়ে কাড়ামন ফিরে পেলে বাঁচি॥
বুঝায়ে বলিও তারে অতি ধীরে ধীরে।
একবার দেখা দিয়ে মন দেয় ফিরে॥

যৌবন।

সিঞ্চিয়া অমৃত নিধি, জীবে দান দিল বিধি,
নিরুপম যৌবন যৌতুক।
যে রতন হারাইলে, কোটিকল্পে নাহি মিলে,
কালকূট কালের কৌতুক॥
জিনিয়া স্যমন্ত মণি, যৌবন রতন গণি,
তরণী তুলিতে তেজ যায়।
খরতর কর ভরে, হৃদয়-রাজীববরে,
ফুল্লকরে হরে অন্ধকার॥
আনন্দ সুন্দর গন্ধ, রস তায় মকরন্দ,
টলটল করে নিরন্তর।
বিবিধ প্রবন্ধে তায়, কেলি করে ফুল্লকায়,
রস খায় মন-মধুকর॥
নৃত্য নবরস রঙ্গে, নিত্য নবরসে মঙ্গে,
নৃত্য কঙ্গে পশিয়া নীরঙ্গে।
কভু পরিহাস-লাস্য, হাস্যে বিকশিত আস্য,
প্রতি অঙ্গে আনন্দ উপজে॥
কখন করুণ'-রসে, নয়ন নীরদ রসে,
হরিষে বরিষে বারিধারা।
সেই ধারা তারাকারা, শীতল যাহার ধারা,
ধরা তাপহরা যেন ধারা॥
কখন ঘৃণার বশে, বিফল বীভৎস রসে,
মানসের শশ প্রায় গতি।
দাবানলে দগ্ধ বন, কুসঙ্গে কুরঙ্গ মন,
চপল চপলা সম অতি॥
প্রণয় পরম রঙ্গ, তাহে হলে আশা ভঙ্গ,
প্রবৃত্তি পিপাসা পরিশেষ।
ভাল বাসা ভালবাসা, তাহে পেয়ে ভাল বাসা,
আনন্দের নাহি থাকে শেষ॥
হুতাশে হুতাশ বাড়ে, বিলাপ প্রলাপ পাড়ে,
শোচনা প্রেমিক-মন ঘেরে।
শ্রান্তি নাহি হয় হত, ভ্রান্তিভরে অবিরত,
সকল স্বপন সম হেরে॥
পরেতে প্রবোধ লয়ে, প্রণয়ে বিরাগী হয়ে,
অন্যরূপ ভাব-পথে ধায়।
প্রণয়ের হতাদর, নিরখিয়া নিরন্তর,
ক্রমে ক্রমে যৌবন পলায়॥
হেরিয়া যৌবন অন্ত, মন সদা দুঃখগ্রস্ত,
নিরন্তর আনন্দবিহীন।
ক্ষুধায় ভ্রমরা ক্ষুণ্ণ, শতদল শোভাশূন্য,
প্রদোষের প্রমাদে মলিন।

শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্নদর্শন।

বৃন্দাবন হরি হরি দ্বারকায় আসি।
সুখের সম্ভোগ ভোগ সিংহাসনবাসী॥
শর্ব্বরীতে স্বপ্নযোগে সুখদ শয়নে।
ব্রজের মধুর ভাব পড়িয়াছে মনে॥
বিষম ব্যাকুল মন করেন রোদন।
কোথা গিরি গোবর্দ্ধন কোথা কুঞ্জবন॥
কোথা কদম্বের তরু কোথা বংশীবট।
কোথা শ্রীগোকুল কোথা কালিন্দীর তট॥
কোথায় এখন সেই মোহন মুরলী।
হায় হায় কোথা মোর শ্যামলী ধবলী॥
কদম্ব কুসুম অনু তনু অনুরাগে।
পূর্ব্বভাবে নব ভাব ভাল নাহি লাগে॥
কেন বা এলেম আমি যমুনার পার।
সম্পদ হইল সব বিপদ আমার॥
পিয়ালী শ্যামলী আদি কাছে কাছে রাখি।
আবা আবা ধবলী ধবলী বোলে ডাকি॥
ধীরি ধীরি ফিরি গিরি গহনের গোঠে।
বেণু-রবে ধেনু সবে পাছু পাছু ছোটে॥
তৃণ পত্র খেয়ে সদা নীচে কুতূহলী।
হায় হায় কোথা মোর শ্যামলী ধবলী॥
কত দিন বিনোদ বিরলবনে যাই।
পিয়ালী শ্যামলী আদি দেখিতে না পাই॥
সঙ্কেতে না বাজাতেম মধুর মুরলী।
তথাচ আসিত ছুটে সাধের ধবলী॥

দিতেম সুখের সহ মুখের অদন।
নাচিয়া খাইত কত নাড়িয়া বদন॥
নিরবধি নীরদ নয়নে নীরধারা।
এমন ধবলী আমি হইলাম হারা!
ব্রজের রাখাল আমি রাখালের দাস।
কোন কার্য্যে কোন রাজ্যে ভ্রমে করি বাস?
কোথায় প্রাণের ভাই শ্রীদাম সুবল।
ক্ষুধায় সুধায় বনে দেয় অন্ন জল॥
হারে রে রে রব শুনে হই জ্ঞানহত।
মুখের উচ্ছিষ্ট খেতে মিষ্ট লাগে কত॥
পরস্পর সখ্যভাব সরস অন্তরে।
দিবা নিশি সুখে ভাসি রস-রত্নাকরে।
ভুলিতে কি পারি কভু ব্রজের রাখালী।
হায় হায় কোথা মোর শ্যামলী ধবলী॥
বিষাদে বিদরে বুক খেদে প্রাণ কাঁদে।
কোথা মম প্রেমময়ী প্রাণেশ্বরী রাধে॥
এখন সে চারুচূড়া নাহি আর মাথে।
সুধামাখা রাধা নাম লেখা আছে যাতে॥
ব্রজে যার প্রেমডোরে সদা হয়ে বাঁধা।
বোয়েছি মস্তকে সুখে শ্রীনন্দের বাধা॥
যার মানে শরীরে মাখিয়া ভস্মরাশি।
হইলাম কাশীবাসী ভিখারী সন্ন্যাসী॥
পদে লিখে কৃষ্ণ নাম করেছি কোটালী।
হায় হায় কোথা মোর শ্যামলী ধবলী।
মধুর শ্রীবৃন্দাবনে সুখ অহরহ।
কতই মধুর ভাব গোপিকার সহ॥
বাজাইয়া বাঁশী হাসি আসি কুঞ্জবনে।
নিত্য-রস-রাসলীলা রস-আলাপনে॥
কোথা রাসময়ী রাধা রসিকা রমণী।
মনসী মহিষী শশী মম শিরোমণি॥
কোথায় বিশাখা বৃন্দা কোথা চন্দ্রাবলী।
হায় হায় কোথা মোর শ্যামলী ধবলী॥

কৃষ্ণের প্রতি রাধিকা।

হে নটবর সর হে সর।
ছি ছি কি কর বসন ধর॥
আমি অবলা গোপের বালা।
হলো কি জ্বালা, ছুঁয়ো না কালা॥
করিলে ভারী বিষম জারী।
নয়ন ঠারি বধিছ নারী॥
তুমি হে শঠ দারুণ নট।
কুরব রট রসিক বট॥
কি হাস হাস কি ভাষ ভাষ।
লাজ না বাস ভাব প্রকাশ॥
গোপী-সমাজে ব্রজের মাঝে।
এমন কাজে মরি হে লাজে॥
আসিয়া জলে হৃদয় জলে।
কপাল ফলে কি ফল ফলে॥
চল হে চল লইব জল।
কি ছল ছল কি বল বল॥
আমি হে সতী নব যুবতী।
আয়ান পতি দুর্জ্জন অতি॥
না জানে প্রেম মনের ভ্রম!
ননদী মম সাপিনী সম।
ননদী-ডরে শরীর জরে।
থাকিতে ঘরে পাগল করে॥
সরল নহে স্বভাবে রহে।
কুকথা কহে জীবন দহে॥
আপন বলে কুপ্রথে চলে।
কথার ছলে অসতী বলে॥
বাঁকা ত্রিভঙ্গ কর কি রঙ্গ।
ছাড় হে সঙ্গ ধরো না অঙ্গ॥
তব বচনে প্রেম রচনে।
গোপিনীগণে হাসিছে মনে॥
মিনতি করি চরণে ধরি।
কি কর হরি সরমে মরি॥

পাপ আয়ানে শুনিলে কাণে।
গঞ্জনা-বাণে বধিবে প্রাণে॥
তুমি গোপাল পাল-গোপাল।
প্রণয় আগ কেন হে জ্বাল॥
গোকুলে থাক গোধন রাখ।
কি হাঁক হাঁক কেন হে ডাক॥
সুখ আধার প্রেম ব্যাভার।
কি ধার ধার কি জান তার?
বংশীর ধ্বনি যেন হে ফণী।
আসি রমণী প্রমাদ গণি॥
নিদয় বাঁশী হৃদয়-ফাঁসী।
করে উদাসী ছুটিয়া আসি॥

সখীর প্রতি রাধিকা।

নিরুপম অপরূপ নিবিড় নীরদ রূপ,
নিয়ত নিরখি সখি নয়ন-নিকটে গো।
লোকে বলে কালো, আমি বলি ভালো,
করিয়া অন্তর আলো পীরিতি প্রকটে গো॥
সখি সবে যাই জলে, শ্রীকৃষ্ণ কদম্বতলে,
কত ছলে কত বলে যমুনারি তটে গো।
শ্যামচাঁদ নবঘন, আমার চাতক মন,
যদি করে বরিষণ তবে সুখ বটে গো।
এ কি জ্বালা আমি বালা, ভাবিলে চিকণ কালা,
কুটীলে কণ্ঠকমালা বদন-বিকটে গো।
ভয় করি প্রতিক্ষণ, প্রতিকুল পরিজন,
শ্যামের সরল মন ভাঙ্গে পাছে শঠে গো॥
পড়েছি প্রণয়ফাঁদে, দিবানিশি প্রাণ কাঁদে,
না হেরিলে কালাচাঁদে কত জ্বালা ঘটে গো,
মরি কিবা ভঙ্গী বাঁকা, চূড়াতে ময়ুরপাখা,
বাঁশীতে অমৃতমাখা রাধানাম রটে গো।
আমি হে গোপের বধূ, বচনে নাহিক মধু,
রসিক নাগর বঁধু পাছে সই চটে গো।
ফলে এই অনুপম, পুরুষ পরশ সম,
পরশে হইবে সোনা, বটে কিনা বটে গো।
ভালবাসে সেবা খাবে, যতনে গোপনে রাখে,
মহাদেব মন্দাকিনী ধরিয়াছে জটে গো।
আর কি শ্যামেরি তুলি, তুলিয়া প্রণয় তুলি,
লিখিয়াছি কালোরূপ মম মন-পটে গো॥

মানভঞ্জন।

মাধবী নিশীথকালে, যুবক যুবতী।
উপবনে উপনীত হরষিত অতি॥
পবিত্র গগনক্ষেত্র, শোভা সুবিমল।
সুচারু শশীর কর করে ঝলমল॥
হইয়াছে সরোবর শোভার ভাণ্ডার।
গন্ধবহ কুমুদের বহে গন্ধভার॥
বনে বনে করিতেছে, বাস-বিতরণ।
রজনীগন্ধের গন্ধে, আমোদিত মন॥
কামিনীর সুবাসে কামিনীমন হরে।
কামিনী কামিনী আশা আপনিই করে॥
উভয়ে উভয় কর, করি প্রসারণ।
হরিছে মনের দুখ করিছে ভ্রমণ॥
ইচ্ছামতে করে গতি যথায় তথায়।
রজনী হইল শেষ কথায় কথায়॥
উঠিয়াছে সুখতারা তারার মণ্ডলে।
বিধু করি মৃদুকর, অস্তাচলে চলে॥
পাখীতে প্রভাতী গায় সুললিত রবে।
সে রবে কে রবে স্থির, ব্যাকুলিত সবে॥
প্রিয় কহে, প্রেয়সী কি কব হায় হায়।
এমন সুখের নিশি, বিফলে পোহায়॥
নিশি কিছু হয় নাই, একেবারে শেষ।
এখনো পুরাতে পারি, মনের আবেশ॥
কুলবান্ কহে চল, চারু তরুমূলে।
কুলবতী বলে বসি, কুলবতী কূলে॥
উভয় বিবাদে নাই শালিসী তথায়।
দম্পতী কলহ বাড়ে কথায় কথায়॥
কুলবতী কুলবতী কূলেতে বসিয়া।
রহিল পতির প্রতি, মানিনী হইয়া॥

বসনে বদন ঢাকি, হেঁট হয়ে রয়।
কত সাধে সাধে তারে কথা নাহি কয়॥
কান্তার দারুণ মান কান্তারে আসিয়া।
কাতরে কহিছে কান্ত কথা কও প্রিয়া॥
একান্তে, এ কান্তে কহে পরিহর রোষ।
করে থাকি অপরাধ, ক্ষমা কর দোষ॥
কত কহে কত সাধে নাহি হয় ভঙ্গ।
ক্রমে আরো বাড়িতেছে মানের তরঙ্গ॥
প্রণয়ী প্রণয়ভাবে, নাহি পেয়ে মান।
বিবিধ কৌশলে ছলে ভাঙ্গিতেছে মান॥
দম্পতী দেখিয়া বনে, সম্প্রীতি পাইয়া মনে,
বিহঙ্গ কি রঙ্গরস করে।
গুন গুন গুন ধনি, কেমন সুখের ধ্বনি,
ভাসিতেছে সুমধুর স্বরে॥
মধু পেয়ে মধুফুলে, মধু খেয়ে মন খুলে,
মধুরবে করে এই গান।
মধুর মধুর কাল, মধুর প্রণয় ভাল,
বধুমুখে মধু কর পান॥
বধূ-নিজ বঁধু লও, মধুরসে কথা কও,
বঁধূ-মুখে মধু কর পান।
দুই দেহ এক হয়ে, একভাবে ভাবে রয়ে
এক প্রাণে রাখ দুই প্রাণ॥
তোমায় আমায় দেখে, গাছের উপরে থেকে,
সঙ্কেত করিছে কত ছলে।
"গৃহস্থের খোকা হোক, গৃহস্থের খোকা হোক্
"গৃহস্থের খোকা হোক্" বলে॥
মান কর তুমি যত, কাতর হতেছে তত,
তার মনে বিলম্ব না সয়।
"গৃহস্থের খোকা হোক্, গৃহস্থের খোকা হোক্,
গৃহস্থের খোকা হোক্" কয়॥
বসনে বদন ঢাকি, মুদিয়াছ দুই আঁখি,
পাখীর মনেতে তাই ধোঁকা।
মানে হয়ে হেঁটমুখী, তুমি যদি হও খুকী,
কেমনে হইবে তারে খোকা॥

কেমনে পাখীর বোধ, ছাড় ছাড় ছাড় ক্রোধ,
অনুরোধ রাখ তুমি তার।
বলে পাখী খোকা হোক্ খোকা হোক্ খোকা হোক্,
তুমি তো সে খোকার আধার॥
তুমি লো গৃহিণী হয়ে, গৃহস্থের গৃহে রয়ে
কুল-কল্পে প্রতিকূল ভাব।
কুলবতী নাম লও, কুলে অনুকূল নও,
সমুদয় স্বভাবে অভাব॥
অদূরে উদয় রবি, এখনি উঠিবে ছবি
শশী করে স্বস্থানে প্রয়ান।
উপবনে উপবাসে, প্রাণ যায় উপবাসে,
প্রেম সুধা না করিলে দান॥
যামিনী থাকিতে হায়, যামিনী বিফলে যায়,
কামিনী কোমল কেবা কহে
নিদয় হৃদয় যার, কোমলতা কোথা তার,
বিপুল বিষাদে বপু দহে॥
অতি কান্ত কান্ত কাল, তুমি ভাব কান্ত কাল,
কি করি কপাল ভাল নহে।
নিশাকান্ত কান্ত কর, কান্ত সুত হানে শর,
পুরুষের প্রাণে এ কি সহে॥
একান্ত কি মনে লয়, একান্ত তোমার নয়,
ভাব যদি কি করিব আমি।
প্রাণকান্তে প্রাণকান্তে, ত্যজিছ মনের ভ্রান্তে,
আমি যাই ধর ধর স্বামী॥
দেখিয়া আমার দুখ, কারো মনে নাহি সুখ,
বনচর অসুখী সবাই।
ব্যাকুল হইয়া অতি, বায়ু করে মৃদুগতি,
খেদ ছলে রব সাঁই সাঁই॥
আমার নয়নতারা, তারাকান্না ফেলে ধারা,
হেরি যত গগনের তারা।
আর না প্রকাশে জ্যোতি, লয়ে প্রিয় তারাপতি,
একে একে লুকাইল তারা।
দেখিয়া তোমার মান, ক্রোধে হয়ে কম্পমান,
এলো খেলো কেতকীর পাত।

বুকের বসন হরি, বদন বিকট করি,
বিস্তার করিছে নিজ দাঁত॥
গুণ গুণ করে অলি, সে গুণের গুণবলি
কহিতেছে করি গুণ গুণ।
মধুগুণে কর দুখ, প্রকাশিয়া পদ্মমুখ,
গুণবতি ধর নিজ গুণ॥
অথবা এ মধুকর, শুনিয়া তোমার স্বর,
মধুরব শুনিতে বাসনা।
সঙ্গে করি মধুকরী, গুণ গুণ গান করি,
করিছে তোমার উপাসনা॥
কোকিল কোকিলা যত, সকলেই সুখহত,
ছট্‌ফট্‌ কোরে সব মরে।
তোমায় মানিনী দেখে, মনোদুখে থেকে থেকে,
কুহু ছলে উহু উহু করে॥
লোকে কহে কলরব, করিতেছে কলরব,
কলরব কলরব ভান।
কুহু কুহু কুহু নয়, উহু উহু মুখে কয়,
হুহু করে কোকিলের প্রাণ॥
পিকবর করে কুহু, প্রথমে কু শেষেতে হু,
কি কু কি হু সু কিছুই নয়।
এই হেতু প্রাণধনি, শিখিতে তোমার ধ্বনি,
তার মনে আশা অতিশয়॥
স্বভাবে ভাষিয়া ভাষা, এখনি পূরাও আশা
সুখী হোক্ ভ্রমর কোকিল।
শুনিয়া মধুর ভাষ, দেখিয়া মধুর হাস,
প্রেমরসে জুড়াক অখিল॥
শ্যামায় ছাড়িছে সিটি, ভাব কি বুঝেছ সি টি
খিটিমিটী কত কথা কয়।
শুনিতে তোমার বোল, চেঁচায়ে করিছে গোল
না শুনিলে ছাড়িবার নয়॥
তার পাশে বুলবুল্, করিতেছে চুলবুল্
ডালে বোসে যায় লুটালুটি।
ডাক পাড়ে হাঁক ছাড়ে, পাখা ঝাড়ে ঝুঁটি নাড়ে
করে কত মাথা-কুটাকুটী।
পাপিয়া হাঁপিয়া পড়ে, কাঁপিয়া শরীর নড়ে,
হাঁপিয়া হাঁপিয়া ছাড়ে ডাক।
'প্রিয় কহ প্রিয় কহ', কহে শুধু 'প্রিয় কহ',
মুখে তার নাহি আর বাক্॥
এ সব পাখীর হয়ে, এক পাখী কথা কয়ে,
হয়েছে তোমার উমেদার।
মরি মরি কিবা রঙ্গী, দেখ তার ভাব-ভঙ্গী
প্রকাশিয়া নয়নের দ্বার॥
শ্রবণে তাহার রব, মহীতে মোহিত সব,
আমার নয়নে শতধার।
পাখী 'বউ কথা কও' কহে 'বউ কথা কও'?
'বউ কথা কও' একবার॥
বলে 'বউ কথা কও', কাঁদে 'বউ কথা কও',
'ওলো বউ কথা কও' মুখে।
নারীর কি এই কর্ম্ম, নাহি দয়া নাহি ধর্ম্ম,
পাষাণ বেঁধেছ বুঝি বুকে॥
বারে বারে 'বউ কথা', কহে 'বউ কও কথা',
বউ, কথা তবু নাহি কও।
কে বলে তোমায় শীলা, আমার কপালে শিলা
শিলা বটে, শীলা কভু নও॥
মানময়ি, ওলো প্রিয়া, মান নিয়া গৃহে গিয়া,
বাস কর হরষিত মনে।
দুখে ভাসি আঁখি জলে বসে এই শাখিতলে,
পাখী সহ থাকি আমি বনে॥
দারুণ মানের ভরে, নেত্র-নীল ইন্দীবরে,
অরুণের করেছ অধীন।
কর্ম্ম এ কি মিত্রতার, মিত্র নহে, মিত্র তার,
কুমুদের শত্রু চিরদিন॥
শীতল শীতল করে, যাহারে শীতল করে,
তারে কর অনলে পূরিত।
কেমন মানের ভাব, শত্রু সহ মিত্রভাব,
সমুদয় দেখি বিপরীত॥
নয়ন-মুকুন্দ পরে, রাগ-রবি কোপ ধরে,
খরতর করযোগে দহে।

তাই পাখা 'চোখ গেল', 'চোক গেল চোক গেল,
'চোক গেল' 'চোক গেল' কহে॥
কাতরে কহিছে পাখী, বিনোদী বাঁচাও আঁখি,
'চোক্ গেল' 'চোক্ গেল' তোর।
মানে এক খেলা খেলে, চোকের মাথাটী খেলে,
দশা দেখে বুক্ ফাটে মোর॥
এত মান মলো মলো,ওলো ওলো চোক খোলো
তোলো তোলো কমল-বদন।
নিকটে দাঁড়িয়ে নাথ, ধর ধর ধর হাত,
কর তার দুঃখনিবারণ॥

'চোক গেল' 'চোক গেল' চোক গেল' কয়।
এ রব শুনিয়া পুন পাখী সমুদয়॥
একে একে হেসে কয় প্রিয় সম্ভাষণে।
কি হোল কি লো,ছি, লো, ছি লো, এত ছিল মনে?
শারী-মুখে মুখ দিয়া শুক করে গান।
মানিনী কামিনী তোর কত দূর মান॥
করি মান পরিমাণ না রাখিলে তার।
মানে, হরি মান, মান, রাখ আপনার॥
অতিশয় ভাল নয় শুন শুন সতি।
অতীত করিছ কাল পতিত কি পতি?
শারী কয়, নারী নয়, ও যে, নিশাচরী।
নরে কেনু দুঃখ দেবে যদি হবে নারী॥
এ কথা শুনিয়া পাখী "দেশের কি হলো॥"
কাতর হইয়া কহে "দেশের কি হলো।"
রমণী রমণ ছাড়ে, মোলো মোলো মোলো।
"দেশের কি হোল' হায়! 'দেশের কি হোল'॥
পুনরায় ডেকে কয় 'বউ কথা কও।'
বার বার এইবার, 'বউ কথা কও।'
'বউ কথা" রবে বউ কথা নাহি কোলো।
"দেশের কি হলো" কয় "দেশের কি হলো॥"
"গৃহস্থের খোকা হোক" স্থির নাহি রয়।
"গৃহস্থের খোকা হোক" পুনঃ পুনঃ কয়॥
মানিনী মানিনী থাকে খোকা নাহি হলো।
"দেশের কি হলো"কয়"দেশের কি হলো॥"
কঠোরতা দেখে তব কোটরে ঢুকিয়া।
পেঁচায় চেঁচায় কত গালাগালি দিয়া॥
কাকা কাকা কাকা ভাষ ভাষিতেছে কাকে।
এ ভাষের আভাস কহিব আমি কাকে॥
কাকা কয় কতক্ষণ দিবে আর ফাঁকি!
কাকা কাকা মার কাকা কথা কও কাকি॥
আমায় ছলেতে কাকা, কাকা কাকা বলে।
তোমায় বলিছে কাকী, কাকী রব ছলে॥
বকাবকি করিতেছে যত বকা-বকী।
বকী বলে বকা বৃথা বকা বলে বকি॥
বলে বকী বকি তবে বকা বকা মোরে।
বকা-বকী, বকাবকি, করিতেছে জোরে॥
আমি যত বকি, বকা, বলে মিছে বকা।
ওলো বকী হলে এ কি সখী ছাড়ে সখা॥
হায় হায় প্রাণ যায় কি কহিব প্রিয়া।
ধার্ম্মিক হয়েছে বক আমায় দেখিয়া॥
তথাচ নিদয়া তুমি ওলো প্রাণসখি!
খেদে তাই বকাবকী করে বকাবকি॥
মানেতে তোমায় প্রাণ দেখিয়া নীরব।
কুঁকুড়ায়, কুকু ছলে করিছে 'কু' রব॥
চিঁচিঁ চিঁচি চুঁচি চুঁচি চড়া চড়ী বলে।
প্রেমরস শিক্ষা দেয়, চড়াচড়ি ছলে॥
চড়া বলে, চড়া চড়া চড় বলে চড়ী।
এইরূপ চড়াচড়ি করে চড়া চড়ী॥
নদীর এ পারে চকা, ও পারেতে চকী।
চকা বলে পারে এসো, চকি প্রাণসখি॥
নর নারী ছাঁড়াছাড়ি থেকে এক ঠাঁই।
এসো এসো, দম্পতীরে, মিলন শিখাই॥
চকী বলে আমাদের বিধাতা বিমুখ।
কখনই নাহি জানি রজনীর সুখ॥
এমন সুখের নিশি পেয়ে ভাগ্যফলে।
যে রমণী মান করে কাটায় বিফলে॥

তার মুখ-পানে আমি চাব না চাব না।
তাহার নিকটে আমি যাব না যাব না॥
কোন পাখী স্তব করে কেহ করে ক্রোধ
সুমধুর রবে কেহ করে অনুরোধ॥
কাহারো স্বভাব দেখি কান্দিয়া ভেঙ্গানী।
মান ভাঙ্গিবারে করে, সবাই ভেঙ্গান॥
অপরূপ! এতরূপে না ভাঙ্গিল মান
জানিলাম প্রাণ তব হৃদয় পাষাণ॥
এ মানের পরিমাণ বুঝিতে না পারি।
কিছুই না জানিলাম মানিলাম হারি॥
এত সাধা এত কাঁদা বিফল হইল।
বৃথায় সাধনা করি সাধ না পূরিল॥
মনে ছিল বনে এসে জুড়াইব প্রাণ।
অমৃতে উঠিল বিষ কিসে বাঁচে প্রাণ॥
অকারণ মিছা এক অভিমান লয়ে
সুখরসে ভঙ্গ দিলে রসবতী হয়ে।
কমলিনী তুমি ধনি ফুল্ল-মধুভরে।
বঞ্চিত করিছ কেন ক্ষুধিত ভ্রমরে।
কখনো দেখিনি তব এমন প্রকৃতি।
পুরুষে বঞ্চনা কর হইয়া প্রকৃতি॥
আমায় সুকৃতিহীন ভাবিয়া অকৃতি।
প্রকৃতি প্রকৃতি তাই করেছে বিকৃতি॥
প্রকৃতি বিকৃতি করি ঢেকেছ আকৃতি।
তোমার প্রকৃতি দেখে হাসিছে প্রকৃতি॥
চেয়ে দেখ স্থল জল অনিল আকাশ।
স্বভাব কি ভাবে করে স্বভাব প্রকাশ॥
চরাচরে চরে যত ভূচর খেচর।
তরু, ফুল, ফল আদি বস্তু বহুতর॥
বনে বসে যত দেখি অচল সচল।
সবাই আমার লাগি হয়েছে চঞ্চল॥
মানভরে, প্রাণ তব, ফিরেছে স্বভাব।
তাই দেখে একে একে দেখায় স্বভাব॥
বেশ করি, বেশ করি, দ্বেষ করি শেষ।
বেশ করি দেশ ছাড়া এলাইলে কেশ॥

কি হার দিলায় গেঁথে বিহার-কারণ।
নীহার সে হার পরে করে আরোহণ॥
হেলে হেলে হেলেহার করেছিল শোভা।
কি কব তাহার দ্যুতি মুনি-মনোলোভা॥
চন্দ্রহারে চন্দ্র হারে কিবা তার ছটা।
কোথা নাগকেশর বেশর চারু ঘটা॥
বিনোদ বেশর চারু নাসিকায় দোলে।
চকোর শোভিত যেন পূর্ণশশী কোলে॥
অপরূপ বালা বালা ধরেছিলে করে।
হীরকের বাজু পোরেছিলে তার পরে॥
সহজে কনককান্তি কমনীয় কর।
হয়েছিল সার ভাতি অতি মনোহর॥
উষসীসময়ে যেন হরিৎ আকাশে।
আধখানি চাঁদখানি তাহাতে প্রকাশে।
দোথরি মুকুতা-হার পোরেছিলে ভালে।
পেলেম কতই সুখ দরশনকালে॥
নয়নে নিরখি শোভা জুড়ালো হৃদয়।
চাঁদ-বেড়া তারা যেন ভূতলে উদয়॥
মরি সে মনের দুখে হরিষে বিষাদ।
প্রেম দে প্রমোদে কেন করিলে প্রমাদ॥
খোঁপায় বিরাজে চাঁপা কোথা সেই কেশ।
কোথা সেই ভাবভঙ্গী কোথা সেই বেশ।
কোথা সে ফুলের মালা কোথা সেই হেলে।
নিকট দেখিয়া উষা ভুষা দিলে ফেলে॥
কোথায় মধুর হাসি কোথা সেই ভাষা।
এখন কোথায় গেল সেই ভালবাসা॥
কোথায় সে মধুর ভাব প্রেম-আলাপন।
এখন লুকালে কোথা নলিন-নয়ন॥
কোথা সে সুধার খনি বিমল-বদন।
মদন যাহাতে এসে করেছে সদন॥
এখন কি আমি আর সেই আমি আছি।
রসালাপ দূরে থাকু কথা কোলে বাঁচি॥
দ্বিজরাজে দয়া কর দ্বিজরাজমুখী।
একবার মুখ তুলে কর প্রাণ সুখী॥

না কও না কও কথা তাহে নাহি খেদ।
লোকেতে না জানে যেন ঘটেছে বিচ্ছেদ॥
দিলে ব্যথা খাও মাথা এই কথা রাখ।
প্রাণপ্রিয়া গৃহে গিয়া মান নিয়া থাক॥
অন্তরে গোপন কর অভিমান-নিধি।
এখন এখানে আর থাকা নয় বিধি॥
বাড়ায়ে মানের মান বাসে গিয়া রহ।
আমি করি বনবাস বনবাসী সহ॥
প্রভাতে করিতে স্নান কুলবতী কুলে।
এখনি আসিবে এই কুলবতী কূলে॥
সুরতরঙ্গিনী তীরে তোমারে দেখিয়া।
সুরত-রঙ্গিণী সব উঠিবে হাসিয়া॥
আমিও পাইব লাজ তুমি পাবে লাজ।
অতএব মানের মাথায় হানো বাজ॥
পতির বচনে সতী না করে উত্তর।
অন্তরে বাড়ায় মান উত্তর উত্তর॥
মজিয়া দুর্জ্জয় মানে না মানে প্রবোধ।
নিশি হয় অবসান কিছু নাই বোধ॥
নীল অম্বরেতে ধনী ঢেকেছে বদন।
তাহার ভিতরে আছে মুদিয়া নয়ন॥
লোচন মোচন করি আর নাহি চায়।
নিশা কৃশা দিবাগম দেখিতে না পায়॥
কিরূপে ভাঙ্গিব মান ভবিছে নাগর।
আধার অপেক্ষা হলো আধেয় ডাগর॥
পুন কয় সরসে রসিক রসময়।
রসিকা এমন কেন হলে অসময়॥
প্রেমিকে পণ্ডিতে তুমি কর অবিচার।
খণ্ডিতে না পারি মান খণ্ডিতে তোমার॥
এখনি খণ্ডিতে পারি মনে ভয় আছে।
তোমার মানের মান খণ্ডে প্রাণ পাছে॥
যে হয় উচিত মনে সুবিহিত কর।
নিজে রেখ নিজ মান প্রাণ পরিহর॥
মানিনি জানিনি এ মান কিসে।
আমারে দহিছ বিরহ-বিষে॥
ইহার উপায় বল কি করি।
সমুখে থাকিয়া বিরহে মরি॥
প্রণয় কারণে কাননে আসা।
এসে না পূরিল মনের আশা॥
পুলকে তোমাকে রাখিয়া বুকে।
অধর-অমৃত খাইব সুখে॥
বসন কষণ তোমার মুখে।
যামিনী যাপন দারুণ দুখে॥
ভূতলে পোড়েছ কনকলতা।
কাতর দেখিয়া না কহ কথা॥
বলনা ললনা ছলনা ছেড়ে।
মধুর কলনা কে নিলে কেড়ে॥
এ ভাব দেখিয়া সকলে হাসে।
আভাসে কুভাষ সুভাষ ভাষে॥
বিফল হইবে কহিব যত।
কত বা দহিব সহিব কত॥
এ ভাবে কতই রবে নীরবে।
শুনলো শুনলো কি কহে সবে॥
সকলে গরবী, তোমার মানে।
তাদের গরব সহে না প্রাণে॥
গরবিনী নিজ গরব ধর।
বিপক্ষ গরব বিনাশ কর॥
তথাচ মানিনী রহিল মানে।
মানের নিষেধ মানে না মানে॥
রসের সাগর নাগর পরে।
ললনা ছলিতে ছলনা করে॥
"মানময়ি, তোলো মুখ" কহিছে খঞ্জন।
"দেখিব কেমন তোর নয়ন-রঞ্জন॥
এখনি করিব সব বিবাদ-ভঞ্জন।
কালো কোরে রাখিয়াছে মাখিয়া অঞ্জন॥"
খঞ্জন হইয়া পাখী এত বল ধরে।
দুষিয়া তোমার আঁখি অহঙ্কার করে॥
একবার খোলো প্রাণ রঞ্জন নয়ন।
খঞ্জন গঞ্জন পেয়ে করুক্ গমন।

কুরঙ্গের কুরঙ্গ দেখিয়া হাসি পায়।
তোমার কেমন আঁখি দেখিতে সে চায়॥
মান রঙ্গে কুরঙ্গিনী তোমায় সে বলে।
কি কব দুঃখের কথা শুনে প্রাণ জ্বলে॥
দুষিয়া তোমার আঁখি হয়ে অভিমানী।
কুরঙ্গ কুরঙ্গ-করি বলে কুরঙ্গিণী॥
আপনার কুরঙ্গ করিয়া পরিহার।
কুরঙ্গ কুরঙ্গ কর সুরঙ্গে সংহার॥
বুক্ ফাটে গৃধিনীর বচন শ্রবণে।
ডাক্ ছেড়ে দুষিতেছে তোমার শ্রবণে॥
কাণ পেতে কথা শুনে দেখাইয়া কাণ।
তার কাণ্ কেটে নিয়া ভাঙ্গ অভিমান।
আর এক পাখী এসে নেড়ে নেড়ে ঠোঁট।
তোমার নাসার প্রতি করিতেছে চোট॥
বারবার ভাষিতেছে বিষম কুভাষা
কহিছে কাপড় খোলো দেখি তোর নাসা॥
পাখা ঝেড়ে গলা ছেড়ে বলে থেকে থেকে।
নাসা যদি খাসা হবে কেন বাখ ঢেকে?
ঠোঁট নাক কাটো তার দেখাইয়া নাক।
নাকে খৎ দিয়া পাখী দূর হয়ে যাক্॥
নিকটে আসিয়া কহে নাচিয়া চামরী।
"কেমন তোমার কেশ দেখাও সুন্দরি"॥
তার রবে ঘন দিয়া ঘন ঘন সায়।
গর্জ্জন করিছে কত চড়িয়া মাথায়॥
ঘোরতর নাদে বলে, দেখাও চিকুর।
চিকুর দেখাও বোলে হানিছে চিকুর॥
হায় হায় কব কায় আ মরি আ মরি।
চুলের গৌরব করে পাপিনী চামরী॥
বিজলী চমকে কত যদি তুল হাই।
ত্রিভুবনে তোমার তুলনা দিতে নাই॥
জিনি রতি রূপবতী আমার ঘরণী।
লম্বিত চিকুর চারু চুম্বিত ধরণী॥
এখন করিছে ঘন ঘন ঘন নাদ।
এখনি হইবে তার হরিবে বিষাদ॥
দেখিলে তোমার কেশ দর্প যাবে সব।
ডাক ছেড়ে কেঁদে শেষ হইবে নীরব।
মাথা খুলে হাত দেও চাঁচর চিকুরে।
যাক্ যাক্ জলদের জাঁক যাক্ দূরে॥
তোমার মধুর হাসি দেখিবে বলিয়া।
চঞ্চলা কাঁপিয়া উঠে চঞ্চলা হইয়া॥
ভামিনি কামিনি মম হৃদয়-আগারে।
হাসিয়া সুধার হাসি দাসী কর তারে॥
ডালিম জিনিতে কুচ, অভিমান করে।
অহঙ্কারে দেখ প্রাণ ফেটে ওই মরে।
তার সহ যোগ দিয়া হইয়া ব্যাকুল।
শিহরে শিহরে উঠে কদম্বের ফুল॥
একবার কুচযুগ দেখাইয়া প্রাণ।
নাশ কর উভয়ের ঘোর অভিমান॥
উভয় মিলন করি এই কথা কয়।
"ওলো ধনি দেখাও দেখাও স্তনদ্বয়।
দাড়িম্ব ছাড়িয়া বীচি প্রাণ যাক্ মরে।
কদম্বের শোভা হের ঝুরি যাক্ ঝোরে"॥
তব ক্ষীণ কটির গরিমা লয়ে হরি
কোটি করী অদূর দাঁড়ায়ে আছে হরি।
হরি লও হরি-দর্প কটি দেখাইয়া।
জপুক্ সে হরি হরি বিবরে ঢুকিয়া।
ভয়ানক যত পশু এই বনে আছে।
করিয়া রূপের দ্বেষ দ্বেষ ছাড়িয়াছে॥
হায় হায় হাসি পায় কব আর কারে।
হরি কাছ করী নাচে গতি জিনিবারে॥
কহিছে করাল ভাবে মরাল আসিয়া।
ওলো সতি কর গতি হাসিয়া হাসিয়া॥
গমনের গরিম হারাবে তুমি জানি।
কেমন চলিতে জান দেখিব এখনি॥
তাই বলি হেমলতা, হাঁটো একবার।
হাঁস হাঁসী দাস দাসী হইবে তোমার॥
পুন আর লোকালয়ে আসিবে না প্রিয়া।
পলাইবে হস্তী মূর্খ শুঁড় গুড়াইয়া॥

যে চাঁপার ফুল তব অঙ্গুলী দেখিয়া।
কটু গন্ধ সার করে নীরস হইয়া॥
চোপা করে সেই চাঁপা করে অহঙ্কার।
অঙ্গুলীর শোভা প্রাণ হরিবে তোমার॥
হর তার অহঙ্কার আঙ্গুল নাড়িয়া।
মরুক্ ঝরুক্ দল পড়ুক খসিয়া॥
রম্ভাতরু উরু-শোভা হরিবারে চায়।
আপনার গুরুভাব ভাবেতে জানায়॥
একবার সুনয়নে চাহ মুখ তুলে।
হর তার গুরুদ্বেষ উরুদেশ খুলে॥
খোলা উরু দেখে তার সার হবে খোলা।
বাসনা রহিবে তার বাসনায় তোলা॥
দেখে তব মুখরূপ অমল কমল।
কমলে লুকায়েছিল সকল কমল।
এতদিন ওঠেনিকো ফোটেনিকো মুখ।
কাঁটা সার করেছিল পেয়ে ঘোর দুখ॥
তোমায় বদন আজ দেখিয়া গোপন।
জল ফুঁড়ে বল করি তুলিছে লপন॥
মুখ তোলে মুখ তোলোমুখ তোলো বলে।
আপন গৌরব করে সৌরভের ছলে॥
কেন লো হারাও মান যোগে ছার মানে।
কমলের অহঙ্কার নাহি সহে প্রাণে॥
তোলো তোলো ২ মুখ খোলো খোলো বাস।
কমলে দেখাও প্রাণ মধুর সুহাস॥
নলিনী মলিনী হয়ে আর না ফুটিবে।
নিশাযোগে কৃশা হয়ে মুখ লুকাইবে॥
বাড়িতেছে প্রাণ তব অধর অধর।
ফাটিতেছে বিম্ব ফল রাগে করি ভর॥
অধরের রাগ তারে দেখাও এখনি।
রাগে রাগে গোলে খসে মরিবে অমনি॥
প্রাণেশ্বরি পায়ে ধরি ছাড় ছাড় মান।
অপমান হয়ে কেন কর অপমান॥
মনের কুভাব যত অভাব করিয়া।
এখন প্রকাশ কর স্বভাব ধরিয়া॥

শিষ্টজনে তুষ্ট কর মিষ্ট আলাপনে।
দুষ্টজনে কষ্ট দেহ বিহিত শাসনে॥
এখানেতে অনুগত যত আছে বনে।
সন্তোষ প্রদান কর সকলের মনে॥
এই বনে হয় যারা তোমায় বিরূপ।
তাদের হতাশ কর দেখাইয়া রূপ॥
দেখাইয়া শরীরের বাহ্য অবয়ব।
একে একে বিপক্ষেরে কর পরাভব॥
ভাঙিতে তোমার মান শুনিতে বচন।
সুনীতে রয়েছে কাছে যত পক্ষিগণ॥
অমৃত-পূরিত ভাষ করিয়া ঘোষণা।
বচনে পুরাও প্রাণ তাদের বাসনা॥
যে জন যে ভাবে প্রাণ আছে উমেদার।
সেরূপ করিয়া তার কর উপকার॥
কৌশল করিল ভাল রমণীরমণ।
গোপনে গলিয়া গেল, রমণীর মন॥

পতির স্বভাবে, সতী মনে হাসে,
ভাব না প্রকাশে মুখে।
ভাবিয়া নাগরে, প্রণয়-সাগরে,
ভাসিছে অশেষ সুখে॥
আপনা আপনি, কহিছে কামিনী,
সুখের ভাগিনী আমি।
কপালেরি ফলে, এসে ধরাতলে,
পেয়েছি এমন স্বামী॥
এ ভাব স্মরণে, নাথের চরণে,
বিনা মূলে দাসী হব।
সুধারব শুনে, গুণের এ গুণে,
চিরকাল বাঁধা রব॥
ভাবিক প্রেমিক, সুরসে রসিক,
চতুর সুজন বটে।
করিলে যতন, এমন রতন,
আর কি কাহারে ঘটে?
এরূপ আধারে, শোভার আগারে,
পড়িবে যাহার আঁখি।

জীবন যৌবন, করি সমাপন,
আমারে সে দিবে ফাঁকি ॥
গিয়ে লোকালয়, থাকা বিধি নয়,
গোপনে গহনে থাকি।
বিপক্ষে দূষিব, প্রণয়ে তুষিব,
পুষিব প্রেমিক-পাখী ॥
রূপের রঞ্জন, করিয়া অঞ্জন,
নিয়ত নয়নে মাখি।
হৃদয় চিরিয়া, যতন করিয়া,
ভিতরে লুকায়ে রাখি ॥
মনে মনে কয়, ওহে রসময়,
থাক থাক চুপে চুপে।
আমারে ছাড়িয়া, কর্পূর হইয়া,
বঁধু হে, যেয়ো না উপে ॥
রেখে পরিমাণ, ছলে করি মান,
স্থির নহি কোনরূপে।
ভাবেতে ভজেছি, রসেতে মজেছি,
ডুবেছি পীরিতি-কূপে ॥
করি জাগরণ, যামিনী-যাপন,
কাতর হয়েছ ঘুমে।
স্বভাবে অমল, শ্রীপদ-কমল,
ও পদ রেখ না ভূমে ॥
পেতেছি হৃদয়, হইয়া সদয়,
বসো হে তাহার পরে।
লয়েছি শরণ, চালাও চরণ,
যেমন বাসনা ধরে ॥
পুরুষ প্রেমিক, তুমি হে রসিক,
কি কব অধিক মুখে।
হইয়া বণিক, চরণ-মাণিক,
খানিক রাখহ বুকে ॥
তুমি মহাজন, প্রেম-মহাজন,
সুজন সুধীর বট।
ব্যাপারী হইয়া, হাটেতে বসিয়া,
লাভে কেন প্রাণ হট ॥

শরীর আমার, বিভব তোমা
যৌবন সঁপেছি হাতে।
বুঝিয়া ব্যাপার, কর হে ব্যাপা
লাভ হয় ভাল যাতে ॥
তুমি প্রাণপতি, আমি কুলবত
সহজে অবলা নারী।
যাঁচি যত দিন, প্রাণ তব ঋ
আমি কি সুধিতে পারি ॥
তোমারে চিনেছি, ত্রিলোক জিনেছি
আপনা কিনেছি আমি।
কোথাও যাব না, কোথাও পাব ন
তোমার সমান স্বামী ॥
তুমি প্রাণধন, মাথার ভূষ
হয়ে কেন পায় ধর ?
এ কি দেখি সাধ, তুমি কেন সা
অপরাধ ক্ষমা কর ॥
ওহে গুণরাশি, চরণের দাস
চিরদিন আছি বাঁধা।
বলিবে যেরূপ, করিব সেরূ
সাধ কোরে কেন সাধা ॥
শয়নে স্বপনে, প্রতি ক্ষণে ক্ষ
তোমারি ভজনা করি।
তুমি ধ্যান জ্ঞান, তুমি ধন প্রা
তোমারি ধারণা ধরি ॥
তোমা বিনা আর, কে আছে আমা
আর কার আমি হব ?
আমা বিনা আর, এরূপ প্রকার
শত শত আছে তব ॥
ওহে রসময়, ত্যজিয়া আমা
শত শত পাবে নারী।
সেরূপ প্রকারে, সখা হে তোমারে
আমি কি ত্যজিতে পারি ?
বঁধু তোমা বই, আমি কারো নই
কেনা আমি কে না জানে

বিধি-বিধিমতে, সতী পূজে সতে,
সুখ দুখ নাহি মানে ॥
বিশেষ কি কব, জান তুমি সব,
জগতে যে নারী সতী।
পতি বিনা তার, গতি নাই আর,
যেমন কামের রতি ॥
দক্ষের তনয়া, অম্বিকা অভয়া,
প্রধানা-প্রকৃতি সতী।
শিব শিবকয়, হর দুখহর,
পশুপতি যাঁর পতি ॥
সেই মহামায়া, মহাদেব-জায়া,
জীবনে না করি স্নেহ।
পতি-নিন্দা শুনে, জলে কোপাগুনে,
ত্যজিলেন নিজ দেহ ॥
এক সুধাকর, অতি মনোহর,
শোভা করে নভোপরে।
সুধার আধার, ভবের আঁধার,
নাশ করে চারু করে ॥
চকোরীর মত, কত শত শত,
নিয়ত ভজিছে তাঁরে।
বিনা এক চাঁদ, চকোরীর সাধ,
আর কে পূরাতে পারে ?
তাই প্রাণনাথ, ধরি দুটী হাত,
প্রণিপাত করি পদে।
অধীনী বলিয়া, করুণা করিয়া,
আমারে রাখ হে পদে ॥
আমি হই সতী, তুমি হও পতি,
তোমা বিনা গতি নাই।
কপালে কি আছে, দুখ ঘটে পাছে,
সদা মনে ভাবি তাই ॥
সুরসিক-বর, দেহ দেহ বর,
এই অভিলাষ করি।
তোমারে রাখিয়া, ও মুখ দেখিয়া,
আমি যেন আগে মরি ॥

আমার অভাবে, স্বরূপ স্বভাবে,
মিশাইয়া পাঁচ পাঁচে।
তব উপকারে, স্থিত ব্যবহারে,
থাকে যেন তারা কাছে ॥
যেই জলে প্রাণ, তুমি কর স্নান,
সেই জলে মিশিবে জল।
এই মনে আশ, যথা কর বাস,
স্থল পাবে তথা স্থল ॥
বাতাসে বাতাস, হইয়া প্রকাশ,
লাগে যেন তব গায়।
রূপের যে ভাগ, করি অনুরাগ,
আঁখি-পথে যেন ধায় ॥
গগনে গগন, হইয়া মগন,
চারি দিক্ রবে ছেয়ে।
চালিয়া চরণ, করিবে গমন,
সতত দেখিবে চেয়ে ॥
তখন রমণীমণি ব্যাকুল হইয়া।
না পারে রাখিতে ভাব গোপন করিয়া ॥
হরিয়া মানের মান অপমান করে।
রাখিতে পতির মান চারুভাব ধরে ॥
ধীরে ধীরে পাশ ফিরে উঠিয়া বসিল।
ক্রমে ক্রমে বদনের বসন খুলিল ॥
ভাবুকের মনে তায় ভাব এই স্থির।
ঘন হতে শশী যেন হতেছে বাহির ॥
থেকে থেকে আড়ে আড়ে করে বিলোকন।
পূর্ণ নহে প্রকটিত নলিনী-নয়ন ॥
নয়নের ভাব দেখে বোধ হয় হেন।
অর্দ্ধ-ফোটা পদ্মফুল দুলিতেছে যেন ॥
সমুদয় মুখখানি হইলে প্রকাশ।
হলো তায় অপরূপ রূপের বিভাস ॥
তরুণী এরূপ ভাব ধরিল তরুণ।
ঘনাচ্ছন্ন প্রাতে যেন উদয় অরুণ ॥
মুখচাঁদে বিন্দু বিন্দু ঘামবারি ঝরে।
যেন বিধু মৃদু মৃদু সুধাবৃষ্টি করে ॥

অধরেতে মৃদু হাসি কিবে শোভা তায়।
সিঁদুরে-মেঘেতে যেন তড়িত খেলায়॥
কপোলের কমনীয় কমনীয় ভাস।
নিরখিয়া গোলাপের হলো সর্ব্বনাশ॥
গোলাপ বিলাপ করি, ভেবে ভেবে মনে।
কাঠ হয়ে কাঁটা নিয়ে বাস করে বনে॥
স্মেরমুখী সুমধুর হাসিতে হাসিতে।
মধুর বিনয়-ভাব ভাবিতে ভাবিতে॥
নীলবাস গলে দিয়া পোড়ে বরাসনে।
প্রণয়িনী প্রণমিল পতির চরণে॥
দেখিয়া সুরূপ গুণ শুনিয়া সুরব।
যেন শব শক্র সব মানে পরাভব।
অনুকূল যারা তারা ভাবেতেই সুখী।
কেবল পেচক বেটা ঘোরতর দুখী॥
প্রাণেশ্বরী প্রাণেশ্বরে করি সম্ভাষণ।
প্রকাশ করিছে সব মনের বচন॥
শ্রুতিমূলে তার তার এমনি মধুর।
সুধা-মাখা বচনেতে ক্ষুধা হয় দূর॥
শিখিতে না পেরে পিক, মধুর সে রব।
বরষায় থাকে দুখে হইয়া নীরব॥
হয় নি অলির গলা সেরূপ মধুর।
অদ্যাপিও ভোঁ ভোঁ কোরে সাধিতেছে সুর॥
শ্যামায় কি দিবে সিটি সিটি তার স্বরে।
না শিখিয়া মিছামিছি কিচিমিচি করে॥
মানিনী ত্যজিয়া মান হেসে কথা কয়।
"গৃহস্থের খোকা হোক্" শুনে সুখী হয়॥
তদবধি তার মুখে, কিছু নাই আর।
"গৃহস্থের খোকা হক" এই রব সার॥
হইয়া বণিক, "চোক গেল" বলে থেকে থেকে।
পানিক্ ক্ গেল রূপ দেখে দেখে॥
তুমি মহাজন, না করে প্রয়োগ।
সুজন সুধীর বটে তলো এহ রোগ॥
ব্যাপারী হইয়া, হাঁকে।
লাভে কেন প্রাণ হট রাঁকে॥

যুবকে বলিয়া কাকা মান ভাঙ্গিবারে।
অদ্যাবধি কাকা রব ভুলিতে না পারে॥
ছলেতে ভাঙ্গিতে মান বউ কথা কও।
ডালে বসে বলেছিল বউ কথা কও॥
শুনিয়া মধুর কথা মধু-রস পেয়ে।
"বউ কথা কও" এই গীত দিলে গেয়ে॥
তদবধি পেলে নাম "বউ-কথা-কও"।
অদ্যাবধি বলে তাই "বউ কথা কও"॥
বকা বকী করেছিল বকাবকি সার।
"বকা বকী" নাম তাই হইল প্রচার॥
মানিনীর মানেতে মিলন ভাব ধোরে।
"চড়াচড়ী" পেলে নাম চড়াচড়ি কোরে
নাগরের কোলে বোলে রসিকা নাগরী
বলে প্রাণ কি ভাবিছ আহা মরি মরি॥
ছিলেম বাড়াতে মান মিছে মান নিয়া।
বাড়িল তোমার মান সে মান ভাঙ্গিয়া॥
ছলেছি বলেছি কত কথায় জ্বলেছি।
অন্তরে প্রেমের রসে কেবল গলেছি॥
চঞ্চল হয়েছে আঁখি তোমায় না হেরে।
মনেতে কেঁদেছি শুধু ফুটিতে না পেরে॥
তুমি হে প্রাণের প্রাণ প্রাণের ঈশ্বর।
আমার কে আছে আর তোমার উপর॥
তোমার আদরে আমি আদরিণী হই।
মনেতে গরব করি প্রেমাদরে রই॥
তোমার সুখেতে সুখ দুখে দুখ পাই।
তোমা ছাড়া দুখিনীর কেহ আর নাই॥
তুমি হে বাড়াও মান তাই মান করি।
রাখিয়া তোমার মান মানে মান হরি॥
প্রাণ তব গুপ্তভাব জানিব বলিয়া।
ছিলাম মনের ভাব গোপন করিয়া॥
জানিলাম সমুদয় মানিলাম হারি।
চাতুরী করিব কত আমি নিজে নারী॥
ভাবের ভাণ্ডার তুমি প্রধান প্রেমেশ।
চতুরের চূড়ামণি রসিকের শেষ॥

দোষ যদি করে থাকি ছার অভিমানে।
করুণা-কটাক্ষে চাও অধীনীর পানে॥
ছাড় ছাড় ছাড় রোষ কর পরিতোষ।
নিজ গুণে ক্ষমা কর সমুদয় দোষ॥
বেশ করি বেশ করি দেহ পুনর্ব্বার।
খোঁপায় চাঁপার কলি পরাও আমার॥
যেরূপ মনের ভাব বনের ভিতর।
সেইরূপ নাট কর নব নটবর॥
সাজিব তোমার সাজে কি করে হে লাজে।
আপনি সাজায়ে দেও যেখানে যা সাজে॥
তোমার মনের সাধে সাজাও আমারে।
তোমায় সাজাব শুধু প্রেম-হেমহারে॥
অপমান অঙ্গের পরালে অলঙ্কার।
উপমেয় কিছু নাই রূপের তোমার॥
যে দেহে ফুলের ভার সহনীয় নয়।
রতনের আভরণ সে দেহে কি সয়?
ক্ষণকাল প্রাণনাথ স্থির হও হও।
আমার নয়ন-পথে স্থিরভাবে রও॥
কিছুকাল তোমারে হে হৃদয়ে ধরিয়া।
দেখি আজ নয়নের নিমেষ হরিয়া॥
কোনখানে যেয়ো না হে আমায় ছাড়িয়া।
যদি যাও লও তবে সঙ্গিনী করিয়া॥
এই অভিলাষ নাথ আমার অন্তরে।
বাস কর অধীনীর নয়ন-নগরে॥
যথা যাবে তথা যাব ওহে রসরায়।
দাসী হয়ে মেগে মেগে খাবাব তোমায়॥
পান-খয়েরের প্রায় তোমায় আমায়।
উভয় একত্র যোগ কত ভোগ তায়॥
কোটি ভাগে কুটিকুটি যদি করে তায়ে।
তথাচ প্রভেদ কেহ করিতে না পারে॥
কেমন প্রেমের ভাব ভেদ নাহি হয়।
রঙ্গে রঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে মিশাইয়া রয়॥
তুমি আমি সেইরূপ প্রেমনিধি নিয়া।
রঙ্গে রঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে আছি মিশাইয়া॥

মানের নিগূঢ়ভাব কিছু নাহি লয়ে।
তুমি বল রব আমি তোমা ছাড়া হয়ে॥
তোমা ছাড়া আমি হব ভেবনাকো মনে।
যুগের মিলন ছেড়ে বাঁচিব কেমনে?
এখনি প্রমাণ দেখ রঙ্গে খেলে পাশা।
তুমিতো পণ্ডিত বট প্রেমে নও চাষা॥
দেখ হে কাঠের বল যুগে যদি রয়।
কোটি যুগে তার আর নাশ নাহি হয়॥
প্রণয়ের কার্য্য করে যুগে যুগে রয়ে।
ক্ষণকাল নাহি বাঁচে যুগছাড়া হয়ে॥
যুগ ছেড়ে কাটি যদি মরে এইরূপে।
প্রেমের বিচ্ছেদে আমি বাঁচিব কিরূপে?
অতএব হৃদয়েশ আর কেন ছল?
রজনী প্রভাত হয় গৃহে চল চল॥
আঁখি দুটী ঢুলু ঢুলু নিদ্রার আবেশ।
তোমারে ঘুমায়ে আগে ঘুমাইব শেষ॥
গৃহকার্য্য পূজা স্নান করি সমাপন।
তোমায় মনের সাধে করাব ভোজন॥
নায়িকার মুখে শুনি পীযুষবচন।
সন্তোষ পাইয়া সুখী নায়কের মন॥
আদরে প্রিয়ার দেহে হাত দিতে যায়।
রমণী অমনি হেসে ঢলে পড়ে গায়॥
উভয়েই টলটল ঢলঢল কায়।
টলাটলি ঢলাঢলি হইল তথায়॥
কবি কহে প্রণয়ের গলাগলি যথা।
টলাটলি ঢলাঢলি বাকী নাহি তথা॥
হাত মুখ ধুয়ে দোঁহে তটিনীর জলে।
সভ্রমে বসন পরি নিকেতনে চলে॥
করিতে করিতে জপ মহেশী মহেশ।
আলয় আলয় করে আলয়প্রবেশ॥
গৃহিণী আসিয়া দিল গৃহকাজে মন।
গৃহী আসি করিলেন সুখেতে শয়ন॥
এইরূপ প্রেমালাপে প্রেমিকা প্রেমিক।
হরিষে হরিল কাল কি কব অধিক॥

মাধবী মানের পালা অন্ত হল সায়।
বরষায় লেখনী ধরিব পুনরায়॥
সকলি রহিল গুপ্ত গুপ্তের ভবনে।
হবে তাহা আছে যাহা ঈশ্বরের মনে॥
এ রসে যদ্যপি শুনি বিরসের ধ্বনি।
শোব না এ ভাবগৃহে ছোঁবো না লেখনী॥

ভালবাসা।

(বহুদিন পরে নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎ)

প্রথমে যখন হয় প্রেমের মিলন।
মনে কর কি বলিয়া তুষিয়াছ মন?
সেই তুমি সেই আমি সেই এই স্থান।
সুখ যথা করিয়াছে সুখে অবস্থান॥
সেই, সেই, এই সেই, সব বর্ত্তমান।
সেই প্রেম কোথা তবে বল দেখি প্রাণ?
একদিন আশাহীন, হয় নাই আসা।
পুরাতে আশার আশা, সদা ছিল আসা॥
জানায়েছ ভালবাসা মুখের বচনে।
আমি সেই ভালবাসা ভালবাসি মনে॥
আমার বচন মন উভয় সমান।
পরীক্ষায় পাইয়াছ প্রচুর প্রমাণ॥
ভঙ্গীভাবে নাহি দেখে বিশেষ বিরাগ।
আমি তাই ভাবিতাম সুখের সোহাগ॥
কোথা সেই ভাব-ভঙ্গী কোথা অনুরাগ।
বলনা তাদের প্রতি এত কেন রাগ?
ভিন্নভাব ভাবি প্রাণ প্রেমাধীনী-জনে।
রাগ করে ভাগ কেন বসায়েছ মনে?
ভাল ভাল সেও ভাল আমি পড়ি রাগে।
প্রেমের মাথায় বাজ কাজ নাই ভাগে॥
যেমন মনের সাধ কর সেই ক্রিয়া।
মিছে কেন রাগারাগি ভাগাভাগি নিয়া?
প্রলাপের উদয় অন্তরে অহরহ।
আলাপ কেবল করি বিলাপের সহ॥
দুঃখভোগে শ্রান্ত হয়ে ঘুমায়েছে মন।
আর প্রাণ আলাপের নাহি প্রয়োজন॥
বিচ্ছেদেরে বুকে রেখে সুখে প্রাণ আছি।
চোখে মাত্র দেখি শুধু যতদিন বাঁচি॥
বিনিময় বিনা তুমি প্রাণ মন দিয়া।
ভ্রমে আর নাহি হাঁটো এই পথ দিয়া॥
কেমনে হইবে দৃষ্টি আমার উপর।
দণ্ডিরূপে বাঁধা আছ গণ্ডীর ভিতর॥
সাক্ষাৎ পাইব কিসে নাহি পূর্ব্বমত।
আমি কোথা দূরে আছি ভুলিয়াছ পথ॥
বিরহে বিরলে বসি কাঁদি আমি একা।
স্বপনে তোমার সহ শুধু হয় দেখা॥
তাহাতে যেরূপ হয় জানে মাত্র মন।
তুমিও জানিতে পার দেখিলে স্বপন॥
সেরূপ তোমার নয় প্রণয় কপট।
স্বপন গোপন তাই তোমার নিকট।
স্বভাবে আমার ভাবে দেখিলে স্বপন্।
প্রেম-সুধাদানে কেন হইবে কৃপণ?
ভাল ভাল, থাক ভাল আমি তাই চাই।
ভাল ভাল, দেখা হলো, বেঁচে আছি যাই॥
দুখের উপরে দুখ সুখ পুন দুখে।
কি বলে আদর করি বাক্য নাহি মুখে॥
অকস্মাৎ এ কি ভাব চারু দরশন।
বল দেখি এখানেতে কেন আগমন?
বিপরীত দেখে আজ মোহিত হৃদয়।
অপরূপ দিনমণি পশ্চিমে উদয়॥
ক্ষণে ক্ষণে মুখ দেখে হতেছি বিস্ময়।
তুমি কি হে সেই তুমি সেই তুমি নয়॥
ক্ষণে ভাবি আমি বুঝি সেই আমি নই।
ভাবিহে তোমায় তাই সেই তুমি কই॥
এসো এসো এসো প্রাণ যে হও সে হও।
আমি কিন্তু সেই আমি তুমি সেই নও॥
এ ভাবে কি হবে আর মিছে মন ছোলে।
গোলে যেতো মম মন সেই তুমি হলে॥

হও যদি সেই 'তুমি' তুমি বটে সেই।
ফলত তোমাতে আর সেই তুমি নেই॥
সেই মুখ, সেই চোখ, সেই অবয়ব।
পূর্ব্বকার আকার রয়েছে বটে সব॥
স্বরূপে স্বভাবে আছে সমুদয় ভাগ।
আকৃতির অঙ্গে শুধু দেখি এক দাগ॥
এখন তোমায় প্রাণ দেখে মরি রেগে।
সত্য করি বল প্রাণ কে দিয়েছে দেগে?
আছে সর্ব্ব পূর্ব্ববৎ আকার প্রকার।
একমাত্র ভাবান্তর হয়েছে তোমার॥
গেলে গেলে যাও যাও একেবারে গেলে।
পুনরায় কেন প্রাণ দাগা হয়ে এলে?
বেঁধেছি মনের হাতে প্রতিজ্ঞার তাগা।
করিয়াছি এই পণ পুষিব না দাগা॥
এখন কি অন্ধকারে জ্বলে আর আলো?
কাড়াকাড়ি ভালো নয় ছাড়াছাড়ি ভালো॥

প্রীতিবিষয়ক প্রশ্নোত্তর।

প্রশ্ন।

বলনা বলনা প্রাণ ললিত-নয়নি।
নলিনী মলিনী কেন করে সে রজনী?

উত্তর।

যেরূপ স্বভাব যার সে চায় সে রূপ।
শক্তির বিস্তার করে করিতে স্বরূপ॥
তিমিরে ত্রিলোক পূর্ণ, পূর্ণ করে যেই।
তামরসে তমোরাশি দান করে সেই॥

প্রশ্ন।

অবণা অসিতবর্ণা নিশা যদি করে।
তবে যে কুমুদী রাজে রজত-নিকরে?

উত্তর।

সময়েতে হয় যারে বন্ধু অনুকূল।
কি করিতে পারে তারে শত্রু প্রতিকূল?
কুমুদ-বান্ধব ইন্দু পূর্ণালোকময়।
তিমিরারি আশ্রিত তিমিরে নাহি ভয়॥

প্রশ্ন।

কোথা সেই ইন্দু-বন্ধু দিবা আগমনে।
মুদিত কুমুদী-ছবি রবির কিরণে॥

উত্তর।

উপযুক্ত প্রতিযোগী মান যদি হরে।
মানী তাহে মনে মনে ক্ষোভ নাহি করে॥
শশী, সূর্য্যে ভেদ বহু, ভাবি মনে মনে।
কুমুদী মুদিত হয়ে দুখ নাহি গণে॥

প্রশ্ন।

কুমুদিনী, কমলিনী, নায়ক বিপক্ষ।
এর মধ্যে বল দেখি শ্রেষ্ঠ কার স্নখ্য?

উত্তর।

শ্রেষ্ঠ গুণ তার, যার, স্বভাব সরল।
সে নহে উত্তম যার হৃদয়ে গরল॥
সুশীতল সুধাকর নায়ক-প্রধান।
কৃষাণু পূরিত ভানু কৃতান্ত সমান॥

প্রশ্ন।

নলিনীনায়ক যদি, নায়ক অধম।
পদ্ম তবে কেন তারে ভাবে প্রিয়তম?

উত্তর।

সমানে সমানে যদি মিলন উপজে।
উভয়ের মন তবে প্রেমরসে মজে॥
লজ্জাহানা কমলিনী পূর্ণ অহঙ্কারে।
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-কর ভাল লাগে তারে॥

প্রশ্ন।

নলিনীর লজ্জা নাই কিরূপে জানিলে।
রূপ-গর্ব্বে গর্ব্বিত সে কিরূপে মানিলে?

উত্তর।

মুখের ভঙ্গিমা দেখি মন জানা যায়।
কে ভাল কে মন্দ লোক পরিচিত তায়॥
বিশেষ পদ্মিনী ফুটে প্রভাত-প্রহরে।
পতি চক্ষে ধূলি দিয়া উপপতি করে॥

প্রশ্ন।

কলানাথ কুমুদের প্রেম কি কারণ ?
উত্তম নামেতে খ্যাত বল কি কারণ ?

উত্তর।

উত্তম প্রণয়ী বলি ব্যাখ্যা করি তারে।
বিচ্ছেদে বিচ্ছেদ-ক্লেশ নাহি হয় যারে॥
অমা-আগমনে সুধাকর না প্রকাশে।
তথাপিও কুমুদিনী সুখরসে ভাসে॥

প্রশ্ন।

শশী অনুদয়ে বল নিশি কি কারণ।
কুমুদীর ক্লেশকরী না হয় কখন ?

উত্তর।

প্রবল বিপক্ষ যদি স্থানান্তর হয়।
কার সাধ্য তাহার অধীনে করে জয় ?
কল্লান্তর কলানাথ হইলে অন্তর।
নিত্য কুমুদীর হবে প্রফুল্ল অন্তর॥

প্রশ্ন।

বল দেখি প্রিয়তমে করিয়া বিচার।
নায়িকার শ্রেষ্ঠগুণ কাহাতে সঞ্চার ?

উত্তর।

লজ্জাবতী যে যুবতী উত্তমা সে হয়।
সেইমাত্র জানে সত্য কিরূপ প্রণয়॥
লজ্জিতা প্রেমদা সহ কুমুদী উপমা।
লজ্জাহীনা পঙ্কজিনী নায়িকা-অধমা।

প্রণয়-গর্ব্ব মান।

এসো এসো এসো প্রাণ বসো এইখানে।
'ভাল আছি' বল মুখে শুনি তাই কাণে॥
ভাল ভাল ভালবাসো না বাসো আমায়।
তুমি যদি ভাল থাক ভাল থাকি তায়॥
ভাবেতে জানাও যেন ভালবাস কত।
কেমনে সে ভাব তব হব অবগত ?
ফলেতে কিরূপে তুমি লুকাবে স্বভাব ?
ভাবেতেই বুঝা যায় ভিতরের ভাব॥
অন্তর হয়েছে তুমি অন্তরেতে থেকে।
সকলি বুঝিতে পারি মুখখানি দেখে॥
হাসি হাসি মুখখানি তাহে কত ঠাট।
হাসির ভিতরে আছে ফাঁকির কপাট॥
আজ তুমি যদি সেই প্রেমছাঁদ ছেঁদে।
থেকে থেকে দেখে কেন প্রাণ উঠে কেঁদে
রাখিব তোমায় আর কেমন করিয়া ?
বোধ হয় উড়ে যাবে শিকল কাটিয়া॥
এত কোরে পুষিলাম না মানিলে পোষ।
জানিলাম সে আমার কপালের দোষ॥

হাসি হাসি মুখ।

(নায়িকার উক্তি)

আপন মনের ভাব গোপন করিয়া।
প্রতিদিন থাক তুমি মলিন হইয়া॥
একবার মুখখানি না হয় সরস।
যখন চাহিয়া দেখি তখনি বিরস॥
এইরূপ ভাবভরে থাক প্রতিক্ষণ।
কে যেন সর্ব্বস্ব ধন করেছে হরণ॥
সুধাইলে কোন কথা সদয় না হও।
আপনার ভাবে তুমি নীরবেই রও॥
অকস্মাৎ এ কি দেখি সবিশেষ কও।
আর যেন সেই তুমি সেই তুমি নও॥
এই ছিলে অধোমুখে পেয়ে ঘোর দুখ।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ॥
কি ভাব কি ভাব মনে ভেবে বোঝা ভার।
ছিল না স্বভাব তব স্বভাবে সঞ্চার॥
দেখিয়া তোমার ভাব ভাবিতাম মনে।
এ ভাবের ভাবান্তর হইবে কেমনে ?
আচম্বিতে দেখি প্রাণ সে ভাবে অভাব।
আর এক অপরূপ ভাবের প্রভাব॥
তব ভাব, নব ভাব ভাবিবার নয়।
অনুভাব করে ভাব সাধ্য কার হয় ?

ভাবের ভাবুক তুমি বুঝিয়াছি ভাবে।
যে ভাবে এ ভাব তব সে ভাব কে পাবে?
কি ভাব উঠেছে মনে কিসে এত সুখ?
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ?
ছিলাম চোখের বালি আমি হে তোমার
আমায় দেখিতে হতো মুখ ভার ভার॥
একবার সুনয়নে দেখনি আমায়।
ফুলিয়া উঠিতে রাগে আমার কথায়॥
কহিতাম যত কথা হইয়া সরল।
গুমুরে গুমুরে তুমি কাঁপিতে কেবল॥
বিষ্ বিষ্ বোধ হতো হাত দিতে কাণে।
ফুটে কিছু বলিতে না জলিতে হে প্রাণে॥
হঠাৎ যে সে ভাবে কেন হলো ভাবান্তর?
গদগদ ভাব যেন মনের ভিতর॥
কিসে মন খুলিয়াছে ফুলিয়াছে বুক।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ?
সাধিতাম, কাঁদিতাম পড়িয়া ধূলায়।
কতরূপ করিতাম ধরিতাম পায়॥
প্রেমের প্রমোদে তুমি ভাবিতে প্রমাদ।
রিষ্ কোরে বিষ্ খেতে মনে হতো সাধ॥
ছোঁও না আমায় তুমি কাছে যাই যদি।
ভাবিয়াছ আমি যেন কর্ম্মনাশা নদী॥
চোখোচোখি হলে পরে মুখে দিয়ে বাড়্।
চোখ্ বুজে থাকিতে হে নোয়াইয়ে ঘাড়্॥
কাছ থেকে সোরে গেলে ফেলিতে নিশ্বাস॥
লাগিত তোমার যেন হাড়েতে বাতাস॥
এখন্ দেখিনে কেন সে সব অসুখ?
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ?
বিরলে একেলা যদি দেখিতে আমায়।
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন পড়িত মাথায়॥
দিশেহারা হয়ে যেতে চলিত না রথ।
খুঁজে আর নাহি পেতে পালাবার পথ॥
মনোদুখে কিছুদিন দূরে গেলে পর।
রাম বোলে বাম দিয়ে ছেড়ে যেতো জ্বর॥
হইতে তোমার তুমি যেন যেতে ভুলে।
উঠিত সুখের সিন্ধু আপনি উথুলে॥
পাপ ভেবে, শাপ দিতে সকল সময়।
আমি পাছে, আসি কাছে হতো এই ভয়॥
ভয়েতে করিত সদা প্রাণ ধুক্ ধুক্।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ?
আজ আমি কোন্ ঘাটে ধুয়েছি হে মুখ?
দূরে গেল এতদিনে চিরকেলে দুখ॥
প্রভাতে পশ্চিমে হলো রবির প্রকাশ।
শীতকালে আচম্বিতে দক্ষিণে বাতাস॥
অঘট ঘটনা, এ যে যা হবার নয়।
আমার নিশিতে হলো শশীর উদয়॥
এখনো মনের ভাব করনি প্রকাশ।
ইঙ্গিভাবে দেখাতেছ মুখের আভাস॥
হাসি হাসি দেখিলাম বদন তোমার।
সাপের মুখেতে যেন সুধার ভাণ্ডার॥
হইল আমার তায় পাঁচ হাত বুক।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ?
তোমার মনের নদী ছিল একটান্।
আজ কেন তায় ঢেউ বহিছে উজান?
খাঁটি হয়ে, ভাঁটি স্রোত খেলিত স্বভাবে।
সে টান কি ফিরে গেল বায়ুর প্রভাবে?
বল বল, কার কাছে শিখে এলে রস।
বিরস বদন কেন হইল সরস?
কি টানে হইল প্রাণ এ টান তোমার?
কি রসে হইল এই রসের সঞ্চার?
টানাটানি ঘোচে যদি তবে বুঝি টান।
স্বরসের রসে জানি রসিক-প্রধান॥
বিনা মেঘে পড়ে জল এ বড় কৌতুক।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ?
কে বলে রসিক নও? রসের সাগর।
জানিলাম তুমি প্রাণ রসিক নাগর।
আমি তার পরিচয় পাইলাম সবে।
রসবোধ না থাকিলে এত কেন হবে?

ঘরে এলে মুখ যেন সেই মুখ নয়।
বাহিরেতে কত রস ছড়াছড়ি হয়॥
বাঁকামুখ নহে আজ সরস অন্তর।
এনেছ পরের রস ঘরের ভিতর॥
সময়েতে "সাজো রস" করিয়া গোপন।
কার "এঁটো" রস এনে দেখাও এখন?
"এঁটোরসে, চেটো" নই দেব না চুমুক।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ?
জানাতেছ, অযাচক ভিখারীর ভাব।
হাটে পোড়ে, লুটে খাও এমনি স্বভাব॥
ঠাট্ দেখে, কাট্ হয়ে আছি আমি একা।
রাখিয়াছ চোখে চোখে চোখে নাই দেখা॥
হয়েছ হাটের নেড়া হুজুক্‌তো চাই।
ঠাটের ঠাকুর বট নাটের গোঁসাই॥
বঙ্গায় রেখেছ ঠাট্ হয়ে ছাড়াছাড়ি।
আছ ভাল ঠাটে ঠাটে হাটে ভেঙে হাঁড়ি॥
আগে যদি জানিতাম এত বাড়াবাড়ি।
তবে কি তোমারে আর কোনমতে ছাড়ি?
করি নাই আত্মসার আমারি সে চুক্।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ?
প্রাণ তুমি আপনি হে নহ আপনার।
কেমন করিয়া তুমি হইবে আমার?
পররসে পরবসে সদা পরাধীন।
তবে তো আমার হতে হইলে স্বাধীন॥
তোমা হতে দুখিনীর সুখ যা হবার।
সমুদয় হয়ে বোয়ে গিয়েছে আমার॥
সময়েতে এক দিন না হইলে বশ।
রসময় অসময় দেখাতেছ রস॥
আমাতে কি আমি আছ আমি হে কি আছি।
এখনি কি ভুলি ঠাটে ঘাটে গেলে বাঁচি॥
বাঁচিবার সাধ আর নাহি একটুক্।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ?
ঠিক যেন ধর্ম্মশীল বকের মতন।
কত দিন প্রাণ তুমি হয়েছ এমন?

বাহিরের ভাব যেন নব-ভেকধারী।
ভিতরের ভাব কিছু বুঝিতে না পারি॥
কপটে কৌশল হেন করেছ ধারণ।
ভোলা ভোলা ভাব যেন খোলা খোলা মন॥
এখন কি করে আর হলে মন-খোলা।
বিদায় করেছ আগে হাতে দিয়ে খোলা॥
আর যেন নাহি লাগে তোমার বাতাস।
ফেলেছি ঘাড়ের বোঝা হয়েছি খালাস।
একেবারে পড়িয়াছে পীরিতের ভুক্।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ?
পায়ে কত পড়িয়াছি দাঁতে কোরে কুটে
সাঁচ্চা-ধন লুকাইয়ে দেখাইলে ঝুঁটো॥
কাঁচাকালে কচি ফল হয়ে গেল সুটো।
মনের আগুনে জ্বলি বলি অই ছুটো॥
দেখাতেছ নবরাগ বিরাগে কি রাগে?
দিতেছ আগায় জল গোড়া কেটে আগে॥
রজকের লাভ কোথা উলঙ্গের কাছে?
কাটা গাছে জল দিয়ে ফল কিবা আছে?
আপনি ভেঙেছ মন উপায় কি তার।
ভাঙামন কখনো কি গোড়ে থাকে আর?
কাটা গোড়া দিবে জোড়া কে শিখালে তুক্?
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ?
কিছুতে না হয় আর মানের বিকার।
মান আর অপমান সমান আমার॥
আছে দেহ নাহি প্রাণ হয়ে আছি শব।
যত তুমি জ্বালাইবে শবে সবে সব॥
সবিশেষ পেয়েছি হে প্রেম পরিচয়।
প্রাণ আমি বিষকৃমি বিষে নাই ভয়॥
হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়াছে বিচ্ছেদের বাণ॥
সমুদয় সহ্য করে হয়েছি পাষাণ॥
ভোগা মেরে দাগা দিলে সাধের সময়।
জাগাঘরে চুরি আর এখন কি হয়?
সমভাবে ভোগ করি সুখ আর দুখ।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ?

নিবেছে আমার প্রাণ অদৃষ্টের আলো।
তুমি যাতে ভাল থাকো সেই ভালো ভালো॥
তোমারে বিশেষরূপে বুঝাব কি বোলে?
স্বভাবের দোষ কভু নাহি যায় মোলে॥
সন্ন্যাসী হইয়া তুমি যদি শেখ যোগ।
তথাচ যাবে না প্রাণ তুম্বনাড়া রোগ॥
কোন্‌খানে মন রেখে এখানেতে এলে?
কাঁচেতে যতন কেন কাঁচাসোণা ফেলে?
যাও যাও তার কাছে বাঁধা যার ভাবে।
সে ধনী এ ধ্বনি শুনে প্রমাদ ঘটাবে॥
দেখিবে না ও মুখ সে তোমার "ওমুক"
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ?
ছমাসে নমাসে নাহি পাই দরশন।
হলে তুমি রাহুগ্রস্ত চাঁদের মতন॥
বলিবার কথা নয় হায় হায় হায়!
সর্ব্বনাশী সর্ব্বগ্রাসী করেছে তোমায়॥
কেমন গ্রহণ এই একভাবে রও।
রাহুমুখে যুক্ত সদা মুক্ত নাহি হও॥
আমি আছি দিবা-নিশি এক ধ্যান ধোরে।
মুক্তি দেখে মুক্তি পাই মুক্তিস্নান কোরে॥
আমার কপাল পোড়া দৃষ্টিপোড়া বিষে।
একবার মুক্ত নহ মুক্ত হব কিসে?
কি জানি কেমন কোরে সে করেছে তুক্।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ?

———

নায়কের উত্তর।

(বাঁকা মুখ কবে?)

বড় যে মধুর ধ্বনি শুনি আজ ধনি!
একেবারে খুলিয়াছ অমৃতের খনি॥
স্বভাবে সমান আছে আমার স্বভাব।
আপনার ভাবে তুমি ভাবিছ অভাব॥
সেই আমি সেই আছি আছে সেই ভাব।
একদিন নাহি হয় ভাবের অভাব॥
যখন তোমার দেখে যে ভাবের ভাব
সেই ভাবে ভাব ধরে আমার স্বভাব॥
ভাবিলেই ভাবে হয় ভাবের উদয়।
পুরাতন এক ভাব নূতনতো নয়॥
দেখিলে তোমার ভাব ভাব পাই তবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে?
রসবতী নাম ধর কোথা সেই রস?
বুঝিতে না পারি প্রাণ সরস বিরস॥
রসের আকরে এসে পাই নাই রস।
সাধ কোরে এতদিন ছিলাম বিরস॥
কৃপণ তোমার মত কেবা আছে আর?
গোপন করিয়াছিলে, আপন ভাণ্ডার॥
সময়েতে এক ফোঁটা কর নাই দান।
বক্ষে কোরে, রক্ষে কর যক্ষের সমান॥
হয় নি তোমার কাছে রসের ব্যাপার।
কি রসে রসিক হব কি আছে আমার?
নূতন রসের কথা শুনিতেছি সবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকা মুখ কবে?
যাহার যেমন ভাব লাভ সে প্রকার।
সেই সব বাঁকা দেখে বাঁকা মন যার॥
নিজ ভাবে তুমি প্রাণ সোজা যদি হতে।
সোজা-পথে চোলে তবে সোজা কথা কোতে॥
সোজা-ভাব, বোঝা প্রাণ সহজেই হয়।
বাঁকা ভাব, বাঁকা বড় বুঝিবার নয়॥
ভিতরের ভাব কিছু নাহি যায় বোঝা।
অথচ জানাও তুমি যেন কত সোজা॥
ললনা তোমার কাছে ছলনা কি খাটে?
আমি খাই ভাঁড়ে জল তুমি খাও ঘাটে॥
ছল্ কোরে, বল্ কোরে দুটো কথা কবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে?
ভিতর বাহির সদা সমান আমার।
মুখে এক, মনে আর স্বভাব তোমার॥
দিয়েছ কথার ভাগা বদনের হাটে।
মুখোমুখি কোরে প্রাণ ও মুখে কে আঁটে॥

বচনের বলিহারি হারি হইয়াছে।
সমুখে কি যেতে পারি ও মুখের কাছে?
আমার হয়েছে প্রাণ হিতে বিপরীত।
কোঁদল করিয়া, সেধে কেঁদে কর জিত?
তোমার কলের আঁখি জলের আধার।
সে জলের মধ্যে কত ছলের ব্যাপার॥
কেঁদে যদি জিতে যাও কে পারিবে তবে?
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে?
সকলি আমায় দোষ দোষী আমি একা।
তুমি কিছু জাননাকো হতে চাও নেকা॥
ভাজা ভাজা করিতেছে হাড় হলো কালী।
এক হাতে কখনো কি বেজে থাকে তালি?
ভালরূপে জানিয়াছি ভাল ব্যবহার।
মিছে তুমি সতীপানা জানায়ো না আর॥
আমায় কিনেছি আমি চিনেছি তোমারে।
ব্যবহার শিখাইলে বিনা ব্যবহারে॥
মনের গোচর সব যার যত পাপ।
যার মনে যত ছল তার তত তাপ॥
এখন সে সব কথা লুকালে কি হবে?
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে?
কিছুতে নারীর মন নাহি হয় বশ।
রমণীর কাছে নাই পুরুষের যশ॥
আপনি করিয়া চুরি সাধু হয়ে রও।
তোমার জেতের দোষ তুমি বোলে নও॥
সব দিকে বড় নারী স্বভাবে সবলা।
হায় হায়! কামিনীরে কে বলে অবলা?
মাখিয়া মধুর ছিটে মুখের উপরে।
নাকে কেঁদে কথা কোয়ে মাথা খুঁড়ে মরে॥
পেটের ভিতরে বিষ নাহি জানে কেউ।
নিরন্তর খেলিতেছে সাগরের ঢেউ॥
দেখে দেখে ঠেকে শিখে রয়েছি নীরবে
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে?
যদি কেউ গুণে থাকে সাগরের ঢেউ।
পৃথিবীর সীমা যদি পেয়ে থাকে কেউ॥
যদি কেউ কোরে থাকে বাতাস বন্ধন।
যদি কেউ কোরে থাকে আকাশ খণ্ডন॥
নিরূপণ যদি করে আকাশের তারা।
নিরূপণ যদি করে জলদের ধারা॥
এইরূপে যার চেয়ে যোগ্য আর নেই।
নারীভাব-নিরূপণে পরাভব সেই॥
এমন কি আছে কেউ রমণীরমণ?
স্থিরভাবে সে পেয়েছে রমণীর মন?
তোমার ও রবে প্রাণ নিকটে কে রবে?
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে?
মনের ভিতরে যার গরিমা-গরল।
সে নারী কেমনে হবে স্বভাবে সরল?
দাসখত লিখে দিয়া পড়ে যদি পায়।
তথাচ নারীর মন পুরুষে কি পায়?
শিকের উপরে কোথা মন আছে তোলা।
কৌশলে কহিছ কথা মনতোলা ভোলা॥
তোলামনে কহিতেছে কত মনভোলা।
কিসে হবে খোলা মন কিসে হব ভোলা?
খোলাখুলি কোরে কত লুটিয়াছি তুমি।
একদিন খোলাখুলি করিলে না তুমি॥
অধর্ম্মের কথা কোলে ধর্ম্মে নাহি সবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে?
রাগ, দ্বেষ অভিমান আর অহঙ্কার।
এখনো রয়েছে যারা শরীরে তোমার॥
সকলেই বলবান্ খাটো কেহ নয়।
সকল সময়ে তারা করিছে প্রলয়॥
ছলনা, চাতুরী, আর কপটতা ভাব।
প্রকাশে তোমার মনে প্রবল প্রভাব॥
যদ্যপি যৌবনকাল বিদায় হয়েছে।
তথাচ সে ঠাটখানি বজায় রয়েছে॥
আছে সেই সমুদয় পূর্ব্বকার ভাব।
ফেরেনি ঠমক্-ঠাট ফেরেনি স্বভাব॥
তাদের জিজ্ঞাসা কর সাক্ষী দেবে সবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে?

এখন এ অহঙ্কার দেখাতেছ কারে ?
আপনার দোষে তুমি গেলে ছারেখারে ॥
মনে কর কি করেছ যৌবনসময় ?
সে দিনের কথা সেতো বহুদিন নয় ॥
যৌবনের গরবেতে গরবিণী হয়ে।
সাপিনীর সম ছিলে ফোঁস্-ফাঁস্ লয়ে ॥
ঠিকুরে ঠিকুরে উঠে ঠ্যাকারে ঠ্যাকারে।
কতদিন কত কথা বলেছ আমারে ॥
মধুমুখে বঁধু বোলে তোষ নি আমায়।
রজনীতে শুধুমুখে দিয়েছ বিদায় ॥
মরি কিছু জাননাকো তবে তবে তবে ?
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ করে ?
ছুতো-নতা খুঁজে খুঁজে কাল হলো গত।
একখানা নিয়ে কর ব্যাক্‌খানা কত ॥
না এলেতো রক্ষা নাই কত কথা ওঠে।
মেদিনী ফাটিয়া যায় বকুনীর চোটে ॥
বকুনী তখুনি গেলে পেতাম নিস্তার।
মুখ দিয়ে পোকা পড়ে থামেনাকো আর ॥
পাড়াপাড়া ছুটে ছুটে কর তোলপাড়্।
পোড়াও আপন দোষে আপনার হাড় ॥
যামিনীতে যে সময়ে নিদ্রা যাও প্রিয়ে।
তখন কোঁদল রাখো ধামা-চাপা দিয়ে ॥
উচ্চ হয়ে কুচ্ছ গেয়ে তুচ্ছ কর ধবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ করে ?
এলে পরে ঘর হতে আমায় দেখিয়া।
ঢুকিয়া ঘরের কোণে বোসে থাকো গিয়া ॥
সাধ কোরে কর তুমি মিছে অভিমান।
বসনেতে ঢেকে রাখো কৃত্রিম-বয়ান ॥
আশা কোরে আসি আমি তুমি মর রিষে।
এসে যদি আশা যায় আসা যায় কিসে ?
কলহের কল্পতরু বটে তুমি বটে।
পেয়েছি কুফল কত তোমার নিকটে ॥
ছাঁদো ছাঁদো কথা শুনে মনের অসুখে।
কেবল গিয়েছি ফিরে কাঁদো কাঁদো-মুখে ॥

কথার ধমকে প্রাণ কেঁপে ওঠে শবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ করে ?
মুখের বচন নয় সুখের প্রণয়।
দুজন দুখন হলে তবে প্রেম হয় ॥
প্রণয়িনী নাম নাই প্রণয় তোমার।
পরিহার করিয়াছ প্রেম-হেমহার ॥
আপনি বিচ্ছেদ কোরে ঘুচালে প্রণয়।
এখন দেখাও কারে বিচ্ছেদের ভয় ?
আমার স্বভাব নয় তোমার মতন।
কেনা হয়ে থাকি তার যে ক. া র চন ॥
সরল হইলে সাপ বুকে তারে ধরি।
তার মুখে মুখ দিয়া বিষ পান করি ॥
যে হয় দুখের দুখী দুখ সেই লবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাকামুখ করে ?
হাসি হাসি মুখখানি দেখিছ আমার।
হাসির ভিতরে আছে হাসির ব্যাপার ॥
মনেতে রোদন কোরে দুঃখনীরে ভাসি।
এ যে হাসি হা স নয় চড়ুকীর হাসি ॥
নবভাবে কেন দিব নব পরিচয় ?
এই ভাব ভব ভাব নবভাব নয় ॥
গরবের ধন ছিল যৌবন তোমার।
সে ধন ফুরায়ে গেল কিছু নাই আর ॥
সময়েতে কল্পিলে না প্রিয় ব্যবহার।
এখন ধরেছ ভাব কিরূপ প্রকার ?
মন তার সমুদয় পরিচয় লবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ করে ?
হাতে কোরে একদিন করিলে না দান।
বচনেতে একদিন রাখিলে না মান ॥
বিফলে বৃথায় গেল সাধের যৌবন।
এইরূপে নষ্ট হয় কৃপণের ধন ॥
এলো না যৌবন-ধন আমার ব্যাভারে।
চুপি চুপি যদি কিছু দিয়ে থাকো কারে ॥
সে বিষয় নহে প্রাণ আমার গোচর।
তুমি জান ধর্ম্ম জানে জানেন ঈশ্বর ॥

আমার ভোগের ধন হলো না আমার।
এর চেয়ে মনোদুখ কিছু নাই আর॥
সুধা দিয়ে সুধালে না ক্ষুধা ছিল যবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে?
মাথার ঘায়েতে তুমি হয়েছ পাগল।
দায়ে পোড়ে গায়ে পোড়ে করিছ কোঁদল॥
ঢোল্ মেরে গোল কোরে ছাড়িতেছ বোল।
গোলেমালে আমি কেন দিব হরিবোল?
হরিবোল বলিবার সময় এ বটে।
পরিণামে হরিনাম শাস্ত্রে এই রটে॥
সেতো বড় সোজা নয় কঠিন ব্যাপার।
মোচন করিতে হয় মনের বিকার॥
পর-প্রেম-পীযূষের স্বাদ যেই পায়।
সার ফেলে ছার প্রেমে সে কি আর চায়?
হাবাতের কপালেতে সে সুখ কি হবে?
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাকামুখ কবে?

(মনের খেদ মনেই আমার)

হরি হরি মরি মরি করি বিবেচনা।
হায় হায় বিধাতার এ কি বিড়ম্বনা॥
সুধাময় সরলতা ভাব নাহি ধরে।
যুবতী যৌবন-মদে অভিমানে মরে॥
ভাবে মনে যৌবনের হবে না সংহার।
কালের কর্ত্তব্য যাহা করে না বিচার॥
আহা আহা কারে কব মনের এ ধোঁকা।
গাছ পাকা থাস্ আঁবে ধরিয়াছে পোকা॥
সাট্ মেরে কাট্ হোয়ে করে কত ঠাট।
ভোলে না প্রেমীর প্রেমে খোলে না কপাট॥
সময়েতে নাহি করে প্রিয় ব্যবহার।
রহিল মনের খেদ মনেই আমার॥
কারে বলি আর বল কারে বলি আর?
রহিল মনের খেদ মনেই আমার॥
যতদিন থাকে তার যৌবনের রস।
ততদিন নাহি হয় পুরুষের বশ॥
রসবোধ নাহি হয় রসের সময়।
সরস অন্তরে কভু করে না প্রণয়॥
তখন তাহার মন এমনি কঠিন।
কোনমতে নাহি হয় প্রেমের অধীন॥
যুবতী যৌবনে যদি পীরিতি জানিতো?
পুরুষের মনে তবে কি সুখ হইতো?
সে সুখ কেমন সুখ জানাব কি বোলে?
যেতেম আপন ভাবে আপনিই গোলে॥
বুকের বিষয় নহে মুখে বলিবার।
রহিল মনের খেদ মনেই আমার॥
যৌবন-জলধি-জল শুকায় যখন।
তখন সরল হয় রমণীর মন॥
সময়ে এ ভাব হলে হইত যেমন।
অসময়ে ততখানি হয় কি তেমন?
স্বভাবের দোষ এই দোষ দিব কার?
রহিল মনের খেদ মনেই আমার॥
কারে বলি আর বল কারে বলি আর?
রহিল মনের খেদ মনেই আমার॥
কহিলাম যত কথা হয় কি না হয়॥
মনে মনে বুঝে দেখ মিছে কিছু নয়॥
বল বল যত পারো বোলে লও রাগে।
তোমার ভূতের ঢেলা গায়ে নাহি লাগে॥
আমার সকল কথা ফুরাইল প্রিয়ে!
মিছে কেন চড় খাই রাড় ঘেঁটাইয়ে?
এখনো হলো না প্রাণ সরল প্রণয়।
সমান স্বভাবে গেল সকল সময়॥
আর ছার পীরিতের সাধ কিছু নাই।
ঈশ্বর জুড়ান যদি তবেই জুড়াই।
গুপ্ত প্রেম গুপ্ত থাক ফুটিব না আর।
রহিল মনের খেদ মনেই আমার॥
কারে বলি আর বল কারে বলি আর?
রহিল মনের খেদ মনেই আমার॥

বিবিধ।

ঝড়।

(২ রা জ্যৈষ্ঠ, ১২৫৯ সাল।)

জগতের আয়ু তুমি, বায়ু নাম ধর।
বায়ু রোধ করি শেষ, আয়ু-বায়ু হর॥
ভূতের প্রধান তুমি ভূতরাজ নাম।
জল স্থল অনল, আকাশ তব ধাম॥
জলের জীবন নাম, নাম মাত্র সার।
তুমি কর জীবনের জীবন-সঞ্চার॥
আগুনে কি গুণ আছে দীপ্তি কোথা তার?
তুমি তার সখা বলে করে অহঙ্কার॥
প্রতিভা প্রকাশ তার, তোমায় পাইলে।
অনল সলিল হতো, তুমি না থাকিলে॥
ক্ষিতির যে খ্যাতি কিছু সুযশ সৌরভ।
সে কেবল আপনার গুণের গৌরব॥
ধরা ধরে হৃদয়েতে, বস্তু যত যত।
তোমার করুণা বিনা, সব হয় হত॥
স্থাবর জঙ্গম, জীব জন্তু সমুদয়।
তোমার চালন বিনা পালন কি হয়?
একবার ধর যদি বিপরীত রীতি॥
কোথা থাকে ক্ষিতি তার, কোথা থাকে স্থিতি?
আকাশের শোভা শুধু তোমার কারণ
যতনে তোমারে তাই করেছে ধারণ॥
স্থলে জলে ঘটে ঘটে থাকিয়া আকাশ।
তোমারে হৃদয়ে ধরি বাড়ায় উল্লাস॥
মৃত্তিকার গন্ধ গুণ তোমার কৃপায়।
ভাল মন্দ গন্ধ সব নাসাপথে ধায়॥
পদার্থের দোষ-গুণ ঘ্রাণেতে জানিয়া।
উত্তম গ্রহণ করি অধম ছাড়িয়া॥
আপন স্বরূপ তুমি আপন স্বরূপ।
বিচিত্রবায়ুর গতি অতি অপরূপ॥
নিরাকারে চলিতেছ ভয়ঙ্কর চেলে।
না জানি কি হতো আর হস্ত পদ পেলে॥
এই চলি এই বলি চলাবলা যত।
কল বল সকল তোমার হস্তগত।
তুমি না চালালে নাই চলিবার কল।
তুমি না বলালে নাই বলিবার বল॥
কলেরে বিকল করি দেহ কর মাটী।
সকল কলের কল তুমি কলকাঠী॥
এ কলে এ কলকাঠী যে জন চালায়।
সাধু সাধু সাধু রে প্রণাম তাঁর পায়॥
প্রণিপাত তোমারে হে প্রতাপী পবন।
ভবমাঝে তব সম আছে কোন্ জন?
কখন্ কি ভাবে থাক বুঝে উঠা ভার।
ত্রিভুবন জয় করে বিক্রম তোমার॥
বানরের পিতে তুমি অনলের মিতে।
ক্ষণমাত্রে পার সব রসাতলে দিতে॥
উগ্রভাবে একবার হইলে উদয়।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে ঠেকাঠেকি হয়॥
ত্রিভুবন রেখে দেও এক ঠাঁই করে।
রবি শশী পড়ে খ'সে তারা যায় ঝোরে॥
আকাশের চাল ভেঙ্গে পাতালেতে চালো।
পাতালের জল তুলে আকাশেতে ঢালো॥
ইন্দ্রধাম উপাড়িয়া ফেলো নাগপুরে।
নাগপুর ইন্দ্রধামে শূন্যে উঠে ঘুরে॥
নীচু গিয়ে উঁচু উঠে উঁচু পড়ে নীচে।
মাঝে থেকে মাঝখান সরে আগে পিছে॥
স্থিরমূর্ত্তি ধরি তুমি থাক যে সময়।
সে সময়ে স্থিরভাবে থাকে সমুদয়॥
চরাচরে স্বভাব স্বভাব ভাল ধরে।
পেঙ্গ শিব যত জীব গুণগান করে॥
মনে কর কি করেছ গত শুক্রবারে।
হুলস্থূল বাধায়েছ অখিল সংসারে॥

একৈ সবে বায়ু বোলে হারায়েছে দিশে।
তাহে বায়ু বায়ুগ্রস্ত রক্ষা আর কিসে ?
কাণ পেতে সমীরণ শুন শুন সব।
চারিদিকে হইতেছে কত কলরব ॥
বাগানেতে দেখিয়াছি গাছে নিচু নিচু।
এখন সে নিচু মাঠ নাহি আর কিছু ॥
পুত্র তব লঙ্কাপুরে বিস্তারিয়া গ্রাস।
রাবণের মধুবন করেছিল নাশ ॥
তুমি তার বাপ বটে ধর বহু বল ॥
কটাক্ষে করিলে শেষ সব মধুফল ॥
তোমারে সাবাসি আছে গুণে নাই ঘাটি।
এত খেয়ে গলদেশে বাধে নাই আটি ॥
খেলে খেলে আব খেলে ক্ষুধা ছিল যেন।
ছোট বড় গাছ সব পেটে দিলে কেন ?
বংশ সহ বংশনাশ করিয়াছ তুমি।
বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়া করেছ সমভূমি ॥
উদরে পূরেছ কত সাই সাই হাঁকে।
কাকের করেছ শেষ বাকী আর কাকে ?
মেষ খেলে অজা খেলে মজা দেখি এতো।
কেমনে খাইলে কাক সে যে বড় তেতো ?
পেটের জ্বালায় খেলে হাতী ঘোড়া সাপ।
হারায়েছ হিঁদুয়ানী ছুলে হয় পাপী ॥
ঘর খাও দ্বার খাও খাও তরী তরু।
পবন যবন হলে খাইয়াছ গরু ॥
এ পাপে তোমার কি হে জাতি আর আছে ?
গঙ্গনা খাইতে হবে অঙ্গনার কাছে ॥
যখন হেদোর জলে করিয়াছ স্নান।
কুইন্স কালেজে গিয়া পাইয়াছ স্থান ॥
ইস্কুলের ঘরে ঢুকে করেছ ভ্রমণ।
ছুঁয়েছিলে ওগেল্‌বীর খানার বাসন ॥
তখনি জেনেছি মনে ঘটিয়াছে দায়।
বাতাস লেগেছে তার বাতাসের গায় ॥
সে বাতাসে বাতাসের ধর্ম্ম হলো নাশ।
খ্রীষ্টান হইয়া বায়ু খাইলে গোমাস ॥
এই ভয় বানরী সে নেবে কি না ঘরে।
ফলে তুমি তেজীয়ান্ দোষ কেবা ধরে ?
জগতের প্রাণ হয়ে প্রাণের বাতাস।
জগতের করিয়াছ কত সর্ব্বনাশ ॥
সমভূমি করিয়াছ গোলাগঞ্জ গ্রাম।
গ্রাম নাই ধাম নাই আছে মাত্র নাম ॥
হাহাকার পড়িয়াছে প্রতি ঘরে ঘরে।
বাস্ত গেল বৃক্ষ গেল কোথা বাস করে ?
অনাহারে সূর্য্যকরে প্রাণে মারা যায়।
দেশে আর তরু নাই কোথায় দাঁড়ায় ?
গৃহ আর বৃক্ষাঘাতে মলো কত লোক।
পরিবার কাঁদে পেয়ে ঘোরতর শোক ॥
কারো দাদা কারো পুত্র কারো বন্ধু ভাই।
কারো কারো সংসারেতে কেহ আর নাই ॥
পতি-শোকে সতী কাঁদে সতী-শোকে পতি
সুত-শোকে প্রসূতির দারুণ দুর্গতি ॥
সমীরণ এ সকল তব অত্যাচার।
হাহারবে ভরিয়াছে অখিল সংসার ॥
যা খাবার খাইয়াছ দোহাই দোহাই।
আর তুমি খেয়োনাকো খেয়োনাকো ভাই ॥
সারিয়াছ মারিয়াছ বটে সমুদায়।
তুমিও ত মোরেছিলে পেটের জ্বালায়॥
হয়েছিল যে প্রকার ওলাউঠা জোর।
টেনেছিল যমরাজ মরণের ডোর ॥
ভাগ্যে কাছে অহিফেন মদ্য ছিল যাই।
লাডেনম পেটে দিয়ে বাঁচিয়াছে তাই ॥
অনেক দেখিতে পাই আরোগ্য-লক্ষণ
ঘুমাও ঘুমাও এখন ঘুমাও এখন ॥
ঘোটেছিল কি প্রমাদ দেখ দেখি বুঝে।
কুপথ্য কারো না আর থাক চোক বুজে ॥

ছুটী।

শুনিয়া ছুটীর কথা কুঠিয়াল যত।
গালে হাত চিৎপাত প্রাণ ওষ্ঠাগত ॥

বিশেষতঃ দূরবাসী পাড়াগেঁয়ে যারা।
দমফেটে সারা হয় মারা যায় তারা॥
ধরিয়াছে ছটাফটি যায় মাত্র কুঠী।
বারমাস কষ্ট ভুগে অষ্ট দিন ছুটী॥
বাটী আসা আশা মনে কত দিন জাগে।
পুরাবে মনের সাধ কত অনুরাগে॥
কে করে বাজার হাট মুখে নাই রব।
আট দিন ছুটী শুনে কাঠ হলো সব॥
পড়িল মাথায় বাড়ি বাড়ীর ব্যাপারে।
আর কারো বাড়ী নাই কর্ম্মী একেবারে॥
চোকে দেখে অন্ধকার হারাইল দিশে।
যেতে যেতে আশা যায় আসা যায় কিসে॥
যাব বটে রবনাকো পূরিবে না আশা।
শ্রীপদে প্রণামী দিয়া শুধুমুখে আসা॥
কারো কারো ভাগ্যে হবে মিছে ছুটাছুটি।
যেতে যেতে পথে পথে ছুটে যাবে ছুটী॥
নাহি রবে প্রবাসে নিবাসে নহে যোগ।
হরিশ্চন্দ্র রাজার যেমন স্বর্গভোগ॥
দেবতা ব্রাহ্মণ মেনে হয় লুটালুটি।
কুঠী গিয়া দুঃখে করে মাথা কুটাকুটি॥
একদৃষ্টে আছে কেহ নয়ন মেলিয়া।
থেকে থেকে হাঁপ ছাড়ে নিশ্বাস ফেলিয়া॥
কেহ বলে বাপ্ কত করিয়াছি পাপ।
সর্ব্বনাশ হোক্ বলে কেহ দেয় শাপ॥
কলমের সহ নাহি যোগ করে কালী।
ভেবে ভেবে কালী হয় বলে কোথা কালী॥
হায় হায় এই ভাগ্যে ছিল কি আমার।
ওমা দুর্গে. ঘোর দুর্গে ফেলিলে এবার॥
তোমার পূজায় কালে ঘটিল প্রমাদ।
বিফল হইল সব বছরের সাধ॥
তবে বল দয়াময়ি বেঁচে কিবা সুখ?
দেখিতে পাব না আর স্ত্রী-পুত্রের মুখ॥
বুঝিতে না পারি কিছু বিশেষ কারণ।
কঠিন করিলে কেন কোম্পানীর মন?

বিলাতী বণিক্ যত এতে নয় মেল।
মেল মেল বলে সবে করেছে বেমেল॥
সে মেলে সে মেলে কি না আসে বে ফিমেল
মেল হয়ে এবার কি পাব না ফিমেল?
ফিমেল রাজ্যের কর্ত্রী এই দেশ তাঁর।
অতএব মেলের কি ধারি বল ধার?
কেহ বলে মেলের কি দোষ আছে তাতে।
পড়েছে রাজ্যের ভার পিসীমার হাতে॥
সাহস ভরসা নাই দৃশ্য বটে নর।
কোনদিকে ছোট নন্, ছোট গবানর॥
ছোট বড় দুই তুল্য কেহ নয় লঘু।
একজন বনবিবী আর জন ঘুঘু॥
কেহ কয় শুন ভাই আমার বচন।
বড় বড় শ্বেতকান্তি আছে যত জন॥
তাদের নিকটে গিয়া করি নিবেদন।
তবেই হইবে গ্রাহ্য এই আবেদন॥
চেষ্টায় দেখিতে হয় যেমন বিহিত।
দেবী যদি দিন দেন হয়ে যাবে জিত॥
আর জন বলে ভাই এরূপে কি পারিবি?
যেওনা রে বাপ বাপ সেখানেতে হারবি॥
আপনি মরিবি প্রাণে আমাদের মারবি।
চাকরীর দফাটি কি একেবারে সারবি?
কাঁচা-খেকো বোঁচা সেটা কাছে যেতে নারবি
হারবিরে হারবিরে, হারবিরে হারবি॥
কেহ বলে হারবি কি হারবি ধরিনে।
"ডরিনে" ডরিনে আমি "ডরিনে" ডরিনে॥
ডালহৌসী তারে বলে ডালে হৌস্ যার।
কতদিকে কত আছে ডালপালা তার॥
এ ডাল ও ডাল দেখ যত ডাল আছে।
কলমে কলম মাত্র মূল রাখে গাছে॥
অমূল বুঝিয়া যদি মূল যায় ধরা।
ধরা বাৎ বাজামাৎ ধরা আছে ধরা॥
কথোপকথন কত এরূপ প্রকার।
শেষকালে পাইল সঠিক সমাচার॥

শ্রীগোপাল পক্ষ হয়ে পক্ষ লক্ষ করি।
করিল বিপক্ষ জয় এক পক্ষ ধরি॥
এক পক্ষ ছুটী পেয়ে দূরে গেল ধাঁদা।
শুক্ল পক্ষে কৃষ্ণ পক্ষ কৃষ্ণ পক্ষে শাদা॥
আশার অতীত লাভ এমন কি হয়।
হয় নাই হইবে না হইবার নয়॥
আশীর্ব্বাদ কোরে সবে মুক্তমুখে কয়।
জয় জয় জয় রামগোপালের জয়॥

হেমন্তে বিবিধ খাদ্য

শরদের রাজ্য লয়ে হিম মহাশয়।
কু-আশার ধ্বজা তুলে করিলেন জয়॥
উত্তরীয় বায়ু অশ্বে করি আরোহণ।
অধিকার করিল গগন-সিংহাসন॥
রজনীর পরিমাণ বৃদ্ধি করে অতি।
দিন দিন দীন দিন, দীন দিনপতি॥
বৃশ্চিকের দন্তাঘাতে হয়ে জরজর।
শাস্তভয়ে অগ্নিকোণে গেল দিবাকর॥
হিমের প্রভায় হেরি ভাস্করের দুঃখ।
নলিনী মলিনী হয়ে লুকাইল মুখ।
তুষারে তুষারকর কর গুপ্ত করে।
কুমুদিনী সরোবরে অভিমানে মরে॥
স্বজাতীয় বিজাতীয় শব্দ করি কাক।
শিশিরের শুভ হেতু বাজাতেছে ঢাক॥
কিছুমাত্র দুঃখ নাই মগ্ন সদা সুখে।
খাদ্যসুখে সুখী হয়ে বাদ্য করে মুখে॥
দ্বিজদল নিজদলে পক্ষ পক্ষ ধরি।
লক্ষ্য করি বসে এসে বৃক্ষ পরিহরি॥
শূন্যচর সহচর সহ চরে চরে।
নানা সুরে গান গায় স্বভাবের স্বরে॥
রাজদণ্ডে ভয় নাই লয়ে সহচরী।
চঞ্চু পূরে শস্য খায় দস্যুবৃত্তি করি॥
কিছুমাত্র চিন্তা নাই আশা পূরে খায়।
[illegible] আশামাত্র তায়॥

স্বভাবে অভাব নাই পূর্ণ ফুলে ফলে।
পুলকে পূরিত সব নিজ নিজ দলে॥
পেয়ে শীত বিকশিত বাকসের ফুল।
মধুপানে হরষিত বিহঙ্গের কুল॥
পরস্পর লাগে যদি বিবাদের চোট।
শালিক মধ্যস্থ হয়ে ভেঙ্গে দেয় ঘোঁট॥
দেখ দেখ বিহঙ্গম কিরূপ প্রকার।
শিশিরে কি সুখে করে আহার বিহার
ক্ষেতে পড়ে খেতে পায় কত তায় সুখ
সদাই স্বাধীন হয়ে করে দূর দুঃখ॥
অভিমানে অহঙ্কারে না হয় পতন।
প্রকৃতির গুণে করে সুকৃতি-সাধন॥
পাখী, পশু, কীট আদি যত যত প্রাণী
মানুষের চেয়ে সবে ভাল বোলে জানি॥
বড় বোলে অভিমান কিসে করে নর?
নানারূপ দুঃখ যার মনের ভিতর॥
একেতো অভাব তায় রিপু বলবান্।
কেমনে হইবে তারা প্রাণীর প্রধান?
স্বভাবে শোভিত সব অনুকূল ধাতা।
নানা শস্য পরিপূর্ণ বসুমতী মাতা॥
ব্রীহিব্যূহ পরিপক হরিৎ আকার।
হেঁটমুখে অবনীরে করে নমস্কার॥
সকল শরীরে শোভে নিশির শিশির
ঋষির জটায় যেন মন্দাকিনী-নীর॥
প্রভাতে পবন চারু চামর ঢুলায়।
প্রকৃতির ভাবভরে মস্তক দুলায়॥
ফুর ফুর বাজে বাদ্য বুঝি অনুভবে।
ঈশ্বরের গুণ গায় ঝুর ঝুর রবে॥
কৃষকের মহানন্দ আশার সুসার।
শস্য শিরে দৃশ্য ভাল ঊষার তুষার॥
বর্ষ যায় হর্ষ তায়, পরিপূর্ণ আশা।
ক্ষেত্র প্রতি নেত্রপাত সুখে করে চাষা।
জীবের জীবিকা দিয়া রক্ষা করে অসু।
রত্নগর্ভা বসুমতী শস্য তার বসু॥

রিল ধরণারে ধনের ভাণ্ডার।
মূল শাক আদি শস্যের আধার ॥
ধারণা গুণ কত ভাব তায়।
রে ধরা ধরে যাহার কৃপায় ॥
এই ধরাধামে যে দিয়েছেন ধান।
পদে নত হয়ে কর গুণগান ॥
(সূর্য্য) যদি না করিত অন্নের সৃজন।
পে বাঁচিত তবে জীবের জীবন?
তে হয়েছে এই শরীর-ধারণ।
কিছু করিতেছি অন্নের কারণ ॥
তে অন্নের দাস হয়েছে সকল।
ল বুড়া আদি সবে অন্নের পাগল ॥
ভাই অন্ন বিনা বল এ সংসারে।
াব জঠর-জ্বালা কে জুড়াতে পারে?
ব্রহ্ম অন্ন ব্রহ্ম এই জেনো সার।
র করেন বিভু অন্নেতে বিহার ॥
র যে কত গুণ নাহি তার সীমা।
মুখে কত কব অন্নের মহিমা?
নাই তুমি নাই উনি আর ইনি।
তুমি ব্রহ্ম বল অন্নদাতা যিনি ॥
দায়েতে দেখ হইয়া কাতর।
জলধিজলে ডুবিতেছে নর ॥
মুখেতে হায় ভয় নাই মনে।
সে হাত দেয় সাপের বদনে ॥
ধনের সার অন্ন মহামণি।
ভিতরে ঢুকে প্রকাশিছে খনি ॥
যে অনুরাগ সর্নে মনে রাখো।
লে ভোগ পেয়ে ভাল চেলে থেকো ॥
ধূম পেকেছে মাঠে নাম যার গম।
তণ্ডুলের কাছে নন কম ॥
গুণময় শস্যের প্রধান।
রসাল" হয়েছে অভিধান ॥
ম্লেচ্ছ যবনাদি যত জাতি আছে।
(গম) প্রিয়তম সকলের কাছে ॥

দেবতার প্রিয় খাদ্য সকলের আগে।
ময়দার কাছে আর কিছুই না লাগে ॥
দুধেগমে ঘিয়ে ভাজা যার নাম লুচি।
ছেলে বুড়া সকলেরি ভোজনেতে রুচি ॥
মনোহর রুচিকর দ্রব্য এই বটে।
শুচি নাই মুচি নাই লুচির নিকটে ॥
যত খায় তত মন থাকে আরো ক্ষোভে।
গন্ধ পেয়ে নেচে ওঠে অন্ধ হয়ে লোভে ॥
পেটুক যদ্যপি শুনে লুচির ফলার।
দড়ী ছিঁড়ে ছুটে যায় রাখে সাধ্য কার?
এই লুচি ব্রাহ্মণের পেটের সম্বল।
বিশেষতঃ রাজপুরে বৈদিকের দল ॥
যত পায় তত খায় তত লয় তুলে।
কর্ম্মীর কুলায় কিসে ভাবেনাকো ভুলে ॥
আচার বিচার আর কিছুই না করে।
দইমাখা লুচিগুলা নিয়া যায় ঘরে ॥
দেও দেও গোল করি ওঠে পাত ছেড়ে।
কোঁচড় পূরণ করে হাঁড়ি থেকে কেড়ে ॥
রবাহুত রেয়ো-ভাট শত শত জন।
লুচির কৃপায় করে উদরপালন ॥
গালি মেরে নাহি হয় মানের লাঘব।
কে দিলে "রাঘব" নাম রাঘব রাঘব ॥
খাজা গজা আদি করি সুখের মিঠাই
এই গমে জন্মলাভ করেছে সবাই ॥
সুমধুর মিষ্ট অন্ন ভোজনের সার।
যে না পায় তার তার বৃথা জন্ম তার ॥
ময়দার মহিমা কেমনে দিব পেয়ে।
খোট্টারা কেবল বাঁচে পূরী রুটী খেয়ে ॥
সেট আর বসাক তাঁতির শ্রেষ্ঠ যাঁরা।
রুটী ঘণ্টে কত সুখ জেনেছেন তাঁরা ॥
রুটী আর বিসকুট সাহেবের খানা।
কেক নামে সুজিতে মেঠাই করে নানা ॥
ভূমিতলে না হইলে যবনের চারা।
যবনের দেশে সবে প্রাণে যেতো মারা ॥

একবার দেখে এসো পৃথিবী ঘুরিয়া।
কতলোক বেঁচে আছে গোধূম খাইয়া॥
শস্যরূপে যে বাঁচায় জীবের জীবন।
"ব্রহ্ম" বোলে সম্বোধন কর তারে মন॥
একবার প্রভাকরে প্রেমভাব ধর।
অবনীরে একবার প্রণিপাত কর॥
গুণ দেখে বুঝে লও গোধূমের গোড়া।
নিদানে লিখিছে দেয় ভাঙ্গা হাড় যোড়া॥

বলবীর্য্যরুচিকর দেহ-হিতকর।
স্বভাবে সারক বাত-পিত্ত-দাহহর॥
শীতল অথচ স্বাদু মন স্থির করে।
গুরু হয়ে পাকভেদে লঘু গুণ ধরে॥
ভোগীর ভোগের ধন সুখের আহার।
রোগীর সুপথ্য হয়ে করে উপকার॥
শিশিরে যবের শীষ কিবা মনোহর।
শস্যরাজ নাম তার দেখিতে সুন্দর।
বাতাসে দুলিছে ডগা করি ঝরঝর।
মরি কত অপরূপ শোভা মনোহর॥
চুমকিজড়িত চারু পিতাম্বর চেলি।
কেলি (পৃথিবী) যেন তাই পোরে করিতেছে কেলি॥

এ যব দোষের নয় গুণের কেবল।
মেহ পিত্ত কফ হরে মধুর শীতল।
নানা কর্ম্মে হিতকর নানা গুণনিধি
নানারূপ রোগে হয় যবমণ্ড বিধি॥
যব-ছাতু খেয়ে বাঁচে পশ্চিমের দীনে।
বঙ্গদেশে বাড়ে মান চড়কের দিনে॥
দেখহ যবের গুণ কেমন প্রধান।
যে তারে পোষণ করে রাখে তার প্রাণ॥
এখন তখন নয় বুঝে যদি খায়।
হবে বল যাবে বল চিরকাল পায়॥
সুখের শিশিরকালে কৃষীর কৃপায়।
অড়হরির তরু চারু কিবা শোভা পায়॥
শাখা নেড়ে দুলিতেছে বায়ুর বিক্রমে।
জটাধারী যোগী যেন চলেছে আশ্রমে॥
আহারেতে পূর্ণ হয় প্রাণীর উদর।
কতরূপ ঘোর ঘটা জটার ভিতর॥
মনোহর "অড়হর" বীর-প্রিয়তম।
সকলের বলদাতা অবলের যম॥
কাছে যেন নাহি আনে পেটেরোগা দলে
খেতে সুখ কিন্তু দুখ বুক বড় জ্বলে॥
এ প্রকার মুখপ্রিয় ডাল নাই আর।
নিত্য যেন খায় সেই অগ্নি আছে যার।
পশ্চিমের পালোয়ান লোক সমুদায়।
অড়হর বিনা তারা কিছুই না খায়॥
ভীমের সমান তারা বলে ও আহারে।
ডাল রুটী যত পারে কোসে কোসে ম
কফ পিত্ত বাত শ্লেষ্মা যে করে সংহার।
বায়ু বৃদ্ধি করে সেই এই দোষ তার॥
এ দোষ দোষের মাঝে করিনে গ্রহণ।
আপনার দেহ বুঝে করিব ভোজন॥
যার স্বাদে শত শত মানব মোহিত।
অবশ্যই তাতে আছে নানারূপ হিত।

ক্ষেত-ভরা খেঁসারী পেকেছে এই
কাটিছে ছাঁটিছে সব হাসিতে হাসি
মাড়িছে ঝাড়িছে ধূলা ঝাড়িছে গোল
কত বা ছাড়িছে কত নাড়িছে তলা
গরিবের গুণনিধি অশেষ বিশেষে।
অতিশয় সমাদর বাঙ্গালের দেশে॥
পূর্ব্বদেশী বড় বড় যত জমীদার।
কেবল খেঁসারী ডাল করেন আহার
ইহাতে বিশেষ গুণ যদি নাহি রবে
সে দেশেতে এত প্রিয় কেন হবে ত
আস্বাদ উত্তম বটে দেখিয়াছি খেয়ে
এই হেতু মোটামুটি গুণ যাই গেয়ে
মাঠে এসে শোভায় সকল যাই ভুলে
কনকের নিভা হরে চণকের ফুলে

ফুলেতে ধরেছে ফল গুটী গুটী সুঁটী।
ইচ্ছা করে দিবানিশি নখ দিয়া খুঁটি ॥
ছাল খুলে মুখে তুলে কচি কচি খাই ।
এমনি মুখের স্বাদ আর নাহি পাই ॥
কাঁচার খিচুড়ী তার সুধার অধিক ।
প্রতি গ্রাসে গ্রাসে হয় রসনা রসিক ॥
পাকাছোলা গুণ ধরে অশেষ প্রকার ।
বিশেষ করিয়া সব লিখে উঠা ভার ॥
অগ্নির দীপন করে ভিজে হলে পর ।
বল-বর্ণ-রুচিকর বাতপিত্তহর ॥
সে ছোলার জল হয় অতি উপকারী ।
চন্দ্রকরবৎ শীত পিত্তরোগহারী ॥
ভিজে ছোলা ভেজে খেলে কত উপকার ।
পিত্ত কফ হরে করে বলের সঞ্চার ॥
শুষ্ক ছোলা ভাজা অতি সুখের আহার ।
সেই জানে তার মজা দাঁত আছে যার ॥
খোট্টারা এ ছোলা লয় পরম আদরে ।
ভাজা খেয়ে ছাতু খেয়ে দিনপাত করে ॥
স্বভাবে গরম বীর্য্য বহুগুণ ধরে ।
অগ্নিজোর না থাকিলে বিপরীত করে ॥
অগ্নিবল না বুঝিয়া যে করে আহার ।
সে ছোলো আছোলা হয় পেটে ঢুকে তার ॥
বিধবার পক্ষে ইনি অতি গুণময় ।
সকল ব্যঞ্জনে মিশে করেন প্রণয় ॥
ছোলার ডেলের রস অতি গুণকর ।
পাকে মধু বাত-কফ-শ্বাস-কাসহর ॥
বলবৃদ্ধি করে করি উদরে প্রবেশ ।
মহারোগে পথ্যবিধি পীনসে বিশেষ ॥
শাক অতি মুখপ্রিয় দন্তশোথ হরে ।
ফলের আদর ভারী ঠাকুরের ঘরে ॥
চণকের খোসা খুলে দেখ দেখ নর ।
কিরূপ পদার্থ আছে তাহার ভিতর ॥
আত্মা আর জ্যোতি দেহে চণকের প্রায় ।
নিয়ত রয়েছে ঢাকা মায়ার খোসায় ॥

আর কেন ? সার লও ছাড় নিদ্রাযোগ ।
খোস্না খুলে কর কর বস্তু কর ভোগ ॥
'রাজমাষ' নাম তাঁর বরবটি যিনি ।
ছোলা আর মটরের গোষ্ঠীপতি তিনি ॥
সারক যে রুচিকর অতি মনোহর ।
কফ শুক্র আম পিত্ত চেরের আকর ॥
পূজার নৈবেদ্যে তাঁর আগে আগমন ।
কাঁচা পাকা দুই চলে সুখের ভোজন ॥
ইথে যদি না হইত কুশল সাধন ।
কখনই হইত না বীজের সৃজন ॥
মাঠে গিয়া দেখ সব মুগের আকার ।
শরীর হয়েছে কিবা শোভার ভাণ্ডার ॥
জটিল সে তরু বটে কুটিল তো নয় ।
এমন সরল বীজ আর নাকি হয় ॥
সূপশ্রেষ্ঠ ভক্তিপ্রদ রসোত্তম আর ।
সুফল বলিয়া নাম হয়েছে প্রচার ॥
দেবতার প্রিয় খাদ্য মুগের অঙ্কুর ।
জলপানে প্রকাশিত প্রতিষ্ঠা প্রচুর ॥
ঔষধ পথ্যের স্থলে সবার প্রধান ।
জ্বরহর শুভকর বল করে দান ॥
সকলেরি শোনা আছে সোণামুগ ভাই ।
এ সোণার নিকটেতে সোণা হয় ছাই ॥
মুগের ডেলের গুণ কি লিখিব আর ?
সর্ব্বরোগ হরে করে রক্ত পরিষ্কার ॥
স্বভাবে সারক মুগ পিত্ত করে ক্ষয় ।
সদাকাল সমভাবে রুচিকর হয় ॥
লাউ দেও মূলা দেও পোড় দেও ফেলে ।
সকলি অমৃত হয় মিশে এই ডেলে ॥
এই শীতে মুগের খিচুড়ী যেই খায় ।
সে জন ভোজনে আর কিছুই না চায় ॥
মুগের মগধ লাড়ু মেঠায়ের রাজা ।
সেই জানে তার তার যে খেয়েছে তাজা ॥
এ মুগের ভাজাপুলি মুগ্ধ করে মুখ ।
বাসি খাও তাজা খাও কত তার সুখ ॥

ইহার কনিষ্ঠ যিনি কৃষ্ণমুগ নাম।
দ্রব্যগুণে শ্রেষ্ঠ তিনি বহুগুণধাম॥
যুগে যুগে আছে এই মুগের গৌরব।
মনে জ্ঞান যোগ কর ভোগ কর সব॥
কড়াই বড়াই করে নিজ অনুরাগে।
তার কাছে কেবা আছে কেবা কোথা লাগে॥
চাষার আশার ধন তেমন কি আছে?
অপরূপ কিবা ফল ফলিয়াছে গাছে॥
সুচারু শ্যামল রূপ ধরিয়া কলাই।
দূর করে উদরের সকল বালাই॥
আদা দিয়া হিঙ দিয়া রাঁধো যদি ঝোল।
থাবা থাবা মেরে দেও কিছু নাই গোল॥
গরীবের গুণনিধি মধুর ভোজন।
মুখে দিতে উলে যায় খুলে যায় মন॥
দীন লোক যারা তারা এই ভাবে সার।
কলাই থাকিলে ঘরে বালাই কি আর?
কাঁচা খায় ভাজা খায় রুচি যার যাতে।
কোঁৎ কোঁৎ গেলে ভাত যত দেয় পাতে॥
গঙ্গার পশ্চিম পারে যত সব রেড়ো।
সমভাবে সকলেই কলায়ের ভেড়ো॥
অতিশয় দুঃখ সয় বায়ু বাড়ে টানে।
কলাই না খেলে তারা মারা যায় প্রাণে॥
কলাই মালায়ে কত কচুরি মেঠাই।
পাকে লঘু সমুদয় পেটভোরে খাই॥
সকলের মুখপ্রিয় কলায়ের বড়ী।
কুমুড়া যাহার পায় যায় গড়াগড়ি॥
সহজে ধরেছে গুণ কিঞ্চিৎ শীতল।
বায়ু হরে মেহ হরে বৃদ্ধি করে বল॥
কলায়ের দেহ দেখে নাহি যায় জানা।
বাহিরেতে খোসাভরা ভিতরেতে দানা॥
সেইরূপ ভাব ধর সমুদয় নরে।
ভিতরে সুন্দর হও বাহিরে কি করে?
মসুর অসুরভোগী সুর-প্রিয়তম।
রূপে গুণে দুই দিকে নাহি তার সম॥

গুড়বীজ নাম ধরে গেলে পরে ভাঙ্গা।
তরুণ অরুণ তনু টুক্‌টুক্ রাঙ্গা॥
ভাতে দেও ডাল রাঁধো ব্যয়ের সুসার
খাঁড়ির খিচুড়ী খেলে ভুলিব না আর।
যূষের গুণেতে হয় মেহের সংহার।
কফ পিত্ত জ্বর নাশে নাশে অতিসার।
কর ভাই মসুরীর গুণের বিচার।
অসারের মাঝে দেখ কত আছে সার।
সরু সরু তরু সব চারুকলেবর।
নবঘন শ্যামরূপ দৃশ্য মনোহর॥
জটিল রামের ন্যায়, শিরে শোভে জটা।
মোক্ষপদ দেয় তারা পেটে যায় যটা॥
নিজে বটে ছোট কিন্তু দানাদার ছেলে
কণ্ঠ হয় স্বর্গ সম ঘণ্ট কোরে খেলে।
আনাজেতে তুল্য আর জুটি নাই দুটী।
বলি হারি যাই তোরে মটরের সুঁটি॥
সুঁটির খিচুড়ী করি খেয়েছে যে জন।
ভুলিতে না পারে আর তার আস্বাদন
কাঁচার নিকটে নয়, পাকার আদর।
বৈদ্যকে 'হরেণু' নাম পেয়েছে মটর॥
ভাজা যেন খাজা খায় তাজা বীর যারা
পেটরোগা যারা তারা প্রাণে যায় মারা
মেঠো গাঁয়ে চলে যারা কাঙালের ছেলে
অনেকেই পেট পালে মটরের ডেলে॥
কষা আর রুক্ষ বটে ফলত মধুর।
পাকে গুরু বটে করে পিত্ত কফ দূর॥
পীড়িতের পক্ষে যদি শুভকর নয়।
তথাপিও অনেকের উপকারী হয়॥
শিশিরসময়ে দেখ কৃষীর কুশল।
তিসির তরুতে কিবা ফলেছে ফসল॥
অতসীর ফুল-শোভা যাই বলিহারি।
হেরিলে নয়ন আর ফিরুতে না পারি॥
ফলের ভিতরে বীজ সমুদয় সার।
হেরে হয় সুখোদয় আলোয় আঁধার॥

বীজের নিজের গুণ উষ্ণভাব ধরে।
কফ-পিত্তকারী বটে বায়ু নাশ করে॥
মদগন্ধী, মধু স্বাদু পাকে কটু খেলে।
বায়ু, কফ, কাসদোষ নাশে এর তেলে॥
কত মতে বিলাতে হতেছে প্রয়োজন।
যেখানে সেখানে দেখি তিসির ওজন॥
আগুন হয়েছে দর বিলাতের খাঁই।
দিশা হয়ে তিসি আর আমরা না পাই॥
মসিনার ক্ষুদ্র বীজে যে দিয়েছে রস।
একবার মুক্তকণ্ঠে গাও তার যশ॥
যে বীজের তরু এই অখিল সংসার।
মনে কর সেই বীজ কিরূপ প্রকার॥
বসুমতী রসবতী যাঁহার কৃপায়।
হায় হায়, কি কহিব কত রস তায়?
সে বীজের তেলগুণ কহে সাধ্য কার?
রবি, শশী, তারা আদি আলো হয় যার॥
নয়ন প্রফুল্ল হয় গেলে পরে মাঠে।
পরিপূর্ণ নানা শোভা স্বভাবের হাটে॥
শরদ পড়িল সরি সারফুল ছেড়ে।
সরিষার ফুল তার শোভা নিল কেড়ে॥
মনোলোভা কিবা শোভা ছটা তার জ্বলে।
দামিনীর হার যেন জলদের গলে॥
ফুল ফল অতি ক্ষুদ্র তার মধ্যে রস।
আলোকে পুলক দিয়া রখিয়াছে যশ॥
সরিষার সার অংশে ব্যঞ্জনের তার।
অসারে গাভীর স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার॥
যার গুণে রজনীর অন্ধকার যায়।
কৃষকের ক্ষেত্রে তাহা শীতের কৃপায়॥
শাদা, কালো আদি করি নানা রঙ ধরে।
কতরূপে মানবের উপকার করে॥
বীজের অশেষ গুণ নিদানে প্রকাশ।
কফ, বাত, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ব্রণ করে নাশ॥
গুল্ম আর কণ্ডুরোগ দুই করে শেষ।
বচনেতে গুণ সব কি কব বিশেষ?

বীচির ভিতরে রস আলোর আধার।
"তেল" নামে নাম যার হয়েছে প্রচার॥
শরীর হতেছে রক্ষা খেয়ে আর মেখে।
অন্ধকারে আলো দেয় প্রদীপেতে থেকে॥
অবিকল গুণ ধরে ঘৃতের সমান।
সমভাবে বাঁচাতেছে সকলের প্রাণ॥
যোগী, ভোগী, রোগী রাজা দীন হীন জন
সকলেরই করিতেছে মঙ্গলসাধন॥
বীজের ভিতরে রস নাম যার স্নেহ।
এ স্নেহের গূঢ় ভাব নাহি বুঝে কেহ॥
ওরে নর! পাইয়াছ মনোহর দেহ।
মনেরে পাষাণ করি বার কর স্নেহ॥
সরিষার স্নেহ দেখে দ্রব্য হও সবে।
স্নেহ যদি না থাকিল মিছে দেহ তবে॥
কর কর প্রণিধান মানব-সকল।
দেখ কিবা ঈশ্বরের স্নেহের কৌশল॥
পরস্পর স্নেহ-রসে সবে রবে বশ।
সর্ষপে দিলেন তাই স্নেহরূপ রস॥
ফুলে ফলে সুশোভিত হইয়াছে তিল।
হেরে আঁখি ফিরাতে না পারি একতিল॥
অতি ছোট বীজগুলি রসের সদন।
বাত অর্শ হরে করে বল-বিতরণ॥
সৌরভের ভুলোল ফুলোল নাম যার।
তিলের তেলেতে হয় জনম তাহার॥
বায়ুহর হিতকর ত্বকে আর চুলে।
ফুলে যে ফুলোল মাখে মরে সেই ফুলে॥
তিলফুল রূপের আভাস দেহে ধরি।
তিলোত্তমা নাম পেলে স্বর্গ-বিদ্যাধরী॥
এ ফুলের শোভা যে দেখেছে একবার।
রূপের গরব যেন সে করে না আর॥
হায় রে শিশির তোর কি লিখিব যশ?
কালগুণে অপরূপ কাঠে হয় রস॥
পরিপূর্ণ সুধাসিন্ধু খেজুরের কাঠে।
কাঠ কেটে উঠে রস, যত কাঠ কাটে॥

দেবের দুর্লভ ধন জীরণের ঘড়া।
এক বিন্দু পান করি বেঁচে উঠে মড়া ॥
না থাকে বিরসভাব রস পেটে পড়ে।
বিন্দু পান, যদি পান প্রাণ পান ধড়ে ॥
সে জলের ভাল ধর্ম্ম মর্ম্ম তায় গূঢ়।
স্বভাবের ক্রিয়া-জালে জ্বালে হয় গুড় ॥
আমাদের ভাগ্যদোষে মিছে করি দ্বেষ।
বিজাতীয় রাজা হয়ে নষ্ট করে দেশ ॥
লোভ ভারী আবকারী যুক্ত করি কর।
এমন খেজুর-রসে বসাইল কর ॥
মাশুল উশুল করে রসে আর গুড়ে।
পরে বুঝি গঙ্গাজলে কর দেবে যুড়ে ॥
মূল্য দিয়া তবু খাই কর পরিমাণে।
একচেটে না করিলে তবে বাঁচি প্রাণে ॥
মাদকতা-শক্তি নাই পেটভরে খেলে।
বিবাদী হইল তায় ফলনার ছেলে ॥
গুণ দেখে অভিধানকর্ত্তা গুণধাম।
খেজুর গাছের দিলে, 'হরিপ্রিয়া' নাম ॥
রসের যশের কথা না হয় প্রকাশ।
দেহ করে বলবান্ মেহ করে নাশ ॥
বায়ু হরে, মল-মূত্র করে পরিষ্কার।
রসনা পবিত্র করে সুধার সুতার ॥
গুড়ের নিগূঢ় গুণ কি কহিব আর?
সুবাসে আমোদ করে মধুর আগার ॥
নূতন খেজুরে গুড়ে দেবতার সক।
নাম শুনে জল সরে নোলা লকলক্ ॥
এ প্রকার সুখসেব্য আর নাকি আছে।
নলিনীর মধু কোথা নলেনের কাছে?
মাতে মন সুখদ 'পয়ড়া' গুড় পেলে।
অরুচির রুচি হয় লুচি দিয়ে খেলে ॥
'ভোজালের পাটালি' যে খায় একবার।
কখনো সে ভুলিতে পারে না তার তার ॥
নূতন নলেন গুড়ে মণ্ডা মনোহর।
পায়স পীযূষ সম অতি প্রেমকর ॥

এ গুড়ে পিষ্টক হয় বিবিধ প্রকার।
কাঁচা পাকা দুই চলে সুখের আহার ॥
বায়ু পিত্ত হরে করে মূত্রের শোধন।
চিনি আর মিছরীর করিছে সৃজন ॥
মিছরি চিনির গুণ সবাই বিদিত।
বিশেষেতে লেখা তাই না হয় উচিত ॥
দেখহ খেজুর গাছ কত গুণ ধরে।
গলা কেটে রক্ত দিয়া উপকার করে ॥
যে তাহার মাথা কাটে তারে দেয় প্রাণ।
খেজুরের মাথি নানা গুণের নিধান ॥
কাঠের ভিতরে রেখে সুমধুর জল।
মানবে শিখান প্রভু রুণা-কৌশল ॥
শিবা সহ সদাশিব ছাড়িয়া কৈলাস।
অবনীতে অধিষ্ঠিত, এই ছয় মাস ॥
ফল মূল রস খান সাধ যত আছে।
নিশাযোগে নিদ্রা যান, শ্রীফলের গাছে ॥
ঘন ঘন হিমবৃষ্টি তাহে স্নান করি।
উলঙ্গ হইল ইক্ষু বস্ত্র পরিহরি ॥
স্বভাবে হইল তায় মধুর সঞ্চার।
পাপে পাপে রস ভরা মিষ্ট তার তার ॥
খণ্ডে পাপ খায় যেই খণ্ড এক পাপ।
বাহু তুলে স্বর্গপুরে নাচে তার বাপ ॥
অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বর মনে ভালবাসি।
আকেরে দিলেন স্থান পুণ্যধাম কাশী ॥
কি বুঝিবে মর্ম্ম গূঢ় যত সব মূঢ়।
বানে ঢুকে বৃষারূঢ় জ্বাল দেন গুড় ॥
শিব-অঙ্গ-আভা পেয়ে শোভা বাড়ে তার।
কাশী নামে নাম খ্যাত ধবল আকার ॥
শিবের সৃজিত বস্তু নাম হলো চিনি।
সাহেবেরা শিরে ধরে ভালরূপে চিনি ॥
মহৎ কে আছে আর আঁকের মতন?
তাহারে অমৃত দেয় যে করে পাড়ন ॥
যত পার তত খাও দেও দেও পেটে।
সুখেতে ভোজন কর পাপ কেটে কেটে ॥

গেঁটে গেঁটে রস ভরা রসের আধার।
'মধুতৃণ' 'মহারস' নাম হলো তার॥
গোড়া আর মাঝখানে সুধা আস্বাদন।
গেঁটেতে লবণরস মাথায় লবণ॥
ত্রিদোষ বিনাশে এই মধুময় ঘাসে।
বপুবাসে বল দেয় লাবণ্য প্রকাশে॥
গুড়ের বিশেষ লয়ে গুণের সন্ধান।
'শিশুপ্রিয়' অভিধান দিলে অভিধান॥
কি চিনি? কি চিনি আমি কি কব বিশেষ।
সবাই মোহিত খেয়ে মেঠাই সন্দেশ।
ভাতে খাও যাতে খাও দুধে আর জলে।
চিনি বিনা মানুষের আহার না চলে॥
সব দেশে প্রিয় ইনি সকল সময়।
ছেলে বুড়া সকলের সমান প্রণয়॥
আহার ঔষধ চিনি অতি হিতকর।
চিনিতে শোধিত হয় দ্রব্য বহুতর॥
রোগী ভোগী উভয়ের সম উপকার।
সুখের সামগ্রী হেন কোথা পাব আর?
আকের মিছরী হয় অমৃতের কোষ।
সকল গুণের নিধি কিছু নাহি দোষ॥
আখে রস রসে গুড় গুড়ে চিনি হয়।
চিনির শরীর পায় মিছরীতে লয়॥
সকল অসার গিয়ে সার থাকে শেষ।
অতএব লহ জীব সার উপদেশ॥
কর্ম্ম হতে ধর্ম্ম হয় ধর্ম্ম হতে জ্ঞান।
নিত্যধাম-প্রবেশের সে জ্ঞান সোপান॥
কামনার রস গুড় দিওনাকো মুখে।
পরম পীযূষরস পান কর সুখে॥
চারু তরু ক্ষুদ্রাকার ফল তার বুকে।
বেগুণের গুণ নাহি ব্যাখ্যা হয় মুখে॥
শাদা কালো নানা রূপ ত্রিভঙ্গ সুঠাম।
দোলায় দুলিছে যেন কৃষ্ণ-বলরাম॥
বোঁটা-রূপ চারু চূড়া কাঁটা পুচ্ছ তাতে।
রাত্রিদিন আলাপন রাখালের সাতে॥

পতিতপাবন নাম মহিমার গুণে।
সমভাবে যুক্ত হন সকল ব্যঞ্জনে॥
চড়্‌চড়ি সড়্‌সড়ি পোড়া আর ভাজা।
আদরে উদরে দেন কত কত রাজা॥
অল্প দরে বহু মিলে গোষ্ঠী শুদ্ধ বাঁচে।
গরীব নেওয়াজ নাম গরীবের কাছে॥
তাহার অরুচি যায় আহার যে করে।
রোচক পাচক হয়ে বাত কফ হরে॥
বেগুণ সগুণ ইথে অগুণতো নাই।
গুণ দেখে গুণ গেয়ে পেট ভোরে খাই॥
যে করেছে বেগুণে এ গুণের নিধান।
নিতে নিতে তার তার গুণ কর গান॥
গোড়া সরু আগা গুরু শিরে শোভে টোপ।
শ্বেতকান্তি শঙ্খাকার ভিন্ন ভিন্ন ঝোপ॥
মূলে তার মূল নাই নাম ধরে মূলে'।
রোগাপেটে যে [illegible] লে যেতে হয় চুলো॥
একদিন বাবাজীরে করিলে আহার।
ছমাস নির্গত হয় সমান উদ্গার॥
খোট্টাদের কাছে তাঁর সমাদর বাড়ে।
ঝাড়শুদ্ধ পেটে দেয় কিছু নাহি ছাড়ে॥
দুইমাস সাহেবেরা সুখে পেট পালে।
নিয়ত হাজির করে হাজিরের কালে॥
জলপানে সমাদর সকলের স্থানে।
কচুরির সহ প্রেম খোট্টার দোকানে॥
গোষ্ঠীপোষা ব্যঞ্জনেতে বড় মান বাড়ে।
বাবাজীরে বেগুণের সঙ্গে সঙ্গে ছাড়ে॥
কচি মূলা রুচিকর ত্রিদোষ-নাশক।
পাকিলে বিনাশে বায়ু পিত্তের জনক॥
শোথ বাত শ্লেষ্মা নাশে শুকাইলে পরে।
অথচ শীতল গুণ আপনি সে ধরে॥
মূলাতে হিঙের গুণ আছে অবিকল।
কাঁচা খেয়ে নেচে উঠে সবল সকল॥
মূলক মূলক বটে অমূলক নয়।
ব্যাভারে পেয়েছি তার মূল পরিচয়॥

মূলে কোন দোষ নাই ভাল বটে মূল।
মূলে যে নিপাত করে তারে দেয় মূল॥
মূলকের কাছে কিছু অমূলক নাই।
মূলকের মূল বুঝে মূল রাখ ভাই॥
প্রাচীনার স্তন সম অঙ্গের ধরণ।
বোঁটা সরু মোটা মুখ বিমল বরণ॥
কখনো মাচায় বাস কভু বাস চালে।
বৃক্ষের উপরে উঠে যুক্ত হয়ে ডালে॥
বড় বড় ধনীলোক জন্ম দিয়া হাতে।
যত্ন করি স্থান দেন তেতালার ছাতে॥
পড়িয়া চাষার হাতে তুষ্ট নহে মন।
অভিমানে করে তাই মাটীতে শয়ন॥
সীতার শ্বশুর যিনি দশরথ ভূপ।
তার সঙ্গে গলাগলি ভাব অপরূপ॥
চিঙ্গড়ীর সহ যোগ লাউ যদি করে।
হাতে হাতে স্বর্গে যাই মুখে দিলে পরে॥
মহাফলা তুম্বী এই যদি হয় কচি।
সুধা ফেলে ছুটে আসে বাসবের শচী॥
কতই আনন্দ বাড়ে আহারের বেলা।
ডাঁটা খোসা আদি কিছু নাহি যায় ফেলা॥
ভাতে কিম্বা ঝোলে ডাঁটা যুক্ত হলে মাছে।
তেমন সুখাদ্য আর জগতে কি আছে?
নিরামিষ লাউ লাগে সুধার সমান।
অম্বলে গুড়ের সহ অতিশয় মান॥
ভেদকর কফকর হিম কিছু বটে।
পিত্তহর কেহ নাই ইহার নিকটে॥
একমুখে কি কহিব কত গুণ ধরে?
শুকাইয়া 'বচ' হয়ে কাস নাশ করে॥
যোগী ঋষি সকলের অন্নের আধার।
যেখানে সেখানে যান তুম্ব করি সার॥
জেলে মালা যতনেতে করিয়া গ্রহণ।
জালে জুড়ে সুখে করে জীবিকা-সাধন॥
তানপুরা বীণাযন্ত্র মধুর সেতার।
এই লাউ হইয়াছে সর্ব্বমূলাধার॥
শিব হইলেন সিদ্ধ গীত-আলাপনে।
নারদ ত্রিলোকপূজ্য বীণার সাধনে॥
দেখ দেখ কেমন মহৎ এই ফল।
এ ফল যে ধরে তার সকলি সফল॥
মনোহর ফুলকপি পাতাযুক্ত তায়।
সাটিনের কাবা যেন বাবুদের গায়॥
শ্রেণীবদ্ধ চারু শোভা এলো আর বাঁধা।
সাহেবেরা প্রেমডোরে চিরকাল বাঁধা॥
রন্ধনেতে তার সঙ্গে যুক্ত হলে কই?
যত পাই তত খাই আরো বলি কই?
ঘৃণার স্বভাবে যেই নাহি খায় কপি।
তারে কি মানুষ বলি নিজে সেই কপি॥
কপির সকলি গুণ দোষ কিছু নাই।
তাতেই আমোদ বাড়ে যেরূপেতে খাই॥
বহুবিধ শাকবৃক্ষে শোভা করে পাতা।
ইন্দ্রের সভায় যেন মছলন্দ পাতা॥
পেটে দেয়া দূরে থাক্ দেখে তুষ্ট আঁখি।
ইচ্ছা হয় পালঙেরে পালঙেতে রাখি॥
অম্ল ভাগ কটু আর মধুর সকল।
রক্তপিত্ত নাশ করে সুপথ্য শীতল॥
বিট নামে পালঙ কি মহাদ্রব্য তিনি।
বিলাতে তাহার রসে হইতেছে চিনি॥
চুখায় চুখায় মুখ সুখ কব কত?
হাতে হাতে উঠে যায় পাতে পড়ে যত॥
অতি অম্ল উদ্দ করে অগ্নির প্রকাশ।
শূল গুল্ম আম বাত শ্লেষ্মা করে নাশ॥
অপরূপ বস্তু এক মৃত্তিকার নীচে।
গাছ দেখে বোধ হয় সমুদয় মিছে॥
কচুর সমাজে তার অতিশয় মান।
গুণ দেখে রসিকেতে নাম দিলে মান॥
মানদাস বাবাজার অভিমান নাই।
পরিমাণে বাড়ে মান মানে দিলে ছাই॥
মাছের সহিত প্রেম যুক্ত হলে ঝোলে।
একবার যে খেয়েছে সে কি আর ভোলে?

ঝোলের সহিত দেখে মানের এ মান।
পটল পটল তুলে করিল প্রস্থান ॥
মানের মানের কথা কি কহিব আর ?
আনাজের রাজা ইনি শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥
শোথহর পিত্তহর পাকে স্বাদু লঘু।
এ মানে যে নিন্দা করে তারে বলি 'রঘু' ॥
মানের কেমন মান দেখ দেখ ভাই।
ছাই দিলে মান বাড়ে মানে দেও ছাই ॥
দেখিয়া মানের মূল মান রাখ মূলে।
মানের মূলের মত উঠনাকো ফুলে ॥
এই মান মানে করে আপন ব্যাঘাত।
যখন ফুলিয়া উঠে তখনি নিপাত ॥
মৃত্তিকায় জন্ম লয় গাছ যেন লতা।
একমুখে কত কব মহিমার কথা ?
পূর্ব্বে তার বাস ছিল ইংরাজের দেশে।
'গোল-আলু' নাম হলো বাঙ্গালায় এসে ॥
সাহেবেরা 'পটাটস্' নামে নাম ধরি।
খানায় আনায় তারে সমাদর করি ॥
মটনের অগ্রভাগে ধরে তার ডিস্।
সুখে দিয়ে বুকে কাঁটা মুখে করে পিস্ ॥
কাঙালের ত্রাণকর্ত্তা অধমতারণ।
অনেকের হয় তাহে জীবন-ধারণ ॥
কিছু যদি নাহি পাই মরিনেকো দুখে।
গোটা দুই ভাতে দিয়া ভাত মারি সুখে ॥
ভাতে দিই যাতে:দিই তাতে হয় রস।
গুণভরা দোষ নয় আলু 'পটাটস্' ॥
ইউরোপে কোটি কোটি শ্বেতাকার নর।
কেবল নির্ভর করে আলুর উপর ॥
মাংস রুটী নাহি পায় দীন হীন জন।
আলু খেয়ে করে শুধু জীবন-ধারণ ॥
গুণে লঘু সুধাস্বাদু বলে করে দান।
অবিকল গুণ ধরে অন্নের সমান ॥
শিমের হইল জন্ম হিমের কৃপায়।
শ্যামল ধবলকান্তি শোভিত লতায় ॥
শরীরে সংলগ্ন শির অসির আকার।
শুক্তরসে যুক্ত হলে সমাদর তাঁর ॥
শীতল অথচ রুক্ষ পাকে গুরু হয়।
অধিক খাইলে পরে বল করে ক্ষয় ॥
ভুঁই ফুঁড়ে 'পুঁই গাছ' হইয়াছে খাড়া
অধমতারণ নাম ধরে তাব খাড়া ॥
ক্ষুদে ক্ষুদে চিঙড়ীর সহ হলে যোগ।
সুধার আস্বাদ হয় সুখের সুভোগ ॥
ভেদকর শুক্রকর কফ বদ্ধ করে।
পাকেতে মধুর হয় স্নিগ্ধগুণ ধরে ॥
পলাণ্ডুর শ্রেণী যেন যুদ্ধের লস্কর।
মুকুটের পর উড়ে মাথার উপর ॥
ফুলে যুক্ত মূলে যুক্ত মনোহর কলি।
তিন যুগ জয় করি ধ্বজা তুলে কলি ॥
যবনে ভবনে আনে যত্ন করি নানা।
তাঁহার সংযোগ বিনা, জাঁকেনাকো খানা ॥
লুকাচুরি খেলা তাঁর হিন্দুর নিকটে।
গোপনে করেন বাস বাবুদের পেটে ॥
পাকে আর রসে প্যাঁজ উষ্ণ নাহি হয়।
বল-বীর্য্য করে আর বায়ু করে ক্ষয় ॥
মাংসভোজী জনের বিশেষ উপকার।
একবার যে খেয়েছে সেই জানে তার ॥
প্যাঁজখোর যারা তারা আহারে সন্তোষ।
লোম ফুঁড়ে গন্ধ ছুটে এই বড় দোষ ॥
শ্বেতকান্তি শাঁক-আলু অতি সুশীতল।
পৃথিবীতে ভোগ করে নিজ কর্ম্মফল ॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ভগবান্।
মনোহর বৈকুণ্ঠ ভবন যাঁর স্থান ॥
বিষ্ণুর করেতে থাকি, না বুঝিয়া হিত।
কলহ করিল শঙ্খ চক্রের সহিত ॥
চক্র করি চক্র তার কেটে দিলে নাক।
অভিমানে ভূতলে পড়িল তাই শাঁক ॥
স্বর্গ ছাড়া হয়ে তার দুঃখিত অন্তর।
লজ্জায় লুকায় মুখ মাটীর ভিতর

সুধাময় রসে করে, ত্রিদোষ হরণ।
মুখের জড়তাহারী কে আর এমন ?
বাহিরে গৌরাঙ্গ তার ভিতরেতে শাদা।
শাঁক-আলু হন যাঁর সহোদর দাদা॥
বয়সে কনিষ্ঠ হয়ে জ্যেষ্ঠ গুণ তার।
কাঁচা পাকা দিই মুখে সুখের আহার॥
ভাজা পোড়া ভাতে আর ব্যঞ্জনে নিয়োগ।
যাতে থাব তাতে পাব সুখের সুভোগ॥
পাকে লঘু গুণকর দোষ বড় নাই।
গুণ দেখে চিনিকন্দ নাম দিলে তাই॥
কমলা কমলারূপে অবনীতে এসে।
শুভদাত্রী অধিষ্ঠাত্রী বাঙ্গালের দেশে॥
শ্রীমতীর আবির্ভাবে সুখ অবিশ্রাম।
শ্রীহট্ট হইল তাই ছিলেটের নাম॥
শ্বেতকান্তি রাঙামুখ টুপিধারী যারা।
টেবিলেতে বেষ্ট নিয়া টেষ্ট পান তাঁরা॥
একবার তুষ্ট যেই কমলার তারে।
অন্য ফল আর নাহি ভাল লাগে তারে॥
বায়ু পিত্ত নাশ করে মধুর অম্বল।
অরুচির রুচিকর মুখের সম্বল॥
আমড়ার চামড়ার সুবর্ণের শোভা।
সৌরভে আমোদ পেয়ে কথা কয় বোবা॥
সুমধুর মিষ্ট তার গুণ কব কত ?
রসনা রসিক হয় রস পায় যত॥
ইচ্ছা হয় স্বভাবের ছাইপেড়ে কাটি।
এমন আমড়া ফলে কেন দিলে আঁটি॥
কিঞ্চিৎ অজীর্ণ-দোষ আম্রাতক ধরে।
বল করে তৃপ্তি করে পিত্ত কফ হরে॥
চালতা পেকেছে গাছে হইয়া সরস।
রূপে আর গন্ধে করে মোহিত মানস॥
আমাদের নিকটে আদর অতিশয়।
পূর্ব্বদেশী লোকে করে যম বোলে ভয়॥
কাঁচা বেলা মুখপ্রিয় নাহি হয় তত।
পাকার আস্বাদ-সুখ মুখে কব কত ?
নূতন নোলেন গুড়ে অম্বল যে খায়।
রসের সাগরে তার মুখ ভেসে যায়॥
তারে তারে ঢেঁক্‌ গিলে খেতে লাগে খাসা।
রসনা রসিক হয় গন্ধে মাতে নাসা॥
টক বটে কষা বটে অথচ মধুর।
স্বভাবে শীতল করে পিত্ত কফ দূর॥
কিঞ্চিৎ অজীর্ণকারী পাকে হয় গুরু।
মুখশুদ্ধিকর অতি স্বাদু কল্পতরু॥
চালিতার অম্বল যে জন নাহি খায়।
ধিক ধিক ধিক তার ধিক রসনায়॥
পেকে হলো কৎবেল সুগন্ধের ধাম।
চিরপাকী দধিফল গন্ধফল নাম॥
কাঁচা বেলা বড় কিছু হিতকর নয়।
মধুর অম্বল হয় পাকার সময়॥
কতই আমোদ বাড়ে করিতে ভোজন।
শ্বাস বমি হরে করে ত্রিদোষ হরণ॥
শ্রমজাত তৃষা কৃশা হয় এই বেলে।
বদন পবিত্র হয় তারে তাবে খেলে॥
ইহার পাতার গুণ কি লিখিব আর ?
পাতাপোড়া বধে নাশে রক্ত-অতিসার॥
বৃক্ষের উপরে হেরে নানা কুল কুল।
লোভাকুল হয়ে মন নাহি পায় কূল॥
পাকালোভী পাকা খায় কাঁচা খায় কাঁচা।
কুলেতে অকুল লোভ বীচি নাই বাছা॥
পবনের পুত্র প্রায় অভিলাষ ভোগে।
উদর ভবনে ছাড়ে লবণের যোগে॥
রিপুর পঞ্চমে যার নারিকুলে কুল।
সমাদরে খায় সেই নারিকুলে কুল॥
বিশেষ সময়ে পেলে কুলের আচার।
কোন ক্রমে নাহি থাকে কুলের আচার॥
গুণেতে বদর বায়ু পিত্তের নাশক।
মধুর শীতল আর মলের রেচক॥
কুলের মহিমা কথা কহিবার নয়।
আচারে অরুচি হরে করে বলক্ষয়।

রেখে কুল খাও কুল যত সাধ লয়।
কুলাচারে কুলাচার-ধর্ম্ম যেন রয়॥
এ কুলের কর্ত্তা যিনি তাঁর নাই কুল।
অথচ দিলেন তিনি সকলের কুল॥
কুল দিয়ে কূল দিয়ে, যে ধরে না কুল।
অকূলসাগরে কর, তারে অনুকূল॥
অকূলে যে কূল দিলে সেই দেবে কুল।
কুল কুল কোরে কেন হতেছ ব্যাকুল?
যাঁহার কৃপায় তুমি খেতেছ এ কুল।
তার কাছে নাহি আর এ কুল ও কুল॥
প্রতিকূলে প্রীতি তার নহে প্রতিকূল।
সকল কুলের পতি স্বভাব অকুল॥
মনে যেন অভিমান আর নাহি রয়।
কুল শীল যত কিছু তাহে কর লয়॥
সকলের সার মেয়া ফল অতি খাসা।
বিশেষতঃ শীতকালে যদি হয় ডাঁসা॥
কেবা জানে ডাঁসা পাকা কেবা জানে কচি।
পেয়ারার গন্ধে হয় অরুচির রুচি॥
সাঁস বীচি দূরে থাক খেলে পরে ছ
একেবারে পরিতোষ তৃপ্ত হয় গাল॥
পাকা ফল পেয়ে পরে বৃদ্ধ লোক যত।
চুষে চুষে রস খায় যশ গায় কত॥
বালকেতে যাহা পায় তাহা খায় কেড়ে।
আগে ভাগে হাত লয় মাতৃস্তন ছেড়ে॥
ডাঁসার আদর অতি যুবকের কাছে।
ইচ্ছা হয় দিবানিশি বোসে থাকে গাছে॥
দন্তের আহ্লাদ অতি চর্ব্বণের কালে।
কোরে অতি মন্দগতি রস ঢোকে গালে॥
কিন্তু পায় তার তার রদনবদন।
আপনার অস্তহীন হইলে মদন॥
এ বড় আশ্চর্য্য ভাব ভেবে জ্ঞানলোপ।
মদন হারায়ে অস্ত্র প্রকাশে প্রকোপ॥
নপাঠ, নপাঠ হলে, মদন আছাড়ে।
অঙ্গহীনে অঙ্গরাগ কত রঙ্গ বাড়ে॥

এই বড় মনে খেদ দগ্ধ হই দ্বেষে।
পেয়ারা পেয়ারা হলো, বেয়ারার দেশে॥
সে দেশের খোট্টালোক খেতে নাহি জানে।
কি সুখে বিরাজ তুমি করিছ সেখানে?
ছাতু খায় চানা খায় ভুট্টা খায় যারা।
তোমার সাদর বল কি জানিবে তারা?
বাঙ্গালী আছেন যাঁরা তাঁরা সেইরূপ।
সঙ্গ-দোষে অঙ্গহীন হয়েছে বিরূপ॥
স্বদেশের প্রতি আর স্নেহ কিছু নাই।
তিনি বড় বাবু হন, বাই যার বাই॥
মোহিত হয়েছে মন মিঠেনের ভনে।
আধা ভেরি মেরি বাৎ খোট্টাচেলে চলে॥
মাছ ভাত খায় যারা তারা চলে ঠেকে।
কাজ কি তোমার আর সেখানেতে থেকে?
এদেশে বাঙ্গালী বাবু ব্যয়কল্পে দড়।
বাড়িবে আদর অতি দর পাবে বড়॥
সেখানে তোমায় কেহ জিজ্ঞাসা না করে।
উঠিবে সোণার থালে বালাখানা ঘরে॥
আমরা গরীব অতি সোণা রূপা নাই।
ফলত সুফল তুমি তোমারেই চাই॥
আস্বাদন এক রূপ সম সুখ খেতে।
তোমারে ধরিব বুকে ছেঁড়াচট পেতে॥
নিয়ত হাজির আমি আঁজির তলায়।
ইচ্ছা করে কোসে খাই গলায় গলায়॥
ডাঁসা খেতে খাসা লাগে কত তায় সুখ।
এখন পড়েছে দাঁত এই বড় দুখ॥
চর্ব্বণের সুখ যত করিলে সংহার।
হায় বিধি কোথা গেল সে কাল আমার?
যে মুখে পাতর কেটে করিয়াছি চুর।
এখন হইল তার অহঙ্কার দূর॥
বদন বৃথায় হয় রদন বিহনে।
অদনের সুখ আর হইবে কেমনে?
এখন পড়েনি সব সবে গেছে ছটা।
উপরে রয়েছে সব নীচে আছে কটা॥

এ দাঁতে বিশ্বাস কিছু নাহি করি আর।
ভাঙন ধরিলে গাঙে রাখে সাধ্য কার?
এ কটা যদিন আছে যেরূপেতে পারি।
কত চেবা কত গোলেমালে সারি॥
একেবারে হইব না এই সুখহত।
আদ্‌বুড়া-কালে খাব আদ্‌পাকা যত॥
শীতল সুস্বাদু অতি ফল অগ্নিকর।
মুখের বৈরস্য হবে বহুগুণধর॥
নাশে বায়ু পিত্ত কফ রক্ত ক্রিমি শূল।
হৃদয়ের পীড়া নাশে হয়ে অনুকূল॥
যে করিল পেয়ারায় এত গুণধাম।
তার লয়ে তার পায় করহ প্রণাম॥
দুই কন্যা অরূপ রূপের মাধুরী।
কাবেলে বিরাজ করে বেদানা সুন্দরী॥
মঙ্গল করেন তিনি মঙ্গলের দেশে।
কনিষ্ঠা দালিম নাম পাটনায় এসে॥
স্থিরচক্ষে চেয়ে দেখি উদ্যানের গাছে।
এমন মধুর ফল আর নাকি আছে॥
ত পাই তত খাই নাহি মিটে সাধ।
কিন্তু মনে দুঃখ এই বীচি যায় বাদ॥
ক বলে রসিক বিধি অতি রসময়?
সময় হলে পরে হেন কেন হয়?
সবোধ নাই তোর তাই বলি ছি ছি।
ধাতা এমন ফলে কেন দিল বীচি?
উদর পবিত্র হয় যার রস খেলে।
খতে খেতে তার বীচি দিতে হয় ফেলে!
ভাবের অস্ত্রযোগে অপরূপ কাঁটা।
রু বর্ণে বিভূষিত চউচির কাটা॥
ষ্টমাত্র বোধ হয় কে দিয়াছে কেটে।
মন অমৃত ফল কেন যায় ফেটে?
রসিক লোক সব করে অনুমান।
শ-দোষে দাড়িমের নাহি থাকে মান॥
নাদার নহে যত খোট্টা তালকাণা।
ভিমানে ফেটে তাই দেখাইছে দানা॥

পুনর্ব্বার ভাবি আর এ প্রকার নয়।
বধাতার অবিচার দেখি সমুদয়॥
যুবতীর হৃদয়েতে পয়োধর রয়।
দালিমের বাসস্থান বৃক্ষ কাঁটাময়॥
মানিনী রূপসী রামা আপনার দুঃখে।
অভিমানে ফেটে তাই থাকে অধোমুখে॥
দান করি ভাণ্ডারের সকল রতন।
একেবারে করিতেছে শরীর পতন॥
ফাটিবার আর এক আছে অভিপ্রায়।
ইঙ্গিতে বালকগণে করে "আয় আয়॥
আমার নিকটে আয় ওরে শিশুগণ।
মিছে কেন পান কর প্রসূতির স্তন?
চুষিলে আমার বীচি বুড়া থাকে বশে।
কোথা ইন্দু সুধাসিন্ধু একবিন্দু রসে?
আমার মধুর রস একবার খেলে।
আর তোরা হবিনেকো জননীর ছেলে॥"
শুন রে দালিম এই করি নিবেদন।
আমাদের প্রতি কর প্রীতি-বিতরণ॥
স্বভাবে মহৎ তুমি উপাদেয় ফল।
সেখানে তোমার থেকে নাহি কোন ফল॥
বড় বড় বাঙ্গালীরা যত বাবু ভেয়ে।
গাহিবে তোমার যশ গাছপাকা খেয়ে॥
সেইতো শেষেতে তুমি স্বদেশে না রও।
পোস্তার বাজারে এসে বস্তাপচা হও॥
অন্তরে তোমার প্রতি অতিশয় স্নেহ।
পচা বোলে ঘৃণা করে নাহি খায় কেহ॥
'মধুবীজ সুফল রোচন কুচফল।
মণিবীজ রক্তবীজ আর বৃত্তফল॥
নিদানে লিখিত আছে এই সব নাম।
গুণভেদে নাম দিলে বৈদ্য গুণধাম॥
সকল রোগের পথ্য পাকা হলে পর।
ত্রিদোষ বিনাশ করে হরে দাহ-জ্বর।
শুক্র বল বৃদ্ধি করে তারে সুমধুর।
হৃৎ-কণ্ঠ মুখরোগ সব করে দূর॥

শীতল অথচ উষ্ণ পাকে লঘু হয়।
কাস কফ পিত্ত বাত তৃষ্ণা করে ক্ষয়॥
শ্রম হরে রুচি করে অগ্নি করে পাকে।
দাড়িমের মহিমা জানাব আর কাকে॥
কেবল মধুর হলে হিত করে কিছু।
হইলে অম্লমধু পিত্ত করে কিছু॥
পিত্তের জনক হয় হলে পরে টক।
ফলত সে ফল বাত-কফের নাশক॥
ডালিমের ক্ষেতে গেলে সফল নয়ন।
তাকায় সেদিকে কেটা পাকায় যখন॥
ইচ্ছা করে শুয়ে থাকি গাছের তলায়।
কেবল আহার করি গলায় গলায়॥
দিশীতেই খুসী কত্ত দেখি যথা তথা।
পাপমুখে কি কহিব "বেদানার" কথা?
সাধুরে "কাবেল" তোর সদাই মঙ্গল।
মঙ্গলের দেশে এই অঙ্গলের ফল॥
বেদানার দানারস পেটে যায় যার।
সাধু সাধু সাধু তারে করি নমস্কার॥
দেখ এর গাছ কত হিতের কারণ।
পাতা ছাল শিকড় ঔষধে প্রয়োজন॥
গাছ দেখ ফল দেখ ছাল দেখ তার।
ফলভোগ করি কর ফলের বিচার॥
চাকো চাকো রস লও ফল হাতে লয়ে।
ভুলে আর বেড়ায়ো না "ফলচাকা" হয়ে॥
তবেই সফল সব যদি হয় ফল।
ফলেই ফলাই ফল না হয় বিফল॥
যদি বল যে গাছেতে ফল ফলিয়াছে।
দেখিতে না পাই গাছ, কত দূরে আছে॥
কি ফল বিফল ভাই গিয়ে তার কাছে?
ফল ধোরে ফল পাবে, ফল নাই গাছে॥
অনেক যতনে তোরে রসময় আতা।
বিশেষ বিরলে বসি গড়েছেন ধাতা॥
সুচারু শ্যামল বর্ণ সুশোভিত পাতা
মনোহর কলেবর অতি সুখদাতা॥

হৃদয়ে ধরেছে তোরে বসুমতী মাতা।
প্রণাম করিছি তাঁরে কোরে হেঁট মাথা॥
থোপ্ থোপ্ টোপ গাঁথা, সকল শরীরে
কেমকের ছাতা যেন, প্রকৃতির শিরে॥
থাকে না রসের লেশ, নব অনুরাগে।
ফুটিফাটা হয়ে যাও পাকিবার আগে॥
তখন বিচিত্র এক রূপ যায় দেখা।
নীরদ ধরেছে যেন পারদের রেখা॥
যার বাড়ী বাস কর সিদ্ধ যার ভিটে।
ত্রিজগতে কিছু নাই তোর মত মিটে॥
কোথায় পায়স ক্ষীর কোথা গুড়পিটে?
ছোট ছোট কুঁষ চুমি মুখে দিয়ে ছিটে॥
যত খাই তত আরো সাধ নাই মিটে।
বীচিভরা সমুদয় কত পাব সিটে?
মনে মনে অতিশয় খেদ আছে ভাই।
পাখীর দৌরাত্ম্যে নাহি গাছপাকা পাই॥
এমন বজ্জাৎ চোর আর নাকি আছে।
উড়ে এসে জুড়ে বসে সমুদয় গাছে॥
কিচিমিচি ডাক ছাড়ে বিষম বিকট।
ভোজ্‌পুর কোথা আছে তাদের নিকট?
গাছেতে পাকিলে তুমি মানুষে না পায়।
যোগেযাগে জাগ দিয়া তোমায় পাকায়॥
যেরূপেতে পাক তুমি ক্ষতি তাহে নাই।
আশার সময়ে তোরে খেতে যেন পাই॥
বায়ু পিত্ত উভয়ে তোমাতে হয় হত।
কিঞ্চিৎ বিরাগ করে কফোধেতো যত॥
দেখিলে তোমার মুখ লোভ অতি বাড়ে।
বিকার স্বীকার তবু তোমায় না ছাড়ে॥
পবনের প্রবলতা আমাদের খেতে।
কোনরূপে ভয় নাই কত সুখ খেতে॥
শিশিরে মোফলা তুমি অতি সুমধুর।
মুখে গিয়ে অরুচির রুচি করে দূর॥
এসেছে কাবেল হতে সুধার আঙ্গুর!
মানস মোহিত হেরে রূপের অঙ্কুর॥

সমাদরে রাখে তারে কৌটার ভিতর।
তুলার তোষক গদী করে থর থর॥
তথাচ গলিয়া যায় এমন কোমল।
রুচির রজতরূপ করে ঝলমল॥
বহুমূল্য ফল এই তুল্য যার নেই।
সাধ পূরে স্বাদ লয় ভাগ্যধর যেই॥
গরীবে জানে না নাম দূরে থাক্ মুট্।
দাম শুনে রাম বলে উঠে দেয় ছুট॥
বধূর অধরে এত মধুর কি আছে?
সুরসের উপমেয় হবে এর কাছে?
মৃতকে অমৃত করে অমৃতের কোষ।
সমুদয় গুণময় কিছু নাই দোষ॥
রোগভেদে পথ্য নয় করিব স্বীকার।
দেহ যার সুস্থ তার সুখের আহার॥
গালে দিয়ে স্থির হবে যে লইবে তার।
সে জন জানিবে শুধু কত গুণ তার॥
স্মরিবে বিভুর গুণ মন করি স্থির।
গলিবে প্রেমের রসে টলিবে শরীর॥
সুখের সুফল পেস্তা বীচি নাই বাছা।
কুট্ কুট্ দাঁতে কেটে খেয়ে ফেল কাঁচা॥
ভাজিলে সুস্বাদ আরো সোঁদা গন্ধ ছোটে।
ভোজনের কালে মনে কত সুখ ওঠে॥
পেস্তার মেঠাই অতি, উপাদেয় হয়।
আস্বাদনে তার সম আর কিছু নয়॥
পাকে গুরু, গুণেতে গরম অতিশয়।
বল-বীর্য্য বৃদ্ধি করে পিত্ত করে ক্ষয়॥
আর আর যত মেয়া পেকেছে এ শীতে।
সকলেরি জন্মলাভ আমাদের হিতে॥
কত তরী সুখভোগ যে করে আহার।
পণ পেয়ে বিক্রেতার কত উপকার॥
কতরূপে কৃষকের হতেছে কুশল।
বণিকের বাণিজ্যেতে মানস সফল॥
তাম্রকূট তরু চারু দৃশ্য সুখ তায়।
সার সারি বাতাসের সুরে সারি গায়॥

এক পত্রে কত গুণ পত্রে লেখা তার।
সেই জানে যে পেয়েছে তামাকের তার॥
শুকাইলে পত্র তায় গুড় মিশাইয়া।
ফুড়ুক্ ফুড়ুক টানি গুড়ুকে করিয়া॥
কত কত মহীপাল উজীর নবাব।
তামাকে আদর করে ফেলিয়া কাবাব॥
শ্রম চিন্তা উভয়ের বিশ্রামের বাটী।
বুদ্ধির প্রদীপে ইনি, উস্কিবার কাঠী॥
বড় বড় সাহেবেরা করেতে ধরিয়া।
মধুর অধরে ধরে চুরুট করিয়া॥
ধূম্রপান আস্বাদান যে জন না পান॥
বদন-সদনে দেন যুক্ত করি পান।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুরঞ্জিত অধ্যাপক যাঁরা।
সদাকাল সঙ্গী করি, সঙ্গে লন তাঁরা॥
না লইলে সর্ব্বনাশ নাম তার 'নাস।
বিচারের স্থানে হয় বুদ্ধিশুদ্ধি নাশ॥
পণ্ডিতেরা আছে শুদ্ধ নস্যগুণে বেঁচে।
নাকে দিয়া রাখে প্রাণ হ্যাঁচ হ্যাঁচ হেঁচে॥
বিশেষত ধনীলোকে সার গুণ জানে।
পেঁচাও কৌশল মাসে পেঁচোয়ার টানে॥
আল্‌বোলা বোল্‌বোলা বৃদ্ধি খুব পায়।
শীতকালে বন্ধু তার তাম্রকুট ভায়া॥
মোটাবুদ্ধি মোটা টান দুঃখী সব হাবা।
আমাদের ত্রাণকর্ত্তা থেলো আর ডাবা॥
এ শীতে শীতল হয়ে ধনের অভাবে।
কড়া টেনে কড়া হই কড়ার হিসাবে॥
শিশিরে তামাকে টান যে জন না লয়।
ভাবি তার কিরূপেতে দিনপাত হয়॥
ক্ষণমাত্র যুক্ত নহে ধূম্র আর জলে।
বুদ্ধির জাহাজ তার কিরূপেতে চলে?
নাসে নাশে পিত্ত, কফ বায়ু রাখে স্থির।
ধূম্রপানে সুখী হন সকল সুধীর॥
মুখ-রোগ হরে করে দাঁতের কুশল।
দন্তরোগে রোগী নয় "চুরুটে" সকল॥

দিবানিশি "পিকা" খায় জালিয়া অনলে।
দাঁতপড়া বুড়া নাই উড়ের মহলে॥
কত সব নারী নর দোক্তা খায় পানে।
দন্ত-সুখ, মুখ-সুখ তারা ভাল জানে॥
রসে তিক্ত, ক্রিমি-কাস-রোগের নাশক।
সতত্তই রুচিকর অগ্নির দীপক॥
গুড়ুকের গুণ মুখে ব্যাখ্যা নাহি হয়।
শোকহর প্রেমকর প্রিয় অতিশয়॥
পুলকে পূরিত করে কবির হৃদয়।
টানিতে টানিতে ভাবে ভাবের উদয়॥
ভাব হয় অনুকূল বচন-রচনে।
যত টানি টানাটানি নাহি হয় মনে॥
বল করে বুদ্ধি করে করে পরিপাক।
কেমনে ভুলিব আমি এমন তামাক?
যে করে লেখক হয়ে ভাবের প্রয়াস।
মন খুলে হোক্ সেই গুড়ুকের দাস॥
কফ আমজ্বর হরে শুদ্ধ করে মুখ।
কোনরূপে দুঃখ নাই সব দিকে সুখ॥
গীতবাদ্য নৃত্য যারা করে আলোচন।
তামাক তাদের পক্ষে পরম রতন॥
এ তামাকে যে করিল এত গুণময়।
তার প্রেমে মন আর প্রাণ কর লয়॥
রসনা বেড়েছে শীতে ভোগের কারণে।
অভয়ে আমিষ খাও হরষিত-মনে॥
কর মাস খাও মাস উদর ভরিয়া।
যত পার খাও মাছ যতন করিয়া॥
পরিপাক পাবে সব করিলে আহার।
অমল হয়েছে জল ভাবনা কি আর?
নিশিতে নিদ্রার আর কে করে ব্যাঘাত।
ঘুমে চোক্ পচে তবু না হয় প্রভাত॥
প্রাতে উঠে ঘুরে ফিরে ফিরে এলে ঘর।
তখনি হইতে হয় ক্ষুধায় কাতর॥
মাস মাছ ডিম খাও রুচি যার যাতে।
সকুলি কুশলকর রুটী আর ভাতে॥

এই শীতে "হংসবীজ" অতি মনোহর।
পাকে লঘু বাতহর বলবীর্য্যকর॥
রূপেতে মোহিত করে মহিমা অসীম।
সর্ব্বদোষ নাশ করে এ হাঁসের ডিম॥
সিদ্ধ খাও ভাজা খাও সব দিকে হিত।
ব্যঞ্জন করিয়া খাও আলুর সহিত॥
অতিশয় রুচিকর এ বীজের "দম"।
গোটাকত খেতে হলে নিতে হয় দম॥
ঘৃণায় যে নাহি খায় এ হাঁসের ডিম।
মরুক্ সে চিরকাল খেয়ে তেতো নিম॥
বৃথায় রসনা তার বৃথা তার মুখ।
কোনকালে নাহি পায় আহারের সুখ॥
ডিমভরা কাঁকড়া এ শিশির সময়।
আহারেতে উপাদেয় অতি সুধাময়॥
সে ডিমের গুণ আমি কি কব বদনে?
মোহিত হয়েছে মন লোহিত বরণে॥
ডিম খাও সাঁস খাও খোসা দেও ফেলে।
বল করে বায়ু হরে পিত্ত হরে খেলে॥
বিশেষ রয়েছে গুণ কাঁকড়ার মাসে।
হাড়েতে জন্মিলে দোষ সেই দোষ নাশে॥
যেরূপে রাঁধিয়া খাও উপকার হয়।
অলাবুর সহ তার অধিক প্রণয়॥
ভাগ্য যার ভাল সেই খেয়ে গায় যশ।
মর্কট জানিবে কি সে কর্কটের রস?
জলের ভিতরে মাছ কত রসভরা।
দাড়ী গোঁপ জটাধারী জামাযোড়া পরা॥
শিরে অসি কাঁটাহীন গন্ধ নাই গায়।
আগা গোড়া মধুমাখা মধু তার পায়॥
বিশেষতঃ শীতকালে অমৃতের খনি।
আমিষের সভাপতি মীন-শিরোমণি॥
গলদা চিঙড়ী মাছ নাম যার মোচা।
পড়েছে চরণতলে এলাইয়া কোঁচা॥
কালিয়ে পোলাও রাঁধো রাঁধো লাউ দিয়া।
তাতে খাও ভেজে খাও হবে মুখপ্রিয়া॥

ভিতরে থাকিলে ডিম কি কহিব আর?
ত্রিভুবনে নাই হেন সুধার আহার॥
স্বভাবে রোচক হয়ে বল বৃদ্ধি করে।
স্বাদে সুধা পাকে গুরু মেদ পিত্ত হরে॥
দীনের তারণকারী চিঙড়ীর ঘুষো।
সুমধুর বাতহর পয়সায় ছুশো॥
মূলক বেগুণ শাক যাতে তাতে লহ।
সমভাবে সদালাপ সকলের সহ॥
অধম পুঁয়ের ডাটা তারে নিয়া তারে।
ব্যঞ্জন মজাতে আর এমন কে পারে?
শুকায়েছে ঝিল বিল খাল সরোবর।
বাজারে বিক্রয় হয়, চুনা বহুতর॥
টেঙরা মৌরলা পুঁটি বেলে আর চাঁদা।
পাঁকাল প্রভৃতি কত রাঙা কালো শাদা॥
এই শীতে তারা অতি উপকারী হয়।
গ্রহণীরোগের পথ্য নাশে দোষত্রয়॥
স্বাদুরসা লঘুপাকা রুচিকর আর।
বল শুক্র করে করে বাতের সংহার॥
কে জানে অম্বল ঝোল কেবা জানে ভাজা।
যাতে খাও তাতে সুখ যদি হয় তাজা॥
মীনরাজ রোহিত অহিতকর নয়।
সমভাবে সমাদর সকল সময়॥
বিশেষ বেড়েছে গুণ শীতকাল পেয়ে।
হয়েছে সে অতি মিঠে মিঠে জল খেয়ে॥
কাতলা মৃগেল আদি বড় মাছ যত।
রুয়ের শ্রীপদতলে সবাই প্রণত॥
কতরূপ সুখোদয় ভোজনের বেলা।
তেল কাঁটা আদি করি নাহি যায় ফেলা॥
কামুকের কত সুখ কুলটার কোলে।
রসনা সে সুখ পায় এ মাছের ঝোলে॥
পঞ্চাঙ্গের রাজা মাছ না হয় এমন।
সুধার আধার এই রুয়ের ব্যঞ্জন॥
বল দেয় বুদ্ধি দেয় বাত নাশ করে।
নয়নের জ্যোতি বাড়ে মুড়া খেলে পরে॥

চক্ষুরোগা যারা তারা গুণ জানে ভালে
মুড়া খেয়ে সুখে দেখে অন্ধকারে আলে
যার জলাশয়ে রুই থাকে অনিবার।
সাধু সাধু সাধু সেই মানবের সার॥
লাউ আলু বেগুণ বাজারে দেখে ভ
কই কই? কই কই? করিছে সবাই॥
কেহ যদি কহে ওই আসিয়াছে কই।
দেখিতে দেখিতে শেষ করে কই কই॥
কেহ কয় কাঁটাময় সাঁস তাতে কই।
এই হেতু এই কই নাম পেলে কই?
আমি কই এর সম ত্রিজগতে কই।
কই নামে নাম দিয়া কই কই কই॥
সকল গুনের নিধি দোষ ইথে কই?
যত পার পেট ভরে সুখে খাও কই॥
এমন মধুর মাছ নাহি হয় আর।
রোগী ভোগী উভয়ের সম উপকার॥
যুবকের কত সুখ যুবতীর কোলে?
কত বা অমৃত আছে বালকের বোলে,
কত বা আমোদ হয় পূর্ণিমার দোলে।
সকল আমোদ এই মাগুরের ঝোলে॥
বায়ু নাশ করে হরে অর্শ অতিসার।
অথচ করে না কফ-পিত্তের সঞ্চার॥
মাগুরের ছোট ভাই শিঙি নাম যার।
হিন্দুর নিকটে নাই সমাদর তার॥
ফলে হয় গুণময় ইহার সমান॥
যবনে মহিমা জানি রাখিয়াছে মান॥
ভেটকী, ভাঙ্গন রাটা পারিসার বাঁ
আমলেট্ আদি করি মাছের কি জাঁক
বাজারে বাজারে দেখ সবার আদর।
সকলেই কিনিতেছে দিয়া দুনা দর॥
লোণা গাঙ্গে জন্ম লয়ে এ সকল মীন।
হইতেছে আমাদের পেটের অধীন॥
সকল সুখাদ্য হয় অতি উপকারী।
পৃথকের গুণে আমি যাই বলিহারি॥

শীতকালে সুখী সেই কড়ি আছে যার।
নের যোগেতে হয় ভোগের আহার॥
বন যাহার ভরা ধান্য আর ধনে।
অনায়াসে কিনে খায় যাহা লয় মনে॥
পাড়াগাঁয়ে গঙ্গাতীরে যারা করে বাস।
ভালরূপে খায় তারা এই কয় মাস॥
উঠিয়াছে নেটাবেলে বেলে গুড়গুড়ি।
এক আনা পণে পাই মাছ এক ঝুড়ি॥
বেগুণেতে মজে ভাল চড়চড়ি তার।
ভুলিতে কি পারে কভু যে পেয়েছে তার?
লুদের জলে ঝোল এক ফোঁটা ঝাল।
শুধু চড়চড়ি কর কাঠে দিয়া জ্বাল॥
এমন মধুর আর পাবে না পাবে না।
হন মৎস্যরা আর খাবে না খাবে না॥
রের ধনী লোক পেতে নাহি পান।
ত্তরে মিঠের জলে বসতির স্থান॥
গাগাঙ্গর দূরে থাক সে দেশের দীন।
মীনে আহারে সুখী নহে কোন দিন॥
জা তাজা তরকারী তাহে নেটেবেলে।
মুক্তর আর খেসে পেট দেয় ফেলে॥
চে যদি গুণ নিয়ে খেতে নাহি পাই।
ছা করে এখনি নগর ছেড়ে যাই॥
দেশে আমার বাস যে দেশে এ মাছ।
চিনার কাছে গিয়া কিনি বাছে বাছ॥
ক করি নিয়ে আসি নিজে বাঁধি ভাই।
প পূরে একদিন পেট ভোরে খাই॥
ন মনে আশা তাই এই বেলা যেতে।
তকাল গেলে আর পাবনাকো খেতে॥
গরের কালে হয় অতিশয় তোষ।
তি গ্রাসে মুড়া খাই কিছু নাহি দোষ॥
নয়ন জুড়ায় দেখে অতি প্রেমকর।
রার পেট যেন ময়রার ঘর॥
রের ডেলে তার তার যায় মেতে।
কা তাঁরা ঘর-ভাজা মজা বড় খেতে॥

মানবের উপাদেয় আহার-কারণ।
জলে করিলেন বিভু মীনের সৃজন॥
সব দিকে উপকারী এই জলচর।
আহার ঔষধ মীন পথ্য শুভকর॥
সলিল-শাখীর এই ফল সুধাময়।
দেবের দুর্ল্লভ ধন এমন কি হয়?
যে দেশেতে যে প্রকার খাদ্য হয় বিধি।
সে দেশে প্রচুর তাই দিয়াছেন বিধি॥
ভাত মাছ খেয়ে বাঁচে বাঙ্গালী সকল।
ধানভরা ভূমি তাই মাছভরা জল॥
এ দেশের খাদ্য এই যদি নাহি হবে।
এত ধান এত মাছ কেন বল তবে?
যে করিয়াছে শস্য আর মাছ বিতরণ।
কৃতজ্ঞতা-রসে তার ডুবে কত মন॥
মৃগ মেষ ছাগ কূর্ম্ম পাখী জলচর
কয় মাস কয় মাস অতি শিবকর॥
মাংসের বিশেষ গুণ নিদানে প্রকাশে।
বল করে রুচি করে কফ করে নাশে॥
শ্রমী আর অগ্নিবলী এই উভয়ার।
তরস (মাংস) ভোজনে হয় কত উপকার॥
অজীর্ণ গ্রহণী অর্শ আর যক্ষ্মাকাস।
এ সব বিনাশ করে প্রসহের মাস॥
সকল প্রসহ মৃগ ভাল কিছু নয়।
তাই খাবে শুভ আর প্রেম যাহে হয়॥
ছাগল ভোজনে হয় পাগল সবাই।
যার চেয়ে পোষকর রক্তকর নাই॥
অতিশয় সুশীতল পাকে হয় ভার।
নহে বায়ু-পিত্ত কফ দোষের আধার॥
মেষমাস ভার বটে শীতল মধুর।
আহারে আহ্লাদ বাড়ে দুঃখ হয় দূর।
তরুণ মেষের অতি মনোহর ক্ষীর (মাংস)।
তার কাছে কোথা আছে চিনিমাখা ক্ষীর?
বনচর বনচর পাখী আছে যত।
হরিয়াল চকা ডাক আদি শত শত॥

এ সব আহারে হয় দেহের কুশল।
ক্ষীণতা বিনাশ করে বৃদ্ধি করে বল ॥
কত মতে শুভ হয় কচ্ছপের মাসে।
বল-মেধা-স্মৃতিকর শোথ-দোষ নাশে ॥
সহজে কোমল অতি নানা গুণধর।
বাতহর শুক্রকর নেত্র-হিতকর ॥
শিশিরে মৃগের মাস প্রিয় অতিশয়।
বাত হরে অগ্নি করে পাকে লঘু হয় ॥
সন্নিপাত হরে করে শরীর সবল।
ছয় রসে অনুকূল মধুর শীতল ॥
কফ পিত্ত হরে করে ত্রিদোষ খণ্ডন।
আহা মরি কত গুণ ধরে সুলোচন ॥
কৈলাস-শিখরে থেকে হয়ে হৃষ্টমন।
হরিণ (শিব) করেন সুখে হরিণ ভোজন ॥
অতিশয় প্রিয় ভেবে এই কৃষ্ণতার (হরিণ)।
কতবার লয়েছেন কৃষ্ণ তার তার ॥
মৃগয়ার ছলে বাধ কাননে হরিণ।
আনন্দে দিলেন তাহা উদরে হরিণ (বিষ্ণু)।
এ হরিণ বাসি হলে মন্দ নাহি লাগে।
বিচালির সহ জলে সিদ্ধ কর আগে ॥
পরে সেই জল আর খড়গুলি ফেলে।
ভাল কোরে ভেজে লও সরিষার তেলে ॥
মেটে আর পচাগন্ধ দূর হবে তায়।
রীতিমত রাঁধো শেষ, ঘৃতামসলায় ॥
পচা মাসে পুঁই-খাঁড়া সুধার সমান।
জন সুখে খায় যে জানে সন্ধান ॥
কাননের নিকটেতে বাস করে যারা।
তাজা তাজা মৃগমাস খেতে পায় তারা ॥
পোকাপড়া পচাসড়া হেথা আসে যত।
পচা খেয়ে গুণ আর রচা যাবে কত ?
মাংসভোগ রাজভোগ ভোগের প্রধান।
আহারেতে নাহি কিছু ইহার সমান ॥
বলকর বুদ্ধিকর সর্ব্বগুণধর।:

যে মাসে যাহার রুচি তাই খাও সুখে।
কোনকালে নিন্দা-কথা এনোনাকো মুখে
ছাগ মেষ মৃগ শৃঙ্গী খাবে প্রেমভরে।
আহারের পাঠ যেন না উঠে উপরে ॥
তাহাতে যে সব দোষ জানেন প্রবীণ।
সাবধান-পথে চল সকল নবীন ॥
জীবন হতেছে রক্ষা যার দুগ্ধ খেয়ে।
কল্যাণকারিণী সেই জননীর চেয়ে ॥
শাস্ত্রে যাহা মানা করে যুক্তি তায় নানা
বিচার করিলে যায় সহজেই জানা ॥
নিত্য যারা মাংস খায় হয়ে প্রেমাধীন
বলী তারা জ্ঞানী তারা সদাই স্বাধীন ॥
যে নর না মাংস খায় পেয়ে কলেবর।
বৃথায় শরীর তার বৃথায় উদর ॥
আমিষ-আহারীদলে কোন দুঃখ নাই।
মাংসভোজী পশু পাখী সবল সবাই ॥
ইউরোপ আদি কার ব্রহ্ম আর চীন।
মাংসবলে বাহুবলে সদাই স্বাধীন ॥
ভারতে যখন ছিল ব্যবহার কার।
বোদ্ধা ছিল যোদ্ধা ছিল সবে ছিল বীর
ধন, মান, যশ, ভাগ্য স্বাধীনতা-সুখ।
সমুদয় ছিল নাহি ছিল কোন দুখ ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চতুষ্টয়।
ছিলেন আমিষভোজী হিন্দু সমুদয় ॥
প্রচুর প্রমাণ তার নানা গ্রন্থে আছে।
সকলেই প্রিয় ছিল মাসে আর মাছে
মাংস মাছ হিতকর যদ্যপি না হবে।
বৈদ্যশাস্ত্রে এত গুণ কেন লেখে তবে
সব দেশে সব শাস্ত্রে ভিষক্ নিপুণ।
লিখেছে বিশেষ করে আমিষের গুণ ॥
আমিষ-ভোজনে যদি না হইত শিব।
বিস্তারিয়া গুণ কেন লিখিবেন শিব।
যে মানব ঘৃণা করে আমিষ আহারে।
পশু বলে সম্বোধন করেছেন তারে ॥

জীবের কারণে হলো জীব স্বতন্তর।
খাদ্য আর খাদক সম্বন্ধ পরস্পর॥
প্রকৃতির শাস্ত্র দেখ শাস্ত্র বটে এই।
যুক্তির বিচারে কোন ব্যতিক্রম নেই॥
ঈশ্বরের অভিপ্রায় মাংস খাবে নর।
সুন্দর কৌশল তাই মুখের ভিতর॥
রদনে অদন-সুখ বদনে প্রকাশে।
"পশুরাজ-দন্ত" সম দন্ত দুই পাশে॥
প্রমাণ প্রত্যক্ষ দেখে ভ্রান্ত তবু জীব।
হায় হায় নাহি বুঝে নিজ নিজ শিব॥
এ মতের বিপরীত কথা যারা কয়।
তাদের সে নীচ উক্তি গ্রহণীয় নয়॥
সে যে মত মত নহে মন্দ অতিশয়।
কে বলে অক্ষয়-মত কে বলে অক্ষয়?
প্রণিধান কর সবে গুণের বিচারে।
সে মত অক্ষয় হলে ক্ষয় বলি কারে?
অক্ষয় অক্ষয় মত ভেবে ভ্রমে বয়।
ক্ষয় যাতে ক্ষয় পায় সে নয় অক্ষয়?
আমিষ অবিধি বলে যে করেছে গোল।
সে এখন নিত্য খায় শামুকের ঝোল।
নদে শান্তিপুর ফিরে ফিরিয়া হুগলী।
শেষ করিয়াছে যত দেশের গুগলী॥
নিরামিষ আহারেতে ঠেকেছেন শিখে।
ঘুরিতেছে মাথামুণ্ড মাথামুণ্ড লিখে॥
কোথা তাঁর "বাহ্যবস্তু" মানব-প্রকৃতি।
এখন ঘটেছে তায় বিষম বিকৃতি।
উদরের রোগে আর অর্শে পায় দুখ।
দিবানিশি মাথা ঘোরে সদাই অসুখ॥
মত চালাবার তরে লিখিলেন বই।
এখন সে লিখিবার শক্তি তাঁর কই?
কলম ধরিলে হাতে মাথা যায় ঘুরে।
রচনার কালে আর কথা নাহি স্ফুরে॥
মাস মাছ বিনা আগে ছিল না আহার।
কিছুদিন করিলেন বিপরীত আর॥
শেষেতে পেলেন তার সমুচিত ফল।
ভাসালেন বল বুদ্ধি হাসালেন দল॥
সমাজ হাসিছে তাঁর ভাব এঁচে এঁচে।
ঘরে তুলে পাকা ঘুঁটি বসিলেন কেঁচে॥
দায়ে পড়ে পূর্ব্বভাব ধরিলেন পিছু।
শুধু মাছ মাস নয় আরো আছে কিছু॥
সমুদয় ফুটে লেখা না হয় বিহিত।
মসলা চলেছে কত পানের সহিত॥
ছেড়ে দেও ছেলে-খেলা ফেলে দেও "কুম।"
মাস মাছ ভাত খেয়ে সুখে দেও ঘুম॥
করোনাকো ধূমধাম টুমটাম আর।
ছিঁড়ে ফেল "বাহ্যবস্তু" সে মত অসার॥
মাখিতেছ "বিষ্ণুতেল" তাই মাথ গায়।
আর যেন ভেবে ভেবে নাহি ঘটে দায়॥
পাকতেল মাখ আর নিত্য কর স্নান।
সেরূপ আহার কর যা হয় বিধান॥
কোটি কোটি গ্রন্থকার লিখিছেন যাহা।
"কুম" ধরে একা কেন কাট তুমি তাহা?
মনে কর যতদিন সৃষ্টির বয়েস।
তত দিন আছে এই মতের আদেশ॥
দ্রব্যের যে গুণ হয় সব যায় জানা।
যাহে যার রুচি কেন তুমি কর মানা?
দেশ-দেহ-রোগ-ভেদে খাদ্যের বিধান।
কেমনে করিবে তুমি বিরূপ প্রমাণ?
গুরু হয়ে উপদেশে করিয়াছ গোঁড়া।
মিছা মতে আনিয়াছ গোটা কত ছোঁড়া॥
তোমার হইয়া চেলা গুরু যারা বলে।
তারা যেন এই মতে আর নাহি চলে॥
ওহে ভাই যদি চাও নিজ উপকার।
অক্ষয়ের মতে তবে চলোনাকো আর॥
শেষে তুমি চেলা হও মন করি কষা।
আগে গিয়ে দেখে এসো গুরুজীর দশা॥
সেই গুরু গুরু হয় গুরু বোধ যার।
গুরু নিজে লঘু হলে কিসে হবে ভার?

"রাজসিক' এই ভোগ দিয়াছেন যিনি।
নানারূপে জ্ঞানময় দয়াময় তিনি॥
সুখে যদি না হইবে মঙ্গল তোমার।
জ্ঞানী লোকে করিত না বিধান প্রচার॥
যিনি সর্ব্বশিবময় সর্ব্বমূলাধার।
ভোগ পেয়ে কর তাঁর মহিমা প্রচার॥
কোন দিকে নাহি দেখি কিছুর অভাব।
সুব্যয় সম্পাদন করিছে স্বভাব॥
সর্ব্বকালে ভবধব দীন দয়াময়।
সমভাবে আমাদের আছেন সদয়॥
বিশেষ এ শীতকালে দয়া দেখ তাঁর।
করিলেন ধরণীরে শস্যের ভাণ্ডার॥
ফল মূল শস্য কত আমাদের দেশে।
আগে খাও পরমান্ন পরমান্ন শেষে॥
আস্বাদনে রসময়ী হইবে রসনা।
মন খুলে কর তাঁর মহিমা ঘোষণা॥
প্রেমময় পীযূষ তাঁর সুখে কর পান।
ভাবভরে উচ্চস্বরে কর গুণ গান॥
ডাকো তাঁরে কৃপাময় প্রাণনাথ বোলে।
কৃতজ্ঞতা-রসে যাও একেবারে গোলে॥

ক্রোধ।

(প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক হইতে)

ওরে এরা কেরে দুরাচার!
অতি কদাকার দেখি অতি কদাকার।
কি সাহসে দাঁড়াইল সম্মুখে আমার॥
ধর্ ধর্ সর সর, ওরে এরে ধর্ ধর্,
কাট্ কাট্ কেটে ফ্যাল্ মার মার মার।
পাশে এসে ঘেঁসে ঘেঁসে, বসেছে নিকটে এসে,
গদি ঠেলে হেসে হেসে করে কি ব্যাভার॥
কিছু নাহি করে ভয়, ঘাড় নেড়ে খাড়া রয়,
বুক চিতে কথা কয় এত অহঙ্কার।
অতিনীচ দুরাশয়, আমার সমান হয়,
কত বড় লোক আমি করে না বিচার॥
সহিতে না পারি যাহা, সকলেই করে তাহ
কোনমতে ছাড়িব না কিসে পাবে পার।
এ ব্যাটা চড়েছে গাড়ী, এ ব্যাটা রেখেছে দা
ঠিক যেন তোলো-হাঁড়ী মুখ ভার ভার॥
দারা সহ যোগ করি, যদ্যপি স্বভাব ধরি,
এ জগতে বল তবে রক্ষা থাকে কার?
কে পারে আমার চোটে, মুখে যেন খই ফে
স্বর্গ মর্ত্ত্য কেঁপে ওঠে ছাড়িলে হুঙ্কার॥
মহাবীর আমি ক্রোধ, বোধের কি রাখি
জনমের মত তারে করেছি সংসার।
উপরোধ অনুরোধ, হিতাহিত বোধা
কোন কালে আমি কারো ধারি নাকো ধ
পিতা মাতা বন্ধু ভাই, কিছুই বিচার
যখন যাহারে পাই তখনি প্রহার।
যে আমারে হিত বলে, তাহা শুনে অঙ্গ জ
আগে যেন গালে গিয়ে চড় মারি তার॥
কত কত রাজকুল, কাহারো রাখিনি
করিয়া জ্ঞানের ভুল হয়েছি প্রচার।
পরস্পর আপনারা, বিবাদে পড়েছে ম
শোক পেয়ে দারাসুত করে হাহাকার।
বিধি হর মুরহর, হইলে আমার
অন্ধ হয়ে একেবারে দেখে অন্ধকার॥

অহঙ্কার।

(প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক হইতে)

রূপে গুণে মানে, ধন-পরিম
আমার সমান কেবা।
দেখ শত শত, দাস দাসী
সতত করিছে সেবা॥
দারা সুত ভাই, দুহিতা জাম
পরিবার দেখ যত।
জ্ঞাতিগণ যারা, অনুগত জা
কুলীন কুটুম্ব কত॥

াকা দিয়ে গালি, কত দিই গালি,
কথনো করে না রাগ।
ুখের ধমকে. সকলে চমকে,
কেঁচো হয়ে থাকে নাগ ॥
নক আমার, গুণের আধার,
ভূষিত ভুবনধাম।
কমন সুকৃতি, আমি হয়ে কৃতী,
ঢেকেছি তাঁহার নাম ॥
কুলের প্রতাপে. ছোট করি বাপে,
বড় হই অনুরাগে।
কুটুম্ব-ভোজনে, বসিলে দুজনে,
ভাত পাই আমি আগে ॥
গৃহের গৃহিণী, আমার জননী,
হাঁড়ী নাহি ছুঁতে পারে।
ারা তার চেয়ে. কুলীনের মেয়ে,
ভাত বেড়ে দেবে তারে ॥
কত বলে বলী, কত ছলে ছলী,
কত কলে আনি চাকি ।
থায় তথায়, কথায় কথায়,
কত জনে দিই ফাঁকী ॥
েখ এ নগরে. প্রতি ঘরে ঘরে,
আমারে কেবা না জানে।
আমা সম নাই, জয়ী সব ঠাঁই,
আমারে কেবা না মানে ॥
কলেই বশ, ভব-ভরা যশ,
দশদিকে আছে গাঁথা।
কুমে হাজির, উজীর নাজীর,
বাদশার কাটি মাথা ॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কুল-পুরোহিত,
আর যত দ্বিজ আছে।
পেলে পড়ে সাড়া, দূরে হয় খাড়া,
ভয়েতে আসে না কাছে ॥
মুরালে নয়ন, কাঁপে ত্রিভুবন,
কেমন আমার ভাব।

কত আমি গুরু, ওই দেখ শুরু,
দিতেছে গুরুর ভাব ॥
আমার সমান, পণ্ডিত প্রধান,
আর কি কখন হবে?
সকলে অশুচি, শুধু আমি শুচি,
একাকী রয়েছি ভবে ॥
নিজ বলে বল, নিজ দল দল,
আপনা আপনি জানি।
কোথা বা ঈশ্বর, নহে সুধাকর,
তারে আমি নাহি মানি ॥
সুখের সময়, সুখের উদয়,
আমা হতে হয় সব।
নিজে আমি বড়, সব দিকে দড়,
কিসে হব পরাভব ॥
মনে যদি করি, স্বর্গ বিদ্যাধরী,
এইখানে আনি বোসে।
যদ্যপি পাছাড়ি, গগনে আছাড়ি,
রবি শশী পড়ে খোসে ॥
কোথা সুররাজ, কোথা তার বাজ,
গোঁপে যদি দিই চাড়া।
সহিত অমর, করি যোড়কর,
এখনি হইবে খাড়া ॥
অসাধ্য আমার, কিছু নাই আর,
সকলি করিতে পারি।
থেকে এই পুরে, খাই সাধ পুরে,
ক্ষীরোদ-সাগর করি ॥
দেবতার স্থল, দিই রসাতল,
ধরা জ্ঞান করি সরা।
দেখা দিয়ে কর, আমার উদর,
চারি পোয়া গুণে ভরা ॥
গুণ আছে যাই, প্রকাশিয়া তাই,
হয়েছি প্রধান ধনী।
সকলেই কর, সব দিকে জয়,
সদা জয় জয়ধ্বনি ॥

এই দেখ নাম, এই দেখ ধাম,
এই দেখ বালাখানা।
এই দেখ পাখা, মখমলে ঢাকা,
কারিগুরী তায় নানা॥
এই দেখ বাড়ী, এই বাড়াবাড়ি,
এই দেখ গাড়ী ঘোড়া।
এই দেখ সাজ, এই দেখ কাজ,
এই দেখ জামা-জোড়া॥
এই দেখ ছাতী, এই দেখ হাতী,
এই দেখ সপ মোড়া।
এই দেখ জন, ·এই দেখ ধন,
সব আছে ঘর-জোড়া॥
কেমন পুকুর, কেমন কুকুর,
কেমন হাতের কোড়া।
কেমন এ ঘড়ী, কেমন এ ছড়ি,
কেমন ফুলের তোড়া॥
দেখ না কেমন, চিকণ বসন,
পেয়েছি আমিই সবে।
মনের মতন, এমন রতন,
আর কি কাহারো হবে?
আঁখি যদি পাড়ে, আমার এ ঝাড়ে,
দোষ দিতে পারে কেটা।
কবি কহে ভালো ঝাড়ে নাই আলো,
ঝাড়ের কলঙ্ক সেটা॥

আমায় ছু সনে, কেউ ছু সনে, কেউ ছু সনে,
রে,
সর্ সর্ সর্ সর্ তোরা সর সর সর সর॥
যত সব দুরাচার, করিতেছে অনাচার,
অতিশয় কদাকার কেহ নহে নর।
ভূত প্রেত সমুদয়, মানুষ কাহারে কয়,
কাজেতে মানুষ নয় মিছে কলেবর॥
কারে কার সম্বোধন, অপবিত্র সর্ব্বজন,
ঘোর পাপা অভাজন নরকের চর।
ঘৃণা হয় গাত্র-বাসে, উকি উঠে বমা আসে
বাতাসে ছুটেছে গন্ধ ভর্ ভর্ ভর্ ভর্।
পচা ভর্ ভর্ ভর্ ভর্॥
আমায় ছু সনে কেউ ছু সনে কেউ ছুঁসনে রে
সর্ সর সর্ সর তোরা সর্ সর্ সর্ সর্॥
জুটিয়াছে হট যত, খট্ মট্ বকে কত
নাহি জানে ভট্ট মত শাস্ত্র সুধাকর।
বৃহস্পতি-কৃত আহা, মধাম-আগম যাহা
কেহ কি করেনি তাহা চক্ষের গোচর॥
মীমাংসা শাস্ত্রের সার, অধিকার আছে কার
সামুদ্রিক আর আর আর মত স্থিরতর।
প্রভাকর মত যত, কেহ নোস্ অবগত
দুর্ দুর্ দুর্ পশু মর্ মর্ মর্ মর্।
তোরা মর মর্ মর্ মর্॥
আমায় ছুঁসনে কেউ ছুঁসনে কেউ ছু সনে রে
সর্ সর্ সর্ সর্ তোরা সর্ সর্ সর্ সর্॥

হিংসা।

(প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক হইতে)

হাদে দেখি ঘরে ঘরে, সকলেই খায় পরে
সুখে আছে পরস্পরে আজো এরা মরেনি।
কত সাজে সাজ করে, গরবেতে ফেটে মরে
এখনো এদের ঘরে যম এসে ধরেনি॥
এই সব জামা-জোড়া, এই সব গাড়ী ঘোড়া
এ সব টাকার তোড়া চোরে কেন হরেনি।
আরে ওরা ভাগ্যবান, বাড়িয়াছে কত মান
গোলাভরা আছে ধান লক্ষ্মী আজো সরেনি
মর এটা যেন হাতী, দশহাত বুকে ছাতি
করিতেছে মাতামাতি জরে কেন জরেনি॥
হাদে মানী কালামুখী, ঠিক যেন কচিখুকি
পতিসুখে বড়সুখী ঠেঁটা কেন পরেনি।
মর্ মর্ ওই ছুঁড়ী, পড়েছে সোণার চুড়ী
বেঁকে চলে মেরে তুড়ি ফুল তবু ঝরেনি

দেখ্ দেখ্ নিয়ে মিঠে, খেতেছে কি পুলিপিঠে,
এখনো এদের ভিটে ঘুঘু কেন চরেনি ॥
প্রাণে আর সয় না, প্রাণে আর সয় না।
সয় নারে প্রাণে আর, সয় না সয় না ॥
খোঁপা বেঁধে পেটে পেড়ে,
চোপা করে নৎ নেড়ে,
ঠেকারে বাঁচে না অরে পায়ে দিয়ে গয়না।
পায়ে দিয়ে গয়না ॥
শুয়েছে ছাপর-খাটে, রয়েছে রাণীর ঠাটে,
রাগেতে গুমুরে মরি গতরতো বয় না।
গতর তো বয় না।
হের রে বিষম ছাই, ননদীরে রক্ষা নাই,
মরুক তাদের ভাই তাতে কিছু বয় না।
তাতে কিছু বয় না ॥
বুকে করে পতি লয়ে, আমি থাকি এয়ো হয়ে,
যতিনী সতিনী মাগী রাঁড় কেন হয় না।
রাঁড় কেন হয় না ॥
ভাই-বুন যতগুলো, সকলেই যাক্ চুলো,
নোড়া হোক্ মুলোক্ষেত কিছু যেন রয় না।
কিছু যেন রয় না ॥
লাথি মেরে দেও তেড়ে, ওরা যাক দেশ ছেড়ে,
থালা ঘড়া কড়া কেঁড়ে কিছু যেন লয় না।
কিছু যেন লয় না ॥
বাপ বুড়ো বড় ঠক, মুখে মিঠে হাড়ে টক,
বোসে আছে যেন বক তত্ত্ব কভু লয় না।
তত্ত্ব কভু লয় না ॥
উদরে ধরেছে যেটা, সাক্ষাৎ ডাকিনী সেটা,
দেখিলে শরীর জ্বলে ঠিক যেন ময়না।
ঠিক যেন ময়না ॥

লোভ।

(প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক হইতে)

বল বল কিসে হবে ক্ষুধা-নিবারণ।
কঠোর জঠরজ্বালা করে জ্বালাতন ॥
সাধ কোরে দিই গাল, এত চাল এত ডাল,
একদিনে গেল কাল কি করি এখন ?
তেল লুণ নাই ঘরে, হাঁড়ী ঠন্ ঠন্ করে,
নূতন করিতে হবে সব আয়োজন ॥
সকলেরি মুখ বাঁকা, কোথা গেলে পাব টাকা,
কার কাছে যেতে পারি পেতে পারি ধন ?
চুরি কোরে আনি কড়ি, পাছে শেষে ধরা পড়ি,
দিয়ে দড়ী হাতে কড়ী করিবে শাসন ॥
যতই বাড়িছে বেলা, ততই ক্ষুধার ঠেলা,
আজ বুঝি কপালেতে হলো না ভোজন।
চল দেখি হাটে যাই, চিঁড়ে মুড়ি যদি পাই,
ফাঁকা ফুকা খেয়ে তবে জুড়াব জীবন ॥
এই দেখি শত শত, বড় বড় ধনী যত,
আমারে করে না কেন ধন বিতরণ ?
গোয়ালাদের বাড়ী ওই, ভাঁড়-ভরা ছানা দই,
চুপি চুপি কেন তাই করিনে হরণ ॥
ফলবান্ যত গাছ, ফলেছে বাছের বাছ,
পুকুরেতে কত মাছ না হয় গণন।
গাছে উঠে ফল পাড়ি, জড় করি কাঁড়ি কাঁড়ি,
যত পারি বাড়ী নিয়ে করিব গমন ॥
পুকুরের কর্ত্তা যারা, এখানে ত নাই তারা,
ছিপ ফেলে ধরি মাছ কে করে বারণ।
দেখে যদি ছিপ সুতো, না হয় মারিবে জুতো,
ধূলো ঝেড়ে চোলে যাব মুদিয়ে নয়ন ॥
যা হবার তাই হয়, মিছে কেন করি ভয়,
পেটে খেলে পিঠে সয় এই ত বচন।
চুরি করে নৎ ঢেঁড়ি, সে দিন খেটেছি বেড়ী,
না হয় আবার গিয়ে খাটিব তখন ॥
বেড়ী নয় মল পরি, মাটী কেটে দিন হরি,
কারাগারে সে আমায় শ্বশুর-সদন।
ছাদে ওই থালা থালা, যদি ভাই যায় আলা,
দুদিন ত হবে তায় সুখেতে যাপন ॥
ধোবারা কাপড় কাচে, ভাল ভাল ধুতী আছে,
শুকাতে দিয়েছে সব চিকণ বসন।

সবুজ সফেদ লাল, পাল্লাদার বেড়ে সাল,
আনিয়াছে পাল পাল খোট্টা মহাজন ॥
মোগল পাঠান কত, কাবেলের মেয়া যত,
উটে উটে আনিতেছে করিয়া যতন।
এ সব সুখের যোগ, যদি নাহি হয় ভোগ,
তবে কেন করি মিছে শরীর ধারণ ?
বেণের দোকানে লোট, রূপা সোণা টাকা নোট,
বেঁধে মোট ছোট্ট ছোট্ট পালা ওরে মন।
এই দেখি পেট ডোঙা, ঢেকুর উঠিছে চোঙা,
হাতী ঘোড়া কত কত করেছি ভক্ষণ ॥
কোথায় গিয়াছে চলে, আবার উঠেছে জ্বলে,
দেরে দেরে খেতে দেরে বাঁচাও এখন।
কটাক্ষেতে দিয়ে টান্, এখনই আপন আন,
খান্ খাম্ করে খাই এ তিন ভুবন ॥
প্রিয়তমা তৃষ্ণা সতী, আমি তার প্রাণপতি,
এই দেখ বুকে তারে করেছি স্থাপন।
আমাদের হয়ে বশ, ম নর বিষয় রস,
মুহূর্ত্তে আনন্দকোটি করিয়াছে সৃজন ॥
আমার কারণে তাঁর, নিদ্রা নাই একবার,
বাসনার পথে শুধু করেন ভ্রমণ।
দেহ হলে নিদ্রাকুল, তবু নাই তায় ভুল,
স্বপনে আপন ভাব করেন জ্ঞাপন ॥
আমাদের ঘোর বেগ, কিসে তিনি নিরুদ্বেগ,
মন বিনা এই বেগ কে করে বারণ।
হেন সাধ্য কার আছে, দাঁড়ায় মনের কাছে,
মনেরে প্রবোধ দিয়া কে করে বারণ ?
যদি কেউ খড়ি পেতে, কোনরূপ গুণে গেঁথে,
আকাশের কত তারা করে নিরূপণ।
যদি কেউ এ জগতে, উপায়েতে কোনমতে,
প্রতাপে করিতে পারে বাতাস বন্ধন ॥
কোনরূপে যদি কেউ, সিন্ধুর প্রখর ঢেউ,
রোধ করি একেবারে করে নিবারণ।
প্রকৃতির এ সংসারে, কোনরূপ অস্ত্রধারে,
যগুপি করিতে পারে আকাশ খণ্ডন ॥

পূর্ব্বদিকে প্রাতে রবি, প্রভাতে প্রকাশে ছবি,
সে উদয় রোধ যদি করে কোন জন।
এ সব সম্ভব নয়, সম্ভাবনা যদি হয়,
হয় হয় হলো হলো কে করে বারণ ॥
মনেরে কে দেবে বোধ, লাঠী ধরে আছে ক্রোধ,
করিবে আমার রোধ কে আছে এমন ?
পেটের নিকটে আর, কিছুতে না পাই পার,
সমুদয় অন্ধকার করি দরশন ॥
ঢুকিয়াছে ভস্মকীট, না মরে ক্ষুধার ছিট,
চুমুকেতে কত আর করিব শোষণ ?
উঠিয়াছে খাই খাই, না মেটে আশার খাই,
খাঁই খাঁই রবে সবে ছাড়িছে বচন ॥
ঠাঁই ঠাঁই ডাঁই ডাঁই, যেন পর্ব্বতের চাঁই,
কোথা হতে এসে করে কোথায় গমন ?
এই দেখি এই এই, ক্ষণপরে নেই নেই,
এ[illegible] সব সব কেটা করে নিরূপণ ॥
কেবা বা[illegible], কেবা বাছে বাসীমড়া,
যত পা[illegible] উদরে ধারণ।
ওই যে ঠাকুর[illegible] বামুনেরা পূজা করে,
বহুবিধ খা[illegible] (প্রবোধে নিবেদন ॥
ওতো কভু শুদ্ধ ন[illegible]থি ঘরে, এঁটো করা সমুদয়,
কতক্ষণ আগে [illegible]ছে পা[illegible]করেছি ভক্ষণ।
ওদের কুলের বধূ, [illegible] প্রফুল্ল ফুলের মধু,
কেহ নাই পায় যাদের খিতে বদন ॥
কত দিন আগে আমি, [illegible]য়েছি তাহার স্বামী,
ঘরে বসে মনে মনে [illegible]ছি রমণ।
ওরা পেয়ে খাটখানা, [illegible]ন, হয়ে আটখানা,
ধরে কত ঠাটখানা ক[illegible]ধান [illegible]ন ॥
সকলের অগোচরে, [illegible] অবসরে,
কতদিন শুয়ে তার করে [illegible]।
দেবপতি তারাপতি, হলো গুরুদারা-পতি,
তাহে কিছু একা নয় কামের সাধন ॥
সম্ভোগে হইল লোভ, না ভুগিলে পায় ক্ষোভ,
সেধে বৈষ্ণ পুজেছিল আমার চরণ।

আমি জাগি সর্ব্ব-আগে, কাম ক্রোধ পারে জাগে,
না জাগালে কেবা চাগে সবারি মরণ।
মানসের ভালবাসা, মানসেই ভালবাসা,
আমার চরণে আশা লয়েছে শরণ॥
বিধি হরি স্মরহর, সেবা করে নিরন্তর,
আমারে না দিয়ে কিছু করে না গ্রহণ।
ধর্ম্মের যে পুত্র হয়, যারে লোক যম কয়,
সে যমের উচ্চপদ আমার কারণ॥
আমার সেবক যারা, দারুণ চতুর তারা,
চতুরতা কেবা জানে তাদের মতন।
ডুব দিয়ে জল খায়, শিব নাহি টের পায়,
জল দিয়ে দুধ করে উদরে শোষণ॥
রেখে বস্তু অবয়ব, জিব দিয়ে চাটে সব,
জিলিপির ফের ভেঙ্গে করিবে ভোজন।
পিতা মাতা দেব গুরু, সবার উপরে গুরু,
নিজ এঁটো সকলেরে করে বিতরণ॥

চার্ব্বাকের মত।

(প্রবোধচন্দ্রোদয় হইতে)

শিষ্যের প্রতি চার্ব্বাকের উক্তি।

ধর্ম্মপথে হয়ে চোর, কেন পাও দুঃখ ঘোর,
নয়নের অগোচর নাই কিছু নাই কিছু।
স্বেচ্ছাচার স্বর্গভোগ, সেই যোগ স্নেহ যোগ,
পরকালে ভোগাভোগ নাই কিছু নাই কিছু॥
শরীরের মাঝে শূন্য, ইথে কেন হও ক্ষুণ্ণ,
কোথা পাপ কোথা পুণ্য নাই কিছু নাই কিছু।
ভ্রমে কর কার সেবা, তোমার উপাস্য কেবা,
শাস্ত্রমতে দেবী দেবা নাই কিছু নাই কিছু॥
ধর্ম্মবল কিসে বল, কর্ম্মবীজে শর্ম্মফল,
পরে আর ফলাফল নাই কিছু নাই কিছু।
তন্ত্র নিজে পাপতন্ত্র, মূলমাত্র মিজ-যন্ত্র,
পঞ্জহাম পুঞ্জ যন্ত্র নাই কিছু নাই কিছু॥
মনে কেন রাখ খেদ, ভণ্ডলোকে মানে বেদ,
আত্মমতে ভেদাভেদ নাই কিছু নাই কিছু॥

সমুদায় এই বিশ্ব, স্থূলরূপে হয় দৃশ্য,
অপরূপ কতরূপ, বস্তু সমুদয় হে
বস্তু সমুদয়।
এই ভব যোগ্য ভব, ভোগে কেন পরাভব,
স্বভাবে শোভিত সব, স্বভাবেই হয় হে
স্বভাবেই হয়॥
সকলি স্বভাব-অংশ, স্বভাবে সকলি ধ্বংস,
সমুদ্রের বিম্ব যথা সমুদ্রেই লয় হে
সমুদ্রেই লয়।
ঋতু মাস তিথি বার, আসে যায় বারবার,
স্বভাবের পরিবার স্বভাবে উদয় হে
স্বভাবে উদয়॥
রবি আর শশধর, স্বভাবত নিরন্তর,
স্বভাবের চক্ষু হয়ে করে আলোময় হে
করে আলোময়।
বহ্নি বায়ু ধরা জল, শস্য বীজ বৃক্ষ ফল,
ভোগের কারণ সব সুখের আলয় হে
সুখের আলয়॥
নয়নের অগোচর, আছে এক সৃষ্টিকর,
নহে দৃশ্য ছাড়া বিশ্ব বল কোথা রয় হে
বল কোথা রয়।
কি কহিব আহা আহা, কেমনে মানিব তাহা,
আঁখির অদৃশ্য যাহা কিছু কিছু নয় হে
কিছু কিছু নয়॥
কলেবর মনোহর, কেবল ভোগের ঘর,
সেই কর্ম্ম সদা কর যাহে সুখোদয় হে
যাহে সুখোদয়।
পদে পদে পরিতাপ, প্রাণ যায় বাপ, বাপ,
আহার বিহারে পাপ পাপী লোকে কয় হে
পাপী লোকে কয়॥

যত সব বুদ্ধি মোটা, কপালে জুড়িয়া ফোঁটা,
সুখপথে ঘেরে খোঁটা, দুঃখবোঝা বয় হে
দুঃখবোঝা বয়।
ইন্দ্রিয়ের রেখে মর্ম্ম, সাধন করিব কর্ম্ম,
দূর্ দূর্ দূর্ ধর্ম্ম তারে কিসে ভয় হে
তারে কিসে ভয়॥
শাস্ত্রকার ভাড় যত, লিখিয়াছে নানা মত,
তাদের অলীক মত, প্রাণে নাহি সয় হে
প্রাণে নাহি সয়।
করি যোগ গাত্রে গাত্রে, স্বর্গভোগ স্পর্শমাত্রে,
ফুল্লভাবে পাত্রে পাত্রে পূর্ণানন্দময় হে
পূর্ণানন্দময়॥
সমভাব সব অঙ্গে, সমভাব সব সঙ্গে,
রসাভাব রসরঙ্গে কর কালক্ষয় হে
কর কালক্ষয়।
চুরি নয় হত্যা নয়, অধিকন্তু সুখ হয়,
ইথে যারা পাপ কয় তারা দুরাশয় হে
তারা দুরাশয়॥
ভেদজ্ঞান মহারোগ, কেবল পাপের ভোগ,
ইচ্ছামতে কর ভোগ মনে যাহা লয় হে
মনে যাহা লয়।
বিবেক বৈরাগ্য আদি, যত সব প্রতিবাদী,
ছেড়ে কর ক্রমে সব কর পরাজয় হে
কর পরাজয়॥

* * * * *

যাগ করে ব্রত করে ক্রিয়া করে যত।
মিছে ভ্রমে মিছে শ্রমে আয়ু করে গত
কর্ত্তা ক্রিয়া দ্রব্যের হইলে পরে নাশ।
যাগ-কারকের যদি হয় স্বর্গবাস॥
দাবানলে দগ্ধ হয় তরু যে সকল।
সে সকল গাছে তবে হতে পারে ফল॥
পোড়া গাছে ফল যদি সম্ভাবনা হয়।
এদের কথায় তবে করিব প্রত্যয়॥
মৃতজনে জল দেয় দেয় অন্নগ্রাস
মরা গরু কখন কি খেয়ে থাকে ঘাস?
মৃত নর তৃপ্ত হয় তর্পণের জলে।
তেল পেলে নেবাদীপ কেন নাহি জ্বলে?
কুহকীজনের মনে কি কুহক আছে।
একেবারে জগতেরে অন্ধ করিয়াছে॥
যে বিদ্যায় নাহি হয় অর্থ-উপার্জ্জন।
সে বিদ্যায় নাহি হয় অর্থের সাধন॥
যে শাস্ত্রের কথা নহে বিশ্বাসের স্থল।
যুক্তি সহ যোগ করি নাহি দেখি ফল॥
এলোমেলো লিখিয়াছে যা এসেছে মনে।
সে লেখা প্রমাণ আমি করিব কেমনে?
ওরে বাপু প্রাণাধিক স্থির জেনো এই।
শাস্ত্র নয় শাস্ত্র নয় বিদ্যা নয় সেই॥
বঞ্চকেরা বাঁধিয়াছে বঞ্চনার গুণে।
ভ্রান্তলোক ভুলিয়াছে ফলশ্রুতি শুনে॥
ভুলিয়া মিষ্টের লোভে শিশু যে প্রকার।
আশার অধীনে হয় অধীন পিতার॥
ভাবী স্বর্গভোগরূপ সন্দেশের লোভে।
যত সব মূর্খলোক মরিতেছে ক্ষোভে॥
ক্রিয়াকাণ্ডরত যত সারতত্ত্বহীন।
আশায় হতেছে সবে শঠের অধীন॥
সংসারেতে দুঃখ আছে করিব স্বীকার।
বিনা দুখে সুখভোগ হয়ে থাকে কার?
আপনার হিতবোধ মনে আছে যার।
সে কি কভু ছেড়ে থাকে সুখের সংসার?
জগতের গূঢ়ভাব কে জানিবে স্থির।
সুখধনে ভরা আছে ভিতর বাহির॥
সমুদ্রের জল দেখ স্বভাবে লবণ।
মথন করিলে হয় অমৃত-সৃজন॥
টক বলে দধি কেন ফেলে দিতে যাবে?
এখনি মথন কর ননী ঘৃত পাবে॥
ধান নিয়ে দেখ বাবা হাতের উপরে।
তণ্ডুল রয়েছে তার তুষের ভিতরে॥

তুষ বলে কেন তারে ফেলে দিতে যাবে ?
ধানভেনে চাল লও কত সুখ পাবে ॥
চিরকাল প্রিয় যেই প্রিয় সেই রয়।
ক্ষুদ্র দোষে কখন কি অপ্রিয় সে হয় ?
নানা দোষে দেহ হলে দোষের আধার।
এই দেহ কবে বল প্রিয় নহে কার ?
রসনারে করে সদা দশন-আঘাত।
নোড়া দিয়ে কোন্ কালে কে ভেঙ্গেছে দাঁত ?
ছারখার করে অগ্নি পোড়াইয়া ঘর
সে আগুনে কবে কেবা করে অনাদর ?
ভূমি নাশ করে জল বিস্তারিয়া ঢেউ।
সে জলের অনাদর নাহি করে কেউ ॥
কিছু দুঃখ আছে বলে শুন ওরে বাবা।
যে জন সংসার ছাড়ে হাবা সেই হাবা ॥
ইচ্ছামতে সুখভোগ আহার বিহার।
তার চেয়ে পরমার্থ কিছু নাহি আর ॥
বোধহীন মূঢ় যারা বদ্ধ ভ্রমজালে।
এ সুখ কি ভোগ হয় তাদের কপালে ?
শরীর শোষণ করে রবির কিরণে।
ঘরে ঘরে ভিক্ষে করে পেটের কারণে ॥
উপবাসে ভোগ করে কঠোর যাতনা।
মোক্ষের সাধনা নয় দুঃখের সাধনা ॥
তপস্যায় জ্বলে পুড়ে পাপে ভোগে দুঃখ।
মরে গেলে ফুরাইবে কবে পাবে সুখ ?
বাপুরে প্রত্যক্ষ দেখ তপস্যার ফল।
আত্মঘাতী হয়ে মরে পাষণ্ডের দল ॥
স্বেচ্ছামত ভোগ করি আমরা সকলে।
সশরীরে স্বর্গভোগ কারে আর বলে ?

(সন্ন্যাসী দেখিয়া।)

বল হে সন্ন্যাসী তুমি কি কাজ করেছ।
বগলে ভিক্ষার ঝুলী কি হেতু ধরেছ ?
ঘরে ঘরে ফেরো যদি ঘর-ছাড়া হয়ে।
ঘর ছেড়ে কিবা ফল থাক ঘর লয়ে ॥
পেট নিয়ে দ্বারে দ্বারে যদি ওগো বাপু।
এমন সন্ন্যাসে তোর কাজ কিরে বাপু ?
ঘর ছেড়ে ঘরে ঘরে না ফিরিতে হয়।
অনাহারে দেহ যদি সমভাবে রয় ॥
তবেতো তপস্যা জানি মানি তোর ক্রিয়া।
সকলেই ঘুরিতেছে পোড়া পেট নিয়া ॥
সেই যদি খেতে হলো অন্ন আর জল।
বল্ বল্ বল্ তবে সন্ন্যাসে কি ফল ?
দেহ আছে খেটে খেয়ে ভোগ কর ক্রিয়া।
কারো কাছে চেঁচায়ো না পেটে হাত দিয়া ॥

(দণ্ডী দেখিয়া)

ওরে ভণ্ড হাতে দণ্ড এ কেমন রোগ।
দণ্ডে দণ্ডে নিজ দণ্ডে দণ্ড কর ভোগ ॥
নিজ হাতে নিজ পিণ্ড করিয়া গ্রহণ।
লণ্ডভণ্ড হয়ে মর কাণ্ড এ কেমন ?
মুক্তি মুক্তি করিতেছে যত নারী নরে।
কথার বস'য়ে হাট বেচা-কেনা করে ॥
কেহ বেচে কেহ কেনে কেহ করে দান।
সকলেই শুনিতেছে কারো নাই কাণ ॥
সকলেই দেখিতেছে চক্ষু কারো নাই।
কোথা যুক্তি কোথা মুক্তি ভাবি আমি তাই
প্রকৃতি প্রকৃতি পেলে আকৃতির নাশ।
ভূতে ভূত মিশাইয়ে হয় অপ্রকাশ ॥
অবিনাশী শূন্য এই স্বভাবেই রয়।
বল তবে এ জগতে মুক্তি কার হয় ?
ভোগেতে প্রত্যক্ষ সুখ আর সব শূন্য।
বল্ বল্ কোথা পাপ কোথা তবে পুণ্য ?

গ্রীষ্ম।

আর তো বাঁচিনে প্রাণে বাপ বাপ্ বা
বাপ্ বাপ্ বাপ্ এ কি গুমটের ঝাপ্ ॥
বিষহীন হয়ে গেল বিষধর সাপ।
ভেক তার বুকে মুখে মারিতেছে লাফ ॥

বলিতে মুখের কথা বুকে লাগে হাঁপ।
বারবার কত আর জলে দিব ঝাঁপ?
প্রাণে আর নাহি সয় তপনের তাপ।
শূন্য হতে পড়ে যেন অনলের চাপ॥
বিকল হতেছে সব শরীরের কল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
কি করে করুণ অতি রবি মহাশয়।
অরুণ ত নয় এ যে অরুণতনয়॥
কি গুণ দেখিয়া লোকে মিত্র তাঁরে কয়?
মিত্র যদি মিত্র তবে শত্রু কোথা রয়?
এই ছবি এই রবি খর অতিশয়।
নলিনী কি গুণ দেখে বিকসিত হয়?
পিতৃগুণ পুত্রে হয় এই ত নিশ্চয়।
পিতা হয়ে রবি বেটা পুত্রগুণ লয়॥
জরজর করিতেছে হরিতেছে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
ছারখার হইতেছে অখিল সংসার।
ঘোর রিষ্টি যায় সৃষ্টি বৃষ্টি নাই আর॥
কিবা ধনী কিবা দীন কেহ নাই সুখে।
সবাকার শবাকার হাহাকার মুখে॥
ক্ষণমাত্র কেহ আর নাহি হয় স্থির।
কার সাধ্য দিনে হয় ঘরের বাহির?
শমনতাতের তাতে বালি তাতে ভাই।
তাতে যদি পড়ে পদ রক্ষা আর নাই॥
তখন অচল হয়ে পড়ে ভূমিতল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল বিনা জলাশয়ে মরে জলচর।
কেমনে বাঁচিবে বল স্থলবাসী নর?

পশু পক্ষী আদি করি ভূচর খেচর।
একেবারে সকলেরি দহে কলেবর॥
শীতল হইবে বোলে যদি যাই বনে।
বনের বিরহে তথা সুখ নাহি মনে॥
তরুতলে তাপ দেয় মায়ারূপা ছায়া।
উপরে তপন বটে নীচে তার জায়া॥
হাবা হয়ে ছুটি বাবা দেখে দাবানল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
বাঘ হলো রাগহত তাগ নাই তার।
শীকার শীকার নাই শীকারে বিকার॥
ভাব দেখে বোধ হয় হইয়াছে মৃগী।
তার কাছে শুয়ে আছে মৃগ আর মৃগী॥
হরি হ'র দ্বেষভাব ডাকে হরি হরি।
করী আছে তার কাছে প্রেমভাব করি॥
এক ঠাঁই রহিয়াছে রাক্ষস বানর।
ময়ূর ভুজঙ্গে নাই দ্বন্দ্ব পরস্পর॥
ছেড়েছে খলতা রোগ যত সব খল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
হয় হায় কি করির রাম রাম রাম।
কত বা মুছিব আর শরীরের ঘাম?
টস টস করে রস ঝরে অবিশ্রাম।
দারুণ দুর্গন্ধ গায় পোচে যায় চাম॥
ঘামাচি ঘামের ছেলে উঠে দেহ ছেয়ে।
পুবের বাঙ্গাল চাচা যত বাবু ভেয়ে॥
নখাঘাতে হয়ে যায় সব অঙ্গ খোলা।
সাক্ষাৎ পরেশনাথ বব বম ভোলা॥

* * * *

দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

আকাশে না শুনি আর সলিলের নাম
বিরস হইল গাছে রসময় জাম ॥
শুকায়ে সকল শাখা ঝড়ে হৈল ভাঙ্গা।
কালরূপ ঘুচে তার হইয়াছে রাঙ্গা ॥
নারিকেল শুকাইল হয়ে জলহারা।
বেতাল হইয়া তাল শাঁসে যায় মারা ॥
কোষেতে ধরেছে দোষ জল না পাইয়া।
কাঁঠাল হইল জ্যেঠা এঁচড়ে পাকিয়া ॥
জল বিনা মধুহীন হলো মধুফল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥
হইলে মধ্যাহ্নকাল কি প্রমাদ ঘটে।
জীবন শুকাতে থাকে কলেবর-ঘটে ॥
ছট ফট লুটাপুট এ পাশ ও পাশ।
আট ঢাট করে খাই পাখার বাতাস ॥
পাখার পবনে প্রাণ কত যায় রাখা।
বোধ হয় সে বাতাসে হুতাশনমাখা ॥
নিদারুণ নিদাঘেতে নাহি পরিত্রাণ।
জগতের প্রাণ নাশ জগতের প্রাণ ॥
অনিল করিছে বৃষ্টি প্রবল অনল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥
উপরে চাহিয়া দেখ পাখী কি প্রকার।
শাখার উপরে করে পাখার প্রহার ॥
কাতর হইয়া কত কাঁদিতেছে দুখে।
অবিরত হা জল যো জল বলে মুখে ॥
ক্ষণমাত্র নীচু পানে নাহি চায় ফিরি।
ঊর্দ্ধমুখে ডেকে ডেকে গলা গেল চিরে ॥
তবু ঘন নাহি হয় সদয়-হৃদয়।
খেয়েছে কাণের মাথা নীরদ নিদয় ॥
পিপাসায় মারা যায় চাতকের দল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥
আহার প্রহার সম নাহি রোচে কিছু।
দাঁতে কেটে, থু করে ফেলিয়া দিই নিচু ॥
পাত পেতে ভাত খেতে বিষ বোধ হয়।
ডাল ঝোল যাহা মাখি কিছু ভাল নয় ॥
সুধু মাত্র বেছে খাই অম্বলের মাছ।
নিকটে না আনি আর কম্বলের গাছ ॥
কেবল অম্বল রস সম্বল করিয়া।
পেটের ধম্বল পাড়ি টম্বল ধরিয়া ॥
তবু পোড়া দেহ মম না হয় শীতল
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥
গ্রীষ্ম করে বিশ্বনাশ দৃশ্য ভয়ঙ্কর।
সৃষ্টি আর নাহি হয় দৃষ্টির গোচর ॥
শাখীপরে আঁখি মুদে আছে পাখী সব।
চরে আর নাহি চরে নাহি কলরব ॥
কোকিল কাতর হয়ে কাননে ভ্রমিছে।
ডেকে ডেকে হেঁকে হেঁকে গলা ভাঙ্গিতেছে ॥
বিরল বিপিন-মাঝে সার করি গাছ।
ধার্ম্মিক হইয়া বক নাহি ছোঁয় মাছ ॥
ভূতল ফুঁড়িয়া তাপ পোড়ায় নিতল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥
ভাবি মনে স্নিগ্ধ হব, সরোবরে নেয়ে।
পুকুরে ফুকুরে কাঁদি জল নাহি পেয়ে ॥
সে জলে অনল জ্বলে পুড়ে হই খাক।
ডুব দিয়ে ভূত সাজি গায়ে মেখে পাঁক ॥
কত জল খাই তার নাহি পরিমাণ।
ডাগর হইল পেট সাগর সমান ॥
বোতলের ছিপি খুলে যদি খাই সোঁদা।
তায় তায় বোদা লাগে মুখ হয় ভোঁদা ॥

উদরে খেলিয়া ঢেউ করে কলকল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

উপবনে উপভোগ ইচ্ছা সবাকার।
কিন্তু হয় উপবাসে উপবাস সার॥
তুলিয়া প্রফুল্ল ফুল নিজে তায় বাস।
অনলের আভা এসে নাকে করে বাস॥
উষা আর উষসিতে তরুতলে বাস।
কিঞ্চিৎ শীতল হয় ফেলে দিলে বাস॥
গুণগুণ, গুণ ভুলি আছে অন্ধকারে।
অলি আর বলী নয় কলি দলিবারে॥
হইল সুবাসহত কমলের দল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

মাঠ আছে কাঠ হয়ে ফুটিফাটা মাটী।
কোথা জল, কোথা হল কোথা তার পাটী॥
হয়ে চাষা, আশাহারা হায় হায় বলে।
কাঁদিয়া ভিজায় মাটী নয়নের জলে॥
শস্যচোর গ্রীষ্মবেটা দস্যু অতিশয়।
কৃষীর কল্যাণ-কথা কভু নাহি কয়॥
কপালে আঘাত করে নীলকর যারা।
রবি-করে সারা হয়ে মারা গেল চারা॥
আকাশে চাহিয়া আছে কাছে রেখে হল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

নগরের দক্ষিণেতে যত শ্বেত নর।
খাটায়ে খসের টাটি মুড়িয়াছে ঘর॥
তাহাতে চামের জল ঢালে নিরন্তর।
তথাচ শীতল নাহি হয় কলেবর॥
ও গড ও গড বলি টবেতে উলিয়া।
মনোহর হাঁসা মূর্ত্তি কামিজ খুলিয়া॥
ব্রাণ্ডি-জল খায় তবু ঠাণ্ডি নাহি কয়ে।
কেবল চাইস (ইচ্ছা) তরা আইসের পরে॥
শুকায়েছে বিবিদের মুখ-শতদল!
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

মণ্ডালোষা দধিচোষা ঢোসা দল যত।
কোশাধরা গোঁসাভরা তপে জপে রত॥
প্রভাতে উঠিয়া মরে মিছে ফুল তুলে।
পূজার আসনে বসে মন্ত্র যায় ভুলে॥
শিবেরে ঠেকায়ে কলা কলা আগে চায়।
খপ করে তুলে নিয়ে গপ করে খায়॥
ভুতপালে ফেসে দিয়া নিজ পেট পালে।
কোশা ধরে ঢক্ ঢক্ জল ঢালে গালে॥
না ছুঁতে না ছুঁতে ফুল আগে চায় ফল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

একেবারে মায়া যায় যত চাঁপদেড়ে।
হাঁস ফাঁস করে যত প্যাজখেগো নেড়ে॥
বিশেষতঃ পাকা দাড়ী পেটমোটা ভুঁড়ে।
রৌদ্র গিয়া পেটে ঢোকে নেড়া মাথা ফুঁড়ে॥
কাজী, কোল্লা মিয়া মোল্লা, দাঁড়িপাল্লা ধরি।
কাছাখোল্লা তোবাতাল্লা, বলে আল্লা মরি॥
দাড়ী বয়ে ঘাম পড়ে বুক যায় ভেসে।
বৃষ্টিজল পেয়ে যেন ফুটিয়াছে কেশে॥
বদনে ধরিছে সুধু বদনার নল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দেল বাবা দে জল দে জল॥

হায় হায় কার কাছে করি বল খেদ।
যায় ধর্ম্ম এ কি কর্ম্ম হয় মর্ম্মভেদ॥
স্ত্রী পুরুষ উভয়ের ঘটেছে বিচ্ছেদ।
লুনিদাঘ নাস্তিক ব্যাটা খু করে বেদ॥

সধবা হইল যেন বিধবার প্রায়।
কেহ আর অলঙ্কার নাহি রাখে গায়॥
সদাই চঞ্চল মন বস্ত্র খুলে থাকে।
ইচ্ছা করে অঞ্চলেরে অঞ্চলে না রাখে॥
আগে ভাগে খুলে ফেলে বালা আর মল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
কোথায় বরুণ হায় কোথায় বরুণ।
বরুণ করুণ হয়ে সাগর ভরুন॥
লুকায়ে দারুণ ভাব অরুণ সরুন।
এখনি নিদয় গ্রীষ্ম মরুন মরুন॥
ঘন ঘন ঘন দল চরুন চরুন।
জীবের সকল দুখ হরুন হরুন॥
অবনীর উপকার করুন করুন।
গ্রীষ্মনাশে রণ-অস্ত্র ধরুন ধরুন॥
মেঘনাদে হয়ে যাক্ ধরা টলটল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
কোথায় করুণাময় জগতে পতি।
তব ভব নাশ হয় কি হইবে গতি?
করুণা-কটাক্ষ নাথ কর একবার।
পড়ুক আকাশ হতে সুধার সুধার॥
চেয়ে দেখ চরাচরে কারো নাহি বল।
কিরূপ হয়েছে সব অচল সচল॥
আর নাহি সহ্য হয় প্রভাকর-কর।
মারা যায় তব দাস প্রভাকর-কর॥
কাতরে তোমায় ডাকি আঁখি ছল ছল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

বর্ষার অধিকারে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব।

প্রতিদিন পোড়া জল হয় হয় হয় না।
ঘোর রিষ্টি নাহি বৃষ্টি সৃষ্টি আর রয় না॥
যাই যাই বিনা কেহ কোন কথা কয় না।
উহু উহু বাপ বাপ তাপ আর সয় না॥
বরুণ করুণ হয়ে কৃপাভাব বয় না।
জলধর চাতকের তত্ত্ব আর লয় না॥
সধবা বিধবা সাজে ফেলে দিয়ে গয়না।
গ্রীষ্মে হলো তপস্বিনী যত সব ময়না॥
মিছেমিছি করি জাঁক, মিছেমিছি ছাড়ি হাঁক,
মিছে ডাক্ শরদের প্রায়।
কোথায় বৃষ্টির পতি, কি হবে সৃষ্টির গতি,
চলে না দৃষ্টির গতি তায়
কে কহে আষাঢ় মাস, খেতেছে গায়ের মাস,
রসকস কিছু নাহি মুখে।
অবনী সরসা নয়, কেমনে ভরসা হয়,
বরষা বরষা মারে বুকে॥
বরষার এ কি ধারা, নাহি মাত্র বারিধারা,
ভাল ধরা ধরে ধরাধর।
করিতেছে সমীরণ, হুতাশন বরিষণ,
পুড়ে যায় ধরা ধরাধর॥
মরে যত জলচর, নদনদী সরোবর,
শুকাইল যত জলাশয়।
হায় এ কি অপরূপ, অনলে পূরিল কূপ,
পাক মাত্র কিছু নাহি রয়॥
ধ্যান করি জলদের, জল দেরে জল দেরে,
হা জল যো-জল শুধু কয়।
হয়ে চাতকের মত, পাতক ভুগিছে কত,
মানবাদি প্রাণী সমুদয়॥
ফুটীফাটা হলো ঘাট, চেলাকাঠ যেন মাঠ,
হাট বাট সকল সমান।
শমন-তাতের তাতে, একেবারে সব তাতে,
তাতে আর নাহি রয় প্রাণ॥

বরষায় খেলে চলি, পবন উড়ায়ে ধূলি,
দশদিক করে অন্ধকার।
দ্বার দিয়ে ঘরে রব, দিবসে বাহির হয়,
এ প্রকার সাধ্য আছে কার?
কিবা ধনী কিবা দীন, একভাবে কাটে দিন,
ক্ষীণ হীন মলিন সবাই।
বলবুদ্ধি কারো নাহি, করিতেছে ত্রাহি ত্রাহি,
কোনরূপে রক্ষা আর নাই॥
এ তাপ ভূতল ফুঁড়ে, ব্যাপিল পাতাল জুড়ে,
বাসুকির মাথা পুড়ে যায়।
উপরে পুড়েছে স্বর্গ, করিছে অমরবর্গ,
মরি মরি হায় এ কি দায়॥
দিনকর খরতর, অমরেরা মরমর,
জরজর হলো ত্রিভুবন।
বিশ্বের জীবন বায়ু, সে হবে বিশ্বের আয়ু,
জীবনদ না দেয় জীবন॥
ভুমে শস্য ফল গাছে, আহারে জীবন বাঁচে,
জলেরে জীবন সবে কয়।
বল বল শুনি তাই, এ জীবন বিনা ভাই,
জীবের জীবন কিসে রয়?
যথা যথা শাখী যত, শুকাতেছে অবিরত,
শাখাপত্র সব হলো সারা।
ঘোর তৃষ্ণা সয়ে সয়ে, ক্রমেতে নীরস হয়ে,
সমুদয় চারা গেল মারা॥
তাপেতে শুকায় মূল, কোথা আর ফল ফুল,
ফলবাসে বহ্নি করে বাসা।
সৌরভে গৌরব নাই, আমোদ নাহিক পাই,
ঘ্রাণ নিলে জ্বোলে যায় নাসা॥
কি কব দুঃখের কথা, বৃক্ষ সহ যত লতা,
সখ্যভাবে ছিল এতদিন।
মুখ তুলে সেই লতা, এখন না কয় কথা,
নতমুখে হতেছে মলিন॥
বৃক্ষবর বক্ষে করি, শাখারূপ করে ধরি,
লতার স্তবকরূপ স্তন।

নাগর নাগরী যোগ, মরি কি সুখের ভো[illegible]
করেছিল প্রেম-আলাপন॥
দীর্ঘকায় প্রাণপতি, লতা বালা বসবর্তী
পতি-মুখ-চুম্বন-আশায়।
দিতে দিতে আলিঙ্গন, করি দেহ সঞ্চাল[illegible]
দ্রুতগতি উর্দ্ধমুখে ধায়॥
মরি মরি আহা আহা, এখনি দেখিছি যাহ[illegible]
ক্ষণপরে তাহা নাই আর।
পতির অবস্থা-ভেদে, সতী লতা মবে খে[illegible]
কালের কি ভাব চমৎকার॥
কালের কি ধর্ম্ম হেন, আষাঢ়ে বৈশাখ যে[illegible]
বিন্দুপাত না হয় ভূতলে।
জ্বোলে পুড়ে ছারখার, ধরণী কি বাঁচে আ[illegible]
ঘর্ম্ম আর নয়নের জলে?
নীরদে না পেয়ে নীর, শাখা আর শাখিনী
হবে গেল দারুণ দুর্দ্দশা।
নরনারী এ প্রকারে, কেমনে রাখিতে পা[illegible]
কোথা তবে সুখের ভরসা॥
কার কাছে কবি খেদ, অভেদে ঘটেছে ভে[illegible]
লুপ্ত হয় বেদ-ব্যবহার।
স্বভাব অভাব ধরে, সৃষ্টি সব নাশ ক[illegible]
নিদাঘ নাস্তিক দুরাচার॥
পুরুষের ঘোর সাজা, ঠিক যেন ইলে রাজ[illegible]
পেটে পূরে জলের সাগর।
ঢক ঢক গেলে যত, উদরী-রোগের ম[illegible]
সকলেরি উদর ডাগর॥
পাতে মাত্র দিই হাত, কে খায় গরম ভা[illegible]
পোড়ে থাকে ব্যঞ্জন সকল।
কেবল অম্বল খাই, পেটের সম্বল তা[illegible]
টম্বল টম্বল ঢালি জল॥
উহু উহু রাম রাম, পচিয়া গায়ের চা[illegible]
ঘাম ফুঁড়ে ঘামাচি নির্গত।
দাদ কণ্ডু, সব গায়, নাটুরে মাকীর প্রা[illegible]

শুদ্ধাচার যারা শুচি, কালভেদে হাড়ীমুচি,
আচার হইল রাখা দায়।
খেতে বোসে চুলকুনি, মেলিয়া নখের কুণি,
এঁটো হাত দিতে হয় গায়॥
পূজা, সন্ধ্যা নাহি খাটে, পিপাসায় ছাতী ফাটে,
ফেলে দিয়ে ফুল বিল্বদল।
ঠাকুরে ঠেকায়ে কলা, বিস্তার করিয়া গলা,
কোশা ধোরে গালে ঢালে জল॥
সাজো নাই অন্তঃপুরে, হবিষ্য গিয়েছে ঘুরে,
তপ্তভাতে তৃপ্ত না হইয়া।
বলে বাসি, ভালবাসি, লেবু রস গন্ধ বাসী,
পান্তা খান আমানী মাখিয়া॥
কেবো নয় নিরাহার, নিরবধি নীরাহার,
রাজভোগে নহে গ্রাস রত।
গা হতে ঝরে নীর, ফেলে দিয়ে দুগ্ধ ক্ষীর,
ঘোল নিয়ে গোল করে কত॥
শো ভাগ্য শ্রীমরাজ, সাধিতেছে আপন কাজ,
ঘোরতর করিছে নাকাল।
ছোট বড় আদি যত, আহারে উড়ের মত,
খেতেছেন সবাই পাকাল॥
যাহারা সকালো খায়, তারা সব বেচে যায়,
পরে আর কে করে আহার।
কিঞ্চিৎ হইলে বেলা, আকাশে অগ্নির খেলা,
সে ঠেলায় প্রাণ বাচা ভার॥
পাশ্চিমের যত খোট্টা, নাহি খায় চানা ভোট্টা,
পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত।
লোডা লোডা সিদ্ধি খেয়ে, খাটিয়ায় গাত গেয়ে,
পড়ে পড়ে খ্যাল দেখে কত॥
উড়ে বলে হোরে ভাই, সেটা গেলা কাঁই পাই,
* * গেহাঁড়ি-পো শলা।
ঘুগাপট্ট নেরে নেরে, ঠণ্ডা জড় আনি দেরে,
খরারে মো হংসা উড়ি গলা॥

দিশি পাতিনেড়ে যারা, তেতে পুড়ে হয় সারা,
মলাম মলাম মামু কয়।
হাঁাদুবারি খেনু ব্যাল, প্যাটেতে মাখিনু ত্যাল,
নাতি তবু নিদ নাহি হয়॥
এঁদে দেয় কুক্, নানী, কলুই ডেলের পানী,
কাঁচাক্যালা কেচুর ছালন।
বাগুণ ফলেনি গাছে, বালবাচ্চা কিসে বাঁচে,
কিসে খাতে তেকার মরণ॥
আসমানে পানী নাই,পেজিতে কি স্বাথে ভাই,
বরাহ্মণে পুচ কর গিয়া।
খোদা তালা নাজা করে, চেনি খাই প্যাটভরে,
মোট বই স্থাপ বিচাইয়া॥
আনি দে * * * বাই, হীতল হলিল খাই,
বাঙাল বলিছে মরি প্রাণে।
টাগা চামু টাহা পামু, গাটে নামু আটে খামু,
বগবতী বৈরব কোহানে?
হিব হিব, অরি অরি, হুজ্জির হুতাশে মরি,
পরে যামু কেম্বাই করিয়া?
বীমাবার্ত্তা বগমান, আমগান রাখ জান,
পুজা দিমু ড্যাড় আনা দিয়া॥
রজনীতে যত নারী, ছাতে পোড়ে সারি সারি,
অলসেতে শরীর এলায়।
মুখের অঞ্চল বাস, অঞ্চলে না করে বাস,
বুকে মুখে পবন খেলায়॥
হাফকাষ্ঠ কালা ট্যাঁস, কলমে না চলে ফাঁস,
আফিসে খপিস হয়ে আছে।
কালামুখে উঠে হোবা, বেলাক বেঙালী তোরা,
আমুস্ না কেউ মোর কাছে॥
নেটীব কেরুর সাৎ, বোলতে কোর্ত্তে নেই বাৎ,
ক্যালাম্যান ড্যাম তোরা ড্যাম॥
গর্মিস ডিকোষ্টা সাৎ, দৌড়িয়ে কেটেনু রাৎ,
সিলিপ করেনি মোর ম্যাম॥

বরষায় খেলে ছলি, পবন উড়ায়ে ধূলি,
দশদিক করে অন্ধকার।
দ্বার দিয়ে ঘরে রয়, দিবসে বাহির হয়,
এ প্রকার সাধ্য আছে কার?
কিবা ধনী কিবা দীন, একভাবে কাটে দিন,
ক্ষীণ হীন মলিন সবাই।
বলবুদ্ধি কারো নাহি, করিতেছে ত্রাহি ত্রাহি,
কোনরূপে রক্ষা আর নাই॥
এ তাপ ভূতল ফুঁড়ে, ব্যাপিল পাতাল জুড়ে,
বাসুকির মাথা পুড়ে যায়।
উপরে পুড়েছে স্বর্গ, করিছে অমরবর্গ,
মরি মরি হায় এ কি দায়॥
দিনকর খরতর, অমরেরা মরমর,
জরজর হলো ত্রিভুবন।
বিশ্বের জীবন [illegible]তহীন, [illegible] বিশ্বের আয়, তরুতলে কাটে [illegible]
পোড়ে থাকে যথায় তথায়॥
গ্রীষ্মের ভীষণ ভোগ, যোগীর ভাঙ্গিল যোগ,
উড়ে যায় তৃণের কুটীর।
তাতে তপ্ত তপোধন, ত্যজ্য সব তপোবন,
জপে তপে মন নহে স্থির॥
যাহা হতে জন্ম যাব, সেই ধরে কম্ম তার,
কিসে তবে হইবে নিস্তার।
সমীরণে হুতাশন, হুতাশনে সমীরণ,
জলে করে অনল বিহার॥
কাননের পশুগণ, এতদূর জ্বালাতন,
সমভাবে শান্তিগুণ ধরে।
যে যাহার হয় ভক্ষ্য, তার প্রতি নাহি লক্ষ্য,
পরস্পর হিংসা নাহি করে॥
কিছুমাত্র নাহি রাগ, বিবর ছাড়িয়া বাঘ,
জরজর হয়ে পোড়ে আছে।
গ্যাঙর গ্যাঙর গ্যাঙ, থপ থপ নেড়ে ঠ্যাং,
ব্যঙ্গ করি ব্যঙ্গ নাচে কাছে।
ঢুকে গৃহস্থের পুরী, চোরে নাহি করে চুরি,
অলসে অবশ তার দেহ।
নাগর নাগরী যোগ, মরি হয়ে বলবুদ্ধিহত,
করেছিল প্রেম-আর কেহ॥
দীর্ঘকায় প্রাণপতি, অবিরত হতরব
পতি-মুখ-ছায় নাহি করে।
দিতে দিতে আলিঙ্গ, যে কিছু শুনিতে পাই
ভ্রূতগদির ব্যাখ্যা সেই স্বরে॥
মরি মরি আহারাশা, গালে হাত দিয়ে চাষ
ক্ষ্যাসে আছে কাছে রেখে হল।
পতির অবস্থ ধারা, ধান্যচারা গেল মার
দুই চক্ষে শতধারা জল॥
কালে[illegible]গছি জেঁকে জুকে, মাঝে মাঝে ডেকেডুবে
ফোঁটা কত হয় বরিষণ।
[illegible]সুধার ঘোর তৃষা, সে জলে কি হয় কৃশ
আরো তিনি হন জ্বালাতন॥
দিবামান নিশামান, হান ফান করে প্রা[illegible]
পরিত্রাণ নাহি জল বিনা।
এমন আঁকশী নাই, খোঁচা মেরে দেখি ভাই
আকাশেতে জল আছে কি না॥
মরে জীব সমুদয়, আর না যাতনা স[illegible]
কোথা নাথ কৃপার আধার।
যায় যায় যায় সৃষ্টি, হয় রিষ্টি দিয়া বৃষ্টি
কৃপাদৃষ্টি কর একবার॥
বরষায় নাহি বারি, দৈব-বিড়ম্বনা ভারি
না জানি পাপের কত ভার।
কিসে এত কোপদৃষ্টি, আপনার এই সৃষ্টি
কেন কর আপনি সংহার?
ছিটে ফোঁটা পড়ে জল, ভেপে উঠে ভূমিতল
গুমটে গুমুরে যায় প্রাণ।
পৃথিবীর মুখশোষ, শুষে খেয়ে ফোঁস, ফোঁস
শব্দ করে সাপের সমান॥
দিনমান নিশামান, দূরে যাক পরিমাণ
কোরে দেও ঘোর অন্ধকার।
শীতল স্বভাব ধরি, ঘোরতর নাদ করি
বৃষ্টি হোক্‌ মুষলের ধার॥

চতুর্ব্বিধ প্রাণীচয়, তৃপ্ত হয়ে যেন রয়,
যেন হয় শস্যের সঞ্চার।
কৃপাকর নাম ধর, কৃপা কর কৃপাকর,
প্রণিপাত চরণে তোমার॥
আর এক ভিক্ষা চাই, দয়া করে দিলে তাই,
কিছুই তো চাহিব না আর।
অহঙ্কার ঘোর ভীম, মানবের মনে গ্রাম,
শান্তি-জলে করহ সংহার॥
এই শান্তি-জল দিয়া, দেখাও কৃপার ক্রিয়া,
বিদ্রোহ-অনল করি নাশ।
বিপদ বিনাশ হোক, রাজা প্রজা সুখে রোক,
এই মাত্র মনে অভিলাষ।

বর্ষার সঞ্চার।

ছুটিল পূর্ব্বের বায়ু, টুটিল গ্রীষ্মের আয়ু,
ফুটিল কদম্ব-কলিগণ।
বরিষে জলদ জল, হরিষে ভেকের দল,
করিছে সঙ্গীত অনুক্ষণ॥
তরুণ-বয়স-কালে, অরুণ জলদজালে,
বরুণ সহিত করে রণ।
প্রভাতে সমর-রঙ্গ, প্রভাতে ভানুর অঙ্গ,
শোভাতে না হয় নিরীক্ষণ॥
মলিন দিবসকান্ত, মলিন বিরস কান্ত,
অলীন ভ্রমর তার কোলে।

*　　*　　*　　*

নিবিড় নীরদকলা, কি শোভা না যায় বলা,
অমলা কালিন্দী রঙ্গময়।
মনে মনে এই গণি, গ্রাসিবারে দিনমণি,
ওই কালনাগিনী উদয়॥
বরষার ঘোর বিষে, নীরদ ভুজঙ্গ বিষে,
ভানুকর নিকর নিঃকর।
ভস্ম-আচ্ছাদিত যেন, প্রজ্বল অনল হেন,
আজি প্রভাতের দিনকর॥

অতঃপর ঘোরতর, নীরধর আড়ম্বর,
শূন্যপর করে অতিশয়।
চারু চারু সমুদিত, গুরু গুরু গরজিত,
দুরু দুরু কম্পিত হৃদয়।
বহিতেছে সমীরণ, করিতেছে ঘোর রণ,
নিদাঘ বরষা সহকার।
সন্ সন্ স্বরে গাজে, ঝন্ ঝন্ মাঝে মাঝে,
শব্দ করে স্তব্ধ ত্রিসংসার॥
চক্‌মক্ চিকিমিকি, ধক্ ধক্ ধিকি ধিকি,
সুচঞ্চলা চপলার মালা।
ঝম্ ঝম্ হয় জল, ধরাতল সুশীতল,
ঘুচে গেল সন্তাপের জ্বালা।
একবারে পড়ে ধারা, কিবা শোভা পায় তারা,
তারা যেন পড়িছে খসিয়া।
পুলকে চাতকদল, পান করে ধারা-জল,
গান করে রসিয়া রসিয়া॥

বর্ষার অভিষেক।

নীরদ দ্বিরদবর, আরোহিয়া তদুপর,
ঋতুবর বরষার জাঁক।
গুড়ু গুড়ু গুম্ গুম্, গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্,
বাজিতেছে রণ-জয়ঢাক॥
ওই করে ফর্ ফর্, গতি অতি খরতর,
দামিনীর উড়িছে পতাকা।
প্রজারূপে তরুচয়, প্রণত হইয়া রয়,
দিয়া কর ফল পাকা পাকা॥
যদি কেহ তুষ্ট হয়, নিদাঘের পক্ষে রয়,
নাতোয়ানী নষ্টামীতে ভরা।
সাঁজোয়াল সমীরণ, কাণ ধরি সেইক্ষণ,
লুটাইয়া দেয় তারে ধরা॥
মণ্ডল কাঁটাল ভারা, পেয়েছেন বড় পায়া,
হেঁড়ে পাগ ভুঁড়ি সুবিখ্যাত।
ফলের পিতৃব্য বুড়া, শ্যালা রসিকের চূড়া,
ঘরে ঘরে সবে আছে জ্ঞাত॥

কুলের কামিনী ধনী, চাতকিনী সুখ গণি,
হুলুধ্বনি করে অবিরত।
জলাশয়ে হংসীগণ, জলে দিয়া সন্তরণ,
কলরবে কেলি করে কত॥
পূর্ণ হলো মনসাধ, করিতেছে ভেরীনাদ,
ভীষণ ভয়াল রবে ভেক।
আষাঢ়ের সুসঞ্চারে, শুভ শশধর বাড়ে,
হইল বর্ষার অভিষেক।

বর্ষাকালে মানবের অবস্থা।

রান্নাঘরে কান্নাহাটী, ভিজে কাঠ ভিজে মাটী,
কোনমতে নাহি জলে চুলো।
নাকে চোকে জল সরে, সেই দণ্ডে ইচ্ছা করে,
চুলোশুদ্ধ চোলে যায় চুলো॥
ধনীর সুখের ধ্বনি, নিয়ত নিকটে ধনী,
নাহি মাত্র মনের বিকার।
ভাল গাড়ী ভাল বাড়ী,প্রতিঘাতে মারে আড়ী,
মনোমত আহার বিহার॥
স্থিরভোগে স্থিরবুদ্ধি, স্থির-যোগে স্থিরশুদ্ধি
পাত্রে পাত্রে পাত্রের বিচার।
সদা তায় সদাচার, আচারে কি কদাচার,
লোকাচার মিছে ব্যভিচার॥
দীন তাহা কোথা পান, সুধুমাত্র জলপান,
তুড়ি সার মুড়ি নাই মুখে।
টাকা বিনে হতবুদ্ধি, কিসে বল হবে শুদ্ধি,
ঘাস কাটি ধান-বোনে ঢুকে॥
বিদেশী ধর্ম্মের ষাঁড়, ভরসা কেবল ভাঁড়,
ভাগ্য-দোষে ভাণ্ড যায় ভেঙ্গে।
বহু রাত্রে পেয়ে ছুটী, ছুটে আসে ছেড়ে কুঠী,
চৌকীদার ধরে চক্ষু রেঙ্গে।
যত সব বিলসাধা, সকল শরীরে কাদা,
জামা-যোগ ভিজিল উবকে।
বহুকেলে ছেঁড়া জুতা, পাইয়া বৃষ্টির ছুতা,
একেবারে উঠিল মস্তকে॥

আমরা টোলের ছাত্র, নাহি জানি পাত্রাপাত্র
জানি শুদ্ধ একমাত্র পাঠ।
বাবুদের গেয়ে গুণ, নাহি মাছ তেল নুণ
ভট্টাচার্য্য দেন চাল কাঠ॥
মরি এই বাদলায়, কেহ নাহি বাদলায়,
পুথি পাঁতি সব যায় ভেসে।
তিন মাস রুদ্ধপাঠ, ফিরে হাট ঘাট মাঠ,
দেখে শুনে মরি হেসে হেসে॥
আমাদের সৃষ্টিধর, চিরজীবী অড়হর
আদসিদ্ধ তাই হয় পাক।
পৈতৃক সম্পত্তি বাদা, তাহার চিঙ্গড়ী দাদা
তাহে সক্ত করি নটে শাক॥
দুই সন্ধ্যা তাই খাই, মাঝে মাঝে গীত গাই
বোবা বেটা ঘটায় প্রমাদ।
রাত্রিকালে হাত বুকে, নিদ্রা যাই মহাসুখে,
নিত্রজরে করি আশীর্ব্বাদ॥
বরষা তোমার গুণ, কি কহিব পুনঃ পুন
বারিবাক্যে চরাচর ভাসে।
কি আর তোমার ব্যাঙ্গ, দোষর হয়েছে ব্যাঙ্গ
দেখে রঙ্গ রাঢ় বঙ্গ হাসে॥
আমরা বিপ্রের পুত্র, ধরিয়াছি যজ্ঞসূত্র
শুন ওহে ঋতুরাজ বাপা।
জাতিধর্ম্মে ভিক্ষা করি, প্রাণে যেন নাহি মরি
চাল ভেঙ্গে পড়ে ঘর চাপা॥

শরৎ ঋতু।

বরষা ভরসাহীন, ক্ষীণ হয় দিন দিন
শুনিয়া শরদ-আগমন।
গগনেতে জলধর, শোকে পাণ্ডু কলেবর
বরষার বিচ্ছেদ কারণ॥
জলদ বিক্রমশূন্য, চাতক বিষম ক্ষুণ্ণ
হাহাকার করে উদ্ধমুখে।
ময়ূর ময়ূরীগণ, নিত্য নিত্য বিমন
কাননে লুকায় মনোদুখে॥

ঘুচিল কোটালী পায়া, ব্যঙ্গ লয়ে ব্যঙ্গ জায়া,
দিয়ে ভঙ্গ রসরঙ্গ সব।
একেবারে সর্ব্বনাশ, করিলেন জলে বাস,
আর তার নাহি কলরব॥
গগনের চারুশোভা, দিন দিন মনোলোভা,
নাহি আর অন্ধকাররাশি।
চকোরের তুষ্টিকর, সুবিমল সুধাকর,
রজনীর মুখে সদা হাসি॥
কর্পূরে পূরিল বিশ্ব, সেই মত হয় দৃশ্য,
সিতপক্ষ শারদ-নিশায়।
অথবা নিশিতে হেন, অনুমান হয় যেন,
শরদ পারদ মাখে গায়॥
প্রিয় দারা তারা যারা, ছিল তারা পতিহারা,
শশী ঘেরি তারা সব জ্বলে।
কিবা শোভা কব তার, মল্লিকা-ফুলের হার,
শোভে যেন স্ফটিকের গলে॥
নির্ম্মল হইল জল, রাজহংস কলকল,
সরোবরে করে অনুক্ষণ।
এত দিবসের পরে, নয়ন রঞ্জন করে,
হৃদয়রঞ্জন এ খঞ্জন॥
ফুটিল সহস্রদল, শতদল সুবিমল,
কুমুদ কহ্লার শোভা করে।
এত দিবসের পর, মত্ত হয়ে মধুকর,
মধুপান করে দুই করে॥
শত শত দলে দলে, বসে শতদলদলে,
বসে শতদল দলে সুখে।
মনোহর সরোবরে, পুলকে ঝঙ্কার করে,
কিবা গুণ গুন্ গুন্ মুখে॥
নাহি পৃথিবীর পঙ্ক, শুষ্ক, পথ নিষ্কলঙ্ক,
নিরাতঙ্ক যোদ্ধাগণ সাজে।
পথিকের পথ-ক্লেশ, দূরে গেল সবিশেষ,
পরন্তু বিচ্ছেদ মনোমাঝে॥
ছয় ঋতু-মধ্যে ধন্য, সকলের অগ্রগণ্য,
শরদের জয় সবে বলে।

সাজাতে যোগীন্দ্র-জায়া, মহেশ্বরী মহামায়া,
আবির্ভূতা অবনীমণ্ডলে॥
লইতে ভক্তের পূজা, অধিষ্ঠাত্রী দশভুজা,
দশদিক করেন প্রকাশ।
শরদের তিন দিন, কিবা ধনী কিবা দীন,
জ্ঞান করে এই স্বর্গবাস॥

* * * *
* * * *

সকলের এক বোল, লেগেছে পূজার গোল,
পড়েছে ঢুলীর ঢোলে কাঠী।
তাধিন তাধিন রব, শুনিয়া মাতিল সব,
চাটি শুনে ফেটে যায় মাটী॥
নবতের বড় ধূম, গুড়্ গুড় গুম্ গুম্,
ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভোঁ বাজিছে সানাই।
মন্দিরে আমোদ ভরা, মন্দিরে মোহিত করা,
তালে তালে তাল ধরে তাই॥
এইরূপে মহানন্দ, আনন্দে হইয়া অন্ধ,
তামসিক ধনী ছাড়ে চাকি।
পূজার না লন খোঁজ, মাছি কান্দে তিনরোজ,
পুরুতের দক্ষিণায় ফাঁকি॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাঁরা, বার্ষিক সাধিয়া তাঁরা,
ব্রাহ্মণীর শাড়ী আগে লন।
সুসার হইলে তায়, শেষে পুত্র বস্ত্র পায়,
আপনার জন্যে দুঃখী নন॥
দাতার গাহিয়া জয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয়,
নস্য ছলে মিসি লন কিনে।
পুঁথির ভিতর ভরি, শ্রীহরি স্মরণ করি,
বাড়ী চলে যান দিনে দিনে॥
প্রায় বৎসরের পরে, প্রবাসীরা যান ঘরে,
কত সাধ মনে অগণন।
হয়ে প্রেম-অনুরাগী, করেন প্রিয়ার লাগি,
নানামত দ্রব্য আয়োজন॥
কেহ লয় সাতনলী, দেখিয়া আমরা বলি,
কাম-কিরাতের সাতনলা।"

প্রকাশিতে নিজ স্নেহ, বিজটা লইল কেহ,
কেহ বা লইল কাণবালা॥
কেহ লয় কর্ণফুল, কেহ বা কনক-দুল,
কেহ বা বিনোদ চন্দ্রহার।
কেহ বা মুকুতা-মালা, কেহ বা কাঞ্চন-বালা,
কিনে লয় শক্তি যে প্রকার॥
ভূষণ লইল যত, বসন তাহার মত,
মনোমত লইল সবাই॥
কেহ লয় শান্তিপুরে, কেহ বা বগড়ী ডুরে,
কেহ কেহ লইল ঢাকাই॥
বড় ধুম বড় ঘরে, সাটিনে কাঁচুলি করে,
চুমকীর কাজ তার সাঝে।
* * * স্ব
হেরি শশী শশধরে লাজে॥
সকল শরীরে ভূষা, মূর্ত্তিমতী যেন উষা,
পৌর্ণমাসী নিশি করি নাশ।
বর্ণনে অক্ষম কবি, মলিন শশাঙ্কচ্ছবি,
রবি যেন হতেছে প্রকাশ॥
আকুলিত চারু কেশে, সেই ভূষা সেই বেশে,
ভুজপাশে বাঁধে যার কর।
কোথা আর স্বর্গবাস, তাহার দাসের দাস,
ইন্দ্র চন্দ্র কাম পঞ্চশর॥
তেমন কপাল নয়, মনে মাত্র সাধ হয়,
রূপখানি দেখ মরে যাই
* * *
বায়না অগ্রেতে দিয়া, আয়না লইল গিয়া,
যায় না তাহার শোভা বলা।
লইল গোলাপী মিসি, ইচ্ছা হয় তাহে মিশি,
আর কত পানের মসলা॥
ঘুনসী প্রেমের ফাঁসি, লইলেক রাশি রাশি,
যাহে ভাল বাসিবেক প্রিয়া।
নিল মালা কত মত, কামিনীর মনোমত,
হাসি হারে যাহারে হেরিয়া॥

জা নাইতে ভালবাসা, চুঁচুড়ার মাথাঘসা,
কসা কিম্বা রসা কেবা গণে।
কিনিল পরমাদরে, দিয়া কামিনীর করে,
কৃতার্থ হইব ভাবে মনে॥
অন্তরেরে ভয় আছে, পছন্দ না হয় পাছে,
এই হেতু সুস্থ নহে মন।
করিয়া বিশেষ ভক্তি, লইলেন যথাশক্তি,
স্বীয় শক্তি-পূজার কারণ॥
পাড়াগেঁয়ে যুবাদল, মুখে হাস্য খল খল,
পরিচ্ছদে সদা মন কাবু।
মনে মনে বড় সাধ, ফাঁদিয়া মোহন ছাঁদ,
দেশে গিয়া সাজিবেন বাবু॥
কালাপেড়ে ধুতি পরা, দাঁতে মিসি গালভরা,
ঠোঁট রাঙ্গা তাম্বূলের জলে।
গোড়গাবি জুতা পায়, রঙ্গিন মেরজাই গায়,
হাতে কোঁৎকা হোঁৎকা সব চলে॥
যাহার সঙ্গতি যত, বস্ত্র লয়ে সেইমত
দূর করে মনের বিলাপ।
ইয়ারের অনুরাগে, চরস লইল আগে
আর কিছু আতর গোলাপ॥
সহরের লোক যত, তাদের উল্লাস কত
সুখের আমোদে সদা রত।
বাবু সবে ঘোর গর্জ্জী, বাড়ীতে আনিয়া দর্জী
পোষাক করিছে কত মত॥
কারপেট ঢাকে সেট, কারপেট কারপেট
কারুকর্ম্ম তাহে বাছা বাছা।
স্বভাবের শোভা সব, তার কাছে পরাভব
কৃত্রিম হয়েছে যেন সাঁচা॥
বান্ধবের গড়াগড়ি, তিনদিন ছড়াছড়ি
লেবেণ্ডর গোলাপ আতর।
আর আর দ্রব্য যাহা, ফুটে না লিখিব তাহ
ব্যয়কল্পে না হন কাতর॥
বিরহিণী নারী যারা, নিয়ত নয়নে ধারা
তারা শুদ্ধ তারা তারা বলে।

কিসে মন হবে শান্ত, কতক্ষণে পাবে কান্ত,
বিচ্ছেদ-অনলে মন জ্বলে॥
হইবে পতির পুয়া, মানে কত পান গুয়া,
করিবেক প্রেমের অধীন।
সুখের আশ্বিনমাসে, প্রবাসী আসিবে বাসে,
সুবচনী দিবেন সুদিন॥
বিদেশী কলমপেষা, সকলের এক নেশা,
পরস্পর কয় এই কথা।
চাকুরীর মুখে ছাই, পাখী হয়ে উড়ে যাই,
নিবাসে রমণী-মণি যথা॥
পড়িয়াছে তাড়াতাড়ি, কতক্ষণে যাব বাড়ী,
কোনরূপে ধৈর্য্য নাহি মানে।
সদাই সজল আঁখি, উড়িয়াছে মন-পাখী,
প্রেয়সীর প্রণয়-বাগানে॥
ধরেছে বাড়ীর টান, বিরহে কি রহে প্রাণ,
কেবল বিচ্ছেদ মনে জাগে।
গৃহে আছে ভালবাসা, প্রবাসের ভালবাসা,
মনে আর ভাল নাহি লাগে॥
ঘরের বিষম স্নেহ, সুস্থির না হয় কেহ,
দহে দেহ শয়নে স্বপনে।
নাহি সুখ একটুক, ঘোর দুখে ফাটে বুক,
চাঁদমুখ সদা পড়ে মনে॥
মনিবে না দেয় ছুটী, দিবানিশি ছুটাছুটী,
কুঠী গিয়া ছটফট করে।
নাহিক মাথার ঠিক, কেমনে করিবে ঠিক,
জমা লেখে খরচের ঘরে॥
ছুটী লয়ে খাড়া খাড়া, ঠিকে পান্সী করি ভাড়া,
বসে গিয়া নাবিকের কাছে।
দুহাত না যেতে যেতে, বলে কত বিনয়েতে,
মাঝী আর কত দূর আছে?
জোসে দাঁড় টান দাঁড়ী, দিয়ে দিনে দিয়ে পাড়ি,
চাল তরী ত্বরায় করিয়া।
তুমি শীঘ্র লয়ে যাবে, অধিক বক্সীস পাবে;
ভাড়া দিব দ্বিগুণ ধরিয়া॥

বদর বদর গাজী, মুখে সদা বলে মাঝী,
ঠেলে ধজি গায়ে যত জোর।
গাজে বড় একটানা, টানে গুণ গুণটানা,
টানাটানি যেন কত চোর॥
লেগেছে বাড়ীর ধুম, বাবুর না হয় ঘুম,
খুলে গেল মনের কপাট।
বাড়াদুর আর নাই, চল চল মাঝি ভাই,
ওই দেখ দেখা যায় ঘাট॥
থাকিতে কিঞ্চিৎ দূর, বাড়িল অধিক ভুর,
চালের উপরে গিয়া চড়ে।
থর থর কাঁপে কায়, না লাগাতে কিনারায়,
ইচ্ছা হয় ঝাঁপ দিয়া পড়ে॥
যায় উজানের যান, যায় উজানের যাম,
মুখ নাড়ে অজগর প্রায়।
ভাঁটি যেন ছোটে কল, কল কল কাটে জল,
আরোহীরা চন্দ্র হাতে পায়॥
গোড়ে পোড়ে নদী ছেয়ে, সারি সারি যায় বেয়ে,
দাঁড়ে হয় শব্দ ঝুপ ঝুপ।
নিদ্রাহার পরিহরি, দিবানিশি চালে তরী,
না মানে শিশির আর ধুপ॥
জলে স্থলে বনে বনে, যত চোর-দস্যুগণে,
নিজ নিজ ব্যবসায় রত।
কারে কাটে কারে মারে, লুটে লয় ভারেভারে,
পথিকের প্রাণ কণ্ঠাগত॥
রামাগণ ঘাটে ঘাটে, স্নান করে নানা ঘাটে,
দূরে থেকে নৌকা দেখে যদি।
ভাবে পতি এলো ঘরে, উল্লাস পবন-ভরে,
ফেঁপে উঠে প্রেমানন্দ-নদী॥
বলে দিদি যাই বাড়ী, কাড়িয়া নূতন হাঁড়ি,
তাড়াতাড়ি রাঁধি গিয়া সই।
চল শীঘ্র চল চল, ফলিল ভাগ্যের ফল,
ফলনা আইল বুঝি ওই॥
বলে পরে কাছাকাছি, সবে করে আঁচা আঁচি,
হেসে কহে কোন সীমন্তিনী।

প্রাণসই তোরে কই, দেখ দেখ রসমই,
বুঝি ওই আমাদের তিনি ॥
হেসে বলে কোন বুড়ী, মর্ মর ওলো ছুঁড়ী,
ও যে বুড়ো আর কার পাপ।
কেহ কেহ দূর দূর, ও বাড়ীর বট্‌ঠাকুর,
কেহ কেহ অমুকের বাপ ॥
আর জন বলে সই, আমাদের কর্ত্তা ওই,
চিনিয়াছি শরীরের ধাঁচে।
গায়ে সব লোম উঠা, চোক কটা পেট মোটা,
সেইরূপ গালে দাগ আছে ॥
কেহ কয় ওলো ওলো, আই আই মোলো মোলো,
চোক খেয়ে কর দরশন।
রূপখানি টলটল, প্রাণধন কারে বল,
ও যে দেখি দাদার মতন ॥
যুবতী কুলের বধূ, প্রফুল্ল ফুলের মধু,
মনে মনে কত শোক উঠে।
ডুব ছলে করে দৃষ্টি, মদনের বাণবৃষ্টি,
ফাটে বুক মুখ নাহি ফোটে ॥
ঘোমটার আড়ে আড়ে, ঈষৎ কটাক্ষ ছাড়ে,
বিরহ-বিলাপ বাড়ে তায়।
যুবক পুরুষ যত, চলিয়াছে শত শত,
নিজপতি দেখিতে না পায় ॥
তরণী আইলে কাছে, তরুণী মনেতে আঁচে,
পাইব আপন প্রাণধনে।
শাশুড়ী ননদ কাছে, লজ্জাভয়ে ফেরে পাছে,
মনের আগুন রাখে মনে ॥
কুলের কামিনী মণি, এত কেন ভাব ধনি,
প্রাণপতি আসিবেক ঘরে।
তোমার শাশুড়ী গিন্নী, মেনেছে পীরের সিন্নী,
সন্তানের আসিবার তরে ॥
সুরতরঙ্গিণী-জলে, * * দলে,
পরস্পর বলে সমাচার।
ঘরে রেখে ছেলে-পুলে, কর্ত্তাটি রহিল ভুলে,
আসিবার নাম নাই আর ॥

যত ছেলে ঘরে ঘরে, ভাল খায় ভাল পরে,
দেখে শুনে কাঁদে সব তারা।
ভেবে ভেবে তনু কালী, রাগে দিই গালাগালি,
ধার করে কত হব সারা ॥
কেহ বলে অতি গাধা, তোমার চাটুয্যা দাদা,
ঘরে থেকে করে খিটিমিটি।
প্রবাসে যাইলে পরে, তত্ত্ব আর নাহি করে,
একমাস লেখে নাই ছিটি ॥
সেজোবৌর্ কচি ছেলে, এক দণ্ড তারে ফেলে,
কোনমতে যেতে নাহি পারি।
বছরের শুভ দিন, দুঃখে হয় দেহ ক্ষীণ,
বিধাতা করিল কেন নারী ॥
কেহ কহে দিদি ওর, কেমন কপাল জোর,
মরি কিবা সোণার সংসার।
অহঙ্কারে মরে রাঁড়ী, সকলে এসছে বাড়ী,
জিনিস এনেছে ভারে ভার ॥
যুগী জোলা মুচি হাড়ী, সকলেই যায় বাড়ী,
তাড়াতাড়ি চলে মনোরথে।
টাকা ছেড়ে খাবড়ায়, পার হয়ে হাবড়ায়,
চলিয়াছে রেলওয়ে পথে ॥
হুগলীর যাত্রী যত, যাত্রা করে জ্ঞানহত,
কলে চলে স্থলে জলে সুখ।
বাড়ী নহে বাড়াদূর, অবিলম্বে পায় পুর,
হয় দূর সমুদয় দুখ ॥
তাদের পশ্চাতে দুখ, প্রথমে কিঞ্চিৎ সুখ,
যাদের নিবাস দূরদেশে।
রেড়ো ভেড়ো যত খেড়ো, ভাবিয়া নাবিয়া পেঁড়ো,
হাটাহাটি ফাটাফাটি শেষে ॥
আগেতে সাজিয়া বাবু, অবশেষে ঘোর কাবু,
হবু থবু তবু সাধ মনে।
ছোটে কত কষ্ট সয়ে, গৃহে গিয়া গৃহী হয়ে,
গৃহিণী দেখিব কতক্ষণে ॥
পশ্চিমের রেড়ো যত, পূবের বাঙ্গাল [illegible]
শত শত চলিয়াছে পথে।

কেহ গাড়ী কেহ ডুলী, কেহ বা উড়ায়ে ধূলি,
চলে যায় নিজ মনোরথে ॥
এঁটে এঁটে তুলে এঁলে, যারা যায় পায় হেঁটে,
নাহি কোচ্‌কা পিটে বোচ্‌কা ঝোলে।
...লে যাবার তরে, পবনের বেগ ধরে,
মাথার উপরে জুতো তোলে ॥
...ন পূজা কেবা করে, কোচড়ে জলপান করে,
যেতে যেতে খেতে খেতে ছোটে।
...ই তিন ক্রোশ গিয়া, গুড়ুকে আগুন দিয়া,
দম মেরে ধরাতলে লোটে ॥
...ামের নিকটে এলে, হেলে বাদশার ছেলে,
এক পদে চলে দশ পদ।
...কে ঝুলী রুক্ষকেশ, গো-দাগার মত বেশ,
যেন কত খাইয়াছে মদ ॥
...পরূপ ভাব তথা, কি কব রহস্যকথা,
নারীগণ দেখে যদি মুটে।
...কের বসন খোলা, প্রেমভাবে হয়ে ভোলা,
তাড়াতাড়ি বাড়ী যায় ছুটে ॥
ভিজে চুল ভিজে খোঁপা, মুখে করে কত চোপা,
পুত্রে বলে পতির উদ্দেশে।
এসেছে অমুক রায়, জিজ্ঞাসা করিয়া আয়,
বাবা কেন এলোনাকো দেশে ॥
এইরূপ সবাকার, আনন্দের নাহি পার,
প্রেমপূর্ণ সকলের মনে।
খেদে নহে মন স্থির, কেবল বহিছে নীর,
বিয়োগীর যুগল নয়নে ॥

শীত।

জলের উঠেছে দাঁত, কার সাধ্য দেয় হাত,
আঁক্ করে কোটে বাপ্ বাপ্।
কালের স্বভাব দোষ, ডাক ছাড়ে ফোঁস্ ফোঁস্,
জল নয় এ যে কালসাপ ॥
অপুত্রের পুত্রলাভে, কত সুখ মনে ভাবে,
তত সুখ রবির কিরণে।
কুটুম্বের কটু বাণী, তাহে ক্লেশ নাহি মানি,
যত ক্লেশ শীত-সমীরণে ॥
বলবান্ বড় বড়, সবে হয় জড় সড়,
হাঁটিতে হোঁচট খেয়ে পড়ে।
গায়ে কাঁটা জরজর, সদা করে থর থর,
কম্পিত কদলী যেন ঝড়ে ॥
নিশির না যায় রিষ্টি, শিশির সতত বৃষ্টি,
ঋষির তাহাতে ভাঙ্গে ধ্যান।
বিষম প্রবল হিম, যে জন সাক্ষাৎ ভীম,
স্পর্শমাত্রে হরে তার জ্ঞান ॥
সন্ন্যাসী মোহন্ত যত, মাঠে ঘাটে শত শত,
মুহুনী গাঞ্জার দম নিয়া।
ছাই ভস্মে লোম ঢাকে, বম্ বম্ মুখে হাঁকে,
পোড়ে থাকে বুকে হাত দিয়া ॥
সেই জন ভাগ্যধর, গদী পাতা পাকা ঘর,
সদা সঙ্গে সুরত-রঙ্গিণী ॥
আহার তাহার মত, বিহার বিবিধমত,
তাহারে জীবনমুক্ত গণি ॥
ধনীর শরীরে সাল, গরীবের পক্ষে শাল,
কম্বল কম্বল করি রয়।
বেণের পুঁটুলী হয়ে, শুয়ে থাকে শীত সয়ে,
উম্ বিনা ঘুম নাহি হয় ॥
চিরজীবী ছেঁড়া কাঁথা, সর্ব্বক্ষণ বুকে গাঁথা,
একক্ষণ তারে নাহি ছাড়ে।
শয়নের ঘর কাঁচা, ভার হয় প্রাণে বাঁচা,
জাড় তার বিন্ধে হাড়ে হাড়ে।
সকালে খাইতে চায়, আয়োজনে বেলা যায়,
সন্ধ্যাকালে খায় ভাতে ভাত।
শীতের কেমন খড়ি, উড়ায় অঙ্গের খড়ি,
ফাটায় সবার পদ হাত ॥
সারিতে পায়ের ফাটা, মহার্ঘ্য আমের আটা,
ফাটাফাটি করিলেক ভাই।
বিষ্ণুতেল কত মাখি, ঘৃতে যদি ডুবে থাকি,
শরীরেতে তবু উড়ে ছাই ॥

থাকিতে দুখড়ী বেলা, ছেলে ছাড়ে ছেলেখেলা,
বেলাবেলি খায় গিয়া ভাত।
লেপে করে মুখ রুজু, পাছে ধরে শীত জুজু,
উঠেনাকো না হলে প্রভাত ॥
বাবু সব হরষিত, শীতে মন বিকসিত,
রাত্রি দিন আহারের খোঁজ।
বাবুজীর প্রাণ চায়, গরম গরম চায়,
মনোমত খাদ্য রোজ রোজ ॥
মুখেতে আলবোলা, মহাঘোর বোলবোলা,
দ্বার ঢাকা ক্যাম্বিসের গুণে।
বায়ু ভায়া মনোডরে, ঘরে না প্রবেশ করে,
শীত ভীত পরদার গুণে ॥
চারিদিকে বন্ধুবর্গ, কিছু নাই উপসর্গ,
ঘরে বসি করে স্বর্গভোগ।
সুমধুর খাদ্য সব, ঠুন্ ঠুন্ বাদ্যরব,
তাহে কি হিমের হয় যোগ?
আমা হেন ভাগ্যপোড়া, দুঃখ লাগা আগাগোড়া,
শীতে মরি দেহ নহে বশ।
চন্ চন্ হাত থাকি, ভরসা মুড়ীর চাক্তি,
পান মাত্র খেজুরের রস ॥
অভিমানী বাবু যারা, প্রাণে সারা হয় তারা,
সাল বিনা মাস নাহি রহে।
ঘুচিল মুখের চোট, ইয়ারের নাহি জোট,
মনের আগুনে শুধু দহে ॥
…নী চাদর যত, এখন আদরহত,
আগে যাহে অভিমান রোতো।
দুই বেশ বেশ, দেখিয়া শীতের বেশ,
জানিলাম কে বাবু কে ফোতো ॥
ইয়ারেরা গদগদ, কেহ গাঁজা কেহ মদ,
কেহ বা চরসে দিয়া টান।
কাছে রেখে অবলায়, দিয়ে চাটি তবলায়,
মনের আনন্দে ছাড়ে গান ॥
কেবা বুঝে সুর বোল কেবল ভেড়ার গোল,
রাগে রাগে সুর উঠে চড়ি।
অপরূপ গলা সাধা, বলে বুঝি ডাকে গাধা,
ধোবা ছোটে হাতে নিয়ে দড়ী ॥
সাহেবে রাখিয়া বাজি, লয়ে তাজি তাজি বাজী,
দমবাজী কারসাজী কত।
সোয়ার হাঁকায় চোটে, ঘোড়া পায় যোড়া ছোটে,
বাজীবলে বাজি বল হত ॥

বসন্তের নিকট শীতের পরাজয়।

শরদ ছিলেন রাজা এই পৃথ্বীদেশে।
ভাঙ্গিল তাঁহার ভাগ্য কার্ত্তিকের শেষে ॥
কাঁপুনী হিমানী দুই মহিষী সহিত।
উপনীত মহাবীর মহীপাল শীত ॥
প্রকাশ করিয়া নাম হিম-ঋতু নামে।
করিলেন রাজধানী হিমালয়-ধামে ॥
ফাটাফোটা সেনাপতি বল ধরে কত।
আহা উহু হিহি হুহু সেনা শত শত ॥
বাজায় বিজয়-কাড়া উত্তরের বায়ু।
বৃদ্ধ আর বিরহীর নাশ করে আয়ু ॥
নিশির বিষম দুঃখ পতির বিলাপে।
ঋষির ভাঙ্গিল ধ্যান শিশির-প্রতাপে ॥
কু-আশার ধ্বজা উড়ে সন্ধ্যা আর প্রাতে।
বিশেষ কে বুঝে কত কু-আশয় তাতে ॥
নলিনী নলিনী মানে বন্ধুবলহত।
প্রেমানন্দে প্রস্ফুটিত গাঁদাফুল যত ॥
শশীসূর্য্য তেজোহীন রাজার প্রতাপে।
আকাশে কেবল ভয়ে থর থর কাঁপে ॥
শাসন করিল খুব চারিদিক রুকে।
কার সাধ্য বাপ বাপ জল দেয় মুখে?
জলের হয়েছে দাঁত হাত দেয়া দায়।
স্নান পান দুই রুদ্ধ খড়ি উড়ে গায় ॥
দিন দিন দীন দিন প্রাণ তার হরে।
বিয়োগী বিনাশ হেতু নিশা বৃদ্ধি করে ॥
দীনের দারুণ দায় দুঃখ যায় কিসে।
দিন যায় নিশা তায় নাহি কোন দিশে ॥

এ সময়ে সাধারণ থাকা সুখে বটে।
কালগুণে কিন্তু তাহে বিপরীত ঘটে॥
শীত-ভয়ে খোল ঝাল নাহি লয় চেয়ে।
বাঁচে শুদ্ধ ফাঁকাফুকো শুকো-রুকো খেয়ে॥
আঁচাবার ভয়ে কেহ হাত নাহি খুলে।
ইচ্ছা মনে যদি হয় মুখে দেয় তুলে॥
প্রচার হইল খুব শীতের বিক্রম।
করিয়া আসনজারী শাসন বিষম॥
সর্ব্বদা শরীরে দুঃখ সুখ কিসে হবে ?
বড় বড় বীর যত জড়সড় সবে॥
এইরূপে দুই মাস লয়ে সেনাজাল।
করিলেন রাজকার্য্য শীত মহীপাল॥
বসন্ত শুনিল সব হিমের ব্যাভার।
সুখের ধরণী-রাজ্য করে ছারখার॥
প্রজা-মধ্যে কোনমতে সুখী নহে কেহ।
শীতভয়ে থর থর জরজর দেহ॥
ঘুচাইতে পৃথিবীর দুঃখ সমুদয়।
মনেতে হইল তাঁর ক্রোধ অতিশয়॥
দেখিব কেমন সেই দুষ্ট দুরাচার।
এখনি হরিয়া লব সব অধিকার॥
মলয়া পর্ব্বতে বসে গোঁপে দিয়া পাক।
দক্ষিণে বাতাস বলি ছাড়িলেন হাঁক॥
আইল দক্ষিণে বায়ু শব্দ ফুরফুর।
অকালে ডাকিলে কেন রাজা বাহাদুর॥
রাজা কন সাজ সাজ বীর সেনাপতি।
অবনীমণ্ডলে চল যাই শীঘ্রগতি॥
কোন প্রজা সুখী নহে শীতের শাসনে।
লইব তাহার রাজ্য অভিলাষ মনে॥
কামের কামান তায় লোভ-গোলা রেখে।
গোটা দুই কোকিলেরে শীঘ্রগতি ডেকে॥
স্বকীয় সৈন্যের সহ বসন্ত ভূপাল।
আইলেন অবনীতে বিক্রম বিশাল॥
সিংহাসন প্রাপ্ত হয়ে ঋতুপতি শীত।
রাণী-সঙ্গে রসরঙ্গে ছিল হরষিত॥
সবিশেষ নাহি জানে কোন সমাচার।
পাত্র মিত্র সেনাগণ সেরূপ প্রকার॥
হঠাৎ বসন্ত আসি হইয়া প্রকাশ।
একেবারে সমুদয় করিল বিনাশ॥
না রহিল কোন চিহ্ন সব গেল উঠে।
উত্তরে,বাতাস ভয়ে পলাইল ছুটে॥
কোথায় রহিল হিম দেখা নাহি আর।
বসন্ত-প্রভাবে মার করে মার মার॥
মলয়া পবন দিলে অতিশয় হেঁকে।
সিংহাসনে ঋতুরাজ বসিলেন জেঁকে॥
বিরহী-শাসন হেতু লয়ে খাঁড়া ঢাল।
কুহুরবে ডাক ছাড়ে কোকিল কোটাল॥
নামমাত্র মাঘমাস ঘোর শীতকাল।
বড় বড় শাল হল বড় বড় সাল॥
সকলের মহানন্দ বসন্তের বলে।
অধিকন্তু হাফ দুঃখী ইয়ারের দলে॥
উড়ানী উড়ায়ে গায় দমে দম ছাড়ি॥
তুড়ি মেরে যায় সবে ইয়ারের বাড়ী॥

(শীতের পুনরায় রাজ্যলাভ।)

শীত-ঋতু মহাশয় রাজ্যহীন হয়ে
মনে মনে ভাবে বসে অভিমান লয়ে॥
কি করিব কোথা যাই বাক্য নাহি ফুটে।
অত্যাচারে দুরাচার রাজ্য নিলে লুটে॥
ঘোর দায় সদুপায় নাহি পায় বীর।
অনেক ভাবিয়া শেষ যুক্তি করে স্থির॥
প্রিয়বন্ধু বর্ষারাজ ধর্ম্মশীল অতি।
অবশ্য করিবে কৃপা আমাদের প্রতি॥
এ বিপদে রক্ষাকর্ত্তা আর কেবা আছে।
এই ভেবে উপনীত বরষার কাছে॥
কাঁপুনী হিমানী দুই প্রিয়তমা নিয়া।
দুঃখের কাহিনী সব কহিলেন গিয়া॥
বরষা আহ্বান করি আলিঙ্গন দিয়া।
রাণী সহ বসিলেন সিংহাসনে গিয়া॥
বসো বসো স্থির হও শান্ত কর মন।
দেখিব কেমন সেই দাম্ভিক দুর্জ্জন॥

একেবারে বসন্তেরে প্রাণে কোরে বধ।
তোমারে করিব দান পৃথিবীর পদ॥
যখন তোমার রাজ্য করেছে হরণ।
তখন জানিবে তার নিশ্চয় মরণ॥
জলদেরে ডাক দিয়া করেন আদেশ।
রমণীমণ্ডলে তুমি করহ প্রবেশ॥
অধার্ম্মিক বসন্তের করিয়া নিধন।
শীতরাজে দেহ গিয়া নিজ-সিংহাসন॥
জলদ জলদ সেজে অগ্রসর হয়ে।
যুদ্ধ হেতু বসিলেন হিমরাজে লয়ে॥
কামান কামান নয় বজ্র তোপ ছাড়ে।
ঘোর বৃষ্টি ছিটে গুলী অন্ধকার বাড়ে॥
ক্রপ্তেন পূবের বায়ু দিয়া খুব ফের।
চারিদিক্ ঘুরে করে ফায়ের ফায়ের॥
বসন্ত পড়িল দায়ে সব হল ভুট।
প্রাণভয়ে রাজ্য ছেড়ে উঠে দিলে ছুট॥
বহিছে উত্তর-পূবে অতি ধীরে ধীরে।
দক্ষিণে-বাতাস গেল একেবারে ফিরে॥
যে কোকিল ডেকেছিল কুহু কুহু স্বরে।
এখন সে শীতভয়ে উহু উহু করে॥
ভাসিল বিপক্ষদল উঠিলেন নেচে।
রাজপাটে রাজা হিম বসিলেন কেঁচে॥
শীতের সেরূপ জয় বসন্তের দলে।
শা সুজা যেমন জয়ী ইংরাজের বলে॥

বসন্ত-বিচ্ছেদ।

যদবধি প্রাণনাথ প্রবাসেতে রয়।
বসন্ত পীযূষ সম বিষোপম হয়॥
কোকিলের কুহুরবে কুহক লাগায়।
আমার হৃদয়ে আসি বিঁধে শেল প্রায়॥
বকুল-মধুর-গন্ধে প্রমোদিত বন।
আকুল করিল তায় অভাগীর মন॥
পলাশে বিলাস করে মালতীর লতা।
প্রবল করয়ে তার মনোমলিনতা॥
নাগেশ্বর কেশর বেশর সম শোভা।
প্রজাপতি বসে ধরি মনোহারী প্রভা॥
যেন কোন চতুর লম্পট জন শেষ।
ভুলায় ললনা-মন, ধরি নানা বেশ॥
পরে মধু ফুরাইলে অমনি প্রস্থান।
যে দিকে সৌরভ ছোটে সে দিকে পয়াণ॥
সেইমত আমারে ভুলালে অরসিক।
আশাপথ চেয়ে আঁখি হলো অনিমিখ॥

বিচিত্র হাস্য।

রসময় বিধাতার বিচিত্র কৌশল।
সৃজিলেন "মুখ"রূপ ভাবের মণ্ডল॥
সুরাগ বিরাগ আদি মানস-আভাষ।
হয় এই ভাবাকর বদনে বিকাশ॥
এই মুখ-ভঙ্গীভরে ভ্রান্ত যত লোক।
কোথায় উদয় সুখ কোথা উঠে শোক॥
আনন কানন সম ভাব তাঁহে শোভা।
কভু নিরানন্দকর কভু মনোলোভা।
বিষাদ বিষম বায়ু বহিলে তথায়।
ক্ষণমাত্রে সর্ব্ব-শোভা লুপ্ত হয়ে যায়॥
তৃণদল পুষ্প ফল প্রাপ্ত মলিনতা।
শুষ্ক হয় ললিত-লাবণ্যরূপ লতা॥
রাগরূপ খরতর দিনকর-করে।
বদন-বিপিন-শোভা একেবারে হরে॥
নয়ন-নিকুঞ্জপুরে জ্বলে দাবানল।
দগ্ধ করে চতুর্দ্দিক্ হইয়া প্রবল॥
এইরূপ বিবিধ বিষম-ভাব-যোগে।
আনন-অটবী-শোভা ভ্রষ্ট হয় ভোগে॥
ফলে যবে সুখ-সমীরণ বহে তথা।
মধুর মাধুর্য্য মাত্র শোভিত সর্ব্বথা॥
প্রফুল্ল নয়নকুঞ্জে পলক পল্লব।
চঞ্চল পুত্তলী যেন কুসুম-বল্লভ॥
গণ্ডযোগে বিকসিত হয় কোকনদ।
সঞ্চারিত রসরূপে সুরূপ সম্পদ॥

হাসির হিল্লোল উঠে অধর-পুষ্করে।
রসন-হংসের শ্রেণী সুখেতে বিহরে॥
হায় রে বিচিত্র ভাব বলিহারি যাই।
এমন মধুর বুঝি আর কিছু নাই॥
দেখ হে রসিকগণ! রমণী-বদনে।
হায় রে মাধুর্য্য কত প্রণয়-মিলনে॥
বলিতে বচন নাই সে রস সুরস।
প্রমোদ-পয়োধি-জলে নিমগ্ন মানস॥
আর দেখ মানিনী বিনোদ বিম্বাধরে।
হাস্যযোগে কত রস রসিকে বিতরে॥
যেমন বরষাকালে মেঘাবৃত দিবা।
অকস্মাৎ সূর্য্যোদয়ে সুখোদয় কিবা॥
অথবা শিশিরকালে ফুল্ল শতদল।
মধুপানে মহাসুখী মধুকর-দল॥
গর্ভজ-প্রফুল্ল-মুখ-পদ্ম-বিলোকনে।
অতুল আনন্দ উঠে জননীর মনে॥
মৃদু মৃদু হাসি মুখে অমৃত বচনে।
স্নেহরসে অভিষিক্ত অধর-চুম্বনে॥
হায় রে বাৎসল্য-রস-প্রকাশিনি হাসি॥
সরলতা তোর গুণে হইয়াছে দাসী॥
আর এক হাস্য-শোভা ভাবুক-বদনে।
চঞ্চল, চপলা দিশি শোভিত সঘনে॥
অথবা গগনে যেন নক্ষত্র-সম্পাত।
অচির উজ্জ্বল দীপ্তি ক্ষরে অকস্মাৎ॥
এই আছে এই নাই এই আরবার।
কতরূপ অপরূপ ভাবের সঞ্চার॥
অপর মধুর হাসি সাধুর অধরে।
পদ্মরাগমণি সম স্নিগ্ধ আভা ধরে॥
স্মেরমুখে শীতল স্বভাব প্রকাশিত।
হেরিয়া প্রশান্ত মন হয় হরষিত॥
এইরূপ শুভপথে হাস্য মনোহর।
তৃপ্ত করে জগতের যাবৎ অন্তর॥
কেবল ঘৃণার হাসে ঘৃণার প্রভাব।
হাস্য নয় শুধু সেই হীনতার ভাব॥

সতীত্ব-দীপ।

রমণীর হস্তে শোভে মনোহর দীপ।
শীতল আলোক তার জিনি নিশাধিপ॥
অথচ প্রখর অতি পাত্রভেদে হয়।
প্রখর তপনমত নয়নে উদয়॥
সতীত্ব সুন্দর নাম সুখদ শ্রবণে।
সুললিত সমুদিত; এ তিন ভবনে॥
শুন হে চঞ্চলা বালা প্রদীপ-ধারিণি।
সাবধানে গমন করহ বিনোদিনি॥
হৃদয়ের দ্বারে যত্নে রাখিয়া তাহারে।
প্রতিপদে ধৈর্য্যঘৃত ঢাল দীপাধারে॥
লজ্জারূপ চারু বস্ত্রে দেহ আবরণ।
তবে তব অমঙ্গল না হবে কখন॥
এরূপেতে চল সখি সন্তোষ-কানন।
প্রবল চঞ্চল অতি মদন-পবন॥
সতীত্ব দুর্গম দুর্গ অতি অপরূপ।
অসংখ্য প্রহরী তাহে শমন-স্বরূপ॥
চারিদিকে প্রাচীর রুচির তাহে শোভা।
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম নাম মনোলোভা॥
তদন্তর মনোহর আছে এক খাত।
গভীর শরীর তার স্বভাবের জাত॥
লজ্জা নামে খ্যাত খাত এ সংসারময়।
নম্রতা তরঙ্গ তাহে নিয়ত উদয়॥
দৃষ্টিরূপ কামানে বিক্রম অতিশয়।
দুষ্টজন সভয়ে তটস্থ হয়ে রয়॥
দ্বারেতে সবল দ্বারপাল কুল-ভয়।
প্রবেশিতে দুর্গমাঝে কারো সাধ্য নয়॥
এমন উত্তম স্থান অধিকার যার।
প্রতিকূলজনে মনে কি ভয় তাহার?
সীমন্তিনী-সরোবরে সতীত্ব-সরোজ।
অতুল্য অমূল্য সেই অমল অম্ভোজ॥
পতি প্রতি অতি মধু সঞ্চারিত সদা।
স্নেহ নামে মধুকর গুঞ্জরিত তদা॥

ধর্ম্মোরূপ সৌরভে পূরিত দিগ্‌দেশ।
লজ্জার লাবণ্যরসে ভাসে তামরস॥
নিশি দিশি করুণা-নীহারে সিক্ত রয়।
প্রফুল্লতা ভাব তার সারল্য বিনয়॥
এ নহে সামান্যতর সমল কমল।
চিরদিন প্রসন্নতা করে ঢলঢল॥
রতিকান্ত দুরন্ত হিমন্ত দুঃসময়।
সতীত্ব স্বরূপ পদ্মরূপ ভ্রষ্ট নয়॥
ধর্ম্মরূপ হংসবর বিস্তারিয়া পক্ষ।
রক্ষা করে সয়োরুহে বিনাশি বিপক্ষ॥

সিপাহী-যুদ্ধে শান্তিকামনা।

কর কর কর দয়া দীনদয়াময়!
হর হর হর নাথ বিপক্ষের ভয়॥
আর যেন নাহি থাকে কোনরূপ দায়।
রাজা প্রজা সুখী হোক্ তোমার কৃপায়॥
প্রকাশ করহ প্রভু সুবিমল স্নেহ।
যেন আর হাহাকার নাহি করে কেহ॥
অত্যাচার করিতেছে যত দুরাশয়।
তাদের পাপের ভার কত আর সয়?
ধন প্রাণ মান আদি সব হয় লোপ।
ভারতের প্রতি নাথ এত কেন কোপ?
যদ্যপি হয়েছে কোপ কর পরিহার।
তবে জানি কৃপাময় করুণা তোমার॥
হইলে মহিমা-চাঁদে কলঙ্ক প্রচার।
দয়াময় নাম তবে কে লইবে আর?
সব দিকে রক্ষা কর এই ভিক্ষা চাই।
দোহাই দোহাই নাথ দোহাই দোহাই॥
করুণাকর হে করুণা কর॥
হর হে সকল বিপদ হর॥
প্রণতি করি হে চরণে তব।
প্রণত পতিতে প্রসন্ন ভব॥
সকলি দেখিছ হৃদয়ে রয়ে।
বিহিত করহ সদয় হয়ে॥
তোমারি চক্ষু রূপ ধরি।
তোমারি ভাবনা ধ্যায়মেতে ধরি॥
কান্তরে তোমারে অন্তরে রাখি।
মনের বিষয় জেনেছে রাখি॥
ধর হে আপন প্রজার ধর্ম।
কর হে বিহিত বিচার কর॥
পালন শাসন তুমি এ ভবে।
নামের মহিমা রাখিতে হবে॥
পামর পাতকী পাষণ্ড যত।
পাপের ঘটনা করিছে কত॥
অদোষে হইয়া কুপথে রত।
রমণী বালক করিছে হত॥
শুনিয়া বধির হতেছি কাণে।
সহে না সহে না সহে না প্রাণে॥
এ সব দেখিয়া হয়ে পাষাণ।
কেমনে দেহেতে ধরিব প্রাণ?
দেখিতে কিছু তো নাহিক বাকি।
তপন-শশাঙ্ক তোমার আঁখি॥
জীবের অন্তরে যে কিছু আছে।
সে সব বিদিত তোমার কাছে॥
অন্তর-বাহির অধীশ হয়ে।
কিরূপে এখানো রয়েছ সয়ে?
দয়াবান্ ভগবান্ দয়া দান কর।
দিয়ে জয় সমুদয় শঙ্কাভয় হর॥
সবাকার তুমি সার মূলাধার হরি।
কোথা নাথ ভবতাত প্রণিপাত করি॥
প্রতিক্ষণ জ্বালাতন দুখে মন দহে।
বারবার অনাচার কত আর সহে?
তোমা বই কারে কই হয়ে রই স্তব্ধ।
অনিবার অশ্রুধার হাহাকার শব্দ॥
এ বিপদে রাখো পদে দুটী পদে ধরি
প্রতীকার কর তার সুবিচার করি॥
কলেবর জরজর অতি থর-কাঁপে।
ধরাধর থর থর কোন্ডর পাপে॥

এ দেশের বড় ক্ষেত্র গাঙ্গেয়ের মুখে।
টলটল টলটল জলজল কাঁপে॥
হও মূল অনুকূল রোষকুল-পক্ষে।
সমুদয় শক্রক্ষয় তবে হয় রক্ষে॥
অতি ক্ষীণ জ্ঞানহীন চিরাধীন যারা।
মেরে লোক কোরে পাপ শ্রেয় ত্যাগ তারা॥
আজ্ঞাচারী রক্ষাকারী অস্ত্রধারী যত।
একেবারে এ প্রকারে পাপাচারে রত॥
নরপশু হয়ে বসু করে অসু নষ্ট।
হতরব কত কব কত সব কষ্ট?
কি বিশাল সোনাপাল বামা-বাল নাশে॥
অকারণে ক্রোধমনে প্রভুগণে শাসে॥
যে বিহিত কর হিত সমুচিত স্নেহ।
নিজবলে দুষ্টদলে রসাতলে দেহ॥

বিদ্রোহী নানা সাহেব।

নানার কি, নানাকেলে, আজো আছে ধন?
নানার কি নানাকেলে, আজো আছে জন?
নানার কি, নানাকেলে, আজো আছে মন?
নানার কি, নানাকেলে, আজো আছে পণ?
নানার কি, নানাকেলে, আজো আছে জাঁক?
নানার কি, নানাকেলে, আজো আছে জাঁক?
প্রকাশিছে পাপপন্থা হয়ে পন্থী "ঢুঢু"।
ঢু, মারিতে জানে শুধু বটে তার "ঢুঢু"॥
নানা পাপে পটু নানা নাহি শুনে না না।
অধর্ম্মের অন্ধকারে হইয়াছে কাণা॥
ভাল-দোষে ভাল তুমি ঘটালে প্রমাদ।
আগেতে দেখেছ ঘুঘু শেষে দেখ ফাঁদ॥

কাণপুর-যুদ্ধে জয়লাভ।

বাজী রাও পায়া যিনি,
বাজী রাও পায়া যিনি, সাধু তিনি,
মাত নানা মতে।
মহারাষ্ট্র মহা রাষ্ট্র পূজ্য এ জগতে॥
ছেড়ে সে নিজ দেশ,
ছেড়ে সে নিজ দেশ, রাজবেশ,
বাঁচিবার তরে।
আত্ম-সমর্পণ করে, ব্রিটিসের করে॥
হয়ে সে পুত্রহত,
হয়ে সে পুত্র-হত, ক্রমাগত,
করে কত দান।
আঁটকুড়ো-কপালে তবু, হলো না সন্তান॥
কোথাকার মহাপাপ,
কোথাকার মহাপাপ, বোলে বাপ,
পুত্র হলো, 'নানা'।
কাকের বাসায় যথা, কোকিলের ছানা॥
সেটা তো পুষ্যি এঁড়ে,
সেটা তো পুষ্যি এঁড়ে, দস্যি ভেড়ে,
নস্যি কর তারে।
উঠে ধানে পত্তি যেন না করিতে পারে॥
নানা কি, নানাকেলে,
নানা, কি নানাকেলে, রাজ্য পেলে,
তাইতে এত ভারী?
যাহা ইচ্ছা তাহা করে হয়ে স্বেচ্ছাচারী॥
হলে সে পাসার ছেলে,
হলে সে পাসার ছেলে, চাষার ছেলে,
কেন তবে চলে?
হয়ে কাল, বামা, বাল নাশে নানা ছলে॥
হলো সে হলোই হিন্দু,
হলো সে হলোই হিন্দু, দোষের সিন্ধু,
দ্বেষানলে দহে।
গলে দোলে পাপের সূত্র, বাপের পুত্র নহে॥
সেটা তো একা নয়,
সেটা তো একা নয় দুরাশয়,
তাই তার ভোলা।
পথে পথে মেগে খাবে, হাতে কোরে খোলা
বড় সে ধূর্ত্ত হাঁদা,
বড় সে ধূর্ত্ত হাঁদা, কেরে গাধা,

বড় দাদার হিতে।
একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব তার মিতে ॥
জুটেছে সমান জুটো, দাঁতে কুটো,
কোর্ত্তে হবে শেষে।
গলে দড়ী, খেয়ে ছড়ী, ফির্ব্বে দেশে দেশে ॥
কোথাকার হরির খুড়ো,
কোথাকার হরির খুড়ো, মেরে হুড়ো,
গুঁড়ো করে দেহ।
বংশে যেন বাতী দিতে, নাহি থাকে কেহ ॥
তারা যে পক্ষী ঢুঢু,
গেল ছারেখারে।
হাড়ে মাটী, বাড়ে দূর্ব্ব, হলো একেবারে ॥
বিথুরে আর কি আছে?
বিথুরে আর কি আছে, নানার কাছে,
নাইক কাণাকড়ি।
অতঃপরে অন্নাভাবে, যাবে গড়াগড়ি ॥
ছিল যার বস্তু যত,
ছিল যার বস্তু যত, ক্রমাগত,
গোরা নিলে লুটে।
কোঁৎকা খেয়ে, হোঁৎকা এঁড়ে হাম্বা বোলে ছুটে
হয়েছে হতভোম্বা,
হয়েছে হতভোম্বা, অষ্টরম্ভা,
নাহি মাত্র চাকি।
সবে কলির সন্ধ্যা এই, কত আছে বাকী ॥
করেছে যেমন মতি,
করেছে যেমন মতি, তেমনি গতি,
শাস্তি আঁতে আঁতে।
অধর্ম্ম বৃক্ষের ফল, ফলে হাতে হাতে ॥
ছেড়ে দেও বামুন বোলে,
ছেড়ে দেও বামুন বোলে, টোলে টোলে,
ধরি পদতলে।
বিড়া মেরে, হাবড়া পথে চালান দেহ জলে ॥
যদি ভাই আমরা ছাড়ি,
যদি ভাই আমরা ছাড়ি, মারামারি,
কর্ব্বে গোরা সবে।
বাঘের গোহত্যা ভয়, কে শুনেছে কবে?
নানা, না পাপী নানা,
নানা, না পাপী নানা, কথা নানা,
কয়ো না রে কেহ।
যথা তথা নানা-কথা, ছেড়ে সবে দেহ ॥
লেখনী থাকে থেমে, নিত্য প্রেমে,
মত্ত হতে হবে।
কুমারসিংহের কথা, লিখি কিছু তবে ॥
সেটা ত কতক ভালো,
সেটা ত কতক ভালো, ধর্ম্ম-আলো,
কিছু আছে ঘটে।
নারীহত্যা শিশুহত্যা, করিনেকো বটে ॥
তবুতো অত্যাচারী,
তবুতো অত্যাচারী, হত্যাকারী,
বলতে তারে হবে।
রাজদ্বেষী মহাপাপী, কবেই কবে সবে ॥
হয়ে সে রাজ্যছাড়া,
হয়ে সে রাজ্যছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া,
রক্ষা কিসে পাবে?
কর্ম্ম-দোষে ধর্ম্ম দোষে, অতঃপাতে যাবে ॥
ছোট তার সিংহ অমর,
ছোট তার সিংহ অমর, সে কি অমর?
গোমর করে কিসে?
চামর হয়ে কোমর বেঁধে সমর করে কীসে!
হবে তার মুখের মত,
হবে তার মুখের মত, গোরা যত,
শাস্তি দেবে কোসে।
এক চাপড়ে অস্ত যাবে, দন্ত যাবে
খোসে ॥
মেতেছে মান সিং,
মেতেছে মান সিং, নেড়ে সিং,
কিং হবে বলে।
কুর্ত্ত হয়ে ধূর্ত্ত যান অভিমানে গলে ॥

হবে শেষ মানসিং,
হবে শেষ মানসিংহ, প্রাম-সিংহ,
বনে বনে থেকে।
হুক্কা হয়ে মোরে যাবে খেউ খেউ ডেকে ॥
থেকে সে অনুগত,
থেকে সে অনুগত, পাপে রত,
বুদ্ধি-দোষে মরে।
খানা কেটে বেণো জল, ঢুকাইল ঘরে ॥
এতো ভাই বড় মজা,
এতো ভাই বড় মজা, হয়ে অজা,
বাঘের মুখে চরে।
পিপীড়া ধরেছে ডানা, মরিবার তরে ॥
হাদে কি শুনি বাণী?
হাদে কি শুনি বাণী, ঝাঁসির রাণী,
ঠোঁটকাটা কাকী।
মেয়ে হয়ে, সেনা নিয়ে, সাজিয়াছে নাকি?
নানা তার ঘরের ঢেঁকি,
নানা তার ঘরের ঢেঁকি, মাগী খেঁকী,
গোয়ালের দলে।
এত দিনে, ধনে জনে যাবে রসাতলে ॥
হয়ে শেষ নানার নানী,
হয়ে শেষ নানার নানী, মরে রাণী,
দেখে বুক ফাটে।
কোম্পানীর মুলুকে কি, বর্গিগিরী খাটে?
বড় সব ধেড়ে ধেড়ে,
বড় সব ধেড়ে ধেড়ে, ছাগলদেড়ে,
নেড়ে পানে রুকে।
চোড়ে ঘাড়ে কোসে দেও, হাড়ে হাড়ে ঠুকে ॥
পশ্চিমে মিয়া-মোল্লা,
পশ্চিমে মিয়া-মোল্লা, কাচাখোল্লা,
তোবাতাল্লা বলে।
কোপে পোড়ে, তোপে উড়ে যাবে সব জ্বোলে ॥
কেবলি মর্জি তেড়া,
কেবলি মর্জি তেড়া, কাজে তেড়া,
নেড়া মাথা যত।
নরাধম নীচ নাই, নেড়েদের মত ॥
যেন ঝাল লঙ্কাপোড়া,
যেন ঝাল লঙ্কাপোড়া, আগা গোড়া,
নষ্টামীতে ভরা।
টেনি পোরে চটে বোসে, ধরা দেখে সরা ॥
তারা তো হয়ে ঢোঁড়া,
তারা তো হয়ে ঢোঁড়া, যেন বোড়া,
দিতে এলো টক্র।
একরত্তি বিষ নইকো, কুলোপানা চক্র ॥
সাজরে যত গোরা,
সাজরে যত গোরা, মেরে হোরা,
তেড়ে ধরো নেড়ে।
তক্ত লুটে, শক্ত হয়ে রক্ত খাও কেড়ে ॥
যত পাও, খেয়ে সেরী,
যত পাও খেয়ে সেরী,
পাত্র হাতে ধরে।
নেচে নেচে মুখে বল, "হিপ হিপ হোরে" ॥
এ শীতে বড় ঠাণ্ডি,
এ শীতে বড় ঠাণ্ডি, রম ব্রাণ্ডি,
কিছু কিছু খেয়ে।
মনের আনন্দে দেও, যীশু-গুণ গেয়ে ॥
ঘুচিল শত্রু-ভয়,
ঘুচিল শত্রুভয়, যুদ্ধে জয়,
জয় সেনাপতি।
করিলেন বাহুবলে, অগতির গতি ॥
রাখিলেন র‍্যাঙ্ক গড,
রাখিলেন র‍্যাঙ্ক গড, থ্যাঙ্ক লর্ড,
কলিন কাম্বেল।
সাধু সাধু, সাধু তুমি, বিপক্ষের শেল ॥
কোথা মা ভগবতী,
কোথা মা ভগবতী, করি নতি,
প্রকাশিয়া দয়া।
একেবারে শত্রুকুলে, করে দাও গয়া ॥

দিল্লীর যুদ্ধ।

ভারতের প্রিয়পুত্র হিন্দু সমুদয়।
মুক্তমুখে বল সবে ব্রিটিসের জয়॥
জয় জয় জগদীশ করুণা-নিধান।
কৃপাময় কেহ নয় তোমার সমান॥
কু-জনের কথাদেশে কুবুদ্ধি লইয়া।
সেনা যারা ক্ষেপেছিল বিপক্ষ হইয়া॥
ধরেছিল রণবেশ হয়ে বলবান্।
হয়েছিল প্রজাদের ধন আর প্রাণ॥
ঘেরেছিল চারিদিকে দিল্লীর ভিতর।
মেরেছিল সেনাপতি বিস্তারিয়া কর॥
বিশাল বিদ্রোহ দেখে করি হায় হায়।
কাতর হইয়া কত ডেকেছি তোমায়॥
অপার কৃপার নিধি তুমি কৃপাময়।
আমাদের দুঃখ দেখে হইলে সদয়॥
তোমার কৃপায় হলো শত্রু পরাজয়।
কিছু নাই ভয় আর কিছু নাই ভয়॥
পুড়ুক বিপক্ষদল মনের অনলে।
উড়ুক ব্রিটিস ধ্বজা সমুদয় স্থলে॥
ঝুড়ুক দুষ্টের মাথা যারে যথা পাবে।
কুড়ুক কুড়ুক্ করি গুড়ুক কে খাবে?
ধুড়ুক ধুড়ুক কোরে তোপ দিলে দেগে।
ছুড়ুক ছুড়ুক সব ভয়ে গেল ভেগে॥
সিংহনাদ শুনে গেল একে একে সোয়ে।
ঘেউ ঘেউ ফেউ ভেউ কেঁউ কেঁউ করে॥
শরদের মেঘ সম ডাকডোক সার।
প্রভাকর প্রভাবেতে কিছু নাই আর॥
ইংরাজের পরাক্রম রবির প্রকাশ।
অত্যাচার অন্ধকার হইল বিনাশ॥
নিজ নিজ কার্য্য-তরু করিয়া ঘর্ষণ।
দাবানলে দগ্ধ হলো বিপক্ষের বন॥
"হোরা" মেরে গোরাগণ ছুটিল যখন।
সামাল সামাল রব উঠিল তখন॥
পালাতে না পথ পায় আছি-সব ত্যাজ।
উঠে ছুটে পলাইল মুখে কোরে আজ॥
মেও মেও ডাক ডেকে বিরীয় সকাল।
দিল্লীর প্রদেশ ছেড়ে করিল প্রস্থান॥
পূর্ব্ববৎ পুনর্ব্বার নাহি আর দায়।
প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম তোমায়॥
প্রতিফল পেলে তাল হাতে হাতে।
ঠেকাঠেকি হয়ে গেল পাতে পাতে॥
উড়ে গেল কত সেনা গোলাঘাতে।
বনে বনে ফিরিতেছে খোলা হাতে॥
ধরে ধরে ভয় পেয়ে মরে ত্রাসে।
সাধ্য কিবা লোকালয়ে পুন আসে?
করিয়াছে মহলন্দ দূর্ব্বাঘাসে।
পশুসহ পশু হলো বনবাসে॥
ওরে তোরা নরাধম যত দুষ্ট।
কার বলে হয়েছিলি এত পুষ্ট?
যত মূঢ় নিজ পদে নহে তুষ্ট।
চিরকাল তাহাদের বিধি রুষ্ট॥

এলাহাবাদের যুদ্ধ।

প্রায়াগেতে ছিল যত, সিকারের দল।
একেবারে সকলেতে, হলো হতবল॥
অধিকার করেছিল তরণীর সেতু।
হয়েছে তাদের তায় মরণের হেতু॥
ঝুসিঘাটে ঘুসী খেয়ে মারা যায় প্রাণে।
ছারখার হইয়াছে অনলের বাণে॥
এখন গোরার মুখে এইমাত্র কথা।
প্রয়াগে মুড়ায়ে মাথা যাও যথা তথা॥

আগরার যুদ্ধ।

আগরায় নাগরায়, মারিয়াছে কাঠী।
বীরদাপে দাপিয়াছে কাঁপিয়াছে মাটী॥
চক্রযোগে ষড়যন্ত্র করিয়াছে যারা।
ভয় পেয়ে কোনখানে ভাগিয়াছে তারা॥

হেল্লা করে কেল্লা লুটে দিল্লীর ভিতরে।
জেল্লা মেরে বেড়াইত অহঙ্কারভরে॥
এখন সে কেল্লা কোথা জেল্লা কোথা আর?
জেল্লা মেরে কেবা দেয় দাড়ীর বাহার?
ছেড়ে পালা বলে আল্লা পড়েছি বিপাকে।
কাছাখোল্লা যত মোল্লা তোবা তাল্লা ডাকে॥
সবার প্রধান হয়ে যে তুলেছে খড়ি।
দিল্লীর দুর্গেতে ঢুকে গুণিয়াছে কড়ি॥
হইয়া হুজুর আলী হাতে নিয়ে ছড়ী।
করেছে হুকুমজারী ত্যজি ঘোড়া চড়ি॥
নিদয়-স্বভাব ধরি ধনাগারে পড়ি।
লুঠিয়া করেছে জড় যত ধন কড়ি॥
মনে মনে লঙ্কা ভাগ আঁক দিয়া খড়ি।
তাকায়েছে চারিদিক পাকায়েছে দড়ী॥
মনোরাজ্য করি আগে যে বাজালে দামা।
রণরঙ্গ দেখাইল ছুড়ে ঢিল ঝামা॥
ধরিয়াছে বাজবেশ পোরে টুপী জামা।
কোথা সেই কালনিমে রাবণের মামা?

যুদ্ধে বিরাম।

ভয় নাই আর কিছু ভয় নাই আর।
শুভ সমচার বড়, শুভ সমচার॥
পুনর্ব্বার হইয়াছে, দিল্লী অধিকার।
"বাদশা বেগম" দোঁহে ভোগে কারাগার॥
অকারণে ক্রিয়া-দোষে কোরে অত্যাচার।
মরিল দুজন তাঁর প্রাণের কুমার॥
ছেলে মেয়ে আদি করি, যত পরিবার।
দিবানিশি করিতেছে, শুধু হাহাকার॥
কোথা সেই আস্ফালন কোথা দরবার?
হাড়ে মাটী ঘাড়ে দুর্ব্বা হয়ে গেল সার॥
একেবারে ঝাড়ে বংশে, হলো ছারখার।
শিশু সব মারা যাবে বিহনে আহার॥
দূরে থাক্ সমুদয় সম্পদ সঞ্চার।
পড়িয়া ব্রিটিস-কোপে প্রাণে বাঁচা ভার॥
করেছিল যে প্রকার, বিষম ব্যাপার।
হাতে হাতে প্রতিফল ফোলে গেল তার॥
অত্যাপিও রবি, শশী, হতেছে প্রচার।
অত্যাপিও হয় নাই, সত্যের সংহার॥
অত্যাপিও ধর্ম্ম এক, করেন বিহার।
তিনি কি কখনো সন, এত পাপভার?
কোথা দীনদয়াময়, সর্ব্বমূলাধার।
আহা আহা মরি কিবা, করুণা তোমার॥
অন্তরীক্ষে থেকে সব, করিছ বিচার।
তোমা বিনে জয় দানে, সাধ্য আছে কার?
সমুচিত শাস্তি পেলে, যত দুরাচার।
অতএব তব পদে, করি নমস্কার॥
যমুনার জল আর পূর্ব্ববৎ নাই রে।
হয়েছে রুধিরে ভরা, কেমনেতে নাই রে?
তৃষ্ণায় সে জল আর, কেমনেতে খাই রে?
ভাসিছে তাহাতে সব, শব ঠাঁই ঠাঁই রে॥
ঝাঁপ দিয়ে মরিতেছে, সকল সিপাই রে।
এ কূল ও কূলে তার, ভস্ম আর ছাই রে॥
কুকুর শৃগাল হেরি যে দিকেতে চাই রে।
শকুনী গৃধিনী উড়ে, শব্দ সাঁই সাঁই রে॥
শা-জাদার শোণিতেতে, মিটে গেল খাঁই রে।
খেয়ে সব পরাভব, মেনেছে সবাই রে॥
স্থলে স্থলে মৃতদেহ, পর্ব্বতের চাঁই রে।
পচাগন্ধে নাক জ্বলে, কোথায় দাঁড়াই রে?
মলহীন একটুকু স্থান নাহি পাই রে।
কোথা খেয়ে,কোথা শুয়ে,সুখে নিদ্রা যাই রে॥
সবদিকে সমদশা কোন্ দিকে চাই রে?
এ দেশেতে নাহি দেখি, হিংসাহীন ঠাঁই রে॥
যমুনার তটে এসে, যমুনার ভাই রে।
বিকট-বদনে এক, বিস্তারিল হাই রে॥
সাধু সাধু ধর্ম্মরাজ, বলিহারি যাই রে।
ঘুচাইল যত কিছু, আপদ বালাই রে॥
ব্রিটিসের জয় জয়, বল সবে ভাই রে।
এসো সবে নেচে কেঁদে, বিভুগুণ গাই রে॥

শীক-সংগ্রম।

বিজ্ঞবর গবর্ণর হিতবাক্য ধর।
সঙ্কটে সমর-সজ্জা সংবরণ কর॥
নরবর গবর্ণর মনে এই ভয়।
রণে পাছে বকারে আকার যুক্ত হয়॥
যুদ্ধ হেতু ক্রুদ্ধ ভাব লাগিয়াছে ধূম।
ঊর্দ্ধভাগ রুদ্ধ করে কামানের ধূম।
শীকের এবার বুঝি নাহিক নিস্তার।
বিপক্ষ-বিনাশ হেতু বিক্রম-বিস্তার॥
ব্রিটিসের জয় জন্য অভিলাষ মনে।
এক হস্তে অস্ত্র ধরি অগ্রসর রণে॥
আপনি চালাও সেনা রণক্ষেত্রে রয়ে।
এমন কে করে আর গবর্ণর হয়ে॥
মহামতি সেনাপতি সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া।
বিপক্ষের গুলী খেয়ে মলো তাঁর ঘোড়া॥
বড় বড় বলবান্ যোদ্ধা যোদ্ধা যত।
ভূমিতলে নিদ্রাগত জন্মের মত॥
লিখিতে উদয় দুঃখ লেখনীর মুখে।
সেলের মরণ শুনি শেল ফুটে বুকে॥
এডিকম্প ছেড়ে কেম্প অস্ত্র ধরি বলে।
মরিল শীকের হস্তে সমরের স্থলে॥
হায় হায় এই দুঃখ কিসে হবে দূর?
ব্রিটিসের রক্ত খায় শৃগাল কুকুর॥
স্বামীর মরণ শুনি বিবিলোক যারা।
নিয়ত নয়ন-মেঘ বহে শোক-ধারা॥
শ্রীযুতের মনে মনে অতিশয় ক্রোধ।
অবশ্য হইবে তার হিংসা পরিশোধ॥
নিশ্চয় মরিবে রণে সমুদয় শীক।
ধর্ম্মরাজ খাতা খুলে করিলেন ঠিক॥
অমর সমরকল্পে ব্রিটিসের সেনা।
পিপীড়ার মৃত্যু হেতু উঠিয়াছে ডেনা॥
লইতে লাহোর রাজ্য হেনরীর কোপ।
নির্জ্জয়েতে যোদ্ধা সব কর তাই হোপ॥
শতলজ পার হয়ে জোরে ছাড় তোপ।
উড়ে যাক্ শাকমুণ্ড পুড়ে যাক্ গোঁপ।
বিপক্ষের পরাক্রম সব করি লোপ।
শতদ্রুতে স্নান করি গায়ে মাখ সোপ॥
কিরূপেতে পরিপূর্ণ সমরের স্থল॥
কিরূপে করিছে যুদ্ধ ইংরাজের দল॥
যুদ্ধভূমি রুদ্ধ করি কাটাকাটি যথা।
ইচ্ছা হয় পক্ষী হয়ে উড়ে যাই তথা॥
দূরে থেকে দৃষ্টি করি ইচ্ছা অনুরাগে।
গুলী যেন ছুটে এসে গায়ে নাহি লাগে॥

যুদ্ধে শীকের পরাজয়।

গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়।
শতলজ পার হলো শীক সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয়॥
কালগুণে বিপরীত বুঝিবার ভ্রম।
এসেছিল শীক সব করিয়া বিক্রম॥
বামনের অভিলাষ ধরিবেক শশী।
ঊর্দ্ধভাগে হস্ত তুলে ভূমিতলে বসি॥
তুরঙ্গের খরগতি খর করে শক।
বাসুকি করিতে বধ বাঞ্ছা করে বক॥
কাকের কোকিল-রবে লজ্জা নাহি হয়।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়॥
শতলজ পার হলো শাক সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয়॥
পঞ্জাবীর শীকদের আশা ছিল মনে।
ব্রিটিস বিনাশ করি জয়ী হবে রণে॥
সমুদয় অস্ত্র লয়ে হয়ে অগ্রসর।
করিল শিবিরে আসি সম্মুখ সমর॥
প্রথমে জঙ্গল পেয়ে মঙ্গল-সাধন।
দঙ্গল বাঁধিয়া করে ঘোরতর রণ॥
মাঠে এসে কাটে বুক মুখ শুষ্ক হয়।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়॥

শতলজ পার হলো শীক সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয়॥

আমাদের সেনাদের বাহুবল বাড়ে।
বিকট-বদনে ঘোর সিংহনাদ ছাড়ে॥
বেঁধে হোপ করে কোপ দিলে তোপ দেগে।
নাহি রব পরাভব গেল সব ভেগে॥
যত দল হতবল প্রতিফল পেলে।
রেজিমেণ্ট করে সেণ্ট তাঁবু টেন্ত ফেলে॥
দেষ ছেড়ে দেশে গিয়া মানে পরাজয়।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়॥
শতলজ পার হলো শীক সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয়॥

বিপক্ষের বড় বড় সরদার যারা।
সিদ্ধিপানে শুদ্ধি খায় বলবুদ্ধি-হারা॥
লাহোরে রাণীর কাছে অধোমুখে থাকে।
ঘোর দুর্গে ঢুকে দুর্গে দুর্গে বলে ডাকে॥
বিক্রমেতে সিংহ সম, শীক-সিংহ যত।
আমাদের কাছে সব, শৃগালের মত॥
নাকে খত যুদ্ধে বাবা, পরস্পর কয়।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়॥
শতলজ পার হলো শীক সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয়।

রণভূমি ছেড়ে যায় যত চাঁপদেড়ে।
গুলী গোল অস্ত্র তোপ সব লয় কেড়ে॥
মাথার পাগড়ী উড়ে পড়ে নদী-কূলে।
বুদ্ধি-লোপ দাড়ী-গোঁপ সব যায় ঝুলে॥
চড়াচড় মারে চড় সিফায়ের দলে।
ধড়ফড় করে ধড় পড়ে ধরাতলে॥
পুনর্ব্বার উঠিবার শক্তি নাহি হয়।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়॥
শতলজ পার হলো শীক সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয়॥

জাগিয়াছে শক্র সব লাগিয়াছে ধুম।
লুটিতে লাহোর দেন হেকেমী হুকুম॥
প্রাণপণ হৃষ্টমন সেনাগণ সাজে।
মহাঝাঁক ঘন হাঁক জয়ঢাক বাজে॥
শীকদেশ হয় শেষ রণবেশ ধরে।
চলে দল ধরাতল টলমল করে॥
ধরাধর কেঁপে উঠে ধরা নাহি রয়।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়॥
শতলজ পার হলো শীক সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয়॥

এ দেশের প্রজা সব ঐক্য হয়ে সুখে।
রাজার মঙ্গলগীত গান কর মুখে॥
ধন্য চীফ কমাণ্ডার ধন্য দেও লর্ডে।
ইংরাজের র‍্যাঙ্ক বাড়ে থ্যাঙ্ক দেও গডে॥
গণ্য বটে সৈন্যগণ ধন্য দেও তায়।
লর্ডের রহিল মান গডের কৃপায়॥
সদয় সমরকল্পে বিভু দয়াময়।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়॥
শতলজ পার হলো শীক সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয়॥

দ্বিতীয়বার যুদ্ধ।

ভারতের অবোধ দুর্ব্বল লোক যত।
ডাল ভাত মাছ খেয়ে নিদ্রা যাবে কত?
পেটে খেলে পিটে সয় এই বাক্য ধর।
রাজার সাহায্য হেতু রণসজ্জা কর॥
লাহোরের শীক-সেনা শক্ত অতিশয়।
এখন আলস্য করা সমুচিত নয়॥
কেহ খড়্গ কেহ ঢাল কেহ যষ্টি লও।
যাহার যেমন সাধ্য সেইরূপ হও॥
করিতে তুমুল যুদ্ধ আমাদের সনে।
লাহোরীর প্রজাপুত্র সাজিয়াছে রণে॥
আমরা তাদের সঙ্গে রোকে রোকে রুকে।
দাড়ী ধোরে দিব টান বাড়ি মেরে বুকে॥
অধিকার যদি পাই শীকেদের ক্ষিতি।
আমাদের প্রতি হবে ভূপতির প্রীতি

সাহসে করিবে যুদ্ধ যত বুদ্ধি ঘটে।
কোন ক্রমে নাহি যাবে গোলার নিকটে॥
অকর্ম্মণ্য শক্তিশূন্য আফিসর যাঁরা।
ডাক পেয়ে ডাকযোগে যুদ্ধে যান তাঁরা॥
শিরে রাখ বিল্বদল মুখে বল হরি।
সঙ্গে সঙ্গে চল সব শুভযাত্রা করি॥
গায়ে দেহ চাপকান পায়ে বুট জুতি।
মাথায় পাগড়ী বাঁধ পর সাদা ধুতি॥
দোবজা দোছট করি চোট কর মনে।
হোঁচোট না খাও যেন ঘোরতর রণে॥
সাইনের অগ্রভাগে যেয়োনাকো রুকে।
চোট্ চাট্ কাট্ কাট্ মালসাট মুখে॥

মুদকিতে শীক-যুদ্ধ।

চেগেছে বিষম যুদ্ধ শীকগণ সঙ্গে।
রেগেছে ইংরাজ-লোক রণরস-রঙ্গে॥
সেজেছে অগণ্য সৈন্য কি কব বিস্তার।
বেজেছে জয়ের ডঙ্কা নাহিক নিস্তার॥
বেড়েছে ব্রিটিস সেনা সংখ্যা শত শত।
ছেড়েছে প্রাণের মায়া যুদ্ধে হয়ে রত॥
ঘেরেছে সমরস্থল লয়ে নিজ দল।
সেরেছে এবার শীকে হইয়া প্রবল॥
মেরেছে বিপক্ষগণে মুদকির রণে।
হেরেছে সকল শত্রু গোরাদের সনে॥
ভেগেছে সম্মুখযুদ্ধে নদী পার হয়ে।
মেগেছে আশ্রয় পুন মিত্রভাব লয়ে॥
হয়েছে সমূহ শীক সমরে সংহার।
বয়েছে চক্ষের যোগে বক্ষে বারিধার॥
লয়েছে দুঃখের ভার শিরোপরে কত।
রয়েছে প্রমাণ তার তোপ একশত॥
ধরেছে ইংরাজ-সেনা মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর।
পরেছে করাল-বস্ত্র অস্ত্রযুক্ত কর॥
বলিছে বদনে শুদ্ধ মার মার ধ্বনি
চলিছে সমরে সবে টলিছে ধরণী॥
ছলিছে ছলনা করি বিপক্ষের দল।
ফলিছে ব্রিটিসবৃন্দে জয়যুক্ত ফল॥

শীকযুদ্ধের অবস্থা।

শীক সব এসেছিল, খল খল হেসেছিল,
নেশেছিল সেনা শত শত।
কটুভাষ ভেবেছিল, বল করি ঠেসেছিল,
পেসেছিল অভিলাষমত।
শিবিরেতে এয়েছিল, ঝাঁকে ঝাঁকে ধেয়েছিল,
ছেয়েছিল সমরের স্থল।
অধিকার চেয়েছিল, রুধিরেতে নেয়েছিল,
পেয়েছিল হাতে হাতে ফল॥
জোট দিতে পেয়েছিল, প্রাণ সব সেয়েছিল,
জেরেছিল অগ্নিবরিষণে।
কোপ করি ঘেরেছিল, কোসে তোপ মেরেছিল,
হেরেছিল গোরা সব রণে॥
বহুসৈন্য লয়েছিল, গুলীগোলা ধরেছিল,
হয়েছিল পূর্ব্বপারবাসী।
যত কথা কয়েছিল, আমাদের সয়েছিল,
রয়েছিল সম্মুখেতে আসি॥
কালবেশ ধরেছিল, প্রাণপুঞ্জ হরেছিল,
করেছিল ভয়ানক গতি।
বহুলোক ভোরেছিল, চক্ষে জল ঝরেছিল,
মরেছিল বহু সেনাপতি॥
যত চাঁপদেড়ে ছিল, দাড়ী গোঁপ নেড়েছিল,
বড় বড় ধেড়ে ছিল সাতে।
ভাল আড্ডা গেড়েছিল, রণভূমি বেঁড়েছিল,
মেড়েছিল বারুদ তাহাতে॥
বড় জাঁক বেড়েছিল, বড় হাঁক ছেড়েছিল,
ঝেড়েছিল গুলীগোলা আগে।
গোরা শেষ চেড়েছিল, ভূমিতলে পেড়েছিল,
তেড়েছিল অতিশয় রাগে॥
শ্বেত সৈন্য রেগেছিল, জোরে তোপ দেগেছিল,
তেগেছিল বিপক্ষের বুকে।

গায়ে গোলা লেগেছিল, শীক সব ভেগেছিল,
মেগেছিল পরাজয় মুখে ॥
মার রব মুখে ছিল, ব্যূহমধ্যে ঢুকেছিল,
বুকে ছিল কামানের জোর।
রোকে রোকে রুকেছিল, হাতে হাতে ঠুকেছিল,
ঝুঁকেছিল লুটিতে লাহোর ॥
কোপে গুলী ছুড়েছিল, তোপে ধূলি উড়েছিল,
জুড়েছিল আকাশ পাতাল।
শাকমুণ্ড উড়েছিল, দাড়ী-গোঁপ পুড়েছিল,
খুড়েছিল ধরি তরবাল ॥
শত্রুদল হটেছিল, দেশে দেশে রটেছিল,
চোটেছিল মহিষীর মন।
দুঃখে বুক ফেটেছিল, নাক কাণ কেটেছিল,
এঁটেছিল করিয়া শাসন ॥

যুদ্ধে জয়।

ধন্য লাড় ধন্য তুমি, ফিরোজপুরের ভূমি,
শীক-রক্তে প্রবাহিত নদী।
এক হস্তে এ প্রকার, না জানি কি হতো আর,
দুই হস্ত প্রাপ্ত হতে যদি ॥
যুদ্ধে যুদ্ধে আপনার, সমতুল্য কোথা আর,
মহিমার নাহি হয় শেষ।
ডিউকের হয়ে পার্টী, বধ করি বোনাপার্টি,
রেখেছিলে ব্রিটনের দেশ ॥
তুলনা তোমার কাছে, তুল্য গুণ কার আছে,
বাহুবল বুদ্ধিবল ধরে।
প্রতিজ্ঞা মনের প্রিয়া, সাহসে সফল ক্রিয়া,
হস্ত দিয়া দেশ রক্ষা করে ॥
ধিক্ ধিক্ শীকপক্ষ, কিসে হবে প্রতিপক্ষ,
কোনরূপে লক্ষণীয় নয়।
যুদ্ধ করি উপলক্ষ, এসেছিল কত লক্ষ,
লক্ষ্যমাত্রে গেল সমুদয় ॥
না জেনে বিশেষ হেতু, বাঁধিল নৌকার সেতু,
কালকেতু ধূমকেতু শীক।
বলহীন হয়ে শেষে, ঢুকিয়া আপন দেশে,
আপনার যুদ্ধে দেয় ধিক ॥
আমাদের সেনা সব, মেরে সব করে শব,
ছেড়ে রব দিলে সব তেড়ে।
গুলী গোলা নিলে কেড়ে, যত বেটা চাঁপদেড়ে,
পলাইল পূর্ব্বাপর ছেড়ে ॥
গোরা সব রাগে রাগে, জোর করি তোপ দাগে,
কামানের আগে যায় উড়ে।
কোরে কোপ বুদ্ধি-লোপ, মিছে হোপ খেয়ে তোপ,
দাড়ী গোঁপ সব গেল পড়ে ॥
শীক শত্রু পরাভব, মুখে আর নাহি রব,
সুখী সব ব্রিটিসের জয়ে।
সকল হইল ভুট, গোটুহেল ড্যাম হুট,
ফেলে উট্ দিলে ছুট্ ভয়ে।
হুড়্ হুড়্ হুড়্ হুড়্, দুড়্ দুড়্ দুড়্ দুড়্,
গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুম্।
কড়্ কড় চড় চড়্ ঘড়্ ঘড়্ ফড় ফড়,
হড়্ হড়্ দড়্ দড় দুম ॥
গাড়া গাড়া গুম গুম্, ডাগা ডাগা ডুম্ ডুম্,
গুম্ গুম্ জয়ঢাক বাজে।
ভঁ ভ ভঁ ভঁ ভম্ ভম্, পঁপ পঁপ পম্ পম্,
ভম্ ভম্ ভম্ ভেরী রাগ ভাঁজে ॥
ফায়ের ফায়ের ফুট, ফাই ফাই ভুট হুট,
ড্যাম্ ড্যাম্ গোরাগণ ডাকে।
* * কাঁহা যাগা, আবি তেরা শের লেগা,
সেফায়েরা এই রব হাঁকে ॥
যুদ্ধের বিষম ধুম, গগনে উঠিল ধুম,
ঘুম নাই নয়ন-নিকটে।
ঘুচিল শীকের শঙ্কা, বাজিল বিজয়-ডঙ্কা,
লঙ্কাজয়ী কাণ্ড ভাই ঘটে ॥
ঘটায় ছটায় চলে, ভটায় হটায় বলে,
চকিতে চটায় শত্রুদল।
কোরে চোট দিয়ে জোট, ধরচোট নিলে কোট,
শীক কোট গেল রসাতল ॥

জোরজার শোরসার, ঘোরঘার কেরকার,
নাহি আর বিপক্ষের দলে।
শ্বেত সৈন্য সবাকার, বৃদ্ধি হলো অহঙ্কার,
মার মার মার মার বলে॥
ধন্য লর্ড গবর্ণর, ধন্য চীফ কমেণ্ডর,
ধন্য ধন্য অন্য সেনাপতি।
ধন্য ধন্য সৈন্য সব, ধন্য ধন্য ধন্য রব,
ধন্য ধন্য ব্রিটিসের রতি॥
শত্রুচয় পেয়ে ভয়, রণে হয় পরাজয়,
সমুদয় হলো ছারখার।
শতদ্রু-সলিল-অঙ্গে, রুধির তরঙ্গ-রঙ্গে,
বিভূষিত শীকশবহার॥
স্রোতে সব শব ভাসে, বাতাসে পুলিনে আসে,
কি কহিব ভয়ানক কথা।
গৃহপাল ফেরুপাল, শকুনি গৃধিনীজাল,
শবাহারে সব হারে তথা॥
আজ্ঞা পেয়ে আপনার, হলো সব নদী পার,
অধিকার করিতে লাহোর।
বিপক্ষের ঘোর দুর্গ, লুটিল সকল দুর্গ,
ব্রিটিসের ভাগ্য বড় জোর॥
মহারাণী শীকেশ্বরী, শিশু-সুত ক্রোড়ে করি,
দারুণ দুঃখিত অহরহ।
নানক বাবার ঘরে, এই অভিলাষ করে,
সন্ধি হোক ইংরাজের সহ।
নিজে তেজ অতি হেজ, কিসে তার এত তেজ,
গন্ধহীন গোলাব সে কাঠ।
কোন্ তুচ্ছ রণজোর, নহে তার রণ জোর,
মিছামিছি করে মালসাট।
কোয়ে লাল চক্ষু লাল, ঠুকে তাল ধরে ঢাল,
সেনাজাল এনেছিল রণে।
ইস্মিথের দেখে যুদ্ধ, নিজ পক্ষ করি রুদ্ধ,
পলাইল ভয় পেয়ে মনে॥
লাহোরের দরবার, আশু হবে অধিকার,
দেখি তার অনুষ্ঠান নানা

এবিল ইংলিস যত, ভেবিল করিয়া হত,
টেবিল পাতিয়া খাবে খানা॥
চারিদিকে সেনাগণ, মধ্যভাগে চ্যাপিলন
সরমন্ পড়িবেন জোরে।
যতেক গোরার ক্লাস, ধরিয়া সেরীর গ্লাস
কহিবেক হিপ হিপ্ হোরে॥
হে গবনর। মানব বর।
রণ সম্বর। বচন ধর॥
ব্রিটিসগণে। অভয় মনে।
শীকের সনে। সেজেছে রণে॥
লাহোরাধিপ। শিশু দলিপ।
তার সমীপ। সমর-দীপ॥
ধনের আশ। করি প্রকাশ।
প্রাণী-বিনাশ। দয়া না বাস॥
স্বরূপ বটে। সকলে রটে।
শতদ্রু-তটে। পাছে কি ঘটে॥
তোমার কার্য্য। নহে নিবার্য্য।
পাইবে ধার্য্য। শীকের রাজ্য॥
না হয় ভঙ্গ। রণ-তরঙ্গ।
শোণিত-রঙ্গ। শোভিত-অঙ্গ॥
দেখিয়া রতি। হাসিছে ক্ষিতি।
ধনের প্রতি। এত কি প্রীতি॥
সমর স্থলে। কামান কলে।
বিপক্ষ দলে। বধিবে বলে।
শীকের পাপে। তোমার দাপে।
রণ প্রতাপে। অবনী কাঁপে॥
বিকট-বেশে। রুধিরে ভেসে।
লাহোর দেশে। কি হবে শেষে॥
শীক ভূপাল। দুধের বাল॥
তারে কি কাল। যাতনা জাল॥
হে গুণ-নিধি। বিফল নিধি।
এ নহে বিধি। বিদিত বিধি॥
করুণা কর। করুণা-কর।
রণ না কর। সমর হর॥

কাবুল-সংগ্রাম।

(১২৪৮ সাল।)

চেগেছে বিষম যুদ্ধ, তেগেছে কাবেল শুদ্ধ,
দেগেছে কামান শত শত।
ভেগেছে গোরার দল, মেগেছে আশ্রয় বল,
রেগেছে ইংরাজ লোক যত॥
করেছে আসর জারী, হয়েছে বিলাতী নারী,
তরেছে সমরে খুব তারা।
পরেছে করাল বস্ত্র, ধরেছে সকল অস্ত্র,
মরেছে প্রধান যোদ্ধা যারা॥
হয়েছে সম্ভ্রম নষ্ট, সয়েছে অশেষ কষ্ট,
বয়েছে দুখের ভার বুকে।
রয়েছে কয়েদী যারা, লয়েছে শরণ তারা,
কয়েছে কুবাক্য কত মুখে॥
ঘেরেছে সমরস্থান, মেরেছে অনল বাণ,
হেরেছে ব্রিটিস সৈন্যগণে।
চেতেছে এরারে ভাল, মেতেছে নেড়ের পাল,
পেড়েছে কামান কত রণে॥
জুড়েছে বন্দুকে গুলী, উড়েছে মাথার খুলী,
পুড়েছে কপাল নানামতে।
বেড়েছে যবনদল, ছেড়েছে সকল বল,
পেতেছে সে পাহাড়ের পথে॥
সমর করিয়া পণ্ড, সেনাদল লণ্ডভণ্ড,
অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড দেহ।
জীবন পেয়েছে যারা, আহার-বিরহে তারা,
কোনরূপে স্থির নহে কেহ॥
শ্বেতকান্তি সবাকার, চারিদিকে শবাকার,
অনিবার হাহাকার রব।
শৃগাল কুকুর কত, গৃধিন্যাদি-শত-শত,
মহানন্দে খায় সব শব॥
হিংস্র-জন্তু আর সব, শবাহারে পরাভব,
কত শত সংখ্যা নাই তার।
সব শব করি দৃষ্টি, বোধ হয় অনাবৃষ্টি,
শববৃষ্টি হয়েছে এবার॥

মেরে বন্দুকের হুড়া, পাহাড় করিল গুঁড়া,
ভাঙ্গিল মাথার চূড়া তায়।
শোণিতের নদী বহে, তরঙ্গ তরল নহে,
তৃণ আদি কত ভেসে যায়॥
বড় বড় দাড়ী গোঁপ, কেউ নিল গোলা তোপ,
বুদ্ধিলোপ হোপ সব হরে।
ছলে ছলে ফাঁদ ফেঁদে, জঙ্গলে দঙ্গল বেঁধে,
মোঙ্গল মঙ্গল-বাদ্য করে॥
কাপ্তেন কর্ণেল কত, বিপাকে হইল হত,
স্বর্গগত ডবলিউ এম।
রাজদূত যারে কয়, কোথা সেই এ সময়,
কোথায় রহিল তাঁর মেম?
দুর্জ্জন যবন নষ্ট, করিলেক মানভ্রষ্ট,
গেল সব ব্রিটিসের ফেম।
কেড়ে নিলে তাঁবু টেন্ট, হত হলো রেজিমেন্ট,
হায় হায় কারে কব সেম॥
অবশিষ্ট যত সৈন্য, আহার-অভাবে দৈন্য,
কাঁচা মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।
শুকাইল রাঙ্গামুখ, ইংরাজের এত দুখ,
ফাটে বুক হায় হায় হায়॥
চারিদিকে গুলী গোলা,কোথা পাবে দানা ছোলা,
অশ্ব কাঁদে সেনা-মুখ চেয়ে।
থেকে থেকে লাফ পাড়ে,চিঁচিচিঁচি ডাক ছাড়ে,
বাঁচে শুধু দড়ী গোঁজ খেয়ে॥
পাহাড়ে সেনার বাস, সেখানে যে আছে ঘাস,
চরে খেতে সোরে পড়ে পদ
নিশির শিশির দুষ্ট, দিবসে তপন রুষ্ট,
দ্বিবিধতে বিষম বিপদ॥
ফলে কিছু নহে অন্য, নিশ্চয় মরণ জন্য,
উঠিয়াছে পিপীড়ার ডেনা।
যবনের যত বংশ, একেবারে হবে ধ্বংস,
সাজিয়াছে কোম্পানীর সেনা॥
ছুটিবে যখন গুলী, উঠিবে আকাশে ধূলি,
ফুটিবে বিপক্ষ-বুকে শূল।

ফুটিবে ঘোড়ার পায়, কুটিবে শরীর তায়,
টুটিবে সকল দেড়েকুল ॥
জ্বলেছে গবর্ণর ক্রোধে, বলিছে বিষম বোধে,
চলেছে সাস্থা ছল করে।
ফলেছে কামনা-ফল, চলিছে সেনার দল,
টলিছে পৃথিবী পদভরে ॥
এ বার বাঁচা ভার, যে প্রকার ঘোর ঘার,
জোর জার শোরসার তায়।
জেনারল গোরা-দল, ঢল ঢল টল টল,
ধরাতল রসাতল যায় ॥
শিলিজির লোক যত, সকলি করিয়া হত,
সেফাই ঠুকিবে সুখে তাল।
গরু জরু লবে কেড়ে, চাঁপদেড়ে যত নেড়ে,
এই বেলা সামাল সামাল ॥

ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ।

বীররসে বিভাসে জুড়িয়া জোর তান।
ছাড়িতেছে সেনা সব রণজয়ী গান ॥
হইল বিবাদ-বহ্নি বড় বলবান্।
যা হয় নিব্বাণ আর না হয় নির্ব্বাণ ॥
কত দূরে ছুটে অগ্নি নাহি পরিমাণ।
করুন্ ধরণী সুখে নররক্ত পান ॥
এক গাঢ়ে গাড়িতে মগের বাচ্ছা যান।
শ্বেত সেনাপতি যত জলযানে যান ॥
কলে চলে জলে তরী ধূম্রযোগে টান।
এক এক জাহাজেতে হাজার কামান ॥
হয়েছেন কমডোর সবার প্রধান।
কোনরূপে বিপক্ষের নাহি আর ত্রাণ?
জলে স্থলে আগে তিনি হলে আগুয়ান।
কোথা রবে মগেদের বগমারা বাণ?
লাফে লাফে বীরদাপে শব্দ আন্ সান্।
পতালেতে বাসুকির দেহ কম্পবান্ ॥
রেঙ্গুনের গবর্নির হবে হতমান।
আসিবে শিকল-পায়ে হয়ে বন্দীমান ॥
হোয়া দিয়া গোরা সব খেতে দিবে খান।
অথবা করিবে তার দেহ খান খান ॥
কি করে আবার রাজা যুবা জাম্বুবান।
ভাগ্যের দিবস তার হয় অবসান ॥
ইংরাজ সহিত রণে পাইবে আসান।
ভেক হয়ে ধরিয়াছে ভুজঙ্গের ভান ॥
ক্ষণমাত্র নাহি করে মনে প্রণিধান।
কেমনে হইবে রক্ষা জাতি কুল মান ॥
শোভা পেতো হলে পরে সমান সমান।
পর্ব্বতের সহ কোথা তৃণের প্রমাণ?
বন্দীরূপে রবে কিন্তু যাবেনাকো প্রাণ।
"বেণ্ডিমেন্স লেণ্ডে" পাবে বসতির স্থান ॥
সেখানে খ্রীষ্টান হয়ে ঢেঁকির প্রধান
মেকির নিকটে লবে ধর্ম্মের বিধান ॥
ধরাইয়া হাতে হাতে করাইবে পান।
মেকাই একাই তারে করিবেন ত্রাণ ॥
অনল উঠিল জোলে কে করে নির্ব্বাণ।
সে অনলে অনেকেই পাইবে নির্ব্বাণ ॥
ব্রিটিস-নিকটে তথা মগের প্রতাপ।
জ্বলন্ত আগুনে যথা পতঙ্গের ঝাঁপ ॥
ফণি-ফণা তুচ্ছ করি কুচ্ছ বহুতর।
ভেক লয়ে ভেক ডাকে গ্যাঙ্গর গ্যাঙ্গর ॥
হতে চায় করী দম স্বরূপ শূকর।
তুরঙ্গের খরগতি ইচ্ছা করে খর ॥
দেখিয়া রবির ছবি নাচিছে জোনাকী।
বকের বাসনা বড় বধিতে বাসুকি ॥
শূনীসুত মিছে কেন করিছে আক্রম।
হরি কি ধরিতে পারে হরির বিক্রম?
ভীরু ফেরু রব করি জয় করে হরি।
হরিবোল হরিবোল হরিবোল হরি ॥
ইংরাজে করিবে দূর কদাকার মগে।
কোথায় লাগেন "বগা বাঙ্গালের লগে" ॥
ধোরে থাক্ পাখাভাঙ্গা মাচরাঙ্গা খগে।
বাঁধুক আবার অজা দোক্তা চুন রগে ॥

রাঙামুখা দল যদি বল করে ভালো।
আঁকা বাঁকা কালোরূপ আরো হবে কালো॥
সন্ধিজলে রণানল করিয়া নির্ব্বাণ।
আবার ক্ষেপিল কেন আবার প্রধান?
হীনবলে এত কেন প্রকাশিছে রোষ।
বুঝিলাম ধরিয়াছে কপালের দোষ॥
নিয়তে টানিলে পরে নাহি যায় রাখা।
মরণের হেতু উঠে পিপীড়ার পাখা॥
দ্বিজরাজে দর্প করে হইয়া শালিক।
অবোধ বগের প্রভু মগের মালিক॥
সকল শরীর চিত্র বিচিত্র ব্যাভার।
সাক্ষাৎ দ্বিপদ পশু মানব আকার॥
সেনা আর সেনাপতি সম সমুদয়।
কেবা রাজা কেবা প্রজা বুঝা অতি দায়॥
শ্রীরামকাটারি হস্তে সমরে নামিয়া।
মাঝে মাঝে ছাড়ে ডাক থামিয়া থামিয়া॥
ইরেক্তা বুকুলী ভুলু কামিয়া কামিয়া।
নাচে আর গান গায় থামিয়া থামিয়া॥
কর্ম্মের উচিত ফল অবশ্যই পাবে।
আবাপতি হাবা অতি বুঝিলাম ভাবে॥
জ্ঞানহত পশু যত আর কত জ্বালাবে?
ভূতবেশে যুদ্ধে এসে মিছে কেন চলাবে?
শ্বেতবীর বাসুকির উচ্চ শির টলাবে।
রাজপুর হয়ে চুর রসাতলে তলাবে॥
কোপে কোপে তোপে তোপে গিরিদেশ
হেলাইবে।
জলে স্থলে শত্রুদলে কাঠচেলা চেলাবে॥
তীরে উঠে ছুটে ছুটে দুই হাতে ঠেলাবে।
ডাকছাড়ি তুলে আড়ি গোঁপদাড়ী ফেলাবে॥
কোরে রাগ ধোরে তাগ বাঁকা ডগ
লেলাবে।
ছুরী দিয়া মাঠে নিয়া কত খেলা খেলাবে॥
ইত মিশে বুঝে মিশে কাণে সীসে ঢালাবে।
মশাই পসাই সোনা কামানেতে গলাবে॥
সিফায়েরা বেঁধে ডেরা রাজধানী জ্বালাবে।
বোকারাজে চোরসাজে সিন্ধুপথে চালাবে॥
যত গোরা মেরে হোরা ভাল ঝাল ঝালাবে।
আবাপতি হারা ভূপ বাবা বোলে পালাবে॥

টোরী ও হুইগ।

কিছুমাত্র নাহি জানি রাম রাম হরি।
কারে বলে রেডিকেল কারে বলে টোরী॥
হুইগ কাহারে বলে কেবা তাহা জানে।
হুইগের অর্থ কভু শুনি নাই কাণে॥
টোরী আর হুইগের যে হন প্রধান।
আমাদের পক্ষে ভাই সকল সমান॥
গুণে করি গুণগান দোষে দোষ গাই
শুধু সুবিচার চাই শুধু সুবিচার চাই॥
আমাদের মনে আর অন্য ভাব নাই।
শুধু সুবিচার চাই॥
নিতান্ত অধীন দীন এদেশের লোক।
শক্তিহীন অতি ক্ষীণ সদা মনে শোক॥
রাজ্যের মঙ্গল হেতু ব্যাকুল সকল।
প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষণ রাজার কুশল॥
চাতকের ভাব যথা জলদের প্রতি।
সেরূপ রাজার ভাব আমাদের প্রতি॥
যাহাতে দেশের সুখ চিন্তা করি তাই।
শুধু সুবিচার চাই শুধু সুবিচার চাই॥
আমাদের মনে আর অন্য ভাব নাই।
শুধু সুবিচার চাই॥
চারিদিকে যুদ্ধের অনলরাশি জ্বলে।
নির্ব্বাণ করহ বিভু সন্ধিরূপ জলে॥
রণরঙ্গে প্রাণীনাশ বিষাদের হেতু।
বিবাদ-সাগরে বাঁধ ঐক্যরূপ সেতু॥
সন্ধিযোগে দান কর শান্তিগুণ-রস।
পৃথিবীর লোক যত প্রেমে হবে বশ॥
প্রশংসা-পুষ্পের গন্ধ যাবে সব ঠাঁই।
শুধু সুবিচার চাই শুধু সুবিচার চাই॥

আমাদের মনে আর অন্য ভাব নাই।
শুধু সুবিচার চাই॥
পরিবর্ত্ত কর সব নিয়মের দোষ॥
যাহাতে হইবে বৃদ্ধি প্রজার সন্তোষ।
জন্ম কর্ম্ম ধর্ম্ম রীতি জাতি আর দেশ।
কোনরূপ কোন পক্ষে নাহি থাকে দ্বেষ॥
নির্ম্মল-নয়নে কর কৃপাদৃষ্টি দান।
একভাবে ভাব মনে সকল সমান॥
মাঙ্গলিক সব কার্য্যে স্নেহ যেন পাই।
শুধু সুবিচার চাই শুধু সুবিচার চাই॥
আমাদের মনে আর অন্য ভাব নাই॥
শুধু সুবিচার চাই॥
দুর্জ্জন-তস্কর-ভয়ে ভীত লোক সব।
চারিদিকে উঠিয়াছে হাহাকার রব॥
ধনীরূপে খ্যাতাপন্ন জমীদার যারা।
নীলামের শক্ত দায়ে মারা যায় তারা॥
শমনের সহোদর নীলকর যত।
মনে প্রাণে প্রজাদের দুখ দেয় কত॥
অত্যাচার দেশে যেন নাহি পায় ঠাঁই।
শুধু সুবিচার চাই শুধু সুবিচার চাই॥
আমাদের মনে আর অন্য ভাব নাই।
শুধু সুবিচার চাই॥

প্রভাতের কমলিনী।

সহস্রকরের করে, কিবা শোভা সরোবরে,
সে রূপের নাহি অনুরূপ।
নলিনী ফেলিয়া বাস, বিস্তার করিয়া বাস,
প্রকাশ করেছে নিজ রূপ।
মাথার আঁচল খুলে, প্রিয় পানে মুখ তুলে,
হেসে হেসে কি খেলা খেলায়।
আহা কিবা মনোহর, দিবাকর দিয়া কর,
স্নেহে তার বদন মুছায়॥
নেচে নেচে ক্ষণে ক্ষণে, হেটমুখে পড়ে বনে,
মনে এই ভাবের আভাষ।
কমলদলের তলে, রবি-ছবি জলে জলে,
বিদূরিত হতেছে বিলাস॥
দলগুলি উঠো উঠো, মুখখানি ফোটা ফোটো,
ছোট ছোট কমলের কলি।
মধুকর দলে দলে, সেই কলি দলে দলে,
* * * *
মোহিত মধুর রসে, উড়ে গিয়ে ফুঁড়ে বসে,
এক ছেড়ে ধরে গিয়া আর।
মধুলোভী মধুব্রত, পাইয়াছে সদাব্রত,
লুটিতেছে মধুর ভাণ্ডার॥

মাতৃভাষা।

মায়ের কোলেতে শুয়ে, উরুতে মস্তক থুয়ে,
খল খল সহাস্য বদন।
অধরে অমৃত ক্ষরে, আধো আধো মৃদুস্বরে,
আধো আধো বচনরচন।
কহিতে অন্তরে আশা, মুখে নাহি ফুটভাষা,
ব্যাকুল হয়েছ কত তায়।
মা-ম্মা-মা-মা-মা-মা-ব্বা-বা-বা-বা।
আবো আবো আবা, আবা,
সমুদয় দেববাণী প্রায়॥
ক্রমেতে ফুটিল মুখ, উঠিল মনের সুখ,
একে একে শিখিলে সকল।
মেসো পিশে, খুড়া বাপ,
জুজু, ভূত, ছুঁচো সাপ,
স্থল জল আকাশ অনল॥
ভাল মন্দ জানিতে না, মলমূত্র মানিতে না
উপদেশ শিক্ষা হলো যত।
পঞ্চমেতে হাতে খড়ি, খাইয়া গুরুর ছড়ী
পাঠশালে পড়িয়াছ কত।
যৌবনের আগমনে, জ্ঞানের প্রতিভা মনে
বস্তু বোধ হইল তোমার।
পুস্তক করিয়া পাঠ, দেখিয়া ভবের নাট
হিতাহিত করিছ বিচার॥

যে ভাষায় হয়ে প্রীত, পরমেশ-গুণ-গীত,
বৃদ্ধকালে গান কর মুখে।
মাতৃ সম মাতৃভাষা, পূরালে তোমার আশা,
তুমি তার সেবা কর সুখে॥

জন্মভূমি।

জান না কি জীব তুমি, জননী জনমভূমি,
যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে ?
...মিতে করিয়া বাস, ঘুমেতে পূরাও আশ,
জাগিলে না দিবা বিভাবরী।
...ত কাল হরিয়াছ, এই ধরা ধরিয়াছ,
জননী-জঠর পরিহরি॥
...র বলে বলিতেছ, যার বলে চলিতেছ,
যার বলে চালিতেছ দেহ।
...র বলে তুমি বলী, তাঁর বলে আমি বলী,
ভক্তিভাবে কর তাঁরে স্নেহ॥
...সূতি তোমার যেই, তাঁহার প্রসূতি এই,
বসুমাতা মাতা সবাকার।
... বুঝে ক্ষিতির রীতি, তোমার জননী ক্ষিতি,
জনকের জননী তোমার॥
... শস্য ফলমূল, না হয় যাহার মূল,
হীরকাদি রজত কাঞ্চন।
...তে জীবের অসু, বক্ষেতে বিপুল বসু,
বসুমতী করেন ধারণ॥
...ভীর রত্নাকর, হইয়াছে রত্নাকর,
রত্নময়ী বসুধার বরে।
...করি অবস্থান, করে করে কর দান.
তরণী ধরণী-রাণী-করে॥
...া ধরার পদ, পেয়ে পদ নদী নদ,
জীবনে জীবন রক্ষা করে।
...নী মহীর মোহে, বহ্নি বারি বয়ু দোঁহে,
প্রেমভাবে চরে চরাচরে॥

প্রকৃতির পূজা ধর, পুলকে প্রণাম কর,
প্রেমময়ী পৃথিবীর পদে।
বিশেষতঃ নিজদেশে, প্রীতি রাখ সবিশেষে,
মুগ্ধ জীব যার মোহনদে॥
ইন্দ্রের অমরাবতী, ভোগেতে না হয় মতি;
স্বর্গভোগ উপসর্গ সার।
শিবের কৈলাসধাম, শিবপূর্ণ বটে নাম,
শিবধাম স্বদেশ তোমার॥
মিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয়প্রেম,
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।
সুধাকরে কত সুধা, দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা,
স্বদেশের শুভ সমাচার॥
ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥
স্বদেশের প্রেম যত, সেই মাত্র অবগত,
বিদেশেতে অধিবাস যার।
ভাব তুলি ধ্যানে ধরে, চিত্তপটে চিত্র করে,
স্বদেশের সকল ব্যাপার॥
স্বদেশের শাস্ত্রমতে, চল সত্য ধর্ম্মপথে,
সুখে কর জ্ঞান আলোচন।
বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা, পূরাও তাহার আশা,
দেশে কর বিদ্যাবিতরণ॥
দিন গত হয় ক্রমে, কেন আর ভ্রম ভ্রমে,
স্থির প্রেমে কর অবধান।
বাস করি এই বর্ষে, এই ভাবে এই বর্ষে,
হর্ষে কর বিভুগুণগান॥
উপদেশবাক্য ধর, দেশে কেন দ্বেষ কর,
শেষ কর মিছে সুখ আশা।
তোমার যে ভালবাসা, সে হলো না ভালবাসা,
আর কোথা পাবে ভালবাসা ?
এ বাসা ছাড়িবে যবে, আর কি হে আশা রবে.

কেবা আর পায় দেখা, এলে একা যাবে একা,
পুনর্ব্বার নাহি আর আসা॥

রাজনীতি।

অনুগত রাজা যত, অধীনেতে রয়।
তাদের বিষয়ে যেন, লোভ নাহি হয়॥
করুণা-তরুর তলে, বাস করে যারা।
নিতান্ত আশ্রিত অতি, নিরুপায় তারা॥
ইঙ্গিত করিলে যারা, উঠে আর বসে।
নত হয়ে সন্ধি করি, সদা আছে বশে॥
তাদের নিগ্রহ করা, উচিত কি হয়?
রাজধর্ম্ম নয়, সেতো, রাজধর্ম্ম নয়॥
রাজা হয়ে এরূপ, অন্যায় যেই করে।
ভবের ভাণ্ডার তার, অপযশে ভরে॥
রাজ-বল, বড় বল, তুল্য যার নাই।
শাস্ত্রবল, শস্ত্রবল, দুই বল চাই॥
ক্ষিতিপতি হইবেন, পণ্ডিত-মণ্ডিত।
করিবেন সুমন্ত্রণা মন্ত্রীর সহিত॥
মন্ত্রী হবে ধর্ম্মশীল, সাধু সুভাজন।
মন্ত্রণা করিবে দান, ধর্ম্মে রেখে মন॥
সভাসদ কুলীন পণ্ডিতগণ যত।
সেইমতে সকলে দিবেন অভিমত॥
তবে করিবেন রাজা সে মত চলিত।
রাজা প্রজা উভয়ের হবে তায় হিত॥
অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি শুকো আর হাজা।
এ সকল বিবেচনা করিবেন রাজা॥
যেবার যেমন হবে শস্যের সঞ্চার।
সেবার লবেন কর সেরূপ প্রকার॥
চাষার আশার ধন না ফলিলে ক্ষেতে।
কেমনে রাজস্ব দিবে নাহি পায় খেতে?
কর নেয়া বিধি হয় এরূপ বিধানে।
চাষা আর ভূমিস্বামী যাহে বাঁচে প্রাণে॥
কর পেতে কর পেতে থাকুন ভূপাল।
সেবক না হয় যেন বিষম বিশাল॥
পাইতে বিলম্ব হলে কররূপ নিধি।
প্রচার না হয় যেন রবি অস্ত বিধি॥
কৃষীর কুশল যাহে নিরন্তর হয়।
সেই দিকে নৃপতির নেত্র যেন রয়॥
ভূমিতে হইলে শস্য গাছে হলে ফল।
নানারূপে হয় তার দেশের মঙ্গল॥
অভাব থাকে না কিছু দূর হয় দুখ।
সকলি সুলভ হয় কত তায় সুখ॥
রাজার রাজস্ব-লাভে ব্যাঘাত না হয়।
প্রজা আর কৃষকেরা স্থির হয়ে রয়॥
বণিক বাণিজ্যে করে বিশেষ ব্যাপার।
শ্রমজীবী জনেদের আনন্দ অপার॥
পরস্পর বিনিময়ে বেড়ে যায় ধন।
সে ধনেতে হয় কত কল্যাণ-সাধন॥
কতজন পেয়ে ধন ধনী হতে চায়।
ধনেতেই ধন বাড়ে কৃষীর কৃপায়॥
যে ফসলে কুশলের সীমা নাই আর।
খুলে যায় অনেকের ভাগ্যের ভাণ্ডার॥
স্বদেশের লোক সব বাহু তুলে নাচে।
বিনিময়ে পরস্পর কত দেশ বাঁচে॥
বাণিজ্য-ব্যাপার তায় বেড়ে যায় কত।
অনুরাগে সবে হয় পরিশ্রমে রত॥
রাজ্য হলে ধনশালী অপার কুশল।
প্রজার মঙ্গলে হয় রাজার মঙ্গল॥
কৃষিকার্য্য করি ধার্য্য প্রথমে ভূপতি।
পরে করিবেন দৃষ্টি বাণিজ্যের প্রতি॥
বাণিজ্যবিহীন রাজ্য শোভা নাহি পায়।
বৃদ্ধি হলে বাণিজ্যের কত সুখ তায়॥
যে দেশে বাণিজ্য নাই সে দেশ কি দেশ
সে দেশে না হয় কভু লক্ষ্মীর প্রবেশ॥
যে দেশেতে বণিকের ব্যবসা না চলে।
লক্ষ্মীছাড়া দেশ তারে সকলেই বলে॥
কতরূপে উপকার একরূপে নয়।
"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" শাস্ত্রে এই ক

বিদেশে বিনোদ বস্তু বিরাজিত যত।
দেশে বোসে সে সকল হয় হস্তগত॥
পরস্পর দ্রব্য যত করি বিনিময়।
কোনরূপ জিনিসের অভাব না রয়॥
কোন্ দেশ কত দূর কিরূপ প্রকার।
কিরূপেতে প্রজাগণ চালায় সংসার॥
রীতি নীতি ধর্ম্মকর্ম্ম আচার বিচার।
কিরূপ স্বভাব ভাব কিরূপ ব্যাভার॥
কিসেতে নির্ভর করি কাল করে গত।
আমাদের সহ তার ভেদাভেদ কত॥
এইরূপে সমুদয় হয়ে অবগত।
বল বুদ্ধি সাহস সভ্যতা বাড়ে কত॥
কতরূপ দেশভাষা করিয়া প্রচার।
বিধিমতে বহুবিধ বিদ্যার বিস্তার॥
বিদেশের সবিশেষ জেনে ইতিহাস।
স্বদেশে করিবে সুখে পুস্তক প্রকাশ॥
যে দেশের ভাল যাহা করিয়া সংগ্রহ।
ব্যবহার দূর হবে দেশের নিগ্রহ॥
এ দেশের যে সকল উত্তম হইবে।
উপদেশে সে দেশেতে প্রচার করিবে॥
এইরূপে কুশলের না রহিবে সীমা।
দিন দিন বৃদ্ধি হবে রাজার মহিমা॥
করিবেন বণিকেরে বিশেষ সাহায্য।
রাজা যেন আপনি না করেন বাণিজ্য॥
বাণিজ্য করিবে সাধু সর্ব্বশাস্ত্রে কয়
রাজার বাণিজ্যবিধি কখনই নয়॥
সাধুর সন্তান সবে রাজার আদেশে।
ব্যবসায়-রত হবে স্বদেশে বিদেশে॥
জলে স্থলে রক্ষা করি, অভয় প্রদানে
নৃপতি লবেন দানি বিধান প্রমাণে॥
রাজার প্রতুলপথে করে প্রতিষেধ।
রাজার বাণিজ্য তাই নিয়মে নিষেধ॥
পৃথিবীর চারিদিক চেয়ে দেখি তাই।
ভূপালের সদাগর কোন দেশে নাই॥

যে দেশের রাজা করে বাণিজ্য-ব্যাপার।
সে দেশের প্রজাগণ করে হাহাকার॥
প্রমাণ প্রত্যক্ষ তার এ দেশে এখন।
কোম্পানীর একচেটে আফিম লবণ॥
রাজার অন্যায় লোভে প্রজা যায় মারা।
নীরদ-নয়নে ফেলে দর দর ধারা॥
"মলঙ্গীরা" যেখানেতে করিতেছে লুণ।
সেইখানে গিয়া দেখ নৃপতির গুণ॥
পাটনা প্রদেশে গেলে দেহ হবে হিম।
কেমন করিয়া রাজা নিতেছে আফিম॥
এইমত ভয়ঙ্কর রাজ-অত্যাচারে।
দুঃখী প্রাণী প্রজা আর বাঁচিতে না পারে॥
আহার ঔষধ যাহা স্বভাবে সম্ভব।
তাই হলো নৃপতির নিজের বিভব॥
একবার প্রজার নিকটে পেতে কর।
রীতিমত লয়েছেন যে ভূমির কর॥
সে ভূমির জাত বস্তু লয়ে পুনর্ব্বার।
করিলেন কররূপে ভাণ্ডারে সঞ্চার॥
যাহার আহার বিনা প্রজা যায় মোরে।
রাখিলেন সেই দ্রব্য "মনাপুলি" করে॥
ভূতে ভূতে যোগ হয়ে জন্ম হয় যার।
তাহারে বলিতে হবে ভৌতিক ব্যাপার॥
স্বভাবে উদ্ভব যাহা ভৌতিক ব্যাপার।
সকল প্রাণীর তায় সম অধিকার॥
চমৎকার সুবিচার রাজার আমার।
করেন "রাজস্ব" বোলে নিজে অধিকার॥
আমার বাড়ীতে মাটী ঘাড়ীতেই জল।
আকাশের রবিকর, বাড়ীর অনল॥
পরস্পর যোগাযোগে যদি করি লুণ।
হাতে দড়ী দিয়ে রাজা মেরে করে খুন॥
ঝুলী কাঁথা লুটে লয় যেখানে যা থাকে।
খাটুনি আঁটুনি করে কারাগারে রাখে॥
তখনই পাড়ে টান জমীদার ফেরে।
জমীদারী বেচে লয় জরিমানা করে॥

লোভের অধীন হয়ে অন্যায় আচার।
এই কি উচিত হয় ধার্ম্মিক রাজার?
কিছুই উপায় নাহি শাসনের জোর।
আপনি আপন ধনে সাধু হয় চোর॥
অনুগত আশ্রিত যে সব লোক থাকে।
তাদের আশ্রয় দিয়া অধীনেতে রাখে॥
এইরূপে উচ্চপদে কর্ত্তাপক্ষগণে।
কর্ম্ম দিয়া পালিতেছে শত শত জনে॥
রাজার নিকটে যেই পরিচিত নয়।
ক্ষমতায় নাহি পায় রাজার আশ্রয়॥
তার আর নাহি হয় সম্পদের সুখ।
আপনার কর্ম্মফলে ভোগ করে দুঃখ॥
পদেতেই মান হয় পদেতেই যশ।
পদে না থাকিলে তার কেবা হয় বশ?
ক্ষমতায় রাজপদ পাবার কারণ।
পরস্পর করে তাই সমান যতন॥
করিবেন দেশে রাজা সুরীতি স্থাপন।
সকলের হরে তায় স্বভাব-শোধন॥
করিবেন সবিশেষ বিদ্যার বিধান।
বিদ্যাবান্ হবে সব প্রজার সন্তান॥
প্রজায় শিখিলে বিদ্যা ভাবনা কি আর।
পরস্পর করে সবে প্রিয় ব্যবহার॥
বিদ্যা আর নীতি-গুণে সাধুভাব ধরে।
কারো প্রতি কেহ নাহি অত্যাচার করে॥
রাজ্যের মঙ্গল তায় অশেষ প্রকার।
কোনমতে নাহি হয় শান্তির সংহার॥
শান্তি হলে সঞ্চারিত না রহে জঞ্জাল।
প্রণয়-প্রভাবে সবে সুখে কাটে কাল॥
সুরীতির সমাগমে সুখ কব কত।
কুরীতি কুনীতি হয় একেবারে হত॥
যে রাজার প্রজাগণ নীতিতে নিপুণ।
শিল্প আদি আর আর ধরে বহু গুণ॥
বিবিধ ব্যাপারে করে বিহিত বিশেষ।
স্বর্গের সমান হয় সে রাজার দেশ॥

নীতি আদি বিদ্যা দান করিয়া প্রথমে।
বিজ্ঞানের উপদেশ ক্রমে যথা ক্রমে॥
ভূগোল খগোল আর পদার্থ-নির্ণয়।
জ্যোতিষ প্রভৃতি আর শাস্ত্র সমুদয়॥
বিশেষতঃ বৈদ্যশাস্ত্র সকলের সার।
যার চেয়ে শুভকর কিছু নাহি আর॥
অনুরত হয়ে রাজা খুলিয়া ভাণ্ডার।
করিবেন এ সকল শাস্ত্রের প্রচার॥
প্রজাদের জাতি-ধর্ম্ম আর কুলাচার।
চিরদিন চলিতেছে যেমন যাহার॥
স্থিরভাবে শান্তিযোগে সেইরূপ রয়।
তাহে যেন কোনরূপ ব্যাঘাত না হয়॥
যার যাহা ধর্ম্ম হয় ভাল তার তাই।
পরধর্ম্মে পীড়া দেয়া প্রয়োজন নাই॥
আপনি পালুন রাজা ধর্ম্ম আপনার।
নিজ নিজ ধর্ম্ম প্রজা করুক্ প্রচার॥
পরিত্রাণ তায় তার যে ধর্ম্মে যে থাকে।
সকলেই একভাবে এক ব্রহ্মে ডাকে॥
ধিক্ ধিক্ অধীনতা ধিক্ তোরে ধিক্।
কুকুরে কাঁদিতে হয় লিখিতে অধিক॥
বোধ আর কোনরূপে প্রবোধ না ধরে।
হৃদয় বিদীর্ণ হয় মনে হলে পরে॥
মনের যাতনা আর ফুটে বলি কারে?
এরূপ না হয় যেন কোন অধিকারে॥
কোথায় করুণ প্রভু করুণানিধান।
করুন্ রাজার মনে করুণা প্রদান॥
ইঙ্গিতে আদেশ কর রাজমন্ত্রিগণে।
যাতনা না দেন যেন অধীনের মনে॥
করুন্ করুণ হয়ে প্রজার কুশল।
হরুন্ বাণিজ্য আদি কুরীতি সকল॥
ধরুন্ তরুণ ভাব ন্যায়ে হয়ে রত।
করুন্ উচিত দয়া অরুণের মত॥
তরুন্ কলঙ্ক হতে করি সুবিচার।
যথা রীতি কর লয়ে ভরুন্ ভাণ্ডার॥

সমুদয় বিষয়েতে আছি পরিতোষে।
কেবল কাঁদিতে হয় গোটাকত দোষে॥
সেইগুলি গেলে পরে রামরাজ্য হয়।
মুক্তমুখে সবে করে ইংরাজের জয়॥
প্রজাদের ব্যবহারে করিয়া ব্যাঘাত।
জাতি আর ধর্ম্মনাশে কেন দেন হাত?
যথা ধর্ম্ম সকলেই করিবে আচার।
সে বিষয়ে কেন হয় আইন প্রচার?
পূর্ব্বকার অঙ্গীকার করিয়া বিনাশ।
যম সম "লেক্সলোসী" নিয়ম প্রকাশ॥
যদ্যপি করেন রাজা অন্যায় আচার।
কিরূপে প্রজার তবে রক্ষা থাকে আর?
মনেরে বুঝাব আর কাহারে বলিয়া?
রক্ষক ভক্ষক হলো "তক্ষক" হইয়া॥
রাজায় বিরত হলে প্রতিজ্ঞা-পালনে।
তাহার উপায় আর হইবে কেমনে?
কে আর শুনিবে সব মনের বচন?
কার কাছে ডাক ছেড়ে করিব রোদন?
ধর্ম্মধন মহাধন সকলের সার।
যার চেয়ে মহামূল্য বস্তু নাই আর॥
যার যাহা ধর্ম্ম তার তাহাই প্রধান।
ধন প্রাণ বড় নহে ধর্ম্মের সমান॥
কোটি কোটি প্রজাগণ কেহ নহে সুখী।
মরমে পরম ব্যথা চিরদিন দুঃখী॥

প্রভাত।

প্রতিদিন প্রাতে উঠি বিভু-নাম স্মরি।
তরুণ অরুণ আভা বিলোকন করি॥
স্বভাবের শোভা কত প্রকাশিব কিবা?
নিদ্রা ত্যজি উঠে যেন কুলবধূ দিবা॥
স্বামী অনুরাগে জাগে ভাঙ্গে ঘুমঘোর।
জাগাইছে অরবিন্দে প্রেমানন্দে ভোর॥
হাস্যমুখী কমলিনী ঘোমটা খুলিয়া।
নাচিতেছে মৃদু [illegible] দুলিয়া॥
ছুটিয়াছে গন্ধ তার ফুটিয়াছে কলি।
মধুলোভে গুণ গুণ গুণ গায় অলি॥
দ্বিজরাজ অস্ত দেখি দ্বিজকুল যত।
নানা স্বরে রাগভরে গান করে কত॥
ধরাতল সুশীতল সুবিমল হয়।
পূর্ব্বভাগে পূর্ব্বরাগে অপূর্ব্ব উদয়॥
অপূর্ব্ব নহেক সেটা অপূর্ব্ব প্রভাস।
নব পরিচ্ছদ যেন ধরেছে আকাশ॥
ছটাযুক্ত সুবর্ণের সুন্দর অঙ্গুরী।
অঙ্গুলীতে ধরে যেন প্রকৃতি সুন্দরী॥
হেরিয়া প্রভাত-প্রভা পূর্ণানন্দময়।
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয়॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি এই দৃষ্টি হয়।
যেন পুরাতন নয়॥

মধ্যাহ্ন।

আর এক নবভাব মধ্যাহ্নসময়।
দিবার যৌবন যাহে প্রকটিত হয়॥
শূন্যের সর্ব্বাঙ্গে যেন হুতাশন ভরা।
তপনের তপ্ত তনু দীপ্ত করে ধরা॥
সমীরণ সখা-অঙ্গে আলিঙ্গন দিয়া।
জানায় পৃথিবীময় প্রকৃতির ক্রিয়া॥
নবভাবে নভ পূর্ব্বভাব পরিহরি।
পুনর্ব্বার শুদ্ধ হয় ধৌতবস্ত্র পরি॥
পশু পক্ষী চোরে খায় তাপ লাগে শিরে।
থেকে থেকে রায় রাখে ছায়ার কুটীরে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা উভয়ের একত্র মিলন।
আলস্য আদর লগ্ন দেহ-নিকেতন॥
শ্রমের হইল ভ্রম গতি ধীরে ধীরে।
বিরতি বসতি করে মনের মন্দিরে॥
অকস্মাৎ এই ভাব কিসের কারণ?
নয়ন লজ্জিত অতি দেখিতে তপন॥
হেরিয়া ভবের ভাব হয় নিরূপণ।
স্বভাব উঠিল জেগে দেখিয়া স্বপন॥

মধ্যকাল হেরে মন ভাবে মুগ্ধ রয়।
পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয়॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি এই দৃষ্টি হয়।
যেন পুরাতন নয়॥

সায়ংকাল।

সন্ধ্যার সন্ধির যোগে সূর্য্য হন বুড়া।
পশ্চিমে ধরেন গিয়া অস্তাচল-চূড়া॥
ঈষৎ আরক্ত ছবি প্রভাহীন কর।
অধোভাগে যান যেন জলের ভিতর॥
কোথা বা প্রখর দেহ কোথা বা কিরণ।
ম্লানমুখে মনোদুঃখে মুদিত নয়ন॥
অহ সহ এক ভাব নাহি আর ক্রম।
জ্যোতির মুকুট তাঁর কেড়ে লয় তম॥
দিননাথ দীন দেখি দিন অতি লাজে।
লুকায় আপন অঙ্গ অন্ধকার-মাঝে॥
তিমিরের শয্যায় শোভিত হয় নভ।
নবভাবে যেন তার নিদ্রা যায় ভব॥
ভাবি ভাবে মুগ্ধ হয় ভাবুকের মন।
বুঝ রে ভবের ভাব ভাবুক যে জন॥
দ্বিজরাজ আসিতেছে সঙ্গে লয়ে রহ।
দ্বিজগণ বাসা লয় নিজগণ সহ॥
তরু-শাখা স্নিগ্ধ হয়ে এই সন্ধ্যাকালে।
ভঙ্গী করি গীত গায় পবনের তালে॥
মানস মোহিত হয় সায়াহ্নসময়।
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয়॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি এই দৃষ্টি হয়।
যেন পুরাতন নয়॥

যামিনী।

যামিনী সজনী সহ প্রফুল্লিত মনে।
হাসি হাসি বসে আসি আকাশ-আসনে॥
ক্ষণমাত্রে দেখা যায় অপরূপ ভাব।
স্বভাব ধরেছে যেন নূতন স্বভাব॥
তারা যারা তারা তারাপতি ঘেরে জলে।
মুকুতামণ্ডিত যেন রজত-অচলে॥
বায়ুর বিচিত্র গতি নানা ভাবে বহে।
প্রকৃতি বিকৃতি হেতু এক ভাব নহে॥
কখনো নির্ম্মল করে গগনমণ্ডল।
কভু করে ছিন্ন-ভিন্ন মেঘ ঢলঢল॥
নদ নদী কত দেখি গগন-উপর।
ললিত লহরী যেন চলে থরথর॥
প্রহর হইলে গত নিদ্রাগত সব।
ক্রমে সব স্তব্ধ হয় নাহি শব্দ রব॥
ভূমিতল সুশীতল তাপ নাই আর।
তৃণ-পত্রে শোভা করে নীহারের হার॥
বহুরূপী বিভাবরী বহুরূপ ধরে।
শোক চিন্তা তাপ আদি সমুদয় হরে॥
কখনো বা অন্ধকার কভু শুভ্রময়।
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয়॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি এই দৃষ্টি হয়।
যেন পুরতন নয়॥

ষড়-ঋতু।

বসন্ত নিদাঘ বর্ষা শরৎ নীহার।
কাল ক্রমে ক্রমে সব করে অধিকার॥
ছয় কালে ছয় ঋতু ছয়রূপ ভাব।
ছয় কালে ছয় ভাবে শোভিত স্বভাব॥
থাকে না অন্যের বোধ একের সময়।
এইরূপ কত কাল গত করি ছয়॥
এই শীত ক্ষণ পরে গ্রীষ্ম যদি হয়।
শীতের স্বভাব তায় অনুভূত নয়॥
ছয় ঋতু অধিকারে ছয়রূপ যোগ
নব নব পরাক্রমে নব নব ভোগ॥
কখনো কম্পিত কায় শীত সমীরণে।
লালসা অধিক হয় রবির কিরণে॥
কখনো তপন-তাপ সহ্য নাহি হয়।
সুশীতল স্নিগ্ধ রসে ইচ্ছা অতিশয়॥

কখনো বা ভাসে সৃষ্টি বৃষ্টির ধারায়।
মেঘনাদ অন্ধকার দৃষ্টিহীন তায়॥
জীবের ভোগের হেতু ঋতুর সৃজন।
পৃথকে পৃথক্ তাঁর প্রভা প্রকটন॥
প্রতিক্ষণ পায় মন নব পরিচয়।
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয়॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি এই দৃষ্টি হয়।
যেন পুরাতন নয়॥

বিচিত্র সৃষ্টি।

এই ধরা এই বহ্নি এই বায়ু জল।
এই তরু এই পত্র এই পুষ্প ফল॥
এই ঘ্রাণ এই দৃষ্টি এই স্পর্শ রব।
এই এই এই এই এই এই সব॥
এই ভব পঞ্চীকৃত পঞ্চ ছাড়া নয়।
এই পাত ভেদগুণে কত পাত হয়॥
এই ক্ষুধা এই তৃষ্ণা এই শোক রোগ।
এই সুখ এই দুখ এই তৃপ্তি ভোগ॥
এই ভাব এই বোধ এই চিন্তা মন॥
এই খাদ্য এই মুখ এই আস্বাদন॥
এই নদী এই ক্ষেত্র এই উপবন।
এই চন্দ্র এই সূর্য্য এই তারাগণ॥
এই রাত্রি এই দিন এই তিথি বার।
এই দৃশ্য এই আলো এই অন্ধকার॥
এই প্রাত এই সন্ধ্যা এই মধ্যাকাল।
এই এই এই দণ্ড এই খণ্ড কাল॥
কি আশ্চর্য্য ভবকার্য্য সব পুরাতন।
অথচ নয়নে নিত্য নিরখি নূতন॥
বিচিত্র তোমার সৃষ্টি ওহে বিশ্বময়।
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয়॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি এই দৃষ্টি হয়।
যেন পুরাতন নয়॥

কিছু নাই

সুশীতল সুনীল ঘ..
সুধা সম সুমধুর দয়া-রস টং.
দীন হীন জনমন-চকোরের ক্ষুধা।
ক্ষণমাত্র নিবারণ করে সেই সুধা॥
কেমনেতে মনে হয় দয়া আবির্ভাব।
ভাবিয়া ভাবুক জনে নাহি পায় ভাব॥
আমি বলি কাজ নাই অন্য কোন ভাবে।
সঞ্চারিত দয়ারস স্বভাব-প্রভাবে॥
পাষাণ সমান যার নিদয় হৃদয়।
কেমনে হইবে তাহে দয়ার উদয়?
উপায়বিহীন জন-মানস নলিন।
নিরদয় নিকটেতে নিয়ত মলিন॥
করুণাবিহীন সেই নিদারুণ জন।
পর-কাতরেতে নাহি গলে তার মন॥
নিরবধি নীরধর বরিষে শিখরে।
গিরিবর কলেবর তাহে সিক্ত করে॥
কখন কি হয় দ্রব ভূধর-শরীর?
অভিমান নিম্নগামী হয় সেই নীর॥
মানুষের প্রতি যার প্রীতি নাই মনে।
মানুষ বলিয়া তায়ে গণিব কেমনে?
আত্মদুঃখে দুঃখী যেই সুখী আত্মসুখে।
কাতর কি হয় সেই অপরের দুঃখে?
আত্মসুখ-অভিলাষী বটে সেই জন।
কিন্তু মনে নাহি পায় সুখ এক ক্ষণ॥
নিরন্তর অন্তরে কল্পনা করে কত।
কিছুই সফল নহে আশা মাত্র হত॥
কোথায় সুখের সূত্র খুঁজিয়া না পায়।
কামনা-কণ্টক-বনে ভ্রমিয়া বেড়ায়॥
জীবের হয়েছে মাত্র জীব পরিবার।
প্রিয় পরিজন প্রতি স্নেহ নাহি যার॥
কেমনে জগতে সেই পাবে সুখলেশ।
উচিত তাহার মাত্র সমুদ্র-প্রবেশ॥

সরল স্বভাব যার হৃদি ক্লেশ।
নয়নের শোভা ... ক্লেশ।
প্রেমরঙ্গে যেন শোভিত দিনেশ ॥
কাতর অন্তর তাহে বিকশিত করে।
প্রফুল্ল কমল তুল্য অতি শোভা ধরে ॥
দুঃখের দারুণ দশা দয়া দানে দলে।
ছল ছাড়ে খল তার সাধুসঙ্গ-ফলে ॥
যার বিচিত্র মায়া, যেন বট-বৃক্ষ-ছায়া,
সদাকাল শ্রান্তি করে দূর।
নীহারে সন্তাপপ্রদা, নিদাঘে শীতল সদা,
প্রমোদিত পল্লব প্রচুর ॥
ছত্ররূপ পত্র দ্বারা, নিবারি শ্রাবণধারা,
শান্ত করে পথশ্রান্ত মন।
পক্ষীদলে প্রতি দলে, অবিকলে সুবিরলে,
ফলে করে উদর-তোষণ ॥
দয়াতরু এপ্রকার, বিরাজিত হয় যার,
সুবিমল মানসের ক্ষেতে।
উপকার ছায়া তার, নানা ফল মিষ্ট তার,
পরিপক্ক প্রণয়-রসেতে ॥

বীণাপাণি-পদে।

হৃদয়কমলে আসি. বিনাশিয়া তমোরাশি,
প্রকাশিতা হও বিধায়িনী।
কবিতা-কমল-মধু, দহি মে মাধববধু,
বীণাপাণি বাক্যপ্রদায়িনী ॥
তব অনুকম্পাধীন, ভারতের শুভদিন,
কোথা গেল বৃশ্চিকবাহিনী।
কবিতার ছিন্ন বেশ, হেরিয়া উপজে ক্লেশ,
বিশেষ কি কব সে কাহিনী ?
নাহি মাত্র অলঙ্কার, হয়েছেন শীর্ণাকার,
রসহীনা বিরসে পূর্ণিতা।
শ্রীঅঙ্গের নাহি জ্যোতি
... মাদকে ঘূর্ণিতা ॥
...হ আর, হয়েছে রোদন স...
সুসাহিত্যসন্তান-বিয়োগে।
কেবল পত্তের মুখ, হেরিয়া নিবারে দুঃ...
শান্ত তার সান্ত্বনা প্রয়োগে ॥
কোথা কবি কালিদাস, বাল্মীকি ও বেদব্যা...
কবিতার দশা দেখ আসি।
কুক্কুরেতে খায় হবি, মূর্খ মুখ্য হয় কা...
জোনাকী রবিত্ব-অভিলাষী ॥
তাই বলি ওগো বাণী, শীতল করহ প্রা...
রসনায় করিয়া আসন।
পূরাও বাসনা মম, নিবার জড়তা-ত...
ক্ষোভরাশি করি বিনাশন ॥
বিতর করুণা লেশ, কহি সব সবিশে...
অধিক আশ্বাস নাহি করি।
এমন বাসনা নাই, সমারূঢ় হতে চা...
কবিতাশেখর চূড়োপরি ॥
মনোভাব ব্যক্ত হয়, লোকেতে কবিতা ব...
আনন্দ বিতরে জনগণে।
যতনে যাতনা শঙ্ক, পাছে মাতা হও ক্র...
শেষ নিবেদন শ্রীচরণে ॥

সুরীতি স্থাপন।

ভারতভূমির মাঝে হিঁদু আছ যত।
অলস অবশ হয়ে রবে আর কত ?
এখনো ভাঙ্গেনি ঘুম করিছ শয়ন ?
এখনো রয়েছ সবে মুদিয়া নয়ন ?
ভবের কি ভাব তাহা কর অনুভব।
একবার চোখ মেলে চেয়ে দেখ সব !
কি হইবে মিছা আর নিদ্রায় রহিলে ?
এখনি রতন পাবে যতন করিলে ॥
কি করিলে ভাল হয় কর বিবেচনা।
স্বদেশের হিতাহিত কর আলোচনা ॥

মনে মনে স্থিরভাবে কর প্রণিধান।
যাহাতে দেশের হয় কুশল বিধান॥
কুরীতি-কণ্টক-বন করিয়া ছেদন।
সুরীতির সুখতরু করহ রোপণ॥
অনুরত হয়ে দেও অনুরাগ-জল॥
শাখীর শাখায় হবে সুশোভিত দল॥
আহ্লাদের ফুল তায় সন্তোষের ফল।
সে ফল ফলিয়া ফলে ফলাবে সুফল॥
পরস্পরে এক হয়ে এক কথা বল।
একমতে এক রথে এক পথে চল॥
সকলেই একভাবে এক হই যদি।
এখনি শুকায়ে দিব ভ্রমময়ী নদী॥
আর না চালাতে হবে অধর্ম্মের পোত।
একেবারে হবে রোধ অজ্ঞানের স্রোত॥
ভ্রান্তিনদী শুকাইলে রবে না উদ্বেগ।
যুক্তি-নদী দেখাইবে আপনার বেগ॥
সুসার সুধার স্রোত, খেলিবে অনিলে।
ভাসিবে ধর্ম্মের খেয়া জ্ঞানের সলিলে॥

—

সেকি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

[ব্রা]হ্মণ পণ্ডিত যত, সকলেই অনুগত,
অবিরত উপকার পান।
[আ]মাদের মত হলে, বিধি আছে আছে বলে,
এখনই দিবেন বিধান॥
[পু]থি লয়ে রাশি রাশি, কাছে আসি হাসি হাসি
কহিবেন হইয়া প্রধান।
ইন্দুবালা বিধবার, বিয়ে হবে পুনর্ব্বার,
শাস্ত্রে তার রয়েছে প্রমাণ॥
[শা]স্ত্র এই বিধি এই, অর্ব্বাচীন মূঢ় যেই
বলে সেই ইথে নেই বিধি।
বিচার করুন এসে, শাস্ত্র তার কণ্ঠ এসে,
দেখিব কেমন বিদ্যানিধি॥
অতিশয় দুরাশয়, যারা হয় তারা কয়,
পরিণয় নয় নয় বলে।
কিছু নাই বোধাবোধ, কথায় কথায় ক্রোধ,
অনুরোধ উপরোধ চলে॥
কেবল মুখেতে জাঁক, ভিতরে সকলি ফাঁক,
মিছে হাঁক মিছে ডাক ছাড়ে॥
কেঁদে টোল মারে ঢোল, মিছামিছি করে গোল
গোলমালে হরিবোল পাড়ে॥
সব শাস্ত্র আছে পড়া, শাস্ত্র সব হাতে গড়া,
মতামত আমাদের ঘরে।
আমাদের পোড়ো যারা, পণ্ডিত হইয়া তারা,
টোল কোরে গোল কোরে মরে॥
আমার মুখের চোটে, কার সাধ্য এঁটে ওঠে,
কেটে কুটে করি ছারখার।
তোমার কল্যাণে বাবু, সকলে করিব কাবু,
দেখ কত ক্ষমতা আমার॥
করিলাম এই পণ, স্মার্ত্ত আছে যত জন,
দেখি দখি কেবা কিবা বলে।
বিচারে যদ্যপি হারি, প্রমাণ না দিতে পারি,
পুঁথি সব ফেলে দিব জলে॥
কালী কালী মুখে ডাকি, যত দিন বেঁচে থাকি,
আশীর্ব্বাদ করিব তোমায়।
করো এই উপকার, যেন কটা পরিবার,
অন্ন বিনা মারা নাহি যায়॥

—

শ্বেত সম্পাদক।

এ দেশেতে আছ যত সম্পাদক শাদা।
সকলেই আমাদের বড়ভাই দাদা॥
তোমরা সকল মতে সবাই প্রধান।
রাজজাতি রাজপ্রিয় রাজবৎ মান॥
ধীর বট বীর বট চুদিকেই দড়।
আমাদের চেয়ে হও সর্ব্বমতে বড়॥
দেখে শুনে জেনে সব তোমাদের ক্রিয়া।
ধরেছি লেখনী শেষ সম্পাদকী নিয়া॥
কিছুতেই তোমাদের তুল্য কভু নই।
বল বীর্য্য সাহস সহায়হীন হই॥

আগেই তোমরা আছ উপরেতে চোড়ে।
আমরা রয়েছি নীচে একপাশে পোড়ে॥
তুলেতে হয়েছি নীচু খেদ কিছু নাই।
ওজনে হইলে উঁচু হেসে মরি তাই॥
আপনারা বড় বড় কি তায় সংশয়?
বড় বোলে প্রকাশিত বড় পরিচয়॥
কিন্তু কিসে খেদ যায় কিসে করি স্থির?
সমান দেখিনে কেন ভিতর বাহির?
বাহিরেতে ধোপদাস্ত ধপ ধপ শাদা।
ভিতরেতে ঘিন্ ঘিন্ পাঁকভরা কাদা॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা নহে অন্যমত।
দুদিক সমান হলে সুখ হতো কত॥
যাহোক্ তাহোক্ ফলে বৃথায় বচন।
গোটাদুই কথা বলি কথার মতন॥
যখন বসেছ ভাই সম্পাদকী-পদে।
মত্ত যেন হয়োনাকো অভিমান-মদে॥
রাগ দ্বেষ অভিমান আর অহঙ্কার।
পাপকর পক্ষপাত কর পরিহার॥
নিয়ত বিরাজ করি তোমাদের করে॥
পক্ষের লেখনী কেন পক্ষপাত করে?
এডিটরি কর্ম্মে শুধু ধর্ম্মের সঞ্চার।
তাহাতে না হয় যেন কলঙ্ক প্রচার॥
ধর্ম্মের আসনে বোসে সেই ধর্ম্ম ধর।
নৃপতিরে ন্যায়মত উপদেশ কর॥
এদেশের বর্ত্তমান যত যত ভূপ।
ব্রিটিসের আনুগত্য করিছে কিরূপ?
দরশন করিতেছ যে সব ব্যাপার।
সে সব স্মরণ ভাই কর একবার॥
তোমাদের কেন হয় এমন ব্যাপার?
হিত ভেবে বিপরীত একে ভাবো আর।
একজন কর্ম্মফলে করিয়াছে দোষ।
এ বোলে কি জাতি মাত্রে বিধি হয় রোষ?
শরীরের একভাগে দোষ যদি হয়।
এ বোলে কি সব দেহ কাটা বিধি হয়?

এক দন্ত দুঃখকর হলে পরে সবে।
নোড়া দিয়ে সব দাঁত কে ভেঙেছে কবে?
নানা পাপে পাপী নানা দণ্ড তার লবে।
এ বোলে কি হিন্দু মাত্রে দোষী হয়ে রবে?
বিশেষ বাঙ্গালী জেতো আমরা সবাই।
কোনকালে কোনরূপ দোষমাত্র নাই॥
রাজভক্ত অনুরক্ত সমান সকলে।
চরিতার্থ হই সদা রাজার মঙ্গলে॥
গবর্ণরে কহিতেছ কেমন করিয়া।
থাকুন হিঁদুর শিরে খাঁড়া ওঁচাইয়া?
হায় হায় কার কাছে করিব রোদন!
তোমাদের এ কথা কি কথার মতন?
বল আছে বোলে লও ইচ্ছা যে প্রকার।
সে বলে না হেন কথা ধর্ম্মবল যার॥
যাঁরা হন সুবিচারী ধর্ম্মপরায়ণ।
তাঁরা কি অন্যায় কথা করেন শ্রবণ?
জয় হোক্ ব্রিটিসের ব্রিটিসের জয়।
রাজ-অনুগত যারা তাদের কি ভয়?

বাজী।

ভারতের অধীশ্বরী মাতা মহারাজী।
আহ্লাদ প্রকাশ হেতু আতোষের বাজী॥
ব্যাপিল পৃথিবীময় শুভ সমাচার।
ঘোরতর ধূমধাম ধূমের ব্যাপার॥
বাজী দেখে সুখী হব ভাবিয়া অন্তরে।
জলে স্থলে কত লোক আইল নগরে॥
ছোট, বড়, কত লোক মাঠের দুধারি।
কিলিবিলি করে যেন পিপীড়ার সারি॥
ঘাড় তুলে চাড় দিয়ে নাহি যায় নোয়া।
যেদিকেতে দৃষ্টি করে সে দিকেই ধোঁয়া॥
দড়ী আর দরমার প্রাণ হলো হত।
ঝাড়ে বংশে পুড়িয়াছে বংশ শত শত॥
ছাঁচুনি হইল ভাল যেমন কাঁচুনি।
তোপের নিদান মাত্র কোপের গাচুনী॥

জে আর পিয়ারসন বাজীর অধ্যক্ষ।
সাবাস্ সাবাস্ তুমি কাজে খুব দক্ষ॥
এ যে বাজী টাকাবাজী বাজী বড় জোর।
বাজী কি বাজী হয়া বাজী হয়া ভোর॥
দেখিয়া অবাক হয়ে সকলেই আছে।
কোথায় দিল্লীর লাড়ু এ বাজীর কাছে ?
যে খেয়েছে তার তার সেই জানে জানি।
আমরা তো খাই নাই তথাচ পস্তানি॥
রাজপদে অভিষিক্ত বিলাতের নর।
জ্যাকেট কামিজপরা শ্বেতকলেবর॥
যা কয় তা শোভা পায় সাহেব বলিয়া।
'বেলাক নেটীব' যত মরিছে জ্বলিয়া॥
যে বাজী করেছ তার উপময় ত নাই।
মানিলাম পবিহারু বলিহারি যাই॥
দেখিতে কেমন মজা হইলে বাঙ্গালী।
খোতামুখ ভোঁতা হতো খেয়ে করতালি॥

ডুয়েল সংগ্রাম।

বিলাতী সভ্যতা তোরে বলি হারি যাই।
এমন অপূর্ব্ব রীতি আর কোথা নাই॥
হাসি খুসী রঙ্গ-রস অশেষ প্রকার।
ক্ষণপরে সেই ভাব নাহি থাকে আর॥
নিজ গুণ লয়ে সদা বিশেষ বড়াই।
কথায় কথায় হয় ডুয়েল লড়াই॥
মরিতে মারিতে পটু ভাব ভয়ঙ্কর।
কিছুমাত্র দয়া নাই প্রাণের উপর॥
প্রথমে প্রথমে গুণে ধরা দেখে সরা।
একাকী পঞ্চম নয় ছয়খানি ভরা॥
তিন কাণা আগে কিন্তু পঞ্জুড়ীর জোর।
ছকুড়ি ফেলিয়া শেষ বাজী করে ভোর॥
পথে রথে গুঁতাগুঁতি জুতাজুতি হয়।
স্বভাবের ধর্ম্ম সেটা দোষ বড় নয়॥
এ কেমন দোষ বল এ কেমন দোষ।
সাপের স্বধর্ম্ম বটে, নাহি ছাড়ে ফোঁস॥

প্রথমেতে মাতামাতি কথার কৌশলে।
হাতাহাতি লাথালাথি বিচারের স্থলে॥
ভিতর বাহিরে লাল কিছু নয় কালো।
লালে লালে লাল করে শোভা পায় ভালো॥

হিন্দু কলেজ।

নগরে অনেককেলে হিন্দুর কালেজ।
গেল তার হিন্দু, নাম ঘুচিয়াছে তেজ॥
মদকের মণ্ডা নাই পড়িয়াছে মেজ্।
জাতি গিয়া একেবারে হয়ে গেল হেজ্॥
এর পরে মিশনরী রেতে জ্বেলে সেজ।
খুলিবেন 'থিয়েটরে' বাইবেলের পেজ॥
কাজ নাই নিয়ে আর ইংলিস নালেজ।
কালেজের নাম হলো খিচুড়ি কালেজ॥

ব্যোমযান।

উড়িয়াছে আকাশেতে সুচারু ফানস।
তাহাতে মানুষ বসে প্রফুল্লমানস॥
সাবাস সাহস তার কিছু নাই ভয়।
যত উঠে তত মনে সুখের উদয়॥
নগরের লোক যত করে হই হই।
দেখি যত আমি তত কত সুখী হই॥
নয়ন নিমেষহীন একদৃষ্টে রই।
হেঁট হয়ে নাহি দেখি ক্ষণকাল বই॥
কেহ বলে দেখিতেছি ওই ওই ওই।
কেহ বলে ওই বটে কেহ বলে কই ?
কেহ বলে দেখা যাবে এইখানে রই।
কেহ বলে এতক্ষণে হলো চাঁদসই॥
হেলে দুলে নেচে নেচে চলে থরে থরে।
মহাবেগে চড়িয়াছে মেঘের উপরে॥
নিরখি নীরদ তারে হয়ে হৃষ্টমন।
পুনঃ পুনঃ প্রেমভরে দেয় আলিঙ্গন॥

ভূলোক পুলকপূর্ণ আলোক ঈক্ষণে।
ত্রিলোক করিছে জয় গোলক গমনে॥
ভাবুকেরা ভাবে ভাবে এই অভিপ্রায়।
চলিয়াছে দেবরাজ ইন্দ্রের সভায়॥
পাপময় নরলোকে নাহি অভিলাষ।
সুখেতে করিবে গিয়ে স্বর্গধামে বাস॥
কেহ বলে ধরাতলে নিদাঘের ভয়ে।
বিহার করিবে গিয়া নীহারনিলয়ে॥
মানব আসিছে উড়ে শূন্যের উপর।
পতঙ্গ পতঙ্গ সম অঙ্গ থর থর॥
দ্বিজরাজ পায় লাজ দিলে মুখঢাকা।
দ্বিজরাজ ভয় পেয়ে গুড়াইল পাখা॥
কেহ বলে দেখেছি আকাশ ঘুরে ঘুরে।
এ ভববৃক্ষের মূল আছে কত দূরে॥
অনুমান করি পুন যুক্তি সহকারে।
উঠিয়াছে ফাঁদ লয়ে চাঁদ ধরিবারে॥
একেবারে এড়াইবে সংসারের ক্ষুধা।
পেটভোরে খাবে গিয়া সুবিমল সুধা॥
চন্দ্রলোকে মৃগয়া করিয়া এইবার।
পোষা মৃগ কেড়ে লবে কোল থেকে তাঁর॥
অকলঙ্ক হবে শশী হারাইয়া শশ।
ভাল রে গগনগামী ভাল তোর যশ॥
আরবার ভাবি যত আকাশের তারা।
তারা নয় তারা হয় তারানাথ দারা॥
বিনোদ বিমানে বসি বিশেষ বিরলে।
সেই তারা হার করি পরিতেছে গলে॥
নবীন নায়ক পেয়ে সুখী সব তারা।
পুরান নাগরচাঁদ নাহি চায় তারা॥
তারাহারা তারাপতি পেয়ে অতি দুখ।
লাজে তাই গগনেতে লুকায়েছে মুখ॥
লোকে কয় কুহূনিশি মাখিয়াছে মসি।
তাহা নয় খেদে অস্ত অনুদিত শশী॥
যদি বল এ প্রকার হইলে ঘটন।
পুনরায় হবে কেন ভূতলে পতন?
শুন সার বলি তার বিবরণ মূল।
চাঁদের অমৃত খায় চকোরের কুল॥
ঘেরিয়াছে আশপাশ স্থিরপক্ষ ধোরে।
রাখিয়াছে সুধাকর একচেটে কোরে॥
তারা দেখে কি প্রমাদ আমরাই পাখা।
চাঁদের চকোর নাম চন্দ্রকোলে থাকি॥
রাত্রি-দিন সমভাবে রয়েছি টাইট।
এ আবার কোথা হতে আইল কাইট।
বিনা সূত্রে উড়িয়াছে কেমন "কাইট।"
পাখা নাই শূন্যে এসে কেমন "কাইট"॥
নাহি বলে বলে চলে কলের "কাইট"।
মর্ত্ত্যলোকে শব্দ করে "কাইট কাইট"॥
ঘোর ক্রুদ্ধে এসে,ঊর্দ্ধে যুদ্ধের সাইট।
হরিয়া লইবে শশী করিয়া ফাইট॥
মনে এই ভাবিয়াছে হইলে "নাইট"।
কেড়ে লবে আমাদের চাঁদের রাইট॥
চঞ্চল চকোরচয় চঞ্চুর আঘাতে।
"কাইট বাইট করি দিলে অধঃপাতে॥
খোঁচা খেয়ে ধূম গেল ধূম কিসে আর।
পুনর্ব্বার এসে করে ধরায় বিহার॥
কেহ বলে আছে এই শাস্ত্রের বচন।
অতি উচ্চে উঠিলেই পশ্চাতে পতন॥

বিজ্ঞান-বিদ্যা।

বিচিত্র বিজ্ঞান-বিদ্যা অতি শুভকরী।
যার বলে জলে বলে কলে চলে তরী॥
না মানে উজান ভাঁটি নাহি কোন দায়।
বায়ুবৎ গতি করি অতি বেগে যায়॥
দেখ তায় মানবের কত উপকার।
কত মতে হইতেছে আশার সুসার॥

অনায়াসে অপার সাগর হয়ে পার।
ব্যাপারী বাণিজ্যে কত করিছে ব্যাপার॥
পাইতেছি কত দ্রব্য প্রয়োজন মত।
কত কত দেশে যায় লোক শত শত॥
নূতন নূতন দেখে কুশল অশেষ।
স্বদেশ বিদেশ আর না হয় বিশেষ॥
জাহাজ কেবল নয় কত দেখ আর।
বস্ত্র অস্ত্র যন্ত্র আদি অশেষ প্রকার॥
সব দিকে বল তার কল যায় চলে।
জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ যত ছাপা হয় কলে॥
এই কলে কোন কিছু থাকে না অভাবে।
এ কলের সৃষ্টি শুধু জ্ঞানের প্রভাবে॥
বিদ্যাবলে বুদ্ধিবলে যাহা করে কারু।
গুণময় সমুদয় অতিশয় চারু॥
দেখনা বিলাতে গিয়া জলের ভিতর।
কিরূপ করেছে এক সেতু মনোহর॥
উপরে জাহাজ চলে নীচে চলে নর।
অপরূপ আর কিবা আছে এর পর?
বুদ্ধিবলে জানকীর উদ্ধারের হেতু।
সাগরের জলে রাম বাঁধিলেন সেতু॥
স্বভাবে সম্ভব সব বিস্তার কৃপায়।
বিনোদ-বিমানে চোড়ে শূন্যপথে যায়॥
দেব বোলে জ্ঞান হয় মানুষের কাজে।
চরে খেচর দেখে পাখী মরে লাজে॥
মানস নামেতে এক বিমান করিয়া।
দেখিতেছে কত শোভা আকাশে উড়িয়া॥
ইন্দ্রজিৎ নামে ছিল রাবণ-নন্দন।
ঘূরিয়া আকাশ-পথে সে করিত রণ॥
দেখ কি সুন্দর কল ঘড়ীর ভিতর।
সংসার-চক্রের ন্যায় চলে নিরন্তর॥

তাড়িদ্বার্ত্তাবহ।

"ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ" কিরূপ প্রকার।
বচনে যাহার গুণ না হয় প্রচার॥
ভূমিতলে জলে ডালে যুক্ত আছে তার।
কলে জলে আসে যায় যত সমাচার॥
ছয়মাসের পথে যাহা হতেছে ঘটনা।
এখনি এখানে তাহা হইবে রটনা॥
হায় কিবা মানুষের কৌশলের কাজ।
দেখে অতি খরগতি লাজ পায় বাজ॥
গগনে চপলাময় চমকে যেরূপ।
তুলনায় এর গতি তার অনুরূপ॥
প্রথমেতে এই বিদ্যা যে করে প্রকাশ।
কোথা গেলে দেখা পাব হব তার দাস॥
কুশলের এই কীর্ত্তি করিলেন যিনি।
সামান্য মানব নন দেবলোক তিনি॥

কলের গাড়ী।

কি আশ্চর্য্য রেলরোড দেখ দেখ সবে।
ভারতে ভারতী তার কে শুনেছ কবে?
এ ব্যাপার যে প্রকার কব কার কাছে।
ভারতে কি ছিল ইহা ভারতে কি আছে.
কলেতে চলেছে গাড়ী নাম বাষ্পরথ।
ছয় দণ্ডে চোলে যায় ছদিনের পথ॥
চমৎকার দেখি আঁখি মেলিতে মেলিতে।
কতদূর পড়ে গিয়া দেখিতে দেখিতে॥
বসিয়া দাঁড়ায়ে চল পদ থাকে স্থির।
এত দ্রুত চলে তবু টলে না শরীর॥
এই আছি কলিকাতা এই বর্দ্ধমান।
এই এসে মানকরে হই অধিষ্ঠান॥
মানকর ছেড়ে দিয়ে তখনি তখনি।
রাণীগঞ্জে এসে দেখি কয়লার খনি॥
কিছু দিন পরে পাব আনন্দ অপার।
বাসি হয়ে কাশীবাসী হবোনাকো আর॥
বিকালেতে বারাণসে কোরে খুব ধুম।
রেতে রেতে বাড়ী এসে সুখে দিব ঘুম॥
দিল্লী যাব আগ্রা যাব যাব কত দেশ।
লাহোরে শীকের দেশে করিব প্রবেশ॥

জ্বলিবে মনের ঘরে আহ্লাদের আলো।
একে একে দেখা যাবে যেখানে যা ভালো॥
নব নব বিলোকনে ঘুচিবে বিলাপ।
সকলের সহ হবে সুখের আলাপ॥
কে প্রবাসী কে নিবাসী রবে না প্রভেদ।
পরস্পর আলাপনে দূর হবে খেদ॥
যাত্রিদের হবে কত তীর্থ দরশন।
ভ্রামকের নানা দেশ হইবে ভ্রমণ॥
ছাত্রের হইবে নানা ভাষায় চালনা।
যেখানে সেখানে হবে বিদ্যার সাধনা॥
বণিকের বাণিজ্যের বিশেষ কুশল।
সহজেই হবে সব মানস সফল॥
এ দেশ ও দেশ হবে সমুদয় হাতে।
সুলভ হইবে তাহা প্রয়োজন যাতে॥
কোনরূপ সাধ্য আর রবেনাকো আটকা।
কাবেলের মেয়া যত খেতে পাবে টাটকা॥
হিন্দু হয়ে কাশী-মৃত্যু ইচ্ছা আছে যার।
সদ্য গিয়া করিবেন উপায় তাহার॥
যা ভাবিব তা করিব হবে যোগাযোগ।
স্বপ্ন-সুখ ভোগ সম, সুখের সম্ভোগ॥
এ বিচিত্র বাষ্প-রথে যে জন চড়েছে।
সবিশেষ গুণ তার সে জন জেনেছে॥
পাখীর পাখায় বল কত বল আছে।
দেখিয়া কলের গাড়ী হারি মানিয়াছে॥
যে দেখেছে সেই মরে ভাবিয়া ভাবিয়া।
করেছে এরূপ কল কিরূপ করিয়া?
দূরবাসী আছে সব অবাক হইয়া।
যে শুনিছে সে বলিছে দেবতার ক্রিয়া॥
এমন অপূর্ব্ব কভু দেখি নাই আগে।
মোহিত হয়েছে মন নব অনুরাগে॥
পুরাণেতে লেখা আছে নলের ব্যাপার।
অতি অপরূপ গতি ছিল নাকি তাঁর॥
চোখে কিছু দেখি নাই শুনি শুধু কাণে।
সম্ভব হইতে পারে এ সব প্রমাণে॥
নব পথ নব রথ, এই সৃষ্টি যার।
কৃপা করি লোন তিনি প্রণাম আমার॥

ঘড়ী।

স্থির-চোখে ধীরমনে যে দেখিবে ঘড়ী।
সে বলিবে অবিকল ঈশ্বরের ঘড়ী॥
এক কলে ঠিক চলে বিরূপ না হয়।
প্রতিক্ষণে করিতেছে কালের নির্ণয়॥
এক দুই ঠুন্ ঠুন্ ধ্বনি যাহা হয়।
কাল-পরিচয় সে যে কালপরিচয়॥
এক দুই তিন করি একে আসে ফিরে।
এক দুই তিন করি ফিরে যায় ফিরে॥
প্রাণীর সহিত ঠিক তুলনা তাহার।
বিকল হইলে কাঁটা চলেনাকো আর।
গুণে জ্ঞানে যে করেছে ঘটিকার সৃজন।
কখনই নহে সেই লোক সাধারণ॥
কোথায় আছেন তিনি ভূলোক ছাড়িয়া।
উদ্দেশে প্রণাম করি দেবতা বলিয়া॥

সৌহার্দ্দ।

অমিয়া ছানিয়া বুঝি রসময় বিধি।
নিরমিল অপরূপ প্রেমরূপ নিধি॥
সেই নিধি-নিলয়ে খেলয়ে এক মীন।
অপাঙ্গ ভঙ্গিমভরে রহে রাত্রি দিন॥
বন্ধুত্ব নামেতে যাহে কহে কবিগণ।
অখণ্ড আনন্দ যাহে লভে ত্রিভুবন॥
এমন সুখের রস, আর বুঝি নাই।
মধুর বন্ধুত্ব-গুণে বলিহারি যাই॥
অসার সংসারে সার বন্ধুর প্রণয়।
যাহাতে সরল করে পাষাণ হৃদয়॥
পশুর চরিত্র ফেরে মিত্রতার বশে।
রসভরা নানা কার্য্য এই প্রেমরসে॥
সুগ্রীবে বলিয়া মিতা রাম রঘুবর।
দশগ্রীবে বধিলেন ধরি ধনুঃশর॥

হরষিত জানকী কানকী লতা পাই।
মধুর বন্ধুত্ব-গুণে বলিহারি যাই॥
ভারতে এ রস কিবা রচে দ্বৈপায়ন।
মধুর বন্ধুত্ব-গুণে সিক্ত নারায়ণ॥
পাইয়া করুণারূপ ক্ষীরোদের ক্ষীর।
পৃথিবীরে জয় করে ধনঞ্জয় বীর॥
করিতে বন্ধুর তুষ্টি সেই ভগবান্।
সহোদরা সুভদ্রায় করিলেন দান॥
ভারত-সুরত-সুধা স্মরহ সবাই।
মধুর বন্ধুত্ব-গুণে বলিহারি যাই॥
ভাগবত ভাগে ভাগে এ রস রচনা।
গোকুলে গোপালকুল সহিত সূচনা॥
প্রেমানন্দে চল চল রাখাল সাজিয়া।
সুরভি সহস্র সহ বাঁশী বাজাইয়া॥
বিপদে বাঁচায় ব্রজ ধরি গোবর্দ্ধন।
কালিন্দীর কালীদহে কালীয়দমন॥
কতবার গোপকুল বাঁচায় কানাই।
মধুর বন্ধুত্ব-গুণে বলিহারি যাই॥
এই রসে পরিপূর্ণ নানা ইতিহাস।
পুরাণ পুরাণ শাস্ত্রে সদা সুপ্রকাশ॥
ততদিন বন্ধুদের রাজ্যনিরূপণ।
যতদিন বন্ধুভাবে ছিল রাজগণ॥
পরস্পর দ্বেষাদ্বেষে নষ্ট করে দেশ।
জয়চন্দ্রে পৃথুরাজে মজায় বিশেষ॥
শাত্রবতা-মুখে দিই কালী চূণ ছাই।
মধুর বন্ধুত্ব-গুণে বলিহারি যাই॥
দুর্লভ নাহিক কিছু ভুবন-ভিতর।
অতি হীন দীন হয় রাজ্যের ঈশ্বর॥
নবাব নাজীম হয় বাঁদীরনন্দন।
পাত্র-পুত্র প্রাপ্ত হয় রাজসিংহাসন!
ভাট কভু মহামান্য পত্র-সম্পাদনে।
সকলি সুলভ হয় মনুষ্য-সাধনে॥
সব মিলে কিন্তু সে বন্ধুত্ব কোথা পাই?
মধুর বন্ধুত্ব গুণে বলিহারি যাই॥

ধনেতে না মিলে বন্ধু এমন কি আছে।
দশানন আনে মর্ত্যে পারিজাত গাছে॥
ধনেতে তাজের রোজা হইল সৃজন।
ধনে হিন্দুকন্যা প্রাপ্ত হইল যবন॥
ধনলোভে ধর্ম্মত্যক্ত হিন্দুর সন্তান।
ধনে শূদ্র হয় ক্ষত্রী পণ্ডিত-বিধান॥
কিন্তু ধনে বন্ধুরত্ন নাহি মিলে ভাই।
মধুর বন্ধুত্ব-গুণে বলি হারি যাই।
বাহুবলে পরাক্রান্ত হয় কত জন।
রণজিৎ রণজয়ী আছে নিদর্শন॥
বিক্রমে বিক্রমাদিত্য হলো নরবর।
চন্দ্রগুপ্ত কোরী হলো মগধ-ঈশ্বর॥
এইরূপে বাহুবলে কত শক্ত জন।
অনায়াসে লব্ধ করে মানসের পণ॥
কিন্তু নাহি মিলে বন্ধু মনে ভাবি তাই।
মধুর বন্ধুত্ব-গুণে বলিহারি যাই॥
তপোবলে দশানন শাসিল ভুবন
তপোবলে বিশ্বামিত্র হইল ব্রাহ্মণ॥
হরিশ্চন্দ্র নামে ছিল এক নৃপবর।
তপোবলে হইল সে অজর অমর॥
কিন্তু বল তপোবলে কোন্ মহাশয়।
পাইলেন প্রিয়তম বন্ধু সদাশয়?
বিনা বন্ধু সব পাই তপস্যার ঠাঁই।
মধুর বন্ধুত্ব-গুণে বলি হারি যাই॥
পেয়েছি বান্ধব এক অমূল্য অতুল্য।
কৈবল্যের সুখ পাই তার আনুকূল্য॥
চমৎকার ভাব তার কটুতা অভাব।
সে জেনেছে ভাব তার যে করেছে ভাব॥
সরল স্বভাবে তার হৃদয় গঠন।
শুভক্ষণে তার সহ হইল ঘটন॥
তাহারে পাইলে আর কিছুই না চাই
মধুর বন্ধুত্বগুণে বলিহারি যাই॥
হেরিলে তাহার মুখ দুঃখ পরিহরি।
শুনিলে তাহার নাম আনন্দে শিহরি॥

প্রেম-অনুরাগী নাম বিখ্যাত নগরে।
সতত সাঁতার দেয় সজ্জন-সাগরে॥
নয়ননীরজে তার মাধুর্য্যের বাসা।
মানস সে রস-পানে সদা করে আশা॥
না ভাঙ্গে পিপাসা তার সদা বলে খাই॥
মধুর বন্ধুত্বগুণে বলি হারি যাই॥
যাহায় অন্তর শাদা জিনিয়া জীবন।
সকলে সমান ভাব সদা শুদ্ধ মন॥
হৃদয়ে শোভয়ে যার দয়া-হেম-হার।
পর-দুঃখে অশ্রু মুক্ত চক্ষে অনিবার॥
পরের সুখেতে যার সুখী হয় মন।
তাহারে মিলয়ে এই বান্ধব-রতন॥
অন্তরে আনন্দ যেন নন্দের বাধাই।
মধুর বন্ধুত্বগুণে বলি হারি যাই॥

ভারতমাতার দুরবস্থা।

ভারতের দশা হেরি বিদরে হৃদয়।
জননী-দুর্ভাগ্যে যথা তাপিত তনয়॥
মনে হলে প্রাচীন সুখের সুসময়।
অসম্ভব বলি কভু প্রত্যয় না হয়॥
রিপুরূপে বিজাতীয় রাজা রাহু আসি।
সুখরূপ শশধরে আহারিল গ্রাসি॥
বেদরূপ সুধাভাণ্ড লয় হলো ক্রমে।
মানুষ মানসফল মোহ আর ভ্রমে॥
ললিত মালতী লতা ভারতের ভাষা।
কটুতা-কীটের যাহে নিতি মিলে বাসা॥
কবিতা-কুসুম-কলি ফুটেছিল কত।
সাহিত্য-স্বরূপ মধু পূর্ণ অবিরত॥
অলঙ্কার পত্রপুঞ্জ লালিত্য পরাগ।
বর্ণরূপ বর্ণ তার সুবিচিত্র রাগ॥
শাস্ত্ররূপ ফল এক ধরেছিল তায়।
ভক্ষণেতে চতুর্ব্বর্গ ফল যাহে পায়॥
বেদবিধি রসভার অপরূপ তান।
ক্ষুধা তৃষ্ণা হত তার যেই করে পান॥

অগ্নিহোত্র আদি নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া?
কোথা ক্ষুধা কোথা তৃষ্ণা, এ সব আশ্রিয়া?
বিজ্ঞান-স্বরূপ বীজ ছিল সেই ফলে।
অসংখ্য-লতিকা যাহে জন্মিত বিরলে॥
এমন সুখের লতা আশ্রয় বিহনে।
দিন দিন ম্রিয়মাণা দুঃখের কাননে॥
হায় হায় সত্যাশ্রয়ী মনুষ্য কোথায়?
অসত্য হইল সত্য মিথ্যার প্রভায়॥
অবিদ্যায় অবসন্ন মানবের মন।
অবিবেকী অবিনয়ী আদরভাজন॥
প্রসন্নতা- প্রবাহ প্রণয় সাধুজনে।
প্রবোধ-প্রভব কভু নাহি হয় মনে॥
প্রদীপের দীপ্তিরূপ প্রপঞ্চ আমোদে।
মুগ্ধ মন-মধুকর, প্রমাদ-প্রমোদে॥
প্রত্যয় প্রবল অতি প্রসক্তি প্রসঙ্গ।
প্রশ্রয় পাইয়া সদা দগ্ধ করে অঙ্গ॥
রাগে অনুরাগ হত রোষাল রসনা।
নয়নে নয়ন করে আগুনের কণা॥
গরল-মিশ্রিত তাহে মুখের বচন।
ক্ষমা শান্তি আদি হয় যাহাতে নিধন॥
কটাক্ষের শরে করে সকলে অস্থির।
প্রচণ্ড সমীর যেন সরোবর-নীর॥
লোলিত হয়েছে পুন লোভরূপ ফাঁস।
পরায় মনের-গলে বাসনা-বাতাস॥
পরদার পরধন হরণে ব্যাকুল।
বিহ্বল লালসা মদে সদা স্থূলে ভুল॥
মোহ-মেঘ করে আছে বিবেক আচ্ছন্ন।
চেতনা-চন্দ্রিমা যাহে গুপ্ত প্রতিপন্ন॥
দারাসুত সহ সমাবেশ সর্ব্বক্ষণ॥
চিত্তের কমলে মায়া হয় সঞ্চারণ॥
মদেতে প্রমত্ত মন বিপদ ঘটায়।
পরের সম্পদে সদা কাতর করায়॥
ঈর্ষা হিংসা দ্বেষ মদে পূর্ণ এই দেশ।
সকলে সমান নাই ইতর-বিশেষ॥

গরিমা-গরল্লে গেল গুণের গৌরব।
আপনি কৈবল্যধাম অপর রৌরব॥
এইরূপ ষড়রিপু নিবারিত নহে।
সোণার ভারতভূমি ভস্ম করি দহে॥
যত লোক অলসে অবশ কলেবর।
দরিদ্র পরের ছিদ্র সন্ধানে তৎপর॥
নাহি মাত্র ঐক্য সখ্য ভাবের সঞ্চার।
হীন ধর্ম্ম কর্ম্ম মর্ম্ম গুপ্ত সবাকার॥
কুকর্ম্মেতে শূন্য হয় ধনের ভাণ্ডার।
সুকর্ম্মে মুদিত হস্ত কমল আকার॥
কোনমতে বুদ্ধি যাহে হয় স্বীয় গর্ব্ব।
করেন বিবিধ পর্ব্ব শ্রাদ্ধ আদি সর্ব্ব
কিরূপ পাতক-বৃদ্ধি উৎসবের দিনে।
লিখিতে লেখনী যায় লজ্জার অধীনে॥
হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা হেতু যে হয় উদ্‌যোগ।
বালির সেতুর প্রায় সেই কর্ম্মভোগ॥
ধর্ম্মরক্ষা হেতু এক বিদ্যালয় আছে।
কত দিন প্রদেশ অস্থির হইয়াছে॥
অবশেষ ধনাভাবে হলো ছায়াবাজী।
বিপক্ষে দিতেছে গালি বলি ছুঁছোপাজী॥
ধর্ম্ম-সভাপতি সবে ধর্ম্ম-অধিকারী।
কি কর্ম্ম করিছে যত উত্তরাধিকারী॥
পিতা পৌত্তলিক পুত্র একেশ্বরবাদী।
নাম মাত্র মতাক্রান্ত সর্ব্বধর্ম্মবাদী॥
হিন্দু নাম ইহাদের হয়েছে কেমন।
নামেতে বিহঙ্গ মাত্র মরাল যেমন॥
ইহারা করেন ঘৃণা খৃষ্টীয়ানগণে।
কোকিল দোষেন যেন কাকের বরণে॥
এরূপেতে পুণ্যভূমি হলো ছারখার।
বিভুর করুণা বিনা রক্ষা নাহি আর॥
ভারতের দশা হেরি বিদরে হৃদয়।
জননী-দুর্ভাগ্যে যথা তাপিত তনয়॥

কবি ও কবিতা।

পান করি কবিতার সুরস মধুর।
শোক তাপ যত আছে সব হয় দূর॥
কবিতা অমৃত-ফলে যে না নিলে তার।
অধিক কি কব ধিক্ বৃথা জন্ম তার॥
হও তুমি সুপণ্ডিত বিদ্যার সাগর।
গন্থ লিখে বাধ্য করি হও প্রিয়বর॥
কবিতার প্রতি যদি প্রেম নাহি ধর।
কবির কবিতা-গুণ ব্যাখ্যা নাহি কর॥
কি রস নীরস তুমি, বিরস বিকট।
কিসে তুমি যশ পাবে, গুণীব নিকট?
কবিতার প্রেমে যদি, না হও প্রেমিক।
কোথা তব রসবোধ, কিসের রসিক?
কাকের ডাকের ন্যায়, কর্কশ কুভাষ।
তাহে তুমি কত গুণ, করিবে প্রকাশ?
ভাব রস প্রেম আছে, কোথায় তোমার?
কার বলে কর তুমি, পুস্তক প্রচার?
কবিগণ মহাজন, নাহি রাখে ধার।
ব্যয় করে পুঁজি পাটা, শুধু আপনার॥
তোমার কি আছে পুঁজি? সকলেরি ধারো।
ধার করা ভাব লয়ে, যা করিতে পারো॥
ধেরো হয়ে হেরো হলে, মুখে বল জিত।
জানিতে না পায় কিছু, কারে বলে হিত॥
যদি জানি নানা রূপ, নিধির নিধান।
সাগরের লোণা জল তবে করি পান॥
সাগর ডাগর নাম, বিহীন রতন।
এমন সাগরে আমি, করিনে যতন॥
কবিতা অমৃতসিন্ধু, ভাব যার ঢেউ।
এ সাগরে প্রেম জল, নাহি খায় কেউ॥
মনের এ খেদ কারে করিব প্রকাশ?
হায় হায়! এই দুঃখ কে করিবে নাশ?
কেহ আর নাহি চায় মধুর সুরস।
কাঠেতে কামড় মেরে গান করে যশ॥

মিছা বাক্ আড়ম্বর নাহি আনিবল।
কার বলে বল করে কি আছে সবল ?
কবির মনের মাঝে অক্ষয় ভাণ্ডার।
কিছুতেই কোন কালে ক্ষয় নাই তার ॥
সাগরেতে যত ঢেউ হতেছে উদ্ভব।
কবির ভাবের কাছে তারা পরাভব ॥
এক যায় আর হয় ক্রমেই উদয়।
নিয়ত লহরী খেলে বিশ্রাম না হয় ॥
সীমার ভিতরে আছে সমুদ্রের নীর।
এ সাগরে কত জল কিছু নাহি স্থির ॥
সে সাগর শুকাইয়া কত দ্বীপ হয়।
এ সাগর কোন কালে শুকাবার নয় ॥
সে সাগরে জোয়-ভাঁটা হ্রাস বৃদ্ধি ভাই।
ইথে নাই জোয় ভাঁটা সমান সদাই ॥
কূল নাই সীমা নাই তুফান না হয়।
নিরমল নিরাকার নীরাকার নয় ॥
সাগরে ডুবিলে পরে প্রাণে মরে জীব।
এ সাগরে যদি ডোবে জীব হয় শিব ॥
সে সাগরে ধরিয়াছে নাম রত্নাকর।
এ সাগরে ভোগ মোক্ষ ধনের আকর ॥
ঈশ্বরের এই সৃষ্টি নাম যার ভূত।
কবি যাহা সৃষ্টি করে, সে ভূত অদ্ভুত ॥
জগতের এক ভাব দেখ চরাচরে।
অভাবে স্বভাবে কবি, কত ভাব ধরে ॥
কতকেলে এই সৃষ্টি অতি পুরাতন।
কবি সব সৃষ্টি করে, নূতন নূতন ॥
সেই সৃষ্টি অনাসৃষ্টি, সৃষ্টিছাড়া ভাই।
কবি তাহা সৃষ্টি করে, সৃষ্টিতে যা নাই ॥
রূপক কি অপরূপ, আভাসে আভাসে।
স্বভাব প্রকাশে কত, স্বভাব প্রকাশে ॥
নগ, নদ, সরোবর, সাগর, কানন।
রূপকে করিছে কবি, সবার বর্ণন ॥
ঈশ্বরের সকল, সৃষ্টির বিপরীতে।
[illegible] কবিতায় রচনা করিতে ॥

কে বুঝিবে কবির, মনের যত আচ ?
গাছেরে মানুষ করে, মানুষেরে গাছ ॥
কত ভাবে ভাব তার, কতদিকে ছুটে।
সকলি করিতে পারে, মনে যাহা উঠে ॥
"কবিরেব প্রজাপতিঃ" শাস্ত্রে এই কয়।
তুলনায় রবি, কবি, সমরূপ হয় ॥
প্রকাশে করিছে রবি, জগৎ প্রকাশ।
বিভার বিভাগে হয়, তিমির বিনাশ ॥
ভাব, ভাষা, রস, প্রেম, প্রভাব প্রচুর।
মনের তিমির কবি, করিতেছে দূর ॥
বিভু করিলেন সৃষ্টি, ছয় রূপ রস।
তার মাঝে এক রস, পাইয়াছে যশ ॥
কবিকৃত রস নয়, মন্দ কিছু নয়।
নয়রূপ গুণে করে প্রমোদিত নয় ॥
রচনা করিবে কবি, যখন যে রস।
সরসে তখন হবে, সে রসের বশ ॥
গীত পদ আদি করি, কবিতা যে সব।
তুল নাই মূল নাই, অতুল বিভব ॥
শিব, বিধি, মনু, ব্যাস, শুক, পরাশর।
বশিষ্ঠ, বাল্মীকি আদি, কত কবিবর ॥
প্রণিপাত করি আমি, তাঁদের চরণে।
শুক বোলে সম্বোধন, প্রতি জনে জনে ॥
এ সব কবির গুণ, কর কর মনে।
তাহাদের কৃত শাস্ত্র, আনহ যতনে ॥
ফলেছে কি সুধাফল, কবিরূপ গাছে।
এমন মধুর আর, জগতে কি আছে ?
উপদেশ করিতেছে সকলের শিব।
কে বলে মরেছে তারা ? সবাই সজীব ॥
সকলের কিছু নয়, সমান স্বভাব।
যাহার যেমন ভাব তার তাই লাভ ॥
কবির করুণা-রসে, প্রবোধ-উদয়।
হইয়া জীবন-মুক্ত জীব শিব হয় ॥
এমন কবিতা-প্রেমে মুগ্ধ যেই নয়ে।
ভয়ানক পশু বোলে, তারে করি ভয় ॥

হায় হায় বিধাতার, ভ্রম দেখি হেন।
ল্যাজ, আর লোম তার, কেন নাই কেন ?
কবিতা-কমল-ফুলে, অলি নয় যারা।
জনপদে জনমাঝে, কেন থাকে তারা ?
মানুষের খাদ্য যত, তারা কেন পায় ?
বনে গিয়া পাতা, ঘাস, কেন নাহি খায় ?
বিধি কিছু রাগ তাঁর, মানুষের প্রতি।
যত কিছু রাগ তাঁর, মানুষের প্রতি ॥
খায় পরে সমুদয়, নরের মতন।
পশুবৎ চলে বলে, করে আচরণ ॥
গীত শুনে প্রেমাকুল, পশুকুল যত।
নরপশু যারা তারা, সেই প্রেমহত ॥
কাজে কাজে ভয় করি, পশুদের চেয়ে।
কাননে বৃক্ষক্ গিয়া, পাতা যায় খেয়ে ॥
মিছে কেন করি আর, লেখনী-ধারণ।
ফল নাই সে কথার, করি আন্দোলন ॥
সহজে মানস্নেহ, সুলভ তো নয়।
মানুষের সার সেই, পণ্ডিত যে হয় ॥
পণ্ডিতের সার সেই, কবি হয় যেই।
দৈবশক্তি আছে যার, মহাকবি সেই ॥
ভাবুক প্রেমিক হও, যুবক সকলে।
মধুকর হয়ে বোসো, কবিতা-কমলে ॥
সুখে খাও মধুরস, লও তার গুণ।
হয়ে প্রীত গাও গীত, কবি গুণ গুণ ॥
হৃদয়ে উদয় কর, অনুরাগ-রবি।
কবিতায় ভাব লও, নিজে হও কবি ॥
গদ্য হয়, পদ্য হয়, যাহা লয় মনে।
পরম প্রবন্ধ লেখ, বিশেষ যতনে ॥
আপনি লিখিতে শেখ, পার যে প্রকারে।
লেখাও শেখাও সবে, সাধ্য অনুসারে ॥
হাতে লেখা, মুখে বলা, দুই যেন চলে।
সমাজে বিখ্যাত হও, বক্তৃতার বলে ॥
চালনায় নাহি রবে আর কোন দুখ।
যত তুমি জ্ঞান পাবে, তত হবে সুখ ॥

সঙ্গীত-বিদ্যা।

"ন বিদ্যা সংগীতাৎ পরা" শাস্ত্রে এই কয়।
প্রেমময়ী বিদ্যা হেন, আর কিছু নয় ॥

কত রাগে কত রাগ,
রাগিণী সহিত।
ক্ষণমাত্রে ভোরে দেয়,
মানস মোহিত ॥

সময়ে যদ্যপি শুন সুললিত গীত।
কদম্ব-কুসুম অমু তনু পুলকিত ॥
গায়ক যদ্যপি গায় মন করি স্থির।
গলায় গলায় মন টলায় শরীর ॥
না করি ভোজনপান যায় তৃষ্ণা ক্ষুধা।
প্রতি বর্ণে বর্ণে কর্ণে ঢুকে যায় সুধা ॥
বীণা বেণু আদি যত সুমধুর স্বর।
সুরবে নীরবে থাকে কোকিল ভ্রমর ॥
সরাগে উঠিল তান সুধাময় রবে।
কাননের পশু পাখী প্রেমাকুল সবে ॥
রাগের সুরাগে রাগে বাড়ে অনুরাগ।
রাগ শুনে রাগ ছেড়ে সাধু হয় নাগ ॥
যদ্যপি শুনিতে পায় সুমধুর গান।
জননীর মাই ফেলে শিশু পাতে কাণ ॥
প্রেমে পরিপূর্ণ হয় পুলকিত মনে
ফুটিতে না পারে কিছু মুখের বচনে ॥
পশু পাখী সাপ আদি প্রাণী বহুতর।
সকলের সমভাবে সরস অন্তর ॥
মানবে বুঝিতে নারে সে ভাব-প্রভাব।
নিজ নিজ মনে রাখে নিজ নিজ ভাব ॥
কি ভাবে কি ভাবে তারা কে বুঝে সে ভাব
সে ভাব ভাবিলে হয় স্বভাবে অভাব ॥
প্রিয়তমা বিদ্যা নাই সংগীতের পর।
এ বিদ্যার সিদ্ধ হলো কত শত নর ॥
শুন শুন শুন জীব যদি চাও হিত।
প্রাণচিত হয়ে গাও ব্রহ্মের সংগীত ॥

জাল প্রতাপচাঁদ

বর্দ্ধমানরাজের গল্প।

LIBRARY
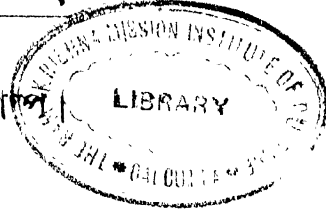
১। পূর্ব্বকথা।

প্রায় পঞ্চাশ-বৎসর হইতে চলিল, হুগ-
ে জালরাজার মোকর্দ্দমা হইয়া গিয়াছে।
ে সে প্রতাপচাঁদ নাই, সে পরাণ বাবু
, সে জজ নাই, সে মেজেষ্টর নাই, সে
ল্লা দারগা নাই, সে আসাদ আলি
ব নাই, সে মনসারাম সেরেস্তাদার নাই;
রাং এ পুরাতন কথা তুলিলে কাহারও
হইবার সম্ভাবনা নাই। দুই এক জন
ী অদ্যাপি জীবিত থাকিলে থাকিতে
বন. ভরসা করি, তাঁহারা আমাদের
শ্য বুঝিয়া ক্ষমা করিবেন।

আমাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক।
র গবর্ণমেণ্ট কিরূপ ছিল, বিচারপ্রণালী
রূপ ছিল, আর সে সময়ে আমাদের
গলীরা কিরূপ ছিলেন, তাহা দেখাইবার
মিত্ত আমরা জাল রাজার কথা আলোচনা
রিতে বসিযাছি। মোকর্দ্দমা-সম্বন্ধে যে
কল কাগজপত্র সেই সময় প্রচারিত হইয়া-
ল. আমরা তাহাই অবলম্বন করিয়া এই
বয়টী লিখিলাম। এই স্থলে বলিয়া রাখি
, লেখক নিজে সেই সময়ে হুগলীতে
লেন, তখন তাঁহার বয়স অল্প, কিন্তু এই
মোকর্দ্দমা লইয়া ঘরে ঘরে যেরূপ হুলস্থুল
ড়িয়া গিয়াছিল, তাহা তাঁহার স্মরণ আছে।

এ অঞ্চলের স্ত্রীলোকমাত্রেই জাল রাজার
ক্ষপাতিনী হইয়াছিল। তাহারা গঙ্গার
ঘাটে গিয়া, আপনার কথা ভুলিয়া, শিবপূজা
ভুলিযা কেবল প্রতাপচাঁদের কথা কহিত
ভিক্ষুকেরা কৃষ্ণগীত ছাড়িয়া কেবল প্রতাপ-
চাঁদের গীত গাইত, "প্রতাপচাঁদের জয় হউক"
বলিয়া তাহারা ভিক্ষা চাহিত। ভিক্ষুকদের
গীত বালকেরা শিখিয়া পথে ঘাটে দল বাঁধিয়া
নাচিয়া নাচিয়া গাইত। "পরাণ-বাবু হয়ে
কাবু হাবু-ডুবু খেতেছে", এই গীত যখন
তখন যেখানে সেখানে শুনা যাইত।

মূল কথা, এ অঞ্চলের কি স্ত্রী, কি পুরুষ
সকলেই জাল রাজার পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়া-
ছিল। মোকদ্দমার সময় হুগলীর চতুষ্পার্শ্বস্থ
দুই তিন ক্রোশের অন্যূন দশ হাজার লোক
নিত্য আসিয়া উপস্থিত হইত। জেলখানার
দ্বার হইতে কাছারী পর্য্যন্ত পথে ঠাসাঠাসি
করিয়া দাঁড়াইত। যাহারা পথে স্থান পাইত
না, তাহারা গাছে উঠিয়া ইসিয়া থাকিত।
যে দিকে চাও, সেই দিকেই লোক—লোকের
উপর লোক—পথে, গাছে, ছাদে। এত
মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর মধ্য দিয়া জাল রাজাকে পদ-
ব্রজে কাছারীতে পাঠাইতে জেলদারগার
সাহস হইত না; সুতরাং পাল্কী করিয়া শত
সিপাহী দ্বারা তাঁহাকে ঘেরাইয়া পাঠান
হইত। তাহাতে কেহ জাল রাজাকে দেখিতে
পাইত না, পাল্কীর ছাদ ভিন্ন আর কিছুই
দেখা যাইত না, লোকে তাহাতেই তৃপ্ত
হইত; নিঃশব্দে অতি গম্ভীরভাবে তাহারা

তাহাই দেখিত আর এক এক দিন এক-বাক্যে আকাশ পূরিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিত—"জয় হউক।" দশ সহস্র কণ্ঠধ্বনি একত্রে—সে গম্ভীর শব্দে যেন দশদিক্ শিহরিয়া উঠিত। বাঙ্গালী তখনও সজীব, তখনও দশ হাজার লোক এক জনের নিমিত্ত একত্র চীৎকার করিতে পারিত। পেনাল্ কোডের ভয়ে হউক, অথবা অন্য কারণে হউক এখন দশ জন লোকের কণ্ঠ একত্র স্ফূর্ত্তি পায় না। মানুষের নিমিত্ত একত্র চীৎকার আর শুনা যায় না, যাহা এখন শুনা যায়, তাহা শব-বাহকের চীৎকার —পথ হইতে লোক তাড়াইবার চীৎকার। এখন সে সকল কথা অনর্থক। যাহারা জাল রাজাকে দেখিবে বলিয়া পথে দাঁড়াইয়া থাকিত, তাহারা জাল রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আদালতে গিয়া গাছতলায় দাঁড়াইত; কে কে সাক্ষ্য দেয়, কে কি বলে, শুনিয়া যাইত, যে দিবস সাক্ষীরা প্রতাপচাঁদের পক্ষে কথা বলিত, সেই দিবস আর তাহাদের আহ্লাদের সীমা থাকিত না; সে দিন গঙ্গার বক্ষে শত শত নৌকা ছুটাছুটি করিত, ময়রার দোকানে খরিদ্দারের উপর খরিদ্দার ঝুঁকিত। ঘরে ঘরে সত্যনারায়ণের সিন্নি হইত। আর যে দিবস সাক্ষীরা বিপক্ষতা করিত, সেই দিবস লোকে একপ্রকার ক্ষিপ্ত-প্রায় হইত। সাক্ষীর প্রাণ রক্ষা করা ভার হইয়া উঠিত। এক দিন এক জন 'মেছুনি' কোন সম্ভ্রান্ত সাক্ষীর শিরে আঁইশ-চুবড়ি নিক্ষেপ করিয়াছিল।

প্রতাপচাঁদের দুর্গতি সকলের অন্তঃকরণ স্পর্শ করিয়াছিল। জাল প্রমাণের পূর্ব্বেই তাঁহার পীড়ন আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়াই হউক, অথবা তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্ব রটনা অনুরোধেই হউক, আবাল-বৃদ্ধ সকলেই জাল রাজার পক্ষ হইয়াছিল।

প্রতাপচাঁদের মৃত্যুর পর এই রটনা হইয়াছিল যে, তিনি কোন পাপিষ্ঠার কৌশলে পড়িয়া মহা পাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য চতুর্দ্দশ বৎসর অজ্ঞাত-বাস গিয়াছেন—প্রকাশ্যে গৃহত্যাগ করিলে ঃ বাস সিদ্ধ না হয়, তাই তিনি ক শব সাজিয়াছিলেন। এই র লোকে বিশ্বাস করিল; বিশ্বাসে ছিল। একে যুবা, তাহাতে আবা ঐশ্বর্য্যাদি সকল ছাড়িয়া প্রায়শি চলিলেন। একপ যাওয়াই বীরত্ব কথা শুনিয়া বাঙ্গালীর অন্তঃক একপ্রকার পবিত্র সুখের উদয় পবিত্র সুখ লোকে ত্যাগ করি না। সুতরাং সকলে এ রটনা বিশ্ব প্রতাপচাঁদের উপর লোকের বাড়িল, সকলেই ঘরে বসিয়া তাঁ কামনা করিতে লাগিল। "আহ ভালয় আবার ফিরিয়া আসুন," স্ত্রীলোকমাত্রেই করিল।

পনর বৎসর পরে এক জন বলিল, "আমি প্রতাপচাঁদ।" সকলের অন্তঃকরণ একেবারে উঠিল। সকলেই ভাবিল, তাঁহার কথাই ছিল। কিন্তু যখন লোকে প্রতাপচাঁদকে বর্দ্ধমান হইতে দিয়াছে, মেজেষ্টর তাঁহাকে কয়েদ ব তখন লোকের আর সহ্য হই এতটা গোলযোগ উপস্থিত হইয় সে সকল পরিচয় আনুপূর্ব্বিক প্রতাপচাঁদের পিতা মহারাজাধির চন্দ্র বাহাদুরের প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু দেওয়া আবশ্যক। কেন না, পরে যা য়াছে, অনেকটা সেই প্রকৃতির ফল একটী ঘটনা বলিলে তাঁহার প্রকৃতি অনুভূত হইতে পারিবে।

২। তেজচাঁদ বাহাদুর।

(বর্দ্ধমানের বুড়া রাজা)

প্রতিদিন প্রাতে দেওয়ান, মোহ ও অন্যান্য কর্ম্মচারীরা অন্দর-মহলের আসিয়া তেজচাঁদ বাহাদুরের বা

প্রতীক্ষা করিতেন; তিনি যথাসময়ে এক স্বর্ণপিঞ্জর হস্তে বহির্গত হইতেন। পিঞ্জরে কতকগুলি লাল নামা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী আবদ্ধ থাকিত, তিনি তাহাদের ক্রীড়া ও কোন্দল দেখিতে দেখিতে আসিতেন। সম্মুখবর্ত্তী হইবামাত্র তাঁহাকে সকলে অভিবাদন করিত; মহারাজও হাসিমুখে তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিতেন। একদিন প্রাতে তিনি পিঞ্জর-হস্তে অন্দরমহল হইতে বহির্গত হইতে-ছেন, এমন সময় একজন প্রধান কর্ম্ম-চারী অগ্রসর হইয়া যোড়করে নিবেদন করিল, "মহারাজ, হুগলীতে খাজানা দাখিল করিবার নিমিত্ত সে দিবস যে এক লক্ষ টাকা পাঠান হইয়াছিল, তাহা তথাকার মোক্তার আত্মসাৎ করিয়া পলাইয়াছে।" তেজচাঁদ বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন, "চুপ! হামরা লাল ঘবড়াওয়েগা!" এক লক্ষ টাকা গেল শুনিয়া তাঁহার কষ্ট হইল না, কিন্তু কথার শব্দে লালপক্ষী ভয় পাইবে, এই জন্যই তাঁহার কষ্ট হইল। এই মনে করিয়া কর্ম্মচারী বড় রাগ করিলেন, 'পাপিষ্ঠ মোক্তারকে সমস্ত টাকা উদ্গীরণ করাইব, নতুবা কর্ম্ম ত্যাগ করিব, এই সঙ্কল্প করিলেন।' মোক্তারের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। কিছু-দিনের পরে সংবাদ আসিল যে, মোক্তার গবর্ণমেন্ট বাটীতে বসিয়া পুষ্করিণী কাটাইতেছে, দান দিতেছে, আর যাহা মনে আসিতেছে, তাহাই করিতেছে। তাহাকে গ্রেপ্তার করি-বার জন্য রাজসরকার হইতে সিপাই ও হাওলদার বাহির হইল। কিন্তু রাজা তেজ-চাঁদ প্রথমে তাহা জানিতে পারেন নাই; কিছুদিন পরে শুনিয়াছিলেন। মোক্তার ধৃত হইয়া রাজবাটীতে আনীত হইলে, তেজচাঁদ বাহাদুর মোক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার এক লক্ষ টাকা চুরি করিয়াছ?"

মোক্তার। না মহারাজ, আমি চুরি করি নাই, আমি তাহা বাটীতে লইয়া গিয়াছি।

তেজচন্দ্র। কেন লইয়া গেলে?

মোক্তার। মহারাজের কার্য্যে ব্যয় করিব বলিয়া লইয়া গিয়াছি। আমাদের গ্রামে একটীও শিবমন্দির ছিল না, কুমারীরা শিব-মন্দিরে দীপদানের ফল পাইত না, যুবতীরা শিবপূজা করিতে পাইত না, এক্ষণে মহা-রাজের পুণ্যে তাহা পাইতেছে। আর একটী অতিথিশালা করিয়াছি, ক্ষুধার্ত্ত পথিকেরা এখন অন্ন পাইতেছে।

তেজচন্দ্র। তুমি কি সমুদায় টাকা ইহাতেই ব্যয় করিয়াছ?

মোক্তার। আজ্ঞা না মহারাজ! আমা-দের দেশে বড় জলকষ্ট ছিল, গোবৎসাদি দুই প্রহরের সময় একটু জল পাইত না। আমি মহারাজের টাকায় একটী বড় পুষ্করিণী কাটাইয়াছি। মহারাজের পুণ্যে তাহার জল কিরূপ আশ্চর্য্য পরিষ্কার ও সুস্বাদ হইয়াছে, তাহা সিপাহীদের জিজ্ঞাসা করুন।

তেজচন্দ্র। পুষ্করিণীটী প্রতিষ্ঠা করিয়াছ?

মোক্তার। আজ্ঞা না। টাকায় কুলায় নাই।

তেজচন্দ্র। এখন কত টাকা হইলে প্রতিষ্ঠা হয়?

মোক্তার। ন্যূনকল্পে আর দুই হাজার চাই।

তেজচন্দ্র। কিন্তু দেখ,—খবরদার! দুই হাজার টাকার এক পয়সা বেশী না লাগে, তাহা হইলে আর আমি দিব না।

তাহার পর পূর্ব্বকথিত কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া মহারাজ বলিলেন, "আমি ত মোক্তা-রের কোন দোষ দেখিতে পাইলাম না। মোক্তার যাহা করিয়াছে, তাহাতে আমার টাকা সার্থক হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আমি আর কি ভাল ব্যয় করিতাম?" কর্ম্মচারী নিরুত্তর হইল।

মহারাজ তেজচন্দ্রের মধ্যবয়সের একটা কথা বলি, তাহা হইলে তাঁহার চরিত্রের আর একদিক্ দৃষ্ট হইবে। তিনি একদিন দরিদ্র একটী বালিকাকে পথে খেলিতে দেখিলেন, বালিকা পরম সুন্দরী। মহারাজ তৎক্ষণাৎ তাহার পিতার সন্ধানে লোক পাঠাইলেন। লোক আসিয়া বলিল, "পিতার নাম কাশী-

নাথ, জগন্নাথদর্শনে যাইবে বলিয়া সপরিবারে লাহোর হইতে এখানে আসিয়াছে। জাতিতে ক্ষত্রিয়।” মহারাজের আর বিলম্ব সহিল না, দরিদ্রকে অর্থলোভ দেখাইয়া কন্যাটীকে বিবাহ করিলেন। তিনিই মহারাণী কমল-কুমারী।

সেই অবধি দরিদ্র কাশীনাথের অদৃষ্ট ফিরিল, পুত্র লইয়া তিনি বর্দ্ধমানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পুত্রটী বালক, তাহার নাম পরাণ,—তিনিই আমাদের এই গল্পের পরাণবাবু।

যেরূপ এক্ষণে বর্দ্ধমান-রাজগোষ্ঠী বাঙ্গালী বলিয়া গণ্য হইতে চাহেন না, পূর্ব্বরাজারা সেরূপ "এক-ঘরের" মত থাকিতেন না; আপনাদের বাঙ্গালা বলিয়া জানিতেন, বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতেন। এদেশী প্রধান ও ধনবানদের সঙ্গে আত্মীয়তা রাখিতেন। তেজচাঁদ বাহাদুর মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতেন এ অঞ্চলের যাবতীয় প্রধান লোকের সহিত মিশিতেন, সকলে তাঁহাকে সম্মান করিতেন, তিনিও সকলকে ভালবাসিতেন, অনেকের বাটীতে পর্য্যন্ত যাইতেন; সালিখার রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকখানায় মধ্যে মধ্যে গিয়া "প্রেমারা" খেলিতেন। একদিন খেলিবার সময় মহারাজের হাতে "মাছ" জুটিল, তখন রাধামোহন-বাবুর হাতে "কাতুর" ছিল। দুই প্রধান "দান"; সুতরাং দুইজনেই "ডাকাডাকি"চলিল। ক্রমে দেড় লক্ষ পর্য্যন্ত "ডাক"উঠিল। রাধামোহন-বাবু দেড় লক্ষ টাকা সহিলেন। শেষ মহারাজ "মাছ" দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে দেড় লক্ষ টাকার নোট লইয়া চলিয়া আসিলেন।

এই সময় এ অঞ্চলে প্রেমারা খেলার অতিশয় চলন ছিল। সকলেই প্রেমারা খেলিত। পাড়ায় পাড়ায় প্রমারার আড্ডা ছিল। বালকেরা পর্য্যন্ত খেলায় দক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার রাত্রে নারিকেল-জল খাওয়া যেমন, অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল, সেইরূপ ঐ রাত্রে—কোথাও বা শ্যামাপূজার রাত্রে,—প্রমারা খেলাও অবশ্য-কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। এমন কি কলিকাতার সুবর্ণবণিক্‌দিগের মধ্যে অদ্যাপি প্রথা আছে যে, দেওয়ালি পর্ব্ব উপলক্ষে প্রমারা খেলিবার টাকা তাঁহারা জামাতাদের পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। এখন কেহ আর প্রমারা খেলে না, তথাপি প্রমারা খেলার টাকা তাঁহারা অদ্যাপি দিয়া থাকেন। রাস যাত্রায় বা কোন যাত্রার পূর্ব্বে যেখানে লোক-সমারোহ হইত, সেইখানেই প্রমারা দোকান খুলিত, বড় বড় বাটী ভাড়া করিয়া আড্ডাধারীরা পরিষ্কার দোহুতি বিছাইয়া তাহার উপর প্রমারার নূতন তাস সাজাইয়া বসিত। ক্রমে ক্রমে সেই আড্ডায় খেলোয়াড় জমিতে আরম্ভ হইত, শেষ বাটীর উপর তালায়, নীচ তালায়, দালানে, বারাণ্ডায় উঠানে—কোথাও তাহার স্থান থাকিত না সর্ব্বত্র প্রমারা চলিত। সে সময় দেখিতে চমৎকার! খেলোয়াড়েরা চক্ষু নাসা উভয় কুঞ্চিত করিয়া একাগ্রচিত্তে তাস পিটিতেছেন একেবারে খুলিয়া দেখিতে সাহস হয় না তাহাই তাস ক্রমে ক্রমে টিপিয়া দেখিতেছেন, ভয় আছে, পাছে "ফিগরু" সরিয়া থাকে। পাছে বাজে রং সরিয়া থাকে। তাহা হইলেই সর্ব্বস্ব যাবে। আবার যদি যাহা ধরিয়াছি, তাহাই আসিয়া থাকে, যদি তেরেস্তার উপর পঞ্জা সরিয়া থাকে, তাহা হইলে সকলের কোল কুড়াইব, এই প্রবল আশা। এই আশা,—এই ভয়। আবার এই ভয়, এই আশা। অন্য সময়ের এক যুগের চাঞ্চল্য সে সময়ের একদণ্ডে উপস্থিত হয়। প্রমারা উপলক্ষ্য মাত্র, কিন্তু খেলাটী Dramatic। যে খেলা এ সংসারে সকলে নিত্য খেলিতেছি, সেই খেলার আশ্চর্য্য অনুকরণ এই প্রমারা। তবে প্রভেদ এই যে, এ সংসারে যে চাঞ্চল্য, যে বেগ, যে আশা দশ বৎসরে, ক্রমে ক্রমে মন্দগতিতে কখন আইসে, কখন আইসে না, সেই আশা, সেই বেগ,সেই চাঞ্চল্য একদিনে, এক দণ্ডে, এক মুহূর্ত্তে, দুর্দ্দম বেগে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহাই এ খেলার সুখ। আবার

তাহার উপর অদৃষ্টের কুহক। প্রমারার অদৃষ্টের নাম "পড়্‌তা।" এ সংসারে অদৃষ্ট খুলিলে "ধূলামুটা ধরিলে সোণামুটা হয়;" প্রমারার পড়্‌তা লাগিলে যে কাগজ ধর,সেই কাগজেই তুমি জিতিবে। এক রঙ্গা ফিগরু ধর তুমি ফুরুস মারিবে, ফুরুস পাচার কর, ন্যূনকল্পে তোমার কোরেস্তা দান জুটিবে। পড়্‌তা সম্বন্ধে স্পেন্‌সার Spencer বলেন যে তাস যেরূপ ভাল মন্দ পরম্পরাক্রমে সাজান থাকে, সেইরূপ একজন ভাল একজন মন্দ পায়। মিথ্যাকথা! তুমি যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া কাগজ সাজাইয়া দেও,ভাঁজিয়া দেও, পড়্‌তা ঠিক থাকিবে; যে তাস লইয়া খেলিতেছিলে, সে তাস ফেলিয়া অন্য তাস দেও, পড়্‌তা সেইরূপ থাকিবে।

আমি প্রমারা খেলার পক্ষপাতী বলিয়া এই খেলার পরিচয় দিতে বা প্রশংসা করিতে বসিয়াছি, এমত নহে। তখনকার লোক কেন প্রমারায় মাতিয়া উঠিত, তাহাই বুঝাইবার জন্য এত কথা বলিলাম। প্রমারাখেলায় উন্মত্ত করে, দিন-রাত্রি কখন্ আসে, কখন্ যায়, তাহা খেলোয়াড় কিছুই জানিতে পারে না। এখন প্রমারা খেলা নাই, তাই এখনকার লোক মদ খায়। একালে মদে যে অভাব পূর্ণ হয়, সেকালে প্রমারায় সেই অভাব পূর্ণ হইত। এ উভয়ের মধ্যে কোন্‌টা ভাল, আমি বলিব না। মোট কথা, পূর্ব্বে রাজাধিরাজ হইতে কেলমালা পর্য্যন্ত প্রমারা খেলিত, আর কবি শুনিত।

কবির কথা এখন আর তুলিব না। তবে এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, কবি যে সময়ের Æsthetic culture প্রধান সহায় ছিল। তদ্দ্বারা তখনকার লোকে কবিত্ব বুঝিয়াছিল, কবিত্ব লইয়া মাতিয়াছিল। সেরূপ জিনিস এখন কিছুই নাই। এ কালের পুঁজি কেবল নাটক। তাহা দেখিয়া শুনিয়া হাসি পায়; তাহা যে কিছুই নহে, এ কথা কেহ এখন বুঝিবে না, কাহারও বুঝাইবার সাধ্য নাই। এ নাটক এখনকার সময়োপযোগী। মূল কথা,এখন বাঙ্গালায় নাটক হইতে পারে না। নাটক উত্তর-প্রত্যুত্তর নহে, উপন্যাস নহে। যাহা লইয়া নাটক, তাহা বাঙ্গালীর অদ্যাপি হয় নাই। নাটকের মজ্জা কার্য্যকারিতা, সে কার্য্যকারিতা ব্যক্তিগত নহে, তাহা জাতিগত ও সমাজগত। সে কার্য্যকারিতা-শক্তি আমাদের কই? স্পেন দেশ যখন কার্য্যকারিতায় অতুল,তখন তথায় সরবণ্টিস নাটক লিখিয়াছিলেন। মহারাজ্ঞী এলিজাবেথের সময় ইংলণ্ডের কার্য্যকারিতাশক্তি বড় প্রবল হইয়াছিল, তখন ইংরেজী ভাষায় নাটক হয়। তাহার পর উভয়দেশের এই শক্তি কমিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে নাটকপ্রসবিনী শক্তি অন্তর্হিত হইয়াছে। তবে এখন যে সকল নাটক তথায় লিখিত হয়, তাহা প্রায়ই বাঙ্গালা নাটকের মত কেবল বকাবকি আর হাঁকাহাঁকি।

সে সকল কথা এখন থাক্। তেজচাঁদ বাহাদুরের কথা হইতেছিল, তিনি শত্রুর মুখে ছাই দিয়া এক একটী করিয়া ক্রমে সাতটী বিবাহ করেন। শেষ বিবাহটী অতি বৃদ্ধবয়সে করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার পুত্র প্রতাপচাঁদ যুবাপুরুষ, বিষয়কার্য্য তিনিই দেখেন, বৃদ্ধ রাজা অপটু বলিয়া সে সকল কার্য্য হইতে নিরস্ত হইয়াছিলেন।

৩। কুমার বাহাদুর।

কুমার প্রতাপচাঁদের বালককালের কথা সবিশেষ বড় প্রকাশ নাই, তবে এই মাত্র শুনা যায় যে, তিনি বড় দুরন্ত ছিলেন। ঘুড়ি উড়াইবার সখ তাঁহার বিশেষ বলবৎ ছিল; একবার ঘুড়ির লক পড়িয়া তাঁহার কর্ণের উপরিভাগ কাটিয়া গিয়াছিল। একবার একটা ঘোড়া তাঁহার পিঠে কামড়াইয়া মাংস তুলিয়া লইয়াছিল। সে চিহ্ন তাঁহার যাবজ্জীবন ছিল। গোলোকচাঁদ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে ইংরেজী পড়াইতেন। এ দেশে রাজকুমারদের যেরূপ বিদ্যা হইয়া থাকে, প্রতাপচাঁদের তাহাই হইয়াছিল।

অল্প বয়সেই তাঁহার গর্ভধারিণী নান্‌কী রাণীর কাল হয়, সেই অবধি তাঁহার পিতামহী বিষণকুমারী তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। বিষণকুমারীর আদরে প্রতাপচাঁদের কোন শিক্ষা হইতে পারে নাই।

প্রতাপচাঁদ কোন অকার্য্য করিলে, রাণী বিষণকুমারীর ভয়ে কেহ তাঁহাকে কোন কথা কহিতে পারিত না। অন্যের কথা দূরে থাক্, স্বয়ং রাজা তেজচন্দ্র কিছু বলিতে সাহস করিতেন না। সুতরাং কুমার বাহাদুর আলালের ঘরের দুলাল হইয়া দাঁড়াইলেন, কাহাকেও ভয় করিতেন না, কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেন। এই বীজ অর্থাৎ এই দুর্দ্দম ইচ্ছা তাঁহার কালস্বরূপ হইয়াছিল। ইচ্ছা দমন করিতে তিনি শিখেন নাই।

তাঁহার বিমাতা কমলকুমারী তাঁহার প্রতি বড় সদয় ছিলেন না। বিমাতা সর্ব্বত্র কুমাতা, বিশেষ রাজবাটীতে। একা বিমাতা নহে, বিমাতার সহোদর পরাণবাবু প্রতাপচাঁদকে একেবারে দেখিতে পারিতেন না। প্রতাপ তাহা জানিতেন এবং তাহার প্রতিশোধ মধ্যে মধ্যে লইতেন। জনশ্রুতি আছে যে, একদিন প্রতাপচাঁদ পরাণবাবুর পশ্চাদ্দেশে কলিকা পুড়াইয়া ছাপ দিয়াছিলেন।

সর্ব্বদাই প্রতাপচাঁদ আমোদ-আহ্লাদে কাটাইতেন, তিনি হাসিতে বড় পটু ছিলেন; হাসিতে গেলে তাঁহার গালে টোল পড়িত। সর্ব্বদাই তাঁহার ঘর্ম্ম হইত, পৌষমাসের শীতেও তিনি ঘামিতেন। এই ঘর্ম্মরোগ তাঁহার মৃত্যুকাল অবধি ছিল।

৪। ছোট রাজা!

কুমার বাহাদুরের বয়ঃক্রম হইলে লোকে তাঁহাকে ছোট রাজা বলিত। তিনি বাল্যকালে দুরন্ত ছিলেন, যৌবনকালে আরও দুরন্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সাহস ও শক্তি অসাধারণ ছিল, সেই সঙ্গে আপনাকে রাজা বলিয়া তাঁহার মনে একটা দাম্ভিকতা সর্ব্বদা জাগরিত থাকিত।

মোগলেরা বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ বলিয়া প্রতাপচাঁদ তাহাদিগকে ভালবাসিতেন, কয়েকজনকে তাঁহার বডিগার্ডস্বরূপ রাজবাটীতে রাখিয়াছিলেন, সেই কয়েকজনের জমাদ্দার—আগা আব্বাছ আলি—সর্ব্বদা ছায়ার মত তাঁহার সঙ্গে বেড়াইত; সেই ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া তিনি অনেক দুঃসাহসিক কার্য্য করিতেন। অপঘাত-মৃত্যু যে কখন হইতে পারে, এ কথা তাঁহার বুদ্ধির অতীত ছিল।

তিনি দেখিতে শ্যামবর্ণ, একহারা অথচ বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন; নিত্য প্রাতে কুস্তি করিতেন; কুস্তি করা তখনকার প্রথাই ছিল। সঙ্গীতবিদ্যা আর মল্লবিদ্যা না জানা অভদ্রের লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইত। এরূপ ধারণা বোধ হয়, গায়ক ও পালোয়ানদিগের দ্বারা উৎপাদিত হইয়া থাকিবে। পশ্চিমাঞ্চলের নানা প্রদেশ হইতে "কুস্তিগীর পালোয়ান" আসিয়া বল ও কৌশল দেখাইত। তদুপলক্ষে বিস্তর ধনবান্ একত্র হইতেন। তাঁহারা পালোয়ানদের মুখে শুনিতেন যে, পশ্চিমাঞ্চলের মহারাজগণ কুস্তিগীরকে কোল দেন, ইংরেজ ডাকিয়া তাহাদের তসবির লন, এবং আপনারা স্বয়ং কুস্তি করিয়া সাধারণ-সমক্ষে বলবন্ত বলিয়া পরিচিত হন।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ভরত নামে একজন প্রসিদ্ধ পালোয়ান এ অঞ্চলে ছিল, কিন্তু সে ব্যক্তি হিন্দুস্থানী। বাঙ্গালীর মধ্যে মনোহর চক্রবর্ত্তীর প্রতিষ্ঠা তখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কবি ভারতচন্দ্র রায়ের পৌত্র নাকি বড় কুস্তিকৌশলী ছিলেন, তাঁহার বল-মাংস এরূপ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল যে, তিনি মাথা নিম্নভাগে রাখিয়া ঊর্দ্ধভাগে পা তুলিয়া কেবল দুই হস্ত দ্বারা অনায়াসে নারিকেলগাছে উঠিতেন।

যাঁহাদের বিশ্বাস যে, ইংরেজ-প্রসাদাৎ ইদানীং বাঙ্গালায় কুস্তি (gymnastic) আরম্ভ হইয়াছে, তাঁহাদের ভুল। ইংরেজি শিক্ষায় ও শাসনে বরং আমাদের কুস্তি উঠিয়া গিয়াছে। প্রাতে বালকেরা স্কুলের পাঠাভ্যাস করে, কুস্তির অবকাশ থাকে না; ইতরলোকেরা কুস্তি করিলে তাহাদের প্রতি পুলিসের দৃষ্টি পড়ে, সুতরাং কুস্তি করা বন্ধিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে দেখিযাছি, ইতরলোকদিগের কোন কার্য্যের ভার দিলে, তাহারা তাল ঠুকিয়া সম্মতি জানাইত। এখন আর সে তাল ঠোকা নাই, কারণ, সাধারণ লোকের মধ্যে আর সে কুস্তি নাই, সে বল নাই। অনেকের বিশ্বাস, আমরা চিরকালই এইরূপ দুর্ব্বল। যাঁহারা ইংরেজী গ্রন্থ পড়িয়া বাঙ্গালীর ইতিহাস শিখিয়াছেন, তাঁহাদের এই বিশ্বাস সম্ভব। কিন্তু যাঁহারা আকবর প্রভৃতির রুবকারী ইত্যাদি পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, মুসলমান আমলে বিস্তর বাঙ্গালী যোদ্ধা ছিল। বাঙ্গালার ফৌজ বাঙ্গালীরাই হইত, নবাবের পক্ষের যুদ্ধ বাঙ্গালীরাই করিত। পঞ্চহাজারি, দশহাজারি যে সকল সেনাপতি ছিলেন, তাঁহারা আপন আপন প্রজা লইয়া যুদ্ধে যাইতেন, সে প্রজা বাঙ্গালী ভিন্ন আর কেহই নহে। সে দিন পলাশীর যুদ্ধে বাঙ্গালী জাঁদরেল আর বাঙ্গালী সেনা যুদ্ধ করিয়াছিল। সে যুদ্ধে ইংরেজ সেনা ও ইংরেজ জাঁদরেলের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহা একজন ইংরেজ সাহস করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। যদি সে দিন মিরজাফর ইংরেজদের স্বপক্ষ হইয়া হঠাৎ যুদ্ধ স্থগিত না করাইতেন, তাহা হইলে বাহাদুরীর স্রোত আজ আর একদিকে বহিত।

এখন বাঙ্গালীর আর বলবীর্য্য নাই সত্য, কিন্তু তাহা বাঙ্গালীর দোষে নহে, রাজশাসনের দোষে। সে সকল কথা এখন অনর্থক।

প্রতাপচাঁদ কুস্তি করিতে, সাঁতার দিতে, ঘোড়ায় চড়িতে বড় পরিপক্ক ছিলেন। লোকে বলে, তিনি ইংরেজ ঠেঙ্গাইতে আরও মজবুদ ছিলেন। গল্প আছে, তিনি না কি কোন একজন ইংরেজকে বড় মর্ম্মপীড়া দিয়াছিলেন, সেই অবধি অধিকাংশ সিবিল সার্বেণ্ট তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না। তিনিও তাঁহাদিগকে দেখিতে পারিতেন না। তাঁহার ধারণা ছিল যে, ধোপা-নাপিতের ছেলেরাই সিবিল সার্বেণ্ট হইয়া এ দেশে আসে, এবং সেইজন্য তাহাদের দাম্ভিকতা তাঁহার সহ্য হইত না। একবার তাঁহার সহিত পথে একজন মেজেষ্টরের দেখা হইয়াছিল। মেজেষ্টর সাহেব সেই সময় তাঁহার বগি একপার্শ্বে লইয়া যান নাই, কি এইরূপ একটা সামান্য ক্রটি করিয়াছিলেন, প্রতাপচাঁদের নিকট ইহা "বেয়াদবি" বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ বগি হইতে মেজেষ্টরকে নামাইয়া আগাগোড়া বিতাইয়া দিলেন। লোকে বলে, তাঁহার নামে সেইজন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছিল।

প্রতাপচাঁদের রাগ কেবল সিভিল সার্বেণ্টদের উপর ছিল; তাহাদিগকেই তিনি "বেয়াদব" বলিতেন। অন্য ইংরেজদের সঙ্গে তাঁহার বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল, পল্টনের একজন ডাক্তার স্কট সাহেবকে তিনি বিশেষ ভালবাসিতেন। আরও অন্যান্য ইংরেজদের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল। তাঁহারা সর্ব্বদাই আসিতেন, আমোদ আহ্লাদ করিতেন আর মদ খাইতেন। প্রতাপচাঁদ তাঁহাদের সঙ্গে মদ ধরিলেন। মেদেরা মদ তাঁহার বিশেষ প্রিয় হইয়াছিল। ক্রমে অভ্যাসে প্রতাপচাঁদ তাঁহাদের সহিত অনর্গল ইংরেজীতে কথা কহিতেন। তিনি কখন ইংরেজী অধ্যয়ন করেন নাই বলিলেই হয়, তাঁহার শিক্ষক গোলোকচাঁদ ঘোষ নিজে ইংরেজী জানিতেন না। থামস্ ডিস্ পর্য্যন্ত তাঁহার বিদ্যা ছিল।

তিনি আবার এদিকে বড় সামাজিক ছিলেন। দেশী বিদেশী সকলের সঙ্গে

আত্মীয়তা করিতেন। এ অঞ্চলে আসিলে একবার সালিখায় যাইতেন, একবার তেলিনীপাড়ার রামধন-বাবুর ভদ্রেশ্বরের বৈঠকখানায় আমোদ করিয়া আসিতেন। চুঁচুড়ায় রাজবাটী আছে, তথায় আসিয়া দিনামারের গবর্ণর ওবারবেক সাহেব, হাজি আবু তালিব প্রভৃতি অনেকানেক প্রধান লোকের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করিতেন। সিঙ্গুরের নবাব-বাবুর সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। কথিত আছে, নবাব বাবু দোল উপলক্ষে তাঁহার সহিত ফাগ খেলিবার জন্য প্রতিবৎসর বৰ্দ্ধমান যাইতেন, একবার এত ফাগ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন যে, পনর দিবস ধরিয়া অনবরত ব্যয় করিয়াও তাহা ফুরাইল না, শেষ প্রত্যাগমনকালে বস্তা বস্তা ফাগ বাঁকার জলে ফেলিয়া আসিলেন, বাঁকার জল একেবারে রক্তবর্ণ হইয়া গেল। কয়েক দিন ধরিয়া লোকে সে জল ব্যবহার করিতে পারিল না। সেই নবাববাবুর স্ত্রী ইদানীং বৃন্দাবনে ভিক্ষা করিয়া খাইতেন।

প্রতাপচাঁদ অল্প বয়সেই বিষয়-কার্য্য দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। লোকে বলে, পরাণ-বাবু তাহাতে প্রতিবাদী হইয়াছিলেন। কেন হইয়াছিলেন, তাহা কেহ বুঝে নাই, কিন্তু প্রতাপচাঁদ সে কথা বুঝিয়াছিলেন। সেই জন্য কৌশল করিয়া পিতার নিকট হইতে সমুদায় বিষয়ের দানপত্র লিখাইয়া লইয়াছিলেন।

পরাণ-বাবু ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিলেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না। কিছু কাল পরে, এক নূতন চাল চালিলেন। তাঁহার এক পরম সুন্দরী কন্যা অবিবাহিতা ছিল। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সেই কন্যা বৃদ্ধ রাজা তেজচাঁদকে সম্প্রদান করিলেন। লোকে অবাক্ হইল। কন্যার নাম বসন্তকুমারী। তিনিই মহারাণী বসন্তকুমারী বলিয়া পরিচিতা।

লোকে এ বিবাহের তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারিল না। এই বিবাহে সকলেই বিরক্ত হইল, অনেকে সন্দেহ করিল। মহারাজ তেজচাঁদ বাহাদুর পরাণ-বাবুর ভগিনীপতি ছিলেন, এবার আবার জামাতা হইলেন। লোকে ভাবিল, ইহা গ্রন্থির উপর গ্রন্থি। প্রতাপচাঁদ ভাবিলেন, "পরাণ মামা দড়ি পাকাচ্ছেন।"

পরাণ-বাবুর যখন সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র ভূমিষ্ঠ হন, সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল যে, অষ্টমগর্ভের পুত্র যদি বাঁচে তবে অসাধারণ ব্যক্তি হইবে। শুনা যায়, এই কথায় প্রতাপচাঁদ বিমর্ষ হইয়া বলিয়াছিলেন, "অষ্টমগর্ভের সন্তান বাঁচিলে রাজা হয়, পরাণের পুত্র নিশ্চয় রাজা হইবে; যদি পরাণ ততদিন জীবিত থাকে, আমার গদীতে পরাণের পুত্র বসিবে; বরং তোমরা এ কথা লিখিয়া রাখ।" এ কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, এবং পরাণ-বাবুর ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালীর বীজ সেই অবধি রোপিত হইল।

পরাণ-বাবুর সহিত প্রতাপচাঁদের অকৌশল ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল; এই বিবাহের পর আরও বাড়িয়া উঠিল। সে সকল পরিচয় এখন অপ্রয়োজন।

কথিত আছে, ১৮১৯ সালের ৮ আইন, যাহাকে সচরাচর "অষ্টম" আইন বলে, তাহা প্রতাপচাঁদ নিজে উদ্ভাবন করেন। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে; প্রতাপচাঁদ যেরূপ আমোদপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয় না যে, তিনি বিষয়রক্ষার নিমিত্ত কোন উপায় চিন্তা করিবার অবকাশ পাইতেন। কিন্তু লোকে বলে যে, তিনি এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের যেরূপ বন্দোবস্ত, তাহাতে নিয়মিত দিনে সূর্য্যাস্তের মধ্যে সরকারি রাজস্ব সমুদায় দিতে না পারিলে জমিদারী নীলাম হইয়া যায়। এই নিয়মের চক্রে, বড় বড় জমিদারদিগের জমিদারী নীলাম হইয়া গিয়াছে। বৰ্দ্ধমান-রাজার জমিদারী বিস্তর, তাহার খাজানা নিয়মিত মুহূর্ত্তমধ্যে দেওয়া কঠিন ব্যাপার। এ অবস্থায় প্রতাপচাঁদ স্থির করিলেন, গবর্ণমেণ্ট যেমন খাস তহসিলের দায় নিজে গ্রহণ করেন নাই, মধ্য-

বর্ত্তী জমিদারের স্কন্ধে তাহা ফেলিয়া খাজানা তহসিল করেন, আমিও সেইরূপ করিব। প্রজাদিগের নিকট খাজানা আদায় করিবার নিমিত্ত মধ্যবর্ত্তী পত্তনীদার রাখিব। জমিদার নিয়মিত মুহূর্ত্তমধ্যে খাজনা দিতে না পারিলে, গবর্ণমেণ্ট যেমন জমিদারী নীলাম করিয়া লন,, আমিও সেইমত অনাদায়ের নিমিত্ত পত্তনী নীলাম করিয়া সেই নীলামের টাকা হইতে গবর্ণমেণ্ট ক খাজানা দিব। এই বিষয় দরখাস্ত করিলে গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ করিয়া তা। অনুমোদন করিলেন, এবং ১৮১৯ সালের ৮ আইন দ্বারা পত্তনী নীলামের বিধি করিয়া দিলেন।

এই কৌশলে প্রতাপচাঁদ আপনার জমিদারী চিরস্থায়ী করিয়া লইলেন, এবং সেই সঙ্গে অন্য জমিদারের জমিদারী রক্ষা পাইল। নতুবা পূর্ব্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (permanent Settlement) নামে মাত্র চিরস্থায়ী বলা হইত। চিরস্থায়ী দূরে থাক্, কাহারও জমিদারী ক্রমান্বয়ে চার বৎসর স্থায়ী হইত না। এ অস্থায়িত্ব লইয়া কোর্ট অব্ ডাইরেক্টারেরা অনেক পত্র লেখালিখি করিয়াছিলেন; কিন্তু তখন কিছুই করিতে পারেন নাই।

প্রতাপচাঁদের যতই প্রশংসা থাক্, তিনি অতিশয় সুরাপায়ী হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ইদানীং তাঁহাকে এই জন্য দেখিতে পারিতেন না। কেহ কেহ বলেন, না দেখিতে পারার অন্য কারণ ছিল। তাহা যাহাই হউক্, শেষ অবস্থায় কিছু দিন তেজচাঁদ বাহাদুর পুত্রের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন।

যাঁহারা কুমার কৃষ্ণনাথকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয়, প্রতাপচাঁদের সহিত তাঁহার কতক সাদৃশ্য অনুভব করিয়া থাকিবেন। আমরা বিলক্ষণ আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, দুই জনের প্রকৃতি একই রূপ ছিল। যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে, সে সময় এইরূপ ব্যক্তি আরও দুই একটী জন্মিয়াছিলেন: কিন্তু তাঁহারা কেহই দীর্ঘকাল টিকিতে পারেন নাই। তাঁহারা সময়োপযোগী বা সমাজোপযোগী ছিলেন না। চারিপার্শ্বস্থ আর সকল যেরূপ, সেইরূপ হইলেই মানুষ বল, পশু বল, যাহা বল, তাহাই টিকে. নতুবা লোপ পায়। এই নিয়ম। যেখানে সমাজের সকলেই অতি নীচ, সেখানে নীচব্যক্তিরই টিকিবে, নীচব্যক্তিরই উন্নতি হইবে; উচ্চপ্রকৃতির লোক, সে সমাজে প্রধানত্ব পাওয়া দূরে থাক্, একেবারে লোপ পাইবে। যেখানে সমাজ পবিত্র, সেখানে ধর্ম্মিষ্ঠ ও পবিত্র লোক টিকিবে; সেখানে নীচ ও শঠ দুর্দ্দশাপন্ন হইবে এবং পরিশেষে লোপ পাইবে। আমাদের মধ্যে অনেকেই জানেন, "যথা ধর্ম্মস্তথা জয়ঃ।" কিন্তু বাস্তবিক এ কথা সকল সময়ে সত্য নহে। তাই বলিতে হইয়াছে, "কলিতে অধর্ম্মেরই জয়, যে প্রবঞ্চনা করে, যে শঠতা করে, তাহারই উন্নতি। মূল কথা, অধিকাংশ লোক যেরূপ, ফলও সেইরূপ হয়। যেখানে কিয়দংশ লোক ধর্ম্মিষ্ঠ, সেইখানেই ধর্ম্মের জয়, আর পাপের পরাজয়; যেখানে অধিকাংশ লোক পাপিষ্ঠ, সেইখানেই পাপের জয়, ধর্ম্মের পরাজয়। কৃষ্ণনাথ প্রতাপচাঁদ উভয়ে লোপ পাইয়াছিলেন। উভয়েই চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকের মত ছিলেন না, কিছু ভিন্ন ছিলেন; ভাল ছিলেন কি মন্দ ছিলেন, তাহা বলিতেছি না।

৫। প্রতাপচাঁদের মৃত্যু।

প্রতাপচাঁদ আটাইশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এইরূপে আমোদ-আহ্লাদে অতিবাহিত করিলেন। তাহার পর, তাঁহার মানসিক অবস্থা হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। যিনি হাসিলে ঘর ভরিয়া যাইত, তাঁহার সে হাসি আর বড় শুনা যাইত না। নিত্য অপরাহ্নে বারদ্বারীর ছাদে উঠিয়া তিনি নীলপুরের দিকে দূরবীণ কসিতেন, তথাকার একটী গেট হইতে কখন্ একখানি বগি ছুটিয়া বাহির হয়, দেখিতেন। তিনি আর সে ছাদে যান না, দূরবীণ স্পর্শ করেন না। রাজবাটীর

দক্ষিণভাগে বহুব্যয়ে এক অপূর্ব্ব স্নানাগার প্রস্তুত করাইতেছিলেন, তাহা প্রস্তুত হইল, কর্ম্মচারী আসিয়া সে সংবাদ দিল, একবার তাহা দেখিতে গেলেন না। শেষ, মোসাহেবদের সহিত আর সাক্ষাৎ করিতেন না। শ্যামচাঁদ বাবু নামে এক পারিষদ ছিলেন, কেবল তাঁহারই সঙ্গে দুই একটী কথাবার্ত্তা কহিতেন, আর চিনারি নামে একজন ইউরোপীয় চিত্রকরের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, সে ব্যক্তি তখন প্রতাপচাঁদের একখানি প্রমাণ চিত্রপট চিত্র করিতে নিযুক্ত ছিল।

কিছুদিন পরে ছোট মহারাজকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। কেহ তাঁহার কোন সন্ধান বলিতে পারিল না। বৃদ্ধ রাজা বড় কাতর হইয়া পড়িলেন। তিনি পুত্রকে অনাদর করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার আরও বিশেষ কষ্ট হইল। মনে করিলেন, সেইজন্য হয় ত তাঁহার প্রতাপচাঁদ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। যে জন্য প্রতাপচাঁদ নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, তাহা দুই এক জন জানিতেন; কিন্তু কেহ প্রকাশ করিতেন না। কিছুকাল পরে, একজন মুসলমান আমলা মহারাজ তেজচাঁদকে গোপনে ছোট মহারাজের সন্ধান বলিয়া দিলেন। তেজচাঁদ বাহাদুর সেই সন্ধান পাইয়া প্রতাপচাঁদকে রাজমহল হইতে ধরিয়া আনিলেন।

কিন্তু প্রতাপচাঁদ পূর্ব্বমত বিমর্ষ থাকিতেন, পিতা কত আদর করিতেন, কত বুঝাইতেন, কিছুতেই কর্ণপাত করিতেন না।

একদিন প্রাতে প্রতাপচাঁদ শয্যা হইতে উঠিয়া খানসামাদিগকে বলিলেন যে, "আজ নুতন মহলে স্নান করিব।" খানসামারা পয়ঃপ্রণালীতে জল পূরিয়া সমুদায় ফোয়ারা খুলিয়া দিল, বাটীর বাহির হইতে জলের গর্জ্জন শুনা যাইতে লাগিল। প্রতাপচাঁদ তথায় প্রবেশ করিলেন, প্রায় প্রহরেক পরে বহির্গত হইলেন। চক্ষু তখন আরক্ত হইয়াছে, সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছে।

সেই দিন অপরাহ্ণে রাষ্ট হইল, প্রতাপচাঁদের পীড়া হইয়াছে। চিকিৎসকেরা যাতায়াত করিতে লাগিল। একজন মুসলমান চিকিৎসক প্রতাপচাঁদের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল, তাহার নাম আসগর আলি। পীড়ার প্রথম অবস্থায় তাহারই ব্যবস্থা চলিতে লাগিল। শেষে তথাকার সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার কুল্‌টার সাহেবকে আনিতে হইল। রাষ্ট যে, ডাক্তার সাহেব কোন ব্যবস্থা করিলেন না, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তিনি প্রতাপচাঁদের কপোলদেশে দশ বারটি জোঁক বসাইতে চাহিয়াছিলেন! তাহাতে বৃদ্ধ রাজা ও প্রতাপচাঁদ উভয়ের আপত্তি হওয়ায় ডাক্তার সাহেব রাগ করিয়া চলিয়া যান। তখনকার ডাক্তারদের সংস্কার ছিল, রক্তমোক্ষণ সকল রোগে নিতান্ত আবশ্যক। জোঁক তাঁহাদের প্রধান সহায় ছিল, তাই ইংলণ্ডে ডাক্তারদের একটী নাম (lech) অর্থাৎ জোঁক।

সেই দিবস কি পরদিবস হইবে, প্রতাপচাঁদ বলিলেন, "আমায় গঙ্গাযাত্রা কর।" পীড়া তখন সাংঘাতিক বলিয়া কাহারও বিশ্বাস ছিল না। পরে রাজবল্লভ কবিরাজ আসিয়া গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা দিলেন। সুতরাং তাঁহাকে কাল্‌নায় লইয়া যাওয়া হইল। তাঁহার সঙ্গে বৃদ্ধ মহারাজ স্বয়ং গেলেন। সম্পর্কীয় অন্য কেহই গেলেন না। স্ত্রীলোকমাত্রই নহে। তাঁহার দুই স্ত্রী ছিলেন; তাঁহার কেহই যান নাই। বোধ হয়, তাঁহাদের যাইতে নিষেধ করা হইয়া থাকিবে। কাল্‌নায় পৌঁছিয়া প্রতাপচাঁদ কয়েক দিন তথাকার রাজবাটীতে থাকিলেন, কিন্তু ক্রমেই তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

পরে, একদিন রাত্রি দেড়প্রহরের সময় তাঁহাকে পাল্কী করিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হইল এবং কানাত দ্বারা ঘাট ঘেরিয়া তাঁহাকে অন্তর্জ্জলি করা হইল। সে সময় বিস্তর লোক তথায় উপস্থিত ছিল, কিন্তু তাহারা সকলে কানাতের বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। রাত্রি বড় অন্ধকার, আট দশটা মাত্র মশাল সেখানে জ্বলিতেছিল, তাহাতে আলোক অধিক হয় নাই। জলের ধারে একটী

তাঁবু খাটান হইয়াছিল; পৌষ মাস, বড় শীত, আত্মীয়-স্বজনেরা তথায় বসিয়াছিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের পর শবদাহ হয়, রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় রাজা তেজচাঁদ বাহাদুর বৰ্দ্ধমান যাত্রা করেন।

মৃত্যুর দুই চারিদিন পরেই রাষ্ট্র হইল, প্রতাপচাঁদ পলাইয়াছেন। রাজা তেজচাঁদ তাহা শুনিলেন, কিন্তু হাঁ—না কিছুই বলিলেন না। যে কারণেই হউক, প্রতাপচাঁদের সমাজমন্দির কাল্‌নায় তখন প্রস্তুত হইল না। রাজবাটীর রীতি আছে, কেহ মরিলে একটী নূতন মন্দিরে তাঁহার ভস্ম রক্ষিত হয়। প্রতাপচাঁদের সমাজ-মন্দির, শুনা যায়, তেজচাঁদ বাহাদুরের মৃত্যুর পর প্রস্তুত হইয়াছিল।

প্রতাপচাঁদের মৃত্যুর পর জমিদারী লইয়া তেজচাঁদ বাহাদুরের সহিত প্রতাপচাঁদের দুই রাণীর মোকৰ্দ্দমা বাধিয়া গেল! প্রতাপচাঁদ দানসূত্রে বিষয় পাইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার রাণীরা বিষয়াধিকারিণী এবং সেই জন্য তাঁহারা দাবি করিলেন এবং তদনুসারে জজ-আদালতে তাঁহারা ডিক্রি পাইলেন। কিন্তু কি কারণে বলা যায় না, শেষ তেজচাঁদের হাতেই বিষয় থাকে; রাণীরা মাসিক "তঙ্কা" পাইয়া নিরস্ত হন।

কিছুদিন গেলে, পোষ্যপুত্রের কথা উত্থাপিত হইল; তেজচাঁদ পোষ্যপুত্র লইতে অসম্মত হইলেন। কেন অসম্মত, তাহার কোন হেতু দর্শাইলেন না। আবার কিছুদিন পরে, পোষ্যপুত্রের কথা উত্থাপিত হইল, আবার তিনি অস্বীকৃত হইলেন। এবার বলিলেন যে, "আমার প্রতাপ আসিবে—সে অবশ্য আসিবে।" তাঁহার আত্মীয়েরা বুঝাইলেন যে, তাঁহাকে পুত্রশোক হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত লোকে প্রতাপের অজ্ঞাতবাস কল্পনা করিয়াছে। এ সুখের ভ্রম নষ্ট করা উচিত নহে। কিন্তু যদি প্রতাপচাঁদ ফিরে না আসেন, বা তাঁহার আসিতে বিলম্ব হয়, আর ইহার মধ্যে যদি মহারাজের দেহনাশ হয়, তবে এই সমস্ত বিষয় কোম্পানী বাহাদুর লইবেন। যাহাতে না লইতে পারেন, তাহার একটী উপায় করিয়া রাখা আবশ্যক।

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর, তেজচাঁদ-বাহাদুর পোষ্য-পুত্র লইতে সম্মত হইলেন। বলা বাহুল্য যে, পরাণ-বাবুর সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র—যেটী অষ্টম গর্ভের—সেইটী গৃহীত হইল। তাহার নাম কুঞ্জবিহারী কি নারায়ণবিহারী এমনি একটী ছিল—রাজপুত্র হইলে সে নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া মহাতাপচাঁদ রাখা হইল।

৬। আলোক শা।

পঞ্চদশ বৎসর পরে, ১৮৩৫ সালে একজন সন্ন্যাসী বৰ্দ্ধমানে প্রবেশ করিল। তখন বৰ্দ্ধমান আর পূর্ব্বমত নাই, স্থানে স্থানে ইংরেজ-পছন্দ নূতন রাস্তা হইয়াছে, তাহার ধারে বিলাতী ফুলের বন গজাইতেছে। কৃষ্ণসায়েরের পাড় ঝর্ ঝর্ করিতেছে, সেখানে আর জঙ্গল নাই, স্থানে স্থানে মনোহর উদ্যান প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাদের নাম আরও মনোহর রাখা হইয়াছে। রাজবাটীর বহির্ভাগ পূর্ব্বমত অপরিষ্কার রহিয়াছে, কিন্তু ভিতরে অনেক নূতন মহল প্রস্তুত হইয়াছে। পায়রার পাল বিলক্ষণ বাড়িয়াছে, চিড়িয়াখানা সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু চিড়িয়াখানায় ফাক্কা, কুম্‌রী প্রভৃতি সাহেবদল সমুদায় মরিয়া গিয়াছে, এখন বিলাতী পক্ষীই অধিক।

সন্ন্যাসী রাজবাটীতে প্রবেশ করিল, চারিদিক্ দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল, কেহ তাহাকে নিবারণ করিল না, সন্ন্যাসী কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। শেষ সন্ন্যাসী বারদ্বারীতে গিয়া উপস্থিত হইল। বারদ্বারী বহুকাল মেরামত হয় নাই, তাহার দুই একটী দ্বার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, দুই এক স্থানের চূণকাম খসিয়া গিয়াছে, সন্ন্যাসী সেইখানে থাকিবে মনে করিল; কিন্তু রাজবাটীর জনকতক লোক কি সন্দেহ করিয়া, সন্ন্যাসীকে তথা হইতে তাড়াইয়া দিল।

তাহার কিঞ্চিৎ পরে সন্ন্যাসী গোলাপবাগে গিয়া উপস্থিত হইল; ভিতরে প্রবেশ ন।

করিয়া গেটের নিকট বসিয়া থাকিল। সেই গেটের নিকট গোপীনাথ ময়রা পরামাণিক নামক একজন বৃদ্ধ একখানি দোকান করিত, সে ব্যক্তি সন্ন্যাসীকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিল, "আমাদের ছোট মহারাজ।" সন্ন্যাসী চাহিয়া দেখিল, গোপীনাথ গলায় কাপড় দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া যোড়হস্তে দাঁড়াইয়া রহিল। সন্ন্যাসী তাহার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিল। এদিকে বিস্তর লোক আসিয়া সন্ন্যাসীকে ঘেরিল। ছোট মহারাজ আসিয়াছেন, এ কথা সহরের সর্ব্বত্র বিদ্যুদ্‌বেগে রাষ্ট হইয়া গেল। চারিদিক্‌ হইতে লোক ছুটিল। ছোট মহারাজের রাণীরা বৃত্তান্ত কি জানিবার জন্য একজন পুরাতন দাসীকে পাঠাইলেন। দাসী ফিরিয়া গিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বলিল, "আর সে বর্ণ নাই, সে মুর্ত্তি নাই, কিন্তু গালভরা সে হাসি রহয়াছে। আহা! ছিলেন মহারাজাধিরাজ, আজ কি না সন্ন্যাসী! একেই বলে—"যে রাজ্যে রাজা ছিলেন, সেই রাজ্যে মেগে খেলেন।" রাণীরা চুপি চুপি চক্ষের জল মুছিলেন।

রাজবাটীর অনেক পুরাতন আমলা দেখিতে আসিল। তাহাদের মধ্যে কুঞ্জবিহারী ঘোষ নামে এক জন মুহুরি সন্ন্যাসীকে দেখিয়া গিয়া পরাণ-বাবুর মধ্যম পুত্র তারাচাঁদকে বলিল, "বাবু! আর দেখিতে হইবে না, আমাদের ছোট মহারাজ সত্যই।"* তারাচাঁদ সে কথা পরাণ-বাবুকে বলিলেন, তৎক্ষণাৎ পরাণ-বাবু কতকগুলি লাঠিয়াল পাঠাইলেন। তাহাদের উত্তেজনায় সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে উঠিয়া কাঞ্চননগরে গিয়া থাকিলেন। তথায় তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত বিস্তর লোক যাতায়াত করিতে লাগিল। পরাণ-বাবু আবার তথায় লাঠিয়াল পাঠাইলেন, এবার লাঠিয়ালেরা সন্ন্যাসীকে দামোদর পার করিয়া দিয়া আসিল।

কিছু দিন পরে সেই সন্ন্যাসী বিষ্ণুপুরের রাজদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন বিষ্ণুপুরের রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ। তিনি সন্ন্যাসীকে মহারাজ প্রতাপচাঁদ বলিয়া হঠাৎ চিনিলেন, এবং বহুযত্ন করিয়া তাঁহাকে আপন বাটীতে রাখিলেন। দুই তিন মাস পরে রাজা ক্ষেত্রমোহন পরামর্শ দিলেন যে, সন্ন্যাসী একবার বাঁকুড়ায় যান, মেজেষ্টর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আপনার অবস্থা তাঁহাকে বলুন। মেজেষ্টর সাহেব অভয় দিলে পুলিসের সাহায্য লইয়া বর্দ্ধমানে যাইবেন; তখন পরাণ-বাবুর লাঠিয়াল আর কিছুই করিতে পারিবে না। পরাণ-বাবু বিষয় না দেন, তখন আদালত আছে।

এই পরামর্শ অনুসারে সন্ন্যাসী বাঁকুড়া যাত্রা করিলেন। পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিলেন না, সঙ্গে কোন লোক লইলেন না।

এই সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বাঁকুড়ার পার্শ্ববর্ত্তী মানভূম জেলার জঙ্গলী লোকের একটা এমন গোলমাল উপস্থিত করিয়াছিল যে, তাহাদের নিরস্ত করিবার নিমিত্ত মিলিটারী ফৌজ পাঠাইতে হইয়াছিল। এখন সে সকল গোলমাল চুকিয়া গিয়াছে; তথাপি ক্যাপ্টেন উইলকিন্সন নামে একজন সাহে পলিটিকেল এজেণ্ট হইয়া মানভূমে আসিয়াছেন, তাঁহার অধীন আর একজন আসিষ্টাণ্ট আসিয়াছেন, নাম ক্যাপ্টেন হানিংটন তাঁহারা উভয়ে বড় সতর্ক, মানভূমে বসিয় চিলের ন্যায় চারিদিকে দেখিতেছেন; কোথা দশজন পাঁচজন লোক একত্র হইতেছে, তাহা তাহা দেখিতেছেন, আর নোট করিতেছেন

পলিটিকেল এজেণ্ট নিযুক্ত হওয়া বাঁকুড়া ও মানভূমের মেজেষ্টরেরা এক সতর্ক হইয়াছিলেন, মনে মনে সঙ্কল্প করি থাকিবেন যে, "আর ঠকিব না, এবা বিদ্রোহ অঙ্কুরে বিনষ্ট করিব।"

এই সময় সন্ন্যাসী বাঁকুড়ায় গিয়া উ স্থিত হইলে কোথাও বাস না করিয়া সরকা সরকিট হাউসের নিকট একটী তেঁতুলতল গিয়া থাকিলেন, মেজেষ্টর সাহেবের বাটী

* কুঞ্জবিহারী এই অপরাধের নিমিত্ত পদচ্যুত

সন্ন্যাসীবেশে তথায় দেখা হওয়া বড় সম্ভব ছিল না। যে কারণেই হউক, সন্ন্যাসী সেই বৃক্ষমূলেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মনে করিয়া থাকিবেন, মেজেষ্টর সাহেব এই পথে হাওয়া খাইতে আসিলেই সাক্ষাৎ হইবে।

প্রতাপচাঁদ ফিরিয়া আসিতেছেন, এ বার্ত্তা বাঁকুড়া অঞ্চলের সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়াছিল। রাজা ক্ষেত্রসিংহ তাহাকে চিনিয়াছেন, এ কথাও লোকে শুনিয়াছিল; সুতরাং সকলে নিঃসন্দেহচিত্তে দলে দলে প্রতাপচাঁদকে দেখিতে আসিল।

মেজেষ্টর এলিয়ট সাহেব দেখিলেন, এই এক সময়। এবার আর ঠকা হইবে না, অতএব তৎক্ষণাৎ দারোগা, জমাদার, বরকন্দাজ সমভিব্যাহারে সন্ন্যাসীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসীকে গেপ্তার করিলেন। যাহারা তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা অনেকেই পলাইল, তথাপি প্রায় এক শত জন ধরা পড়িল। সকলেই জেলখানায় প্রেরিত হইল। বলা বাহুল্য, গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট গেল যে, একজন বিদ্রোহী গ্রেপ্তার হইয়াছে; সে ব্যক্তির পাল্লায় বিস্তর লোক ছিল, কেবল তাহার মধ্যে একশত জন ধরা পড়িয়াছে। সন্ন্যাসী জেলখানায় থাকিলেন।

যাঁহারা প্রতাপচাদের প্রত্যাগমনবার্ত্তা বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কলিকাতা হইতে একজন ইংরেজ উকীল বাঁকুড়ায় পাঠাইলেন। উকীলসাহেব গিয়া মেজেষ্টর সাহেবের নিকট গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্টের নকল চাহিলেন। মেজেষ্টর সাহেব বলিলেন, "কোন ওয়ারেণ্ট হয় নাই, আমার হুকুমই ওয়ারেণ্ট।"

উকীল সাহেব তখন আপনার মক্কেলের অপরাধ কি, জানিতে চাহিলেন এবং দরখাস্ত দিয়া বলিলেন, "চার্জের নকল দেওয়া হউক।" মেজেষ্টর সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "আমরা বৃক্ষস্থলে চার্জ লিখি না। তোমার মক্কেলের অপরাধ অবশ্য আছে, তাহা পূর্ব্বে বলা রীতি নহে।" সুতরাং উকীল সাহেব কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

প্রায় আট মাস পরে সন্ন্যাসী হুগলীতে প্রেরিত হইলেন। কেন, তাহার কোন হেতু প্রকাশ নাই। হুগলীর দায়রায় তাহার বিচার আরম্ভ হইল। কৌন্সিলি টর্টন সাহেব তাহার পক্ষ হইয়া হুগলীর আদালতে উপস্থিত হইলেন। জজ সাহেব তাঁহাকে কোন কথা কহিতে দিলেন না। তাহাতে টর্টন সাহেব রাগত হইয়া নিজমতে দরখাস্ত করিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, নিজামত আদালতে জজ সাহেবের হুকুম বাহাল থাকিল। সুতরাং সন্ন্যাসীর পক্ষসমর্থন করিবার জন্য কোন উকীল, কি কৌন্সিলি, কি মোক্তার কেহই থাকিতে পাইল না। জজ সাহেব একতরফা বিচার করিয়া সন্ন্যাসীকে ছয় মাস কারাবন্ধের আজ্ঞা দিলেন; এবং খালাসের পর চল্লিশ হাজার টাকার পরিমাণে এক বৎসরের নিমিত্ত ফেরজামিন দিতে হুকুম দিলেন।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিচারপতি! আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই যে, কি অপরাধের নিমিত্ত আমি দণ্ড পাইলাম।"

বিচারপতি বলিলেন, "তোমার নাম আলোক শা। তুমি মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদ বলিয়া লোক জুটাইয়াছ, রাজ্যের শান্তি ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়াছ।" সন্ন্যাসী নিরস্ত হইলেন।

সন্ন্যাসী যথারীতি ছয়মাস কারাবাস করিয়া চল্লিশ হাজার টাকার পরিমাণে এক-বৎসরের নিমিত্ত ফের জামিন দিয়া, ১৮৩১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের যে দিবসে খালাস হইলেন, সে দিবস হুগলীতে মহাসমারোহ হইল। কলিকাতা হইতে বিস্তর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাকে লইতে আসিয়াছিলেন। পরদিবস অর্দ্ধোদয়যোগ ছিল, সেই উপলক্ষে বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়ার বিস্তর লোক হুগলী ও ত্রিবেণীতে আসিয়াছিল; তাহারাও ঐ

সমারোহে যোগ দিল। পঞ্চকোটের রাজা ও বিষ্ণুপুরের রাজা উভয়েই যোগ উপলক্ষে আসিয়াছিলেন, উভয়েই জেলখানার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ অঞ্চলের ধনবানেরা দেশী বাদ্য, ইংরাজী বাদ্য, হাতী, ঘোড়া, রেসালা লইয়া তথায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। যখন জেলখানা হইতে জালরাজা বহির্গত হইলেন, অমনি হাতীর উপর হইতে নহবত বাজিয়া উঠিল, দূরে কাড়ানাগরা বাজিতে লাগিল, চারিদিকে হরিবোল পড়িয়া গেল, তিন চারি দল ইংরাজী বাদ্য বাজিয়া উঠিল। সকলে জালরাজাকে সহাসম্ভ্রমে সুখাসনে বসাইলেন, বাহকেরা সুখাসন স্কন্ধে তুলিল, চারিজন বালক চামর ব্যজন করিতে লাগিল। শত শত পতাকা দুলিতে দুলিতে আগে আগে চলিতে লাগিল। নগর প্রদক্ষিণ করিয়া শেষে কলের জাহাজে উঠিয়া রাজা কলিকাতায় আসিলেন এবং বাবু রাধাকৃষ্ণ বসাকের বাটীতে প্রথমে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

———

৭। কাপ্তেন লিটিলের লড়াই।

কয়েক মাস পরে, আত্মীয়-সকলের পরামর্শ অনুসারে অপাততঃ কলিকাতার সম্পত্তির নিমিত্ত সুপ্রিমকোর্টে নালিশ-মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইল।

বর্দ্ধমানের রাজা শ্রীলশ্রীযুক্ত মহাতাপচাঁদ তখন নাবালক। তাঁহার পূর্ব্ব-পিতা পরাণবাবু রাণী কমলকুমারীর পক্ষ হইয়া তাঁহার বিষয়াদি রক্ষণাবেক্ষণ করেন। সুপ্রিম কোর্টের মোকর্দ্দমা জবাব দিবার নিমিত্ত তিনি মদন-মোহন কর্পূরকে পাঠাইয়া দিলেন।

জালরাজা প্রকৃত পক্ষে প্রতাপচাঁদ কি না, ইহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত কলিকাতা অঞ্চলের অনেক প্রধান ব্যক্তির জবানবন্দী হইল। সকলেই স্বীকার করিলেন যে, বাদী সত্যই রাজা প্রতাপচাঁদ। তার পর, বর্দ্ধমানের লোকের সাক্ষ্য আবশ্যক হইল সুতরাং উকীলেরা পরামর্শ দিলেন যে, একবার প্রতাপচাঁদ স্বয়ং সেখানে গেলে ভাল হয়, যাঁহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন, তাঁহাদের দ্বারা সুপ্রিম কোর্টের মোকর্দ্দমা প্রমাণিত হইবে।

জাল-রাজা বর্দ্ধমানে যাইতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু কলিকাতানিবাসী যাঁহারা তাঁহার জামিন ছিলেন, তাঁহারা এক বৎসর পূর্ণ না হইলে যাইতে নিষেধ করিলেন; জাল-রাজা সুতরাং এক বৎসর অপেক্ষা করিলেন, তাহার পর বর্দ্ধমান যাত্রা করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। এই সময় উকীলদের পরামর্শমতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত ডেপুটী গবর্ণর এলেকজাণ্ডর রস সাহেবের নিকট একখানি দরখাস্ত করা হইল*। কিন্তু হালিডে সাহেব তখন সেক্রেটারী, তিনি দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলেন। †

দরখাস্ত অসঙ্গত হয় নাই, বর্দ্ধমানে গেলে পাছে কেহ অপমান করে বা অত্যাচার করে, এই ভয়ে দরখাস্ত করা হইয়াছিল; সে দরখাস্ত নামঞ্জুর হওয়ায় অনেকে সন্দেহ করিতে লাগিলেন। কি[illegible] জাল-রাজা সে সকল কথা কিছু মনে না [illegible]িয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বর্দ্ধমান যাত্রা করিলেন। কালনা [illegible]িয়া গেলে সুবিধা হয় বোধ করিয়া তিনি সেই

---

* Extract from petition dated 15th February 1838.

"Your memorialist prays, therefore, that your Honor will be graciously pleased to grant to him (through the proper chanel such means of safeguard to protect his person and life, from any eventual insult or danger during the time he may be obliged to stay at Burdwan."

† Reply.

"The prayer of this petition cannot be complied with."

Fort William. } (Signed) Fred. Jas. Halliday. Offg secy. to the Govt. of Bengal.

March 5. 1838.

‡ ইংরাজী সন ১৮৩৮ সালের মার্চ্চ মাস।

পথেই গেলেন। এ অঞ্চলের অনেকগুলি প্রধান ব্যক্তি সঙ্গে চলিলেন। সিঙ্গুরের শ্রীনাথ-বাবু—যাঁহাকে লোকে সচরাচর নবাব-বাবু বলিত, তিনি গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড হইয়া বর্দ্ধমান গেলেন।

জাল-রাজা সঙ্গে অধিক লোক লইলেন না; যে সকল ভৃত্যগণ ও প্রহরীরা তাঁহার পরিচর্য্যার্থ কলিকাতায় নিযুক্ত ছিল, কেবল তাহাদিগকেই লইলেন। তথাপি নৌকার বহর বড় মন্দ হইল না। রাজার নিমিত্ত একখানি পিনেস, সঙ্গীদের নিমিত্ত কয়েকখানি বজরা, চাকরদের নিমিত্ত পান্‌সী, তদ্ভিন্ন পাকের নৌকা, মালের নৌকা, চিড়িয়াখানার নৌকা, গায়কদের নৌকা, তাঞ্জামের নৌকা, এইরূপে ৪০ কি ৫০ খানা একত্র বাহিত হইল।

রাজা প্রতাপচাঁদ বর্দ্ধমান যাইতেছেন, এ কথা পরদিন গঙ্গার উভয় কূলে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। কুলবধূ অবধি গঙ্গাতীরে ছুটিয়া দেখিতে আসিল। মাস্তুলে মাস্তুলে রক্ত-পতাকা উড়িতেছে, নৌকার ছাদে তখমাওয়ালা প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে। কতই লোক নৌকা হইতে মুখ বাড়াইয়া কূল দেখিতেছে। কতই লোক কূল হইতে নৌকা দেখিতেছে। রাজা পিনেসের ভিতর আছেন, তাহার খড়খড়ি খোলা রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে দেখা যাইতেছে না। তাঁহার উদ্দেশে বৃদ্ধারা বলিতে লাগিল, "যাও বাছা! আপনার ঘরে যাও। কত দিন পথে পথে বেড়ালে, এখন ঘরে যাও।"

নৌকা গমনে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। তাঁহার কৌন্সিলি ও উকীল কেহই সঙ্গে আসিতে পারেন নাই। তাঁহাদের অপেক্ষায় তিনি এখানে সেখানে নৌকা রাখিয়া বিলম্ব করিতে লাগিলেন এবং সেই উপলক্ষে আত্মীয়দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে লাগিলেন। চুঁচুড়ার অপরপারে জাল-রাজা প্রায় অষ্টাহ ছিলেন। নিকটবর্ত্তী মোগল, ফরাসিস ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিস্তর লোক তথায় আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এই স্থানেই কাল্‌নার পুলিস আসিয়া তাঁহার পশ্চাৎ লয়। কে কে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছে, কাল্‌নার জমাদার তাহার এত্তেলা পাঠাইতে লাগিল। গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের মেজেষ্টরকে সংবাদ দিয়াছিলেন যে, 'জাল-রাজা কাল্‌না হইয়া বর্দ্ধমানে যাইতেছেন, সেই সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধে কি একখানা গোপন মিনিটও পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।* মেজেষ্টর সাহেব—তাহা পাঠ করিয়াই কিংকর্ত্তব্য স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন ও দারোগার উপর পরোয়ানা পাঠাইয়াছিলেন।

শেষ ২রা বৈশাখ † তারিখে জাল রাজা কাল্‌নায় পৌঁছিলেন। পৌঁছিয়াই দুই জন মোক্তারকে বর্দ্ধমান পাঠাইলেন। তাহারা মেজেষ্টর সাহেবের নিকট এই বলিয়া দরখাস্ত করিবে যে, "প্রতাপচাঁদ কাল্‌নায় পৌঁছিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা বর্দ্ধমান আইসেন। কিন্তু হুজুরের অভয় না পাইলে আসিতে সাহস করেন না।"

একদিন মেজেষ্টর সাহেব ডাক্তার চিক সাহেবের সঙ্গে একসঙ্গে কুঠী হইতে আহারান্তে বহির্গত হইতেছেন, এমত সময়ে গেটের নিকট দেখিলেন, কাল্‌না হইতে জাল-রাজার দুই জন মোক্তার দরখাস্ত লইয়া আসিয়াছে। কি দরখাস্ত, তাহা তিনি অনুসন্ধান না করিয়া একবারে উভয়কে গেপ্তার করিয়া জেলখানায় পাঠাইয়া দিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন মোক্তারের নাম রাধাকৃষ্ণ ঘোষাল। মোক্তারদের জেলখানায় পাঠাইয়া মেজেষ্টর সাহেব কাল্‌নার দারোগাকে হুকুম দিলেন যে, "তথায় জমিয়তবস্ত হইতে দিবে না, যদি জাল রাজা হুকুমমাত্রেই আপনার সঙ্গিদের

---

* এই মিনিটের কথা সুপ্রিমকোর্টে জবানবন্দীতে প্রকাশ পায়।

† ২রা বৈশাখ ১২৪৫, ইংরেজী ১৩ই এপ্রেল ১৮৩৮।

বরখাস্ত না করে, তবে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে।"

ইতিপূর্ব্বে পরাণ-বাবু জাল-রাজার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া পিয়ারালাল নামে একজন ক্ষত্রিয়কে কাল্‌নায় পাঠাইয়াছিলেন। সে ব্যক্তি এতদূর পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল যে, বাজারের কেহ কোন দ্রব্য জাল-রাজাকে বিক্রয় করিতে সাহস করিত না। অধিক মূল্যে যে যাহা বিক্রয় করিত, তাহা অতি গোপনে।

কাল্‌নায় একজন পাদরী থাকিতেন,তাঁহার নাম এলেক্‌জাণ্ডার। তাঁহাকে মেজেষ্টর সাহেব একখানি স্বতন্ত্র পত্র লিখিয়াছিলেন যে,জাল-রাজা কাল্‌নায় পৌঁছিয়া কিরূপ ব্যবহার করেন ও তাঁহার সঙ্গে কত লোক, তাহা গোপনে অনুসন্ধান করিয়া জানাইবেন। এ পত্রের সন্ধান পিয়ারালাল বাবু জানিতেন, অতএব পাদরী সাহেবের চক্ষে ধূলা দিবার জন্য তিনি একজন খ্রীষ্টানকে হস্তগত করিলেন। সেই খ্রীষ্টান যাহা বলিত, তাহাই পাদরী সাহেব মেজেষ্টরকে লিখিতেন, স্বয়ং কোন বিশেষ তদন্ত করিতেন না। এ কথা তিনি পরে জবানবন্দীতে আপনি স্বীকার করিয়াছিলেন।

কাল্‌নার দারোগা রাজবাটীর অনুগত, তাঁহার নিমিত্ত পিয়ারালাল বাবুকে কোন কষ্ট করিতে হইল না। দারোগা পুনঃ পুনঃ পিয়ারালালকে জানাইলেন যে, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এ অধীন জীবিত থাকিতে জাল-রাজা কখন কাল্‌নায় পদার্পণ করিতে পারিবে না।"

দারোগার নাম মহিবুল্লা। লেখাপড়া তিনি একবারে জানিতেন না। দারোগাগিরী কর্ম্মে লেখাপড়া জানা অনাবশ্যক বলিয়া তখনকার মেজেষ্টর সাহেব প্রায়ই মূর্খদিগকে এ কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। দরোগারা একজন করিয়া মুহুরি রাখিতেন, তাহারাই রিপোর্ট লিখিয়া দিত। দারোগারা কেবল তাহাতে মোহর ছেব্দ করিতেন। পিয়ারালাল বাবু মহিবুল্লার মুহুরিকে হস্তগত করিলেন।

জালরাজার মোক্তারেরা বর্দ্ধমানে পৌঁছিবা মাত্র যে জেলখানায় প্রেরিত হইয়াছে, এ সংবাদ জাল-রাজা কিছুমাত্র জানিতে পারেন নাই; সুতরাং বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলেন। কিন্তু কতদিন আর চুপ করিয়া নৌকায় বসিয়া থাকিবেন, একবার কাল্‌নায় নামিতে ইচ্ছা করিলেন।

৯ই বৈশাখ তারিখের প্রাতে বেলা ৮টার সময় নৌকা হইতে নামিবার উদ্‌যোগ হইল। তাঁহার সঙ্গে তাঞ্জাম ও বাহক ছিল, তাহারা তৎক্ষণাৎ পাথুরিয়ামহল ঘাটে গিয়া নৌকা ভিড়াইল। নগরে রাষ্ট হইল যে, রাজা আসিতেছেন। আবালবৃদ্ধ সকলে পাথুরিয়ামহল ঘাটের দিকে ছুটিল। পিয়ারালাল থানার দিকে ছুটিলেন। দারোগা তখন অতি ব্যস্ত হইয়া পোষাক পরিতেছিলেন, পিয়ারালাল গিয়া বলিলেন, 'সর্ব্বনাশ হইল, শীঘ্র আসুন। দারোগা পাগ্‌ড়ী জড়াইতে জড়াইতে বলিলেন, "ভয় কি, এই আমি চলিলাম, কাহার সাধ্য এখানে ভিড়ায় ? মহিবুল্লা দারোগা বাহির হইলেন ; সঙ্গে জমাদ্দার, বরকন্দাজ চৌকীদার প্রভৃতি অনেক চলিল। তাঁহার ইচ্ছা—সদর্পে চলেন, কিন্তু তিনি অতি স্থূলকায়;* একটী প্রকাণ্ড মহিষাকার বলিলেও হয়! সদর্পে বা শীঘ্র চলা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য সুতরাং মহিবুল্লা যথাকালে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। তখন জাল-রাজার নৌকা ঘাটে ভিড়াইতেছে। মহিবুল্লা তখন অতি ব্যস্ত হইয়া নৌকার নিকটে গেলেন, আভূমি নতশিরে জাল-রাজাকে সেলাম করিয়া যোড়করে দাঁড়াইলেন। রাজা নৌকা হইতে তাঞ্জামে উঠিলেন, একজন ভৃত্য আসিয়া রাজার দক্ষিণদিকে একখানি তরবারি রাখিয়া

---

*"Mahiboollah, the worthy Darogah of Culna the constituted authority, who can neither read not write, not walk not run" Petition to the Nizamut Andalut

গীন। * আর এক জন ছাগ ধরিল, তৃতীয় একজন আড়ানি ধরিল, অপর দুইজন চামর করিতে লাগিল, পাঁচ ছয় জন আশা-সোটা ধরিল। সম্মুখে নকিব ফুকারি: উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে মহিবুল্লা ফুকারিয়া উঠিলেন—"তফাৎ, তফাৎ"—আর লোক তাড়াইতে লাগিলেন। তাঞ্জামের দুই পাশে দুইজন আরদালী তাঞ্জাম ধরিয়া যাইতেছিল,মহিবুল্লা একজনকে সরাইয়া আপনি আরদালী হইয়া তাঞ্জাম ধরিয়া চলিলেন। জাল-রাজাকে দেখিয়া গঞ্জের বৃদ্ধ মহাজনেরা চিনিল,তাহারা আসিয়া গলায় কাপড় দিয়া দাঁড়াইল; দূর হইতে স্ত্রীলোকেরা উলু দিতে লাগিল; আনন্দের আর সীমা রহিল না। নগর প্রদক্ষিণ করিয়া রাজা নৌকারোহণ করিলেন। সেই সময়ে কয়েক জন বৃদ্ধ আসিয়া আপন আপন পরিচয় দিতে লাগিল, রাজা তাহাদের সঙ্গে অনেক পূর্ব্বকথা কহিলেন। বৃদ্ধেরা আহ্লাদে চক্ষের জল মুছিয়া ঘরে ফিরিল।

এই ব্যাপারের কথা পাদরী এলেকজাণ্ডার সাহেব আপনার খৃষ্টানের নিকট শুনিয়া তৎক্ষণাৎ মেজেষ্টরকে লিখিলেন যে, একশত তরবারধারী আর দুই শত সড়কিওয়ালা লইয়া প্রতাপচাঁদ কাল্না প্রদক্ষিণ করিতে গিয়াছে। রাজবাটীর প্রতি তাহার লক্ষ্য ছিল; কেবল সুদক্ষ দারোগার জন্য কিছু করিতে পারে নাই। ছয় হাজার কি আট হাজার লোক জমিয়াছিল। যদি প্রতাপচাঁদকে শীঘ্র দমন করা না হয়, তবে বোধ হয়, একটা দাঙ্গা উপস্থিত হইবে। †

পত্র পাইয়া মেজেষ্টর সাহেব প্রতাপচাঁদের গেপ্তারি জন্য তাঁহার চতুর নাজীর আসাদ আলিকে পাঠাইয়া দিলেন। পরাণবাবুও এই সুযোগ পাইয়া রাধামোহন সরকারের সঙ্গে বিস্তর লাঠিয়াল পাঠাইলেন।

পূর্ব্বে সমুদয় বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে একজন পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। মেজেষ্টরেরা তাঁহারই আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিতেন। যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে, সেই সময় স্মিথ সাহেব এই পদে ছিলেন। কিন্তু তিনি জাল-রাজাকে গ্রেপ্তার করিতে পরামর্শ কি হুকুম দেন নাই, তিনি কেবল লিখিয়াছিলেন যে, যদি জাল-রাজা আপনার লোক বিদায় না করে, তবে তাহার নিকট হইতে ফেল-জামিন লইতে পার। * মেজেষ্টর সাহেব এই পরামর্শ অনুসারে পূর্ব্বে পরোয়ানা জারি করিয়াছিলেন। জালরাজাও তদনুসারে লোক বিদায় করিতে চাহিয়াছিলেন; কেবল এইমাত্র ওজর করিয়াছিলেন যে, কোন্ কোন্ লোক বিদায় করিবেন, তাহা তাঁহাকে বলিয়া বা দেখাইয়া দিতে হইবে; কিন্তু মেজেষ্টর সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া একেবারে তাঁহাকে গ্রেপ্তারের নিমিত্ত নাজীরকে পাঠাইলেন। নাজীরকে পাঠাইয়াও তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার স্মরণ হইল

---

* বর্দ্ধমানের রাজারা জাতিতে ক্ষত্রিয়। জাতীয় ধর্ম্মানুরোধে হউক অথবা রাজা বলিয়াই হউক, তরবারি তাহাদের পরিচ্ছদের মধ্যে গণ্য। কিন্তু জালরাজার তাঞ্জামে তরওয়ার থাকায় "drawn sword" বলিয়া পাদরী সাহেব রিপোর্ট করিয়াছিলেন ও মেজেষ্টর সাহেব ভয় পাইয়াছিলেন।

† My dear sir,—Protap Chund has just gone on board his boat, after parading the whole lenghth of Kalna in a Tonjohn with a drawn sword in his own hand, attended by upwards of a hundred swordsmen and double that number of stickmen. The concourse was altogether 6 to 8,000 He appeared to be intent on the Rajbarry But your active Darogah prevented him. The aspect of things, I think, threatens an affray if he is not checked soon.

I am &c. A. ALEXANDER.

* Extract from Superintendent's letter. No 400, dated 28th. April, 1838.

"4th The conduct of the claimant of the Burdwan Raj, appears to me to be of such a dangerous nature, so insulting to the family

যে, পূর্ব্বদিন একটী পল্টন * বর্দ্ধমান দিয়া বারাকপুর গিয়াছে। অতএব আর ইতস্তত: না করিয়া পত্র দ্বারা তাহার কাপ্তেনকে পথে আটক করিলেন। জজ সাহেব এই বার্ত্তা শুনিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং মেজেষ্টর সাহেবের সঙ্গে ডাক্তার চিক সাহেব কালনায় যাইতেছেন শুনিয়া আপনার দুইটী পিস্তলে স্বহস্তে গুলী পুরিয়া উভয়কে সাদরে দিলেন।

কাপ্তেন সাহেব পত্র পাইয়া সিপাহী-সমভিব্যাহারে বৈঁচিতে অপেক্ষা করিয়া থাকিলেন। সেই দিন অপরাহ্নে মেজেষ্টর সাহেব স্বয়ং আর ডাক্তার সাহেব একসঙ্গে তথায় উপস্থিত হইলেন। জালরাজার সংবাদের নিমিত্ত মেজেষ্টরের আদেশমত ডাক্তার সাহেব তথা হইতে কালনার পাদ্রীকে এক পত্র লিখিলেন। উক্ত পাদ্রী ভয় দেখাইলেন, সুতরাং মেজেষ্টর সাহেব ফৌজ লইয়া তৎক্ষণাৎ কালনা যাত্রা করিলেন।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে পল্টন কালনায় পৌঁছিল। কাপ্তেনের নাম লিটিল। তিনি মেজেষ্টর সাহেবের পরামর্শমতে প্রথমে সিপাহী লইয়া পাদরী সাহেবের কুঠীতে গেলেন, তথায় স্থির হইল যে, মেজেষ্টর এবার নদীর কূলে গিয়া সংবাদ লইয়া আসিবেন; তাহার পর ইতিকর্ত্তব্য স্থির হইবে। ওগলবি সাহেব পিস্তল হস্তে লইয়া দারোগা ও নাজীরের সঙ্গে ঘাটে গেলেন। তথা হইতে কাপ্তেন লিটিলকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে "বিনা যুদ্ধে জাল প্রতাপকে গ্রেপ্তার করা কঠিন। অতএব আপনি সসৈন্য সত্বর আসুন।" পত্র পাইয়া কাপ্তেন সাহেব হুকুম দিলেন, অমনি সিপাহীরা বন্দুকে গুলী গাদিল, তাহার পর গম্ভীর-পদচারণে তাহারা গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইল। সম্মুখে জল কল কল করিয়া ছুটিতেছে, এখানে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে সিপাহীরা বুঝিতে পারিল না। গঙ্গার মধ্যস্থলে একখানি পিনাস নঙ্গর করিয়া রহিয়াছে, তৎপশ্চাৎ চারিখানি পান্‌সী ব্যতীত আর কিছু নাই। মাঝিরা নৌকার ছাদে, ভদ্রলোকেরা নৌকার ভিতরে নিদ্রা যাইতেছে। রাত্রি তৃতীয় প্রহর। নৌকার আলোক নিবিয়া গিয়াছে।—সকল অন্ধকার, সকলে ঘুমাইতেছে। এমন সময় কাপ্তেন সাহেব মেজেষ্টরের সহিত কি পরামর্শ করিয়া ফায়ারের হুকুম দিলেন। ওগলবি সাহেব নৌকা দেখাইয়া "মার মার" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনার পিস্তল ছুড়িলেন, অমনি গুড় গুড় করিয়া পল্টনের বন্দুক গর্জ্জিয়া উঠিল। নৌকার ছাদে যাহারা নিদ্রিত ছিল, তাহাদের মধ্যে ১৮ জনের নিদ্রা ভাঙ্গিল না, অপরমধ্যে কাহার হাত ভাঙ্গিল, কাহার পা ভাঙ্গিল, কাহার দেহ উলটিয়া জলে পড়িল। জাল-রাজা হঠাৎ উঠিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন। পশ্চাতে বজরা হইতে আর একজন লাফ দিয়া গঙ্গায় পড়িলেন, তাঁহার নাম রাজা নরহরিচন্দ্র—নিবাস হরধাম। উভয়ে গঙ্গা পার হইয়া শান্তিপুরের উত্তরে একস্থানে লুকাইয়া থাকিলেন।

এদিকে যুদ্ধ ফুরাইল, যুদ্ধের পর লুঠ। সুতরাং লুঠ আরম্ভ হইল। সিপাহীরা ঘাট হইতে নৌকা খুলিয়া লইয়া পিনাসে আসিল;

---

in possession, that I think there is every reason to apprehend a serious affray.

5th Considering the tendency of his acts to tumult and riot, I am of opinion, that you will be fully justified in requiring to disband his array, and so behave himself like a good and quiet subject, and on his refusal to obey or evasion of your orders, I think you will be fully justified in calling on him furnish good security to keep tre peace.

"6th. It will be necessary previous to the adoption of such a measure to take evidence of his having assembled such a body of men, and of the tendency of their conduct to break the peace."

* A detachment of 3rd Regiment N. I under the command of Captain Little

সঙ্গে সঙ্গে আসাদ আলি নাজীর ও মহিবুল্লা দারোগা আপন আপন দলবল লইয়া উপস্থিত হইলেন। জাল-রাজা রাজা সাজিয়াছেন, কর্জ্জ করিয়া রাজার আসবাব কিনিয়াছিলেন, সোণার আশা, সোণার সোটা, সোনার ছাতি, সোণার আড়ানি, লুঠের মুখে তৎসমুদয় অন্তর্হিত হইল।

লুঠ শেষ হইলে পর গ্রেপ্তার আরম্ভ হইল। মাঝিমাল্লা, খানসামা, খেজমৎগার, যাহারা গুলী বৃষ্টিতে রক্ষা পাইয়াছিল এবং জলে ঝাঁপ দিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিল, তাহারা সকলেই ধরা পড়িল; কিন্তু তাহাদের সংখ্যায় নাজীরের মন উঠিল না। দারোগা নাজীর উভয়েই রিপোর্ট করিয়াছেন যে, রাজার সঙ্গে ৭০০ কি ৮০০ লোক। রাজা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন তাঁহার সঙ্গে ৩৪২ জন লোক। এখন অল্প লোক চালান দিলে গ্রেপ্তার অসম্পন্ন হয়; সুতরাং গ্রেপ্তারীর আড়ম্বর কিছু বাড়াইতে হইল। নিকটে দুই একখানি তীর্থযাত্রীর নৌকা ছিল, নাজীর সে সকল নৌকা হইতে যাত্রীদিগকে বাহির করিয়া আনিলেন। তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি স্ত্রীলোক বাহির হইল। কিন্তু স্ত্রীলোক বলিয়া ত্যাগ করার আর সময় নাই; সুতরাং তাহারাও জালরাজার সঙ্গী বলিয়া গ্রেপ্তার হইল। ওগলবি সাহেব ২রা মে (১৮৩৮) তারিখের রোবকারীতে সেই হতভাগ্যদের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। দ্রবময়ী বেওয়া, সুর্য্যি, গঙ্গামণি, অনু, চন্দ্রমণি তুলসী, পদ্ম গোয়ালিনী, রূপ, পদ্ম ঠাকুরাণী, গয়া ঠাকুরাণী, দাসী ঠাকুরাণী ইত্যাদি। বৃদ্ধারা বর্দ্ধমানে চালান গিয়া প্রায় নয় মাস তথায় আবদ্ধ থাকিল। যেরূপ তখন গবর্ণমেণ্ট ছিল, যেরূপ কর্ম্মচারী ছিল, যেরূপ সমাজ ছিল, তাহাতে বিপদ্গ্রস্তের নিকটে আসিলে বিপদ্গ্রস্ত হইতে হইত। মন্দ সমাজের দোষ এই। যদি আমাদের সমাজ ভাল হইত, যদি আমরা নিজে ভাল হইতাম, আসাদ আলি ভাল হইতেন, মহিবুল্লা ভাল হইতেন, তাহা হইলে মেজেষ্টর সাহেব অত্যাচার করিতে সাহস পাইতেন না, যেরূপ সমাজ, সেইরূপ গবর্ণমেণ্ট হইয়া থাকে। সমাজের দোষে গবর্ণমেণ্ট মন্দ হয়, সমাজের গুণে গবর্ণমেণ্ট ভাল হয়।

কালনাগঞ্জের যে সকল বৃদ্ধ দোকানদার জাল-রাজাকে চিনিয়াছে বলিয়াছিল, তাহারাও তীর্থযাত্রীর সঙ্গে সঙ্গী হইল। তথাকার কতকগুলি স্ত্রীলোকও সেই দশাপন্ন হইল। মেজেষ্টর সাহেব তাহাদের সম্বন্ধে পূর্ব্বকথিত রোবকারীতে লিখিয়াছেন যে, "তারা আর গুণমণি জালরাজার লোককে বাটীতে অন্ন পাক করিতে দিয়াছিল। গৌরমণি তারার বাটীতে থাকে। গোবিন্দ সরকার আর নাথ পাইক গুণমণির দোকানে চাকুরী করে। আর তারাকে যখন গ্রেপ্তার করা হয়, তখন সেখানে কিশোরমণি উপস্থিত ছিল। সুতরাং এই সমস্ত লোকই গ্রেপ্তার-যোগ্য।"

এইরূপে ২৯৪জন গ্রেপ্তার হইয়া বর্দ্ধমানের জেলখানায় প্রেরিত হইল। জালরাজা আর নরহরিচন্দ্র শান্তিপুরের নিকটে ধরা পড়িলেন। কিন্তু জাল-রাজাকে বর্দ্ধমানে না পাঠাইয়া হুগলীর জেলে পাঠান হইল। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, তাঁহাকে বর্দ্ধমানে চালান দেওয়া হয়। তিনি ত বর্দ্ধমানেই যাইতেছিলেন, রাজার মত যাইতেন—না হয় অপরাধীর মত গেলেন। যেরূপেই যান, বর্দ্ধমানে যাইতে পারিলেই তাঁহার কার্য্য সিদ্ধ হইবে, এই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা পূরণ হইল না। সিপাহী-পরিবেষ্টিত হইয়া হুগলীতে বিচারের নিমিত্ত প্রেরিত হইলেন। কিন্তু যে জেলায় অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইল, সে জেলায় তাঁহার বিচারের পক্ষে কি আপত্তি ছিল, তাহা কোন কাগজপত্রে প্রকাশ নাই। কেহ কেহ অনুভব করেন, পূর্ব্বেই পরামর্শ ছিল, তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া হুগলীর জেলখানায় পাঠাইতে হইবে। নরহরিচন্দ্র প্রভৃতি আর সকলে বর্দ্ধমানে প্রেরিত হইলেন।

জাল-রাজা গ্রেপ্তার হইলে পর, তাঁহার উকীল ডব্লিউ, ডি, সা (W. D. Shaw) গ্রেপ্তার হইলেন। তিনি পূর্ব্বে জাল-রাজার সমভিব্যাহারে আসিতে পারেন নাই। লড়ায়ের তিন চারি দিন পূর্ব্বে আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। যে রাত্রে লড়াই হয়, সে রাত্রে সা সাহেব উপস্থিত ছিলেন না—নিকটে পাইগাছি গ্রামে লায়েল সাহেবের নীলকুঠীতে গিয়াছিলেন, প্রাতে তথা হইতে আসিতেছিলেন, পথে ওগলবি সাহেব তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন। উকীল (British born subject) প্রভৃতি কত কথাই বলিলেন। মেজেষ্টর সাহেব তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। গ্রেপ্তারের সময় সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার কি অপরাধ ? মেজেষ্টর সাহেব মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "রাজদ্রোহিতা (treason)"।

মেজেষ্টরের মুখে হঠাৎ যাহা আসিয়াছিল, তাহাই যে তিনি বলিয়াছিলেন—এমত নহে। পরে পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আপনার ১৮৩৯ সালের ২৪শে মে তারিখের ৫২৭ নং পত্রে এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি আসামীদের এই বলিয়া উল্লেখ করেন যে,

"Persons accused of being conspirators against the Government, and of resistance to the constituted authorities."

সা সাহেব গ্রেপ্তার হইয়াছেন—এই জনরব শুনিয়া পাইগাছির নীলকর সাহেব তাহা সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত তাঁহার একজন সরকারকে পাঠাইয়া দিলেন। আসামীর তত্ত্ব লইতে আসিয়াছেন বলিয়া এই সরকারকে তৎক্ষণাৎ হাজতে যাইতে হইল এবং সে ব্যক্তি যে হাতী চড়িয়া আসিয়াছিল, সে হাতীটীও সেই সঙ্গে গ্রেপ্তার হইল।

প্রতাপচাঁদের পরম বন্ধু নবাব-বাবু সিঙ্গুর হইতে একাকী বর্দ্ধমানে গিয়া অপেক্ষা সাহেব কিরূপে পাইলেন, পাইয়া যথানিয়ম তাঁহাকে জেলে পুরিলেন।

তাহার পর, আর কাহাকে গ্রেপ্তার করিবেন খুঁজিতে লাগিলেন। শেষ সন্ধান পাইলেন যে, বিলকুলির নবাব আনওয়ার আলি জালরাজার স্বপক্ষ; অতএব তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্ত হুগলীর মেজেষ্টরকে পত্র লিখিলেন। সেই সঙ্গে জাহানাবাদের রামদীন সিংহ ও বল্লালদীঘির হাফেজ ফতে আলিকে গ্রেপ্তার করিতে অনুরোধ করিলেন আরও জনকয়েককে গ্রেপ্তার করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তিনি সন্ধান পাইয়াছিলেন যে কলিকাতার মুলুকচাঁদ-বাবু, পানিহাটি জয়নারায়ণ-বাবু প্রভৃতি কয়েকজন জাল রাজার নৌকায় ছিলেন। কিন্তু তাঁহা দের গ্রেপ্তার করিবার কি চেষ্ট হইয়াছিল, তাহা কাগজপত্রে প্রকা নাই।

লড়াই হইল, লুঠ হইল, গ্রেপ্তার হইল কিন্তু একটা কাজ বাকি থাকিল। মেজে ষ্টারিতে এত্তেলা গিয়াছিল যে, জাল-রাজা সঙ্গে পাঁচ সাত শত অস্ত্রধারী আছে; কি তাহাদের সেই সব অস্ত্র কোথায় গেল নৌকায় পনরখানি তরোয়ার, ৩টী ৪টী বন্দুক আর একটী পিস্তল ব্যতী আর কিছুই পাওয়া যায় না দারোগা সাহেব বড়ই গোলে পড়িলে আসাদ আলি নির্ভীক পুরুষ—তৎক্ষণ কালনার রাজবাটী হইতে এবং অন্যান্য স্থ হইতে ৮৬ খানি তরওয়ার সংগ্রহ করিলে তাহার পর মেজেষ্টর সাহেবকে জানাইলে যে "সিপাহীরা সমস্ত তরোয়ার লুঠ করি লইয়া গিয়াছে, আমি বহুযত্নে তাহাদে নিকট হইতে পঞ্চাশখান মাত্র উদ্ধার ক য়াছি। এখনও তাহাদের নিকট এত তরো য়ার আছে যে, গাড়ী বোঝাই হইতে পারে কাপ্তেন লিটিল এই সময় হুগলীতে পৌঁছি ছেন অনুভব করিয়া ওগলবি সাহেব হু লীর মেজেষ্টরকে পত্র লিখিলেন যে, সিপা

পাঠাইয়া দিবেন ; কেন না, সেই তরোয়ার-গুলিই এই মোকর্দ্দমার প্রধান প্রমাণ। *

——

৮। ওগলবি সাহেব আসামী।

কাপ্তেন লিটিল সাহেবের যুদ্ধের পর কলিকাতার ইংরাজী কাগজে তাঁহার বিস্তর প্রশংসা প্রকাশ হইল। ৮ই মে তারিখের হরকরা লিখিলেন যে, সিপাহীদের বুঝিবার দোষে কয়জন লোক আহত হইয়াছিল বটে, কিন্তু "the arrangements and proceedings of this officer (captain Little) reflect equal credit on his judgment and humanity." শেষ কথাটা বড় ঠিক।

জালরাজা সম্বন্ধে তাঁহারা কেহ কটু বলিলেন, কেহ রসিকতা করিলেন। কোরিয়ার (courier) পত্রের সম্পাদক লিখিলেন, "there is a good chance of his closing his eventful career and exalted character." হরকরা তাহার টীকা করিয়া বুঝাইলেন যে, "exalted situation অর্থে বুঝিতে হইবে,—ঊর্দ্ধ ফাঁসীকাটে ঝুলন।" লোকে ভাবিল, বিচার বটে। খুন করিল কোম্পানীর সিপাহী, ফাঁসী যাইবে জাল-রাজা।

এই সময় কে একজন সম্পাদককে ধমক দিয়া হরকরায় লিখিলেন যে, "আমি বিশেষ জানি, সে রাত্রে নৌকার নর্দ্দমা দিয়া রক্ত গড়াইয়া গঙ্গায় পড়িয়াছিল—ঘুমন্ত লোকের রক্ত। তোমরা তাহা ভুলিয়া কেবল কাপ্তেনের প্রশংসা করিতেছ, মেজেষ্টরের প্রশংসা করিতেছ। এই ঘটনা যদি আজ ইংলণ্ডে হইত, তাহা হইলে সেখানকার সম্পাদকগণ কি বলিতেন?" এই পত্রের পর সম্পাদকের সুর যেন একটু ফিরিল, তদারকের নিমিত্ত তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন। ক্রমে ডেপুটী গবর্নর রস সাহেবের আসন একটু টলিল, তিনি তদারকের হুকুম দিলেন। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, তখন মেজেষ্টরদিগের উপর পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন, তাঁহার নাম স্মিথ সাহেব। তদারকের ভার সুতরাং তাঁহার উপরেই পড়িল। কিন্তু তিনি অতি প্রধান পদস্থ ব্যক্তি। যখনই কিছু তদারকের প্রয়োজন হইয়াছে, তিনি এ কাল পর্য্যন্ত মেজেষ্টরকে তাহার ভার দিয়া আসিয়াছেন। এবারও তাহাই দিলেন। সুতরাং মেজেষ্টর ওগলবি আপনার অপরাধের তদারক আপনি করিতে বসিলেন।

এদিকে উকীল সা সাহেবের কেরাণী জয়-নারায়ণ চন্দ্র এফিডেবিড করিয়া সা সাহেবের খালাসের নিমিত্ত সুপ্রিমকোর্টের (Writ of Habeas Corpus) পরোয়ানা বাহির করিলেন। কিন্তু সে পরোয়ানা ওগলবি সাহেব বড় গ্রাহ্য করিলেন না।

যতক্ষণ কথা হইতেছিল, বাঙ্গালীর রক্ত নৌকার নর্দ্দমা দিয়া গড়াইয়াছে, ততক্ষণ ওগলবি সাহেবের ন্যায় মেজেষ্টরের নিমিত্ত কোন ইংরাজের ভয় হয় নাই, কিন্তু যাই

---

* Extract from a letter from the Acting Magistrate of Burdwan to the Magistrate of Hooghly. Dated the 9th May 1838.

"In my recent capture of SO DISTANT Rajah of Burdwan, with his armed followers, some hundreds of swords were discovered in his boats. The Sepoys however, of Captain Little's detachment considering them their fair plunder, appropriated to themselves as many as they could carry away. Their camp followers did the same and my Burkundazes and Chowkeedars caught the infection, so that here are only now 86 swords forthcoming, of which upwards of 50 were received from sepoys * * As Captain Little is today at Hooghly may I request you will join with him, if necessary in making the necessary search in his camp, and do your best to get possession for me the plundered swords. It is of the greatest importance to get them, as they form such strong evidence in the case.

প্রকাশ হইল যে, সুপ্রিমকোর্টের পরোয়ানা এই মেজেষ্টর অগ্রাহ্য করিয়াছেন, আর অমনি হরকরা লিখিলেন যে, তবে আমাদের আর রক্ষা নাই।

"The British inhabitants of Bengal will now look with intense anxiety to the course which Sir Edward Rayn may adopt on this occasion. On him will depend in a great measure the degree of protection for life and property, and freedom, Europeans not in the service may expect. If it be once ruled that a Company's servant can hold a writ of Habeas corpus at arm's length no man is safe."

কিছুদিন পরে মেজেষ্টর সাহেব জামিন লইয়া সা সাহেবকে খালাস দিলেন। কলিকাতায় পৌছিয়াই সা সাহেব ওগলবির নামে বে-আইনি কয়েদ রাখার জন্য পুলিসে নালিস করিলেন। এই মোকর্দ্দমার এজাহারে অনেক কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। সুপ্রিম-কোর্টের এটর্ণি ও কৌন্সিলিদের মধ্যে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। মফস্বলের অরাজকতা-সম্বন্ধে সকলে একবাক্য হইলেন। সকলেই বলিলেন যে, ওগলবির নামে খুনের নালিস আনা উচিত, কিন্তু শেষ স্থির হইল যে, প্রথমে গবর্ণমেণ্ট কি করেন, তাহা দেখিয়া পরে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য মীমাংসা করা যাইবে। পুলিসে যে জবানবন্দী হইয়াছিল, কৌন্সিলিরা তাহার নকল গবর্ণমেণ্টে পাঠাইলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট মনোযোগ না করায়, তাঁহারা ওগলবি সাহেবের নামে খুনের নালিস উপস্থিত করাইলেন।

স্মিথ সাহেব দেখিলেন যে, গতিক বড় ভাল নহে, সুতরাং তাঁহাকে বর্দ্ধমানে যাইতে হইল। তথা হইতে তিনি কি রিপোর্ট করিলেন, আমরা তাহা দেখি নাই, কিন্তু সে রিপোর্ট পাইবার পর গবর্ণমেণ্ট কিছুদিনের নিমিত্ত ওগলবি সাহেবকে ছুটী দিলেন।

এদিকে রাষ্ট হইল যে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহা[কে] সস্‌পেণ্ড করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক ত[াহা] নহে। সুপ্রিম-কোর্টে হাজির হইতে হই[বে] বলিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অবকাশ দি[য়া]ছিলেন, এবং যথানিয়মে তাঁহাকে সম[স্ত] বেতনও দিয়াছিলেন।

এই স্থলে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, আ[মা]দের মধ্যে শাক্ত আর বৈষ্ণবে যেরূপ দ[লা]দলি ছিল, এ দেশে ইংরেজদের মধ্যে কো[ম্পা]নীর চাকর আর অপর দলে প্রায় সেই[রূপ] হইয়া পড়িয়াছিল। যে সাহেবেরা কো[ম্পা]নীর চিহ্নিত চাকর (Covenant servants) তাঁহাদের অহঙ্কার ছিল, আমরা এ দেশের হর্ত্তাকর্ত্তা, আর কে[হ] সাহেব আমাদের সমকক্ষ নহে। সুপ্রি[ম-]কোর্টের উকীল কৌন্সিলিরা কোন মো[ক]দ্দমায় মফস্বল-আদালতে আসিলে এই হ[র্ত্তা]কর্ত্তাদের যথেচ্ছাচারিতার কিছু ব্যাঘ[াত] হইত, এবং বিদ্যাবুদ্ধিও ধরা পড়িত, সুত[রাং] তাহারা কৌন্সিলিদিগকে চক্ষে দেখি[তে] পারিতেন না। কোম্পানীর কোন কে[ান] জজ, আপন আপন নির্ভীকতা অথবা যথে[চ্ছা]ক্ষমতা দর্শাইবার জন্য কৌন্সিলিকে ক[খন] কখন তুচ্ছ করিতেন, তাহার মক্কেলের স[র্ব]নাশ করিতেন, আইনকানুন কিছু মানিতে[ন] না, শুনিতেন না; সুতরাং কৌন্সিলি[রা] চিহ্নিত চাকরদের প্রতি একটু অশ্রদ্ধা ক[রি]তেন। অপর সাহেবেরাও বিশেষ স[ম্মান] পাইতেন না বলিয়া চিহ্নিত চাকরদের প্র[তি] একটু বিরক্ত ছিলেন।

এই দলাদলির ফল কতকটা এই স[ময়] ফলিয়াছিল। এ দলাদলি না থাকি[লে] ওগলবি সাহেব হয় ত সা সাহেবকে ক[য়েদ] করিতেন না। কিন্তু তাহা না করিলে, [হয়] ত কাল্‌নার হত্যাকাণ্ড কৌন্সিলিদের অ[ঙ্গ] স্পর্শ করিত না। কাল্‌নার ব্যাপার সম্ব[ন্ধে] যাহা কিছু তদারক হইয়াছিল, তাহা কে[বল] কৌন্সিলিদের উদ্‌যোগে। ওগলবি সাহে[ব] যে খুনের নিমিত্ত আসামী হইয়াছিলে[ন], তাহাও তাঁহাদের যত্নে। নতুবা এই হ[ত্যা]

কাণ্ড হয় ত গবর্ণমেণ্ট শুনিতে পাইতেন না।

ওগলবি সাহেবকে কলিকাতার মেজেষ্টর ওহনলন সাহেব জামিন লইয়া দায়রায় সোপর্দ্দ করিলেন। বিচার সুপ্রিম-কোর্টের জজ সার জে, পি, গ্রাণ্ট সাহেবের নিকট ১৩ই আগষ্ট তারিখে আরম্ভ হইল। জজ, কৌন্সিলি প্রভৃতি সকলেই পরচুল (Periwig) পরিয়া স্ব স্ব স্থানে আসিয়া বসিলেন। তখনও সাহেবদের মধ্যে পেরি উইগ পরার প্রথা ছিল। পিটার কোং (Pittar & Co) তখন কলিকাতার মধ্যে প্রধান পেরি উইগওয়ালা। জুরি সকলেই ইংরেজ; তাঁহাদের মধ্যে প্রথমে একজন বাঙ্গালী ছিলেন, কিন্তু আসামীর কৌন্সিলি আপত্তি করায় তাঁহার পরিবর্ত্তে আর একজন ইংরেজ মনোনীত হইলেন।

আসামী ওগলবি হাজির হইলেন। আর তাহার সে তেজ, সে দাম্ভিকতা নাই, মুখখানি শুকাইয়াছে,বড় দুর্ব্বল। পীড়া হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে বসিতে একখানি কেদারা দেওয়া হইল, তাঁহার মুখ দেখিয়া ইংরেজে পীড়া মনে করিয়াছিল; কিন্তু তিনি বাঙ্গালী হইলে লোকে বলিত,ভয়ে তাঁহার মুখ শুকাইয়াছে। আসল কথা, যাহারা অত্যাচারী, তাহারা বড় ভীরু। যাহারা সুবিধা পাইলে অত্যাচার করে, তাহারা ধরা পড়িলে পায়ে ধরে। ওগলবি সাহেব বড় ভীরু ছিলেন, তাই তিনি এত অত্যাচার করিয়াছিলেন, এবং ধরা পড়িয়া তাই তাঁহার মুখ এত শুকাইয়াছে।

তাঁহার পক্ষে কৌন্সিলি প্রিন্সেপ। ফরিয়াদীর পক্ষে কৌন্সিলি লঙ্গবিলক্লার্ক। ফরিয়াদীর পক্ষে সাক্ষীর জবানবন্দী আরম্ভ হইল।

এক জন সাক্ষী জাল-রাজা। তাঁহাকে দুইজন সার্জন আর মেজেষ্টর সাহেব স্বয়ং সঙ্গে করিয়া হুগলী হইতে আলিপুরের জেলে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। আলিপুর হইতে তাঁহাকে সার্জ্জনের পাহারায় আদালতে আনা হইল, এবং যখন তিনি জবানবন্দী দিবার জন্য দাঁড়াইলেন, তখনও তাঁহার দুই পার্শ্বে দুইজন সার্জ্জন তাঁহাকে ঠেসিয়া দাঁড়াইল। তাহা দেখিয়া অনেকে হাসিতে লাগিল, সকলেই বুঝিল যে, হাকিমদের ভয়, পাছে জালরাজা তথা হইতে অন্তর্ধান হন, তাই তাঁহাকে সার্জ্জনেরা ঠেসিয়া দাঁড়াইয়াছে। জালরাজা জবানবন্দীতে বলিলেন, "কাল্‌নায় একদিন রাত্রে বন্দুকের শব্দে আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী চীৎকার করিয়া বলিল, 'আমায় গুলী লাগিয়াছে।' এই কথা শুনিয়াই আমি জলে ঝাঁপ দিলাম। আমি পলাইতেছি জানিতে পারিয়া সিপাহীরা জলে গুলী মারিতে লাগিল। বন্দুকের আলোক দপ করিয়া উঠে, আর আমি ডুব মারি। গুলী আমার চারিদিকে পড়িতে লাগিল। নৌকায় আমার সঙ্গে ১০ কি ১৫ খানা তরোয়ার,তিনটী কি চারিটী বন্দুক, একটী পিস্তল, দুইটী কি তিনটী বর্শা ছিল। আমার স্বসম্পর্কীয়দের সঙ্গে অসদ্ভাব হইয়াছিল বলিয়া আমি পলাইয়াছিলাম, কিন্তু মরি নাই, মৃত্যুর ভাণ করিয়াছিলাম। সে সকল অনেক কথা।"

জয়নারায়ণ চন্দ্র জবানবন্দীতে বলিলেন, "আমি সা সাহেবের কেরাণী, রাত্রে যখন সিপাহীরা গুলী করে, আমি তখন নৌকায় নিদ্রিত ছিলাম। তাহার পর সকালে কলিকাতায় পলাইয়া আসি। (বম্বেটিয়ার ভয়ে) নৌকাযাত্রীদের সঙ্গে তরোয়ার রাখিতে হয়।"

ভিকা সিংহ বলিলেন, "আমি ৮ নং পল্‌টনের সুবাদার। গুলী করিবার পূর্ব্বে 'মারো মারো' হুকুম শুনিয়াছি। সে হুকুম কে দিয়াছিলেন, বলিতে পারি না। কিন্তু সাহেবেরা যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইখান হইতে এ হুকুম দেওয়া হয়।"

এল, এ, মেকলিন বলিলেন, "আমি ঐ পল্টনের এন্সাইন। কাপ্তেন লিটিল সাহেব মেজেষ্টরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, প্রতাপকে যেরূপে পারি জীবিত হউক, কি মৃত হউক, গ্রেপ্তার করিব কি না? ওগলবি তাহাতে বলেন, 'হাঁ, যেমন করিয়া পার, তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে'।"

বাবু তিওয়ারী বলিলেন, গুলী করিবার

পূর্ব্বে মেজেষ্টর সাহেব 'মারো মারো' বলিয়া হুকুম দিয়াছিলেন। একবার গুলী করা বন্ধ হইলে পর যখন বুঝা গেল, রাজা সাঁতার দিয়া পলাইতেছেন, তখন মেজেষ্টর বলিলেন, 'উস্কো গুলীসে মারো।' আবার গুলী আরম্ভ হইল। সকল সাহেবের হাতে বন্দুক ছিল। পাদরী সাহেবও গুলী করিয়াছেন, আমি তাহা দেখিয়াছি। মেজেষ্টর সাহেব প্রথমে গুলী করেন।"

খোদাবক্স হাবিলদার বলিল," গুলী করিতে আমি পাদরীকে দেখি নাই। হয় ত তিনি গুলী করিয়া থাকিবেন, কিন্তু মেজেষ্টর যে 'মারো মারো' হুকুম দিয়াছেন, তাহা আমার স্পষ্ট মনে আছে।"

কাপ্তেন লিটিল বলিলেন, "গুলী করিতে কেহ হুকুম দেয় নাই। সিপাহারা ভুলে গুলী করিয়াছে। ওগলবি সাহেব গুলী করিতে হুকুম দিয়াছেন, এমত আমি শুনি নাই। তিনি, কি ডাক্তার সাহেব, কি পাদরী সাহেব, কেহ গুলী করেন নাই। প্রতাপের সঙ্গে তিন শত যোদ্ধা লোক (fighting men) ছিল। প্রতাপকে ধরিয়া আমার তাঁবুতে রাখিলে পর, দুই প্রহর হইতে অস্ত পর্য্যন্ত প্রায় ত্রিশ হাজার লোক জমিয়াছিল। তাহারা রাজাকে ছিনিয়া লইবার চেষ্টা করে নাই। তবে একটু ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিল।"

ডাক্তার চিক বলিলেন, "বর্দ্ধমানের জজ আমাকে ও ওগলবিকে এক একটা করিয়া পিস্তল নিজ হস্তে গুলী পুরিয়া দিয়াছিলেন। গুলী করিবার সময় মেজেষ্টর আমার নিকট হইতে দূরে ছিলেন, সুতরাং তিনি কি বলিয়াছেন, না বলিয়াছেন, তাহা আমি শুনি নাই। পাদরী আলেকজাণ্ডার পূর্ব্বে পল্টনের গোরা ছিলেন।"

এইরূপে অনেকে সাক্ষ্য দিলেন, সে সকল লিখিবার প্রয়োজন নাই। বাদীর সাক্ষীর জবানবন্দী হইয়া গেলে আসামী ওগলবির জবাব আরম্ভ হইবে, কিন্তু তিনি নিজ মুখে কিছুই বলিতে পারিলেন না; একখানি বর্ণনা-পত্র লিখিয়া আনিয়াছিলেন, তাহাও তিনি স্বয়ং পাঠ করিতে সমর্থ হইলেন না। হুগলীর মেজেষ্টর সামুয়েল সাহেব সাক্ষ্য দিতে গিয়াছিলেন, তিনি আদালতের অনুমতি লইয়া তাহা পাঠ করিলেন।

এই জবাবে আসামী ওগলবি জানাইলেন যে, আমি নির্দ্দোষী। কালনায় যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, তাহা কেবল সিপাহীদের দোষে। আমি পল্টন লইয়া গিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু কেবল ভয় দেখাইবার নিমিত্ত। সকলেই জানেন, মেজেষ্টরের কার্য্য কি গুরুতর। সকলেই জানেন, পরাণ-বাবুর কার্য্যদোষে লোকে রাজপরিবারের উপর কতদূর বিরক্ত। এ সময় লোকে জালরাজার পক্ষ হওয়াতে একটি গোলমাল বাধিবার সম্ভাবনা। জালরাজ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট হইতে যে হুকুম আমি পূর্ব্বে পাইয়াছিলাম, তাহা দাখিল করা হইয়াছে। ও পক্ষে প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে যে, আমি স্বয়ং গুলী করিয়াছি এবং 'মারো মারো' বলিয়াছি, তৎসম্বন্ধে ডাক্তার চিক সাহেব ও কাপ্তেন সাহেবের জবানবন্দীর পর আমার আর কিছু বলা বাহুল্য। যাহাই হউক, যদি কেহ আমাকে এরূপ মনে করিয়া থাকেন যে, আমি নিরস্ত্র লোকদিগকে সিপাহী দ্বারা হত্যা করাইতে পারি, তাহা হইলে যে দণ্ডবিধান হইবে আমি তাহা শিরোধার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি।" *

তাহার পর আসামীর পক্ষে সাক্ষী জবানবন্দী আরম্ভ হইল। আসাদ আলি নাজীর আর মহিবুল্লা দারোগা ভিন্ন আর যাহারা সাক্ষ্য দিলেন, তাঁহারা কেহ কালনায় উপস্থিত ছিলেন না। এই সকল সাক্ষীর জবানবন্দী শেষ হইলে পর সা

* উপরে যাহা লিখিত হইল, তা জবাবের অনুবাদ নহে, কেবল স্থূলম মাত্র।

জে, পি, গ্রাণ্ট সাহেব জুরিদিগকে চার্জ দিলেন।

জুরিরা বলিলেন, "ওগলবি সাহেব নির্দ্দোষী।"

জজ সাহেব ওগলবি সাহেবকে খালাস দিলেন, খালাস দিবার সময় তাঁহাকে বলিলেন যে –

"You now stand quite free from all charges and imputations, and if there have been a little error of judgment, you are still most clearly proved to have had no participation whatever in the act itself, which resulted so fatally, and to have been acted throughout by no feeling or motive, other than becomes a gentleman."

সংবাদপত্রের সম্পাদকের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, কাপ্তেন লিটিলকে আসামী না করা ভুল হইয়াছিল।

৯। সামুয়েল সাহেবের উদ্‌যোগ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জালরাজা গেপ্তার হইয়া হুগলী প্রেরিত হইলেন। কিন্তু সে সময় তাঁহার কি দুরবস্থা করা হইয়াছিল, তাহা বলা হয় নাই, বলিতেও ইচ্ছা নাই। তবে এইমাত্র উল্লেখ করিয়া রাখি যে, জালরাজা আর তাঁহার সঙ্গী রাজা নরহরিচন্দ্রকে দুইখানি মলিন ক্ষুদ্র বস্ত্র পরাইয়া পুলিস দ্বারা দুই চারিবার গ্রাম প্রদক্ষিণ করান হইয়াছিল। কিন্তু কে তাহা দেখিবে? গ্রামে কেহই ছিল না। দোকান বন্ধ, হাট বন্ধ, পথে লোক-জন আর চলে না, বৃদ্ধা ভিখারিণীরা পর্য্যন্ত কুঁড়ে ফেলিয়া পলাইয়াছিল। যাহারা ছিল, তাহারা কেবল পরাণ-বাবুর দলস্থ।

সিপাহী সঙ্গে দিয়া, সেই ক্ষুদ্র বস্ত্র পরাইয়া জালরাজাকে পদব্রজে হুগলী পাঠান হইল। কিন্তু প্রতাপ পথে কি আহার করিবেন, বোধ হয়, ভুলক্রমে তাহার কোন বন্দোবস্ত করা হয় নাই, সুতরাং তাঁহাকে নিরাহারে পথ চলিতে হইল। যেখানে সিপাহীরা অন্ন পাক করিত, জাল-রাজা সেইখানে বসিয়া আপনার হাতকড়ি নাড়িতেন আর দেখিতেন। একদিন একটী সিপাহীর দয়া হইল; সে ব্যক্তি আপনার পয়সায় দুটী চা'ল আনিয়া দিল। জালরাজা সে দিন অতি গুরুতর আহার করিলেন।

জালরাজা ন-সরাই নামক স্থানে পৌঁছিলে বিস্তর লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিল। হরকরার সম্পাদক বলেন, আট দশ হাজার লোকের ন্যূন নহে। আমরা শুনিয়াছি, তাহাদের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোক প্রতাপের নিমিত্ত অঞ্চলে করিয়া মিষ্টান্ন আনিয়াছিল, দরিদ্রেরা পয়সা আনিয়াছিল, ভিখারিণীরা চা'ল আনিয়াছিল। তখনও বাঙ্গালা দয়ায় পূর্ণ। আমাদের বহুকালের শিক্ষার ফল এই দয়া। সহস্র পুরুষ ধরিয়া ভক্তি আর দয়া বাঙ্গালায় অভ্যাস হইয়াছিল। মুসলমানের সংস্পর্শে এই সহস্র-পুরুষার্জ্জিত রত্ন লোপ পায় নাই; বরং সংসর্গ-প্রাবল্যে মুসলমানদের দয়া মজ্জাগত হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু ইংরেজ-সংস্পর্শে আমরা অনেক মূলধন হারাইয়াছি। আমরা এখন বলিতে অভ্যাস করিয়াছি,—দয়া a weakness—ভক্তি a weakness—স্নেহ a weakness। সুতরাং যাহা দয়ার বিপরীত, যাহা স্নেহের বিপরীত, যাহা ভক্তির বিপরীত, তাহাই strength of mind, আবার যদি কখনও আরও অদৃষ্ট পোড়ে, যদি এই গরুর পাল আবার হস্তান্তর হয়, তখন হয় ত বলিতে অভ্যাস করিব,—সত্যবাদ "বেওকুফি"; মিথ্যাবাদ "সেয়ান্তামি" পরদ্রব্য-হরণ "কর্ত্তব্য কার্য্য"; কেন না, তাহাতে কখন কখন লাভ আছে।

সে সকল দুঃখের কথা যাক্। যাহারা প্রতাপের নিমিত্ত খাদ্য বা পয়সা আনিয়াছিল, তাহারা কেহই প্রতাপকে তাহা দিতে পারিল না। সিপাহীদের তাড়নায় কেহ তাঁহার নিকট আসিতেও পারিল না।

৫ই মে তারিখে জালরাজা হুগলাতে পৌঁছিলেন। তথাকার জেলখানায় একটী ক্ষুদ্র ঘরে রক্ষিত হইলেন। একখানি কম্বল পাইলেন, সেখানি নূতন কি পুরাতন, কি অন্য কয়েদীর ব্যবহৃত, তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না; তবে সংবাদপত্রে কে একজন লিখিয়াছেন যে, সেখানা নিশ্চয়ই নূতন।

এই সময় হুগলীতে সামুয়েল সাহেব মেজেষ্টর। তিনি ইহার কিছু পূর্ব্বে বর্দ্ধমানে মেজেষ্টারি করিয়াছিলেন। যখন জালরাজা সন্ন্যাসীবেশে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হন, তখন তিনি সেখানে ছিলেন। সেই সময় তিনি জাল প্রতাপচাঁদ-সম্বন্ধে সবিশেষ সকল কথাই পরাণ-বাবুর নিকট শুনিয়াছিলেন, সুতরাং সেই অবধি তাঁহার দৃঢ়-বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, জালরাজা একজন ভয়ানক জুয়াচোর। এক্ষণে হুগলীতে তাঁহাকে আপন হাতে পাইয়া আপ্যায়িত হইলেন। কোথা হইতে অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিবেন, তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে সেই জন্য এখানে সেখানে পত্র লিখিতে লাগিলেন। কথিত আছে, তিনি এই নিমিত্ত পরাণ বাবুকে এক পত্র লেখেন। সে পত্রের নকলের জন্য লেষ্টার সাহেবের নিকট জালরাজা দরখাস্ত করেন। নকল প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু সামুয়েল সাহেব তাহা দিতে দেন নাই। তিনি দিন-কতকের নিমিত্ত অনুপস্থিত ছিলেন। লেষ্টার সাহেব তাঁহার পরিবর্ত্তে কার্য্য করিতেন।

সামুয়েল সাহেব শুনিয়াছিলেন, গোয়াড়ির শ্যামলাল ব্রহ্মচারীর পুত্র কৃষ্ণলাল বলিয়া একজন পাকা জুয়াচোর ছিল। চার পাঁচ বৎসর অবধি সে নিরুদ্দেশ হইয়াছে, এক্ষণে সেই ব্যক্তিই এই জালরাজা সাজিয়াছে। অতএব তাহার সনাক্তের জন্য তিনি নদীয়ার মেজেষ্টর হালকেট সাহেবকে পত্র লিখিলেন। হালকেট সাহেব কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারীর কতকগুলি প্রতিবাসী পাঠাইয়া দিলেন। সামুয়েল গেলেন। তাহারা জালরাজাকে দেখিয়া ভাল সনাক্ত করিতে পারিল না। সুতরা সামুয়েল সাহেব বড় চটিয়া গেলেন। জবানবন্দী না লইয়া তাহাদিগকে ফেরৎ পাঠাইলেন। আবার হালকেট সাহেবকে পত্র লিখিলেন। এবার হালকেট সাহেব আপনার নাজীর, পেস্কার, সেরেস্তাদার প্রভৃতি বিস্তর আমলা পাঠাইয়া দিলেন। আপনি একদিন নিজে আসিয়াছিলেন।

সামুয়েল সাহেব আর একখানি পত্র বা দ্বারকানাথ ঠাকুরকে লেখেন। তাঁহার কতদূর চেষ্টা ছিল, তাহা বুঝা যাইবে বলিয়া আমরা সেই পত্রখানি উদ্ধৃত করিলাম। রাজা বৈদ্যনাথের জবানবন্দী হইয়া গেলে পর এই পত্রখানি তাঁহাকে লেখা হয়।

"Hooghly, Sept. 4, 183

My dear Dwarkanath,

I was disappointed at your nonarriv as I think you could speak more decided than any of other witnesses to the man non-identity, but it is not of much consequence. I have no objection to make bargain with you. I will let you altogether, if you will procure the names of half a dozen g respectable witnesses from Boranago who know him as Kristolall. I dare s you could do this through Kali Nath R Chowdhery. Mhthhranath Mookerji any of your own servant. Let me kn what you say to this. What scoundrel tl Buddinath Roy is! If I had known character, I would rather have g without evidence altogether than h had his.

Remember I must have the evide from Boranagore within a week or Persuade Mothuranath also to come. I hoormut and izzut shall be hureck sc ut se bahal.

yours truly

F A. SAMUELL

সামুয়েল সাহেব বিস্তর সাক্ষী জুটাই

তিনি তাহা পড়িয়া সাক্ষীদিগকে শুনাইতেন না। তখন সে প্রথা ছিল না। জালরাজার উকীলেরা বলিতেন যে, "সাক্ষীরা যাহা বলিত,তাহা অবিকল লেখা হইত না।" তাঁহারা আরও বলিতেন, "কোন কোন সাক্ষীর জবানবন্দী জালরাজার অসাক্ষাতেও লওয়া হইত।"

হরকরা-সম্পাদক হুগলীতে একজন রিপোর্টার পাঠাইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, সামুয়েল সাহেব সেই ব্যক্তির নিমিত্ত রিপোর্ট সংশোধন করিয়া হুগলী কলেজের অধ্যাপক সদরলাণ্ড সাহেবের দ্বারা হরকরায় পাঠাইতেন। জালরাজার উকীলেরা বলিতেন, "হরকরায় যে জবানবন্দী প্রকাশ হয়, তাহা প্রকৃত নহে, তাহা কেবল মেজেষ্টর সাহেবের মনগড়া।" ইহা লইয়া অনেক তর্ক হইয়াছিল, নিজামতে দরখাস্তও হইয়াছিল। সামুয়েল সাহেব বলেন, সদরলাণ্ড সাহেবকে তিনি তাঁহার ইয়াদদাস্ত দিতেন মাত্র, আর কিছু নহে। *

জালরাজার বিরুদ্ধে যাঁহাদের সাক্ষ্য দিবার সম্ভাবনা,তাঁহারাই ফরিয়াদীর সাক্ষী; সুতরাং তাঁহাদের জবানবন্দী প্রথমে লওয়া হইতে লাগিল। তাঁহারা প্রায় অনেকেই বলেন, জালরাজা প্রতাপচাঁদ নহেন। হরকরা-সংবাদ-পত্রে এই সকল জবানবন্দী প্রথমেই ছাপা হইতে লাগিল। হরকরা হইতে তাহা সমাচার-দর্পণে উদ্ধৃত ও অনুবাদিত হইল। সামুয়েল সাহেব এই জবানবন্দী সর্ব্বত্র প্রচার করিবার নিমিত্ত সপ্তাহে সপ্তাহে কতকগুলি করিয়া সমাচার-দর্পণ থানায় থানায় পাঠাইয়া দিতেন, আবার থানার দারোগারা তাহা গ্রামে গ্রামে পাঠাইয়া দিতেন। কিন্তু যখন দায়রায় জালরাজার স্বপক্ষ সাক্ষীর জবানবন্দী আরম্ভ হইল, তখন আর সমাচারদর্পণ সেইরূপ থানায় থানায় পাঠান হইল না। প্রথম জবানবন্দী পড়িয়া অনেকের ধারণা হইল যে, জালরাজা সত্যই জাল। সুতরাং এই বিষয়ে লোকে সামুয়েল সাহেবকে দোষী করিতে লাগিল। কিন্তু সামুয়েল সাহেব বলেন যে, লোকের মনে একটা অসঙ্গত ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল, তাহা দূর করিবার নিমিত্ত তিনি সমাচার দর্পণ থানায় থানায় পাঠাইয়া দিতেন। ইহা ছাড়া কোন অন্যায় অভিপ্রায়ে নহে।

১০। দায়রা-সোপর্দ্দ।

সামুয়েল সাহেব ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে জাল-রাজার মোকর্দ্দমা আরম্ভ করেন। সেই দিন তিনি এজলাসে বসিয়া জালরাজার

---

*এই অপবাদের উত্তরে সামুয়েল সাহেব সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন যে—

"A silly reporter, was deputed by the publisher of that paper (Hurkura) to Hooghly, for the perpose of reporting the proceedings in my Court. The reports which he furnished however, were so exceedingly incorrect that, Mr. Sutherland now principal of the Hooghly College, who resides with me, and who had formerly been connected with the Hurkura preses requested me to furnish him with my note in order that he might correct these reports before they were forwarded. To this, of course I could have no objection, and the reports which appeard from that time forwarded in the Hurkura, were the only reports which give a tolerable idea of the evidence, which was given in court. That there were many inacuracies even in these, is very probable as Mr. Sutherland's leisure was not such as to enable him in most instances to give more than a general correction.

কিন্তু জালরাজার উকীলেরা বলেন যে, সদরলণ্ড সাহেব যে রিপোর্ট পাঠাইতেন, তাহা হরকরা আপিসে গিয়া তাঁহারা দেখিয়াছেন। সে রিপোর্টে যত কাটকুট বা নূতন লেখা থাকিত, তাহা সমুদায় সামুয়েল সাহেবের স্বহস্তের।"

বলিলেন, "তুমি আপনার নাম গোপন করিয়া অসৎ অভিপ্রায়ে মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করিয়াছ। সেই জন্য তোমাকে আসামী করা হইয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া অনেকে অবাক্ হইলেন। হরিবোল হরি! কালুনার জমিয়ৎবস্ত তবে কোন কাজের কথা নহে! তাহা কেবল ছল মাত্র। প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করাই তবে মূল অপরাধ। এ গুরুতর অপরাধের আবার জামিন নাই। খুনের মোকর্দমায় ওগল্‌বি সাহেবের জামিন লওয়া হইয়াছিল; প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করা অপরাধে জামিন লওয়া হইতে পারিল না। খুন অপেক্ষা ইহা গুরুতর অপরাধ। এ অপরাধের নিমিত্ত চারি মাস ধরিয়া হাজতে রাখা হইল।

সামুয়েল সাহেব জালরাজার এই গুরুতর অপরাধ প্রকাশ করিলে, জালরাজার উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ফরিয়াদী?" মেজেষ্টর উত্তর করিলেন, "গবর্ণমেণ্ট ফরিয়াদী।" আবার সকলে অবাক্ হইল! প্রতাপের নাম ব্যবহার করায় যাহাদের ক্ষতি, তাহারা কেহ নালিস করিল না, পরাণ-বাবু নালিস করিলেন না, তবে গবর্ণমেণ্টের কেন এত গরজ পড়িল? কেহ কিছু বুঝিতে পারিল না, সুতরাং নানা লোক নানা কথা বলিতে লাগিল। তাহার পর সাক্ষীর জবানবন্দী আরম্ভ হইল।

চিনারি সাহেব দ্বারা প্রতাপচাঁদ নিজের যে প্রমাণ চিত্রপট আঁকাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেখানি বর্দ্ধমানের রাজবাটী হইতে আনীত হইয়া এজলাসের পার্শ্বে এক ঘরে রাখা হইল। চিনারি সাহেব একজন প্রধান চিত্রকর ছিলেন। তিনি রাজা প্রতাপচাঁদের ছবি লিখিতেছেন, এ কথা সাহেবমহলে সকলে শুনিয়াছিলেন। অনেকেই সেই ছবি দেখিতে চিনারি সাহেবের বাটী যাইতেন। ছবিখানি বাস্তবিক নির্দ্দোষ হইয়াছিল। প্রতাপচাঁদ চিনারি সাহেবকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া- পটের দেহ যেন ঠিক সেই পরিমাণে লম্বা হয়, দৈর্ঘ্যের যেন কিছুমাত্র প্রভেদ না থাকে। পট ঝুলাইবার স্থানানুরোধে বা তাহার দূরতা অনুসারে চিত্রকরেরা দৈর্ঘ্যের যেমন কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া থাকে, প্রতাপ সেরূপ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। সেই চিত্রপট হুগলীর মেজেষ্টারিতে আনীত হইলে, অনেকেই বুঝিলেন, ছবিখানি এ মোকর্দ্দমার প্রধান সাক্ষী—নির্লোভী নিরপেক্ষ সাক্ষী—কথা কহে না, কাহারও মুখ চাহে না। পার্শ্বের ঘরে দাঁড়াইয়া কাহারও সহিত কথা কহিয়া ছবি কি বলিল, জজ, মেজেষ্টর তাহা কি বুঝিলেন, সে সকল বৃত্তান্ত ক্রমে লেখা যাইতেছে।*

গবর্ণমেণ্ট আপনার চাকরদিগকে সাক্ষী দিতে পাঠাইলেন। সেক্রেটারি প্রিন্সেপ—একজন সাক্ষী, সদর দেওয়ানীর জজ হাচিনসন—একজন সাক্ষী, বোর্ডের মেম্বর প্যাটাল—একজন সাক্ষী। ঐরাবত নামক জাহাজে করিয়া গবর্ণমেণ্ট এই সকল সাক্ষিগণকে মহা সমারোহে হুগলী পাঠাইলেন। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর আপনার জাহাজে করিয়া আর একদিন আসিলেন। এইরূপে ঘটার আর সীমা রহিল না। তিন বিষয়ের সাক্ষ্য লওয়া হইল। প্রথমতঃ, জালরাজার সনাক্ত সম্বন্ধে; দ্বিতীয়তঃ, প্রতাপচাঁদের মৃত্যু সম্বন্ধে; তৃতীয়তঃ, জালরাজা গোয়াড়ির কৃষ্ণলাল কি না, এই সম্বন্ধে। কেবল এই তিন বিষয়ের প্রমাণ লইয়া সামুয়েল সাহেব জালরাজাকে দায়রা-সোপর্দ্দ করিলেন। কিন্তু সোপর্দ্দের সময় একটী চার্জ বাড়াইয়া দিলেন—কালনায় জমিয়ৎবস্ত। এ বিষয়ে কোন সাক্ষীর জবান-

*"Some curious evidence transpired concerning the "Portrait" that novel mute witness * * The prosecution certainly seems to have unwittingly suppeonad, in this portrait a rather hostile witness, * * Long odds in favour of the Rajah and no takers, quit a dark horse, however, and may prove a winner." Hurkaru 5th September

বন্দী লওয়া হয় নাই। কিন্তু তাহার চার্জ হইল।

সামুয়েল সাহেব বর্দ্ধমান হইতে প্রায় সকল আসামীকে আনাইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কেবল সাত জনকে দায়রায় সোপর্দ্দ করিলেন।

প্রথম, জালরাজা। দ্বিতীয়, মোক্তার রাধাকৃষ্ণ ঘোষাল, (যিনি বর্দ্ধমানে মেজেষ্ট্রের গেটের নিকট গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন)। তৃতীয়, হাফেজ ফতে-উল্লা। চতুর্থ, সাগরচন্দ্র ধর। পঞ্চম, কালীপ্রসাদ সিংহ। ষষ্ঠ, জুমন খাঁ। সপ্তম, রাজা নরহরিচন্দ্র।

১১। দায়রার কার্য্যপ্রণালী।

২০শে নবেম্বর মোকর্দ্দমার দিন ধার্য্য ছিল এবং সাক্ষীদিগকে সেই দিনে উপস্থিত হইতে আদেশ করা হইয়াছিল। কিন্তু কি গতিকে বলা যায় না, তাহার পূর্ব্বদিনে মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইল। সাক্ষীরা আইসে নাই, কিন্তু অপর কার্য্য হইল। জজ সাহেবের নাম কার্টিস।

গবর্ণমেণ্ট প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে বিগ্‌নেল নামে একজনকে ৫০০ টাকা বেতনে ডিপুটী লিগ্যাল রিমেম্ব্রান্সার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বিগ্‌নেল সাহেব বড় বুদ্ধিমান্, হালিডে সাহেবের বিশেষ অনুগৃহীত। তিনি এই মোকর্দ্দমায় দায়রায় গবর্ণমেণ্ট-পক্ষ সমর্থন করিবার নিমিত্ত প্রেরিত হইলেন। বলা বাহুল্য যে, হালিডে সাহেবই তাঁহাকে পাঠান। তিনি ১৯শে তারিখে আসিয়া উপস্থিত হন। সুতরাং ১৯শে তারিখে মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইল। ধার্য্য দিনের নিমিত্ত অপেক্ষা করা হইল না।

কৌন্সিলি মর্টন সাহেব জালরাজার পক্ষ-সমর্থন করিবার জন্য সেই দিন পত্রের দ্বারা জজ সাহেবের অনুমতি চাহিয়া পাঠাইলেন। জজ সাহেব সে পত্র পাইয়া ফরিয়াদীর উকীল বিগ্‌নেল সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অনুমতি দেওয়া যাইবে কি?" বিগ্‌নেল উত্তর করিলেন যে, এ বিষয়ে কোন আপত্তি করিতে গবর্ণমেণ্ট নিষেধ করিয়াছেন। জজ সাহেব তখন মর্টন সাহেবকে অনুমতি পাঠাইলেন। উত্তর পাইয়া মর্টন আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আসামীর কৌন্সিলি জজ সাহেবকে জানাইলেন যে, "আসামী শারীরিক অসুস্থ আছেন, অতএব তাঁহাকে বসিবার আসন দিতে অনুমতি করিলে ভাল হয়।" জজ সাহেব কেদারা দিতে হুকুম দিলেন। মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইল।

ফৌজদারী হইতে মোকদ্দমা সংক্রান্ত যে রোবকারী আসিয়াছিল, তাহা মনসারাম দেওয়ানজী ১১টার সময় পড়িতে আরম্ভ করিলেন। দেড়টার সময় তাহা পড়া শেষ হইল। তাহার পর সাক্ষীর জবানবন্দী যাহা মেজেষ্টর পাঠাইয়াছেন, তাহাও দেওয়ানজী মহাশয় পড়িতে আরম্ভ করিলেন। জজ সাহেব বলিলেন, "এখানে জবানবন্দী লওয়া হইবে, সুতরাং সাবেক জবানবন্দী আর পড়া অনবাশ্যক।" বিগ্‌নেল সাহেবও জজ সাহেবের কথায় সম্মত দিলেন। দেওয়ানজী শ্রীযুক্ত মনসারাম মহাশয় বলিলেন, "তাহা হইতে পারে না, এ সমুদায় পাঠ করা আবশ্যক। ফৌজদারীর সমুদায় কাগজপত্র না পড়িলে আসামীদের ফেরেবি কিরূপে বুঝা যাইবে?" জজ আর কোন আপত্তি করিতে পারিলেন না। দেওয়ানজীর যাহা ইচ্ছা, তাহা সমুদায় পড়িয়া শুনাইলেন।

তাহার পর চার্জ পড়া হইল। (১) আলোক শা ওরফে কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী মৃত মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদ বাহাদুরের নাম ব্যবহার করিয়াছে; (২) সেই নাম ব্যবহার করিয়া ট্রেজরির দেওয়ান রাধাকৃষ্ণ বসাককে ঠকাইয়া তাহার নিকট টাকা লইয়াছে; (৩) বে-আইনিরূপে কাল্‌নায় বিস্তর লোক জমিয়ৎবস্ত করিয়াছে।

আসামী নিরপরাধী বলিয়া জবাব দিল। সে দিন আর কোন কার্য্য হইল না। এই স্থানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, জালরাজা একখানি লিখিত জবাব দিয়াছিলেন। ...

দিন পরে (২১ শে নবেম্বর) সে সম্বন্ধে কথা উঠিলে জজ সাহেব বলিলেন, "আমার বোধ হয়, জালরাজার একটা আপত্তি সঙ্গত, এই মোকর্দ্দমা দেওয়ানীর বিচার্য্য, ফৌজদারীর নহে। অন্ততঃ জুরি কিংবা আর একজন জজের সঙ্গে বসিয়া বিচার করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি কি করিব? আমার আপত্তি আমি গবর্ণমেণ্টে জানাইয়াছিলাম, গবর্ণমেণ্ট তাহা শুনেন নাই। সুতরাং আমার উপর যেরূপ হুকুম, আমি তাহাই করিতে বাধ্য।"

আর এক কথা। ডাক্তার হ্যালিডে বর্দ্ধমানে রাজবাটীর চিকিৎসক ছিলেন। তিনি অনেকবার প্রতাপচাঁদের চিকিৎসা করিয়াছিলেন—একবার তাঁহার উরুস্তম্ভ অস্ত্র করিয়াছিলেন। সুতরাং ডাক্তার হ্যালিডে আসামীর একজন প্রধান সাক্ষী। বিশেষতঃ বোর্ডের মেম্বার টোয়ার সাহেব মেজেষ্টারিতে জবানবন্দী দিয়াছেন যে, সেই ডাক্তার হ্যালিডে তাঁহার নিকট বলিয়াছিলেন, "আসামী সত্যই প্রতাপচাঁদ।" অতএব তাঁহাকে হাজির করিবার নিমিত্ত আসামী সপিনা জারি করাইল। ডাক্তার সাহেব তখন কাশীতে থাকেন, তাঁহার আসিতে বিস্তর ব্যয় এবং বেতন-ক্ষতি, সুতরাং তিনি লিখিলেন যে, 'আমার খরচ অগ্রিম পাঠাইলে আমি যাইতে প্রস্তুত আছি।' জালরাজার তখন এক পয়সার সঙ্গতি নাই, কেহ আর তাঁহাকে কর্জ্জ দেয় না। তিনি টাকা পাঠাইতে না পারিয়া জজ সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিলেন যে, "ফৌজদারী আদালতের সাক্ষীকে অন্য মোকর্দ্দমায় যেমন বিনা খরচে হাজির করা হইয়া থাকে, যেমন গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সাক্ষীদিগকে এ মোকর্দ্দমায় হাজির করা হইতেছে, আমার পক্ষ এই সাক্ষীকে সেইরূপে হাজির করা হউক। ডাক্তার হ্যালিডে গবর্ণমেণ্টের চাকর, গবর্ণমেণ্ট হুকুম দিলেই তিনি আসিতে বাধ্য হইবেন। জজ সাহেব সে দরখাস্ত গবর্ণমেণ্টে পাঠাইলেন কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাতে মনো-

হইল, সেখানকার জজেরাও তাহা শুনিলে না। জালরাজা তখন নিরুপায় হইয়া প্রা করিলেন যে, "আমার নৌকায় যে স দ্রব্যাদি ছিল, তাহা রাজকর্ম্মচারীরা কোম নীতে অবশ্য দাখিল করিয়া থাকিবেন। ে সকল দ্রব্যাদির কিয়দংশ নীলাম করি হ্যালিডে সাহেবকে পথ-খরচ পাঠান হউক এ প্রার্থনাতেও কেহ উত্তর দিলেন না। ে কমিশন দ্বারা ডাক্তার সাহেবের জবানব লইবার প্রার্থনা হইল; কিন্তু জজ সাে বলিলেন, "কমিশন বাঙ্গালী সাক্ষীর নিমি ইংরেজের নিমিত্ত নহে।"

কোম্পানীর পক্ষ সাক্ষীদিগকে উপ করিবার জন্য সপিনায় লেখা থাকিত, " ধার্য্যদিনে কোন সাক্ষী উপস্থিত না তাহার এত টাকা দণ্ড হইবে।" কিন্তু জ রাজার সাক্ষীদিগকে হাজির করিবার এরূপ দণ্ডের কোন কথা থাকিত না, "ে অনুপস্থিত হইলে তাহাকে হাজির করি নিমিত্ত কোন উপায় করা হইত না। যাঁহ আপনা হইতে উপস্থিত হইতেন, বরং সাহেব তাঁহাদিগকে কটূক্তি করিতে 'বিষ্ণুপুরের রাজা সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত আ আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে "গাধা" ব গালি দেওয়া হইয়াছিল। তেলিনাপা রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সা তালিকায় ছিল, তিনি নিত্য হুগলীতে গ করিয়া বেড়াইতেন, কিন্তু সাক্ষ্য দিতেন জালরাজার উকীল তাঁহাকে অনুরোধ ক তিনি বলিলেন, "যেরূপ দেখিতেছি, তা সাক্ষ্য দিতে আমার সাহস হয় না। এই জেলায় বাস করি, আমার জমিদ বিষয়-আশয় সমুদায় এই জেলায়, শে বিপদে পড়িব?" এইরূপ অনেকে পাইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের অনেকে উপস্থিত হইলেন না।

২০শে নবেম্বর হইতে সাক্ষীর জবা আরম্ভ হইল। ফরিয়াদীর পক্ষে যে সাক্ষীর জবানবন্দী মেজেষ্টারিতে

লিখিলাম। দায়রায় কেহ কিছু অতিরিক্ত বলিয়া থাকিলে তাহাও উল্লেখ করিলাম। আসামীর সাক্ষী সম্বন্ধে যে জবানবন্দী নিয়ে দেওয়া হইল, তাহা দায়রায় লওয়া হইয়াছিল। মেজেষ্টারিতে বিচার হয় নাই, সুতরাং আসামীর পক্ষে কোন প্রমাণ তথায় লওয়া হয় নাই।

১২। সনাক্ত সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সাক্ষী।

ট্রাওয়ার সাহেব (C. T. Trower) বলিলেন, "আমি ১৮০৮ সাল হইতে ১৮১৮ সাল পর্য্যন্ত বৰ্দ্ধমানের কালেক্টর ছিলাম। প্রতাপকে বিলক্ষণ চিনিতাম। অপর ঘরে যে ছবি আছে, তাহা দেখিবামাত্র প্রতাপকে মনে পড়ে। কিন্তু এই আসামীকে দেখিবামাত্র প্রতাপকে মনে পড়ে না। যতদূর স্মরণ হয়, তাহাতে এ ব্যক্তিকে কোন মতেই প্রতাপ বলিয়া বিশ্বাস হয় না। প্রতাপের চক্ষু কটা ছিল, এ ব্যক্তির চক্ষু কাল। ডাক্তার হালিডে প্রতাপের চিকিৎসা করিতেন। একবার প্রতাপের উরুস্তম্ভ হয়, হালিডে তাহা অস্ত্র করেন। কিন্তু সেই হালিডে আমায় বলিয়াছিলেন যে, 'এই আসামী সত্যই প্রতাপচাঁদ।' হালিডে এখন কাশীতে আছেন।" দায়রায় বলিলেন যে, "আসামী কোন ক্রমেই রাজা প্রতাপচাঁদ নহে।"

প্রিন্সেপ সাহেব (H. T. Prinsep, গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী) বলিলেন, "আমি প্রতাপকে চিনিতাম, ১৯ বৎসর কি, ২০ বৎসর যাহাকে দেখি নাই, তাহার আকৃতি যেরূপ স্মরণ থাকে, প্রতাপের আকৃতিও আমার সেইরূপ স্মরণ আছে। আসামীকে প্রতাপচাঁদ বলিয়া বোধ হয় না। (I should say that he was not protap Chunder) প্রতাপ বেঁটে ছিলেন, এ লোকটা লম্বা। অপর ঘরে যে ছবি দেখিয়াছি, তাহা প্রতাপের, সে ছবির সঙ্গে এই ব্যক্তির কোন সাদৃশ্য নাই। প্রতাপের নাকে চোক কিরূপ ছিল, তাহা আমার স্মরণ নাই।" দায়রায় বলেন যে "জেনারেল আলার্ড ফ্রান্স হইতে ফিরিয়া আসিলে পর আমায় এক দিন বলিয়াছিলেন, লাহোরের নিকট আসামীর সঙ্গে অনেক দিন হইল তাঁহার একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আসামী তখন ফকিরের বেশে বেড়াইতেন।"

প্যাটাল সাহেব (James pattle বোর্ডের মেম্বর) বলিলেন, "১৮১৩ সালে আমি কলিকাতায় যাই। প্রতাপ আমার সহিত দেখা করিতে সেখানে যাইতেন, কিন্তু কয়বার গিয়াছিলেন, স্মরণ নাই। যে ছবি দেখিলাম, তাহা যদি প্রতাপের হয়, তবে প্রতাপের আকৃতি আমার আর কিছুমাত্র স্মরণ নাই। ঐ ছবির সঙ্গে আসামীর কোন সাদৃশ্য দেখিতে পাইলাম না।"

হাচিন্সন্ সাহেব (Mr. Hutchinson) বলিলেন, "আমি সদর দেওয়ানী আদালতের জজ। পূর্ব্বে বৰ্দ্ধমানে একটীং জজ ছিলাম। আসামীকে আমি চিনি না। এ ব্যক্তি প্রতাপচাঁদ নহে। এব্যক্তি অনেক লম্বা ও স্থূলকায়। ইহার সঙ্গে প্রতাপের ছবির সাদৃশ্য নাই। তবে বুক হইতে উপরদিকে কতক মেলে। প্রতাপের মৃত্যুর পূর্ব্বে ডাক্তার কোল্টারের নিকট শুনিয়াছিলাম, প্রতাপের জ্বর হইয়াছিল।" দায়রায় এই সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হয় নাই, কারণ, তখন তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছিল।

বিচর সাহেব (Jhon Beecher) বলিলেন, "আমি একজন হাউসওয়ালা। আমি প্রতাপকে চিনিতাম। তাঁহার আকৃতি আমার কিছুমাত্র স্মরণ নাই। ছবি দেখিয়াও তাঁহার আকৃতি আমার স্মরণ হইল না। তবে এই ছবির সঙ্গে আসামীর সাদৃশ্য বিলক্ষণ আছে। মাপিয়া দেখিলাম, ছবির প্রতাপ আর আসামী প্রতাপ একই রূপ লম্বা।" দায়রায় এই সাক্ষীকে আর আহ্বান করা হয় নাই।

ওবারবেক সাহেব (D. A. Overbeck) বলিলেন, "আমি এক্ষণে চুঁচুড়ায় থাকি।

দিনারের আমলে আমি চুঁচুড়ার গবর্ণর ছিলাম। আমি এই আসামীকে চিনি না।" তাহার পর অপর ঘরে প্রতাপের ছবি দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, "এখন আমি আসামীকে চিনিলাম। ইনি আমার পূর্ব্বপরিচিত ছোট রাজা। ছবির আকৃতি আর আসামীর আকৃতি স্পষ্ট একই রূপ।" দায়রায় এই সাক্ষী বলিলেন যে, "পূর্ব্বে জেলখানায় ও মেজেষ্টারিতে আমি এই আসামীকে দেখিয়াছি, আমি তখন ইহাকে জুয়াচোর মনে করিয়াছিলাম, আমি প্রতাপকে বিশেষ জানিতাম। তাঁহার মৃত্যুর কিছু পরে আমি শুনিয়াছিলাম যে, তিনি পলাইয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণ চক্ষের বামভাগে মেহগনি রঙ্গের একটী ক্ষুদ্র দাগ ছিল, তিনি ঊর্দ্ধে চাহিলে সেটী দেখা যাইত, এই আসামীর ঠিক সেইখানে সেই দাগ আছে, তবে একটু যেন বর্ণের ঘোর কমিয়াছে। এরূপ দাগ কাহার চক্ষে আর কখন দেখি নাই। শুনিয়াছি, একবার গবর্ণর জনারেলের একজন এজেন্ট গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছিলেন যে, রাজা প্রতাপচাঁদ সেই রেসিডেন্সীতে বাস করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট সে বিষয় রাজা তেজচাঁদকে লেখায় তিনি উত্তর করেন, 'আমি প্রতাপকে মরিতে দেখি নাই।' এই চিঠির কথা প্রকৃত কি না, তাহা গবর্ণমেণ্টের কাগজ খুঁজিলেই পাওয়া যাইবে।"

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর বলিলেন, "প্রতাপচাঁদের সঙ্গে আমার বড় বন্ধুতা ছিল। তিনি ওয়াটার্লুর যুদ্ধের পর একবার কলিকাতায় রোসনাই দেখিতে আসিয়া আমার বাটীর নিকটে কান্তবাবুর বাটীতে ছিলেন। সেই সময় আমার সঙ্গে তাঁহার প্রথম আলাপ হয়। তিনি গবর্ণমেণ্ট হাউসে রোসনাই দেখিতে যান, আমি তাঁহার সঙ্গে যাই। প্রতাপ কখন কলিকাতার তাঁতি কি বেণিয়ার বাড়ী যান নাই। তিনি কেবল আপনার সমযোগ্য লোকের বাড়ী যাইতেন—রাজা গোপীমোহন আর আমার বন্ধু রামমোহন রায়ের বাটীতে যাইতেন। আমি এই আসামীকে চিনি না, এ ব্যক্তি নিশ্চয় প্রতাপ নহে। ওগলবির মোকর্দ্দমায় যখন এই আসামী সুপ্রিমকোর্টে সাক্ষ্য দিয়াছিল, তখন আমি ইহাকে দেখিয়াছিলাম। ঐ সময় আমাকে এই ব্যক্তি চিনিয়াছিল, কিন্তু এ ব্যক্তি আমাকে চিনিলে কি হইবে, আমি উঁহাকে চিনি নাই। ওয়াটার্লুর লড়াইয়ের সময় হইতে আমার চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে। তাহার পূর্ব্বে যে আমায় দেখিয়াছে, সেই আমায় চিনিতে পারে। মেজেষ্টর সাহেব আমায় যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার নকল কে চুরি করিয়া আনিয়াছে, আমি সে চোর ধরিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছি।" চিঠিসম্বন্ধে কথাগুলি সাক্ষী বিনা সওয়ালে বলিলেন। দায়রায় আসিয়া বলিলেন, "প্রতাপের যে ছবি এই আদালতে দেখিলাম, তাহার সঙ্গে এই আসামীর বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। আমি ঠিক বলিতে পারি না যে, এ আসামী প্রতাপচাঁদ তবে আমার বোধ হয়, ইনি প্রতাপচাঁদ নহেন।"

রাজা বৈদ্যনাথ রায় বলিলেন, "প্রতাপের সঙ্গে আমার দুইবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল—একবার গবর্ণর জেনারলের দরবারে,—আর একবার একটা বিবাহ-বাটীতে। সেখানে প্রতাপ ছদ্মবেশে গিয়াছিলেন। এই আসামী রাজা প্রতাপচাঁদ নহে। আমি কাহারও নিকট বলি নাই যে, ঐ ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ।" রাজা বৈদ্যনাথ আদালতের বাহিরে আসিলে লোকে তাঁহার গাত্রে ধূলা দিয়াছিল। এ সাক্ষীকে আর দায়রায় তলব হয় নাই, বরং তাঁহাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার নিমিত্ত দণ্ড দিবার পরামর্শ হইয়াছিল।

হারক্লটস্ সাহেব (Gregary Herclots) বলিলেন, "আমি হুগলীর সদর আমীন ছিলাম। দুই তিনবার প্রতাপকে দেখিয়াছি, এখন দেখিলে, বোধ হয়, তাঁহাকে চিনিতে পারি। এই আসামী প্রতাপ নহে। কিন্তু আমি নিশ্চয় তাহা বলিতে পারি না।" দায়রায়

বলিলেন, "এই আসামীকে মৃত প্রতাপচাঁদ অপেক্ষা এক ইঞ্চ লম্বা দেখায়।"

রাধাকৃষ্ণ বসাক বলিলেন, "আমি এই আসামীকে অনেক টাকা কর্জ্জ দিয়াছি। কত, তাহা হিসাব নিকাস না করিলে বলিতে পারি না। ষোল হাজার হইবে। ইহাকে সত্যই প্রতাপচাঁদ মনে করিয়া আমি টাকা দিয়াছি। ইহাকে আমি নিজে চিনিতাম না, কেবল লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া টাকা দিয়াছি। রাজা গোপীমোহন দেব বলিয়াছেন, 'ইনি নিশ্চয় প্রতাপচাঁদ।' গোপীমোহন এখন মরিয়াছেন। গোপীমোহন তাঁহার লোকের দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিলেন যে, এ ব্যক্তি সত্যই প্রতাপচাঁদ। ডাক্তার হালিডে আমার নিকট বলিয়াছেন, এই ব্যক্তি নিশ্চয় প্রতাপচাঁদ। তদ্ভিন্ন জেনারেল আলার্ড* ঐরূপ বলিয়াছেন, তাঁহার কথায় আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তাঁহার সঙ্গে লাহোরে এই আসামীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি একা ইহাকে টাকা কর্জ্জ দিই নাই, আরও অনেকে দিয়াছেন, দুই একজন ইংরেজও দিয়াছেন।" দায়রায় উপস্থিত হইয়া এই সাক্ষী বলিলেন, "পূর্ব্বে রাজা বৈদ্যনাথের সঙ্গে এই আসামীকে হুগলীর জেলে একবার দেখিতে আসিয়াছিলাম। আমি ছয় মাস ইহাকে কলিকাতায় আমার আপনার বাটীতে রাখিয়াছিলাম। সেখানে ডাক্তার হালিডে একদিন আসিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, 'ইনি যে নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই'।"

রাধামোহন সরকার (যাঁহার সঙ্গে পরাণ-বাবু একদল লাঠিয়াল কালনায় পাঠাইয়াছিলেন) গঙ্গাজল হাতে করিয়া বলিলেন, "প্রতাপচাঁদের সঙ্গে এই আসামীর বিস্তর প্রভেদ। প্রতাপচাঁদ দেখিতে বিক্রমাদিত্যের মত ছিলেন, আর এ লোকটা দেখিতে যেন ভিকে হাড়ি। এ লোকটার হাত-পা বড় বড়, শরীর লম্বা, বর্ণ কাল, ছবির সঙ্গে ইহার কোন সাদৃশ্য নাই। আমি এখন রাজবাটীর দেবত্তর মহলের মোক্তার। আগা আব্বাস নামে কোন মোগল কস্মিন্‌কালে প্রতাপচাঁদের চাকর ছিল না।"

বসন্তলাল-বাবু বলিলেন, "আসামীকে আমি চিনি না। ইহাকে একবার বাঁকুড়ার মেজেষ্টারিতে দেখিয়াছিলাম; তখন ইহার দাড়ি ছিল।† এ ব্যক্তি প্রতাপচাঁদ নহে। আমি এক্ষণে রাজবাটীর খাস দপ্তরে কর্ম্ম করি। পরাণ-বাবুর পুত্র তারাচাঁদ আমার নাতিনীকে বিবাহ করিয়াছেন।" দায়রায় বলিলেন, "আসামী রাজা প্রতাপচাঁদ অপেক্ষা লম্বা, বয়স অল্প। বাঙ্গালা ১১৯৭ সালের কার্ত্তিক মাসে প্রতাপ জন্মগ্রহণ করেন।"

মোহনলাল বাবু বলিলেন, "আমি রাজবাটীর হাতীশালার দারোগা। এই আসামী প্রতাপচাঁদ নহে।" দায়রায় বলিলেন, "রাজা প্রতাপের সঙ্গে আসামীর বয়সে, বর্ণে, দৈর্ঘ্যে, আকৃতিতে, গঠনে, কি কোন বিষয়ে সাদৃশ্য নাই।"

ভৈরবনাথ-বাবু বলিলেন, "আমি প্রতাপচাঁদকে দুই তিনবার দেখিয়াছি, এ আসামী প্রতাপচাঁদ নহে। আমি রাজবাটী হইতে তঙ্খা পাই।" দায়রায় বলিলেন, "আমি পরাণ-বাবুর ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছি, পরাণ-বাবুও আমার ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছেন।"

নন্দলাল-বাবু বলিলেন, "আসামী

---

* জেনেরেল আলার্ড মহারাজ রঞ্জিত সিংহের একজন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন।

† অনেকে বলেন যে, যখন জালরাজার দাড়ি ছিল, তখন তাঁহার সহিত চিত্রপটের সাদৃশ্য হঠাৎ অনুভব হইত না, তাহাই রাজবাটী হইতে চিত্রপট আনীত হইয়াছিল। ধূর্ত্ত জালরাজা তখন সময় অপেক্ষা করিতেছিলেন। চিত্রপটখানি আদালতে আনীত হইলে পর, তিনি দাড়ি ফেলিলেন। তখন সকলেই দেখিল, চিত্রপটের সহিত তাঁহার মুখের সাদৃশ্য অতি স্পষ্ট।

প্রতাপচাঁদ নহে। আমি রাজসরকারে কর্ম্ম করি।" দায়রায় বলিলেন, "পরাণ-বাবু আমার কুটুম্ব।"

এইরূপে আর কয়েকজন জবানবন্দী দিলেন। তাঁহারা সকলেই রাজবাটীর সাক্ষী—পরাণ-বাবুর চাকর।

——

১৩। সনাক্ত সম্বন্ধে আসামীর সাক্ষ্য।

ডাক্তার স্কট সাহেব Robert Scott, 37th Madras Native Infantry) বলিলেন, "আমি ১৮১৫ সাল হইতে ১৮১৭ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানে ছিলাম। আমি রাজা প্রতাপচাঁদকে ভাল চিনিতাম। তাঁহার সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। এই আসামী সেই প্রতাপচাঁদ। জেলখানায় গিয়া আমি ইহাঁর সর্ব্বাঙ্গের চিহ্ন বিলক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি, সকল চিহ্নই মিলিয়াছে। ১৮১৭ সালে ইহাঁর গালের ভিতর একখানি ঘা হইয়া শোথ হয়, আমি তাহা ভাল করি। সে ঘার দাগ অদ্যাবধি রহিয়াছে। অন্য লোকে মুখে ঘার দাগ করিতে পারে সত্য, কিন্তু ঠিক সেই স্থানে সেইরূপ দাগ করিতে কেহই পারে না। প্রতাপচাঁদ শীতকালেও ঘামিতেন, আসামীও সেইরূপ ঘামেন। আর প্রতাপের মত ইহাঁর হাসি, কথা কহিবার পূর্ব্বে প্রতাপের মত কণ্ঠ পরিষ্কার করা ইহাঁর অভ্যাস। প্রতাপের মত ইহাঁর বসিবার ভঙ্গী। প্রতাপ আমার সঙ্গে ইংরাজীতে কথা কহিতেন, কিন্তু আসামী তেমন কহিতে পারিলেন না দেখিয়া আমি হেতু জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন, 'আর অভ্যাস নাই।' তাহা হইতে পারে। আমি পূর্ব্বে বিলক্ষণ হিন্দী বলিতে পারিতাম, কিন্তু দুই বৎসর বিলাতে থাকিয়া, আমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কেবল শুনিয়া কোন ভাষা শিখিলে এইরূপ হয়। পূর্ব্বের কথা আসামীকে দুই একটা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু তখনকার জজ মার্টিন সাহেবের নাম ব্যতীত আসামী আর কোন সাহেবের নাম করিতে পারিলে না। আমি আপনকার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম যে, 'আমি কি করিয়া বেড়াইতাম?' আসামী বলিলেন, 'একটী পিস্তল লইয়া পথে পথে কুক্কুর মারিয়া বেড়াইতে।' আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এই সময় দেওয়ানী জেলে কি একটা গোলমাল হইয়াছিল?' আসামী উত্তর করিলেন, 'বুলার সাহেব রঘু-বাবুকে জেলে পাঠাইয়াছিলেন। রঘু-বাবু তথায় বিষ খাইয়া মরিয়াছিলেন। তুমি তাঁহার দেহ চিরিয়া বিষের কথা বলিয়াছিলে।' এ সকল কথাই সত্য। প্রতাপ মেদেরা মদ খাইতেন। আমি এ কথা জিজ্ঞাসা করায় আসামী বলিলেন, 'আমি আর মদ খাই না, তবে ব্রাণ্ডি এখনও ভালবাসি।' আমি যখন বর্দ্ধমানে ছিলাম, তখন সেখানে ট্রাওয়ার সাহেব থাকিতেন। আমি তাঁহার পুত্রদের চিকিৎসা করিতাম। সে দিন আমি আপিসে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন না। তাহার স্মরণশক্তি অতি সামান্য।"

রিডলি [John Ridey] বলিলেন, "আমি প্রতাপচাঁদকে চিনিতাম। আমি ১৮১৫ সাল হইতে ১৮১৭ সাল পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানে ছিলাম। এই আসামী রাজা প্রতাপচাঁদের মত। আমি ইহাঁকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইনি সে সকল কথার যথার্থ উত্তর দিয়াছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, 'আপনার নিকট কখন আমি কিছু বিক্রয় করিয়াছিলাম কি না?' আসামী বলিলেন যে, 'একবার একটী সোনার ঘড়ী বিক্রয় করিয়াছিলে।' আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলাম যে. 'রাজবাটীর সিপাহীদের সঙ্গে প্রোবিন্সাল সিপাহীদের যে বিবাদ হয়, তাহা কিরূপে মিটিয়াছিল?' তাহাতে আসামী বলেন, 'রেবিনিউ বোর্ড হুকুম দেন যে, রাজবাটীর সিপাহীরা সবুজ পোষাক পরিবে, তাহাতেই সে বিবাদ-ভঞ্জন হয়।' এ-সকল প্রকৃত কথা।"

বিবি হেরিয়াট বিটিং বলিলেন, "আমি প্রতাপচাঁদকে বিশেষরূপে চিনিতাম।

আসামী নিশ্চয়ই সেই প্রতাপচাঁদ। আমার বয়স যখন ষোল বৎসর, তখন আমি ইহাঁকে অনেকবার আমার পিতার বাটীতে ও অন্যত্র দেখিয়াছি।”

বিবি সফিয়া ক্রেন বলিলেন, “আমি প্রতাপচাঁদকে ভালরূপে জানিতাম। এই আসামী নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ।”

জন মার্শাল বলিলেন, “আমি ৭১ নম্বর সিপাহীপল্টনের ব্রিগেড মেজর। আসামী প্রতাপচাঁদ কি না, তাহা আমি জানি না। তবে ২০ বৎসর কি ততোধিক হইল ইহার সঙ্গে ওবারবেক সাহেবের বাটীতে ও অন্যত্র আমার সর্ব্বদা সাক্ষাৎ ছিল। ইহাঁকে আমরা ছোট রাজা বলিতাম। ইহার অন্য কোন নাম যদি তখন শুনিয়া থাকি, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। কতবার ইহাঁকে দেখিয়াছি, তাহা আমার মনে নাই। বোধ হয়, ১৮২০ সালের পর আর আমি ইহাঁকে দেখি নাই। তাহার পর ওগল্‌বির মোকদ্দমার সময় সুপ্রিম-কোর্টে ইহাঁকে সাক্ষ্য দিতে দেখিয়াই আমার তখন স্মরণ হইল যে, এ ব্যক্তি আমার আলাপী, কোথায় যেন ইহাঁকে দেখিয়াছি। স্মরণ করিবার নিমিত্ত, ইহাঁর মুখের ছবি আমার প্যানটুলনে আঁকিয়া লইলাম। সেই ছবি ইংলিসম্যান কাগজে প্রকাশ হয়। তখন আমার বোধ হইয়াছিল, এ ব্যক্তি জুয়াচোর। ইহাঁকে আমি পশ্চিমে কোথায় দেখিয়া থাকিব। তাহার পর, গত কল্য ওবারবেক সাহেবের বাটীতে আহার করিতে করিতে এই ব্যক্তির কথা উপস্থিত হয়। তিনি ছোট রাজার সংক্রান্ত দুই একটী ঘটনা বলিলেন। আমার তখন স্মরণ হইল—ছোট রাজাকে মনে পড়িল। আসামী বর্দ্ধমানের রাজা বলিয়া পরিচয় দিতেছে, আমি তাহা জানিতাম। কিন্তু চুঁচুড়ায় যাঁহাকে ছোটরাজা বলিতাম, তিনিই যে বর্দ্ধমানের রাজা, তাহা আমি জানিতাম না।”

ফ্রানসুয়া সুলিমান (সাং চন্দ্র জাতিতে ফরাসিস) বলিলেন, “আমি প্রতাপচাঁদকে চিনি, আমি সর্ব্বদাই চুঁচুড়া যাইতাম, সেখানে প্রতাপচাঁদকে দেখিয়াছি। একবার নীলকুঠী ক্রয় করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট আট দশ বার যাতায়াত করিয়াছিলাম। এই আসামী—সেই প্রতাপচাঁদ। অদ্য আমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমাকে ইনি চিনিতে পারিলেন এবং নীলকুঠী বিক্রয় সম্বন্ধে কথা বলিলেন।”

হাজি আবু তালেব চুঁচুড়ার একজন মোগল, সওয়ালমতে বলিলেন, “আমি প্রতাপচাঁদকে ভালরূপে চিনিতাম। আসগর আলি নামে একজন হাকিম তাঁহার চুঁচুড়ার বাটীতে থাকিত। আমি তথায় গিয়া সেই আসগর আলির নিকট চিকিৎসাশাস্ত্র পড়িতাম। সুতরাং প্রতাপচাঁদকে বিলক্ষণ চিনিতাম। কিছুকাল পরে, আমি লক্ষ্ণৌ গিয়াছিলাম, তথা হইতে আসিয়া শুনিলাম, ‘প্রতাপচাঁদ মরিয়াছেন, কিন্তু আসগর আলি এবং অন্যান্য লোক বলেন যে, রাজা মরেন নাই, পলাইয়াছেন। এই আসামী সেই রাজা। আমি পূর্ব্বে রাজার চক্ষে যে দাগ দেখিয়াছিলাম আসামীর চক্ষে সেই দাগ দেখিতেছি।”

ডাক্তার জুলিয়ান নাইটার্ড, সাং ফরাসডাঙ্গা, ফরাসী ভাষায় জবানবন্দী দিলেন,—“আমার বয়স ৭৯ বৎসর। আমি এখনও ভাল দেখিতে পাই। এই আসামীকে চিনি, ইনি বর্দ্ধমানের রাজা, ইহাঁর নাম স্মরণ নাই, ইহাকে আমরা ছোট রাজা বলিতাম। আমি সেদিন জেলখানায় ইহাঁকে দেখিতে গিয়াছিলাম। আসামী আমাকে দেখিবামাত্র চিনিয়াছিলেন।”

ফ্রেডারিক থিয়ার্শ বলিলেন “আমি ফরাসডাঙ্গার মেজেষ্টর, আমি নিজে আসামীকে চিনি না; সেদিন আমি ডাক্তার নাইটার্ড সাহেবের সঙ্গে জেলখানায় গিয়াছিলাম। ডাক্তারকে আসামী দেখিবামাত্র চিনিয়াছিল। আমি জেনারেল আলার্ডকে চিনি, তিনি এখন লাহোরে আছেন। তিনি একদিন জেলখানায় আসামীকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। জেলখানা হইতে

ফিরিয়া গেলে, তাঁহার সহিত এই আসামী-সংক্রান্ত আমার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন যে, এই আসামীকে তিনি লাহোরে অনেকবার দেখিয়াছিলেন। জেনারেল আলার্ড বোধ হয়, ১৮৩: সালে বিলাত যান, ১৮৩৭ সালে প্রত্যাগমন করেন। তাহার পর আমার সহিত কথা হয়।" (এই জবানবন্দীর পর অথচ মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তির পূর্ব্বে জেনেরেল আলার্ডরে মৃত্যু হয়)।

গোলোকচন্দ্র ঘোষ, সাং সানিখা, বলিলেন, "আমি কিছুদিনের নিমিত্ত ছোট রাজাকে ইংরাজী পড়াইয়াছিলাম। তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছি, তাঁহাকে আমি চিনি, এই আসামী সেই ছোট মহারাজ। ছোট মহারাজ মরিয়াছেন, এ কথা আমি শুনিয়াছিলাম। আবার তাহার একমাস পরে শুনিয়াছিলাম যে, তিনি পলাইয়াছেন।"

গোপীমোহন পরামাণিক বলিল, "আমি জাতিতে ময়রা, আমার বয়স ৮৬ বৎসর, গোলাপবাগের গেটের কাছে আমার দোকান আছে। এই আসামীদের মধ্যে আমি কেবল মহারাজ প্রতাপচাঁদ বাহাদুরকে চিনি। যখন ইনি বর্দ্ধমানে প্রথম ফিরিয়া আসিলেন, তখন আমি ইহাঁকে গোলাপবাগে দেখিয়াছিলাম। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, ছোট মহারাজ মরেন নাই, মৃত্যুর ভাণ করিয়া পলাইয়াছিলেন, তীর্থযাত্রায় গিয়াছিলেন।"

রামধন বাগ্দী বলিল, "আমি পাল্‌তার ঘাটমাঝি, এই আসামী মহারাজকে চিনি। ষোল সতর বৎসর ধরিয়া আমি তেলিনীপাড়ার রামধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাউলের মাঝি ছিলাম। ভদ্রেশ্বরে রামধন-বাবুর এক খানি বাগান ও বৈঠকখানা ছিল। সেখানে মহারাজ মধ্যে মধ্যে যাইতেন, এক রাত এক দিন সেখানে থাকিতেন, ইহা আমি দেখিয়াছি।"

আমীর উদ্দীন আমেদ বলিলেন, "আমার নিবাস চুঁচুড়া। আমি প্রতাপচাঁদকে চিনিতাম। আমি চুঁচুড়ার রাজবাটীতে মুন্সি কালাম উদ্দীনের নিকট প্রায় দশ বৎসর অধ্যয়ন করি। তাহার পর মত বুড়া রাজার ফরাসিস বিবি ইসাবেল আপন পুত্রদের শিক্ষার নিমিত্ত আমাকে রাজবাটীতে রাখেন। প্রতাপচাঁদ চুঁচুড়ায় আসিলেই আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম। এই আসামী সেই প্রতাপচাঁদ।"

আগা আব্বাস যে ব্যক্তি প্রতাপের ছায়ারূপে সঙ্গে থাকিত, সেই ব্যক্তি বলিল, "এই আসামী রাজা প্রতাপচাঁদ। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

ডেবিড হেয়ার সাহেব (David Hare) বলিলেন, "আমি রাজা প্রতাপচাঁদকে চিনিতাম। কলিকাতায় ১৮১৭ কি ১৮১৮ সালে তিনি যখন ছিলেন, তখন ছয় সাত বার আমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার সহিত এই আসামীর সাদৃশ্য বিলক্ষণ আছে। পার্শ্বের ঘরে যে ছবি আছে, তাহা আমি দেখিয়াছি। সেই ছবির পার্শ্বে আসামীকে একবার এদিকে, একবার ওদিকে দাঁড় করাইয়া দেখিয়াছি, তাহার সঙ্গে আসামীর নাক, চোক, অবয়ব বিলক্ষণ মিলে। বিশেষতঃ ছবির বামদিকে দাঁড় করাইলে আরো মিলে। আসামীর চিবুক ও নিম্ন ঠোঁটের নীচে যে গর্ত্তের মত আছে, তাহাও মিলে। আমি যখন আসামীকে প্রথম দেখিলাম, তখন তাহাকে প্রতাপ অপেক্ষা লম্বা বোধ হইয়াছিল। তাহার পর আমি তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া দেখিলাম যে, আমার ভ্রম হইয়াছিল। আসামী ঠিক প্রতাপের মত উচ্চ। অদ্য প্রাতে জেলখানায় আসামীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেই সময় আসামীর সহিত দুই একটী বিষয়ে আমার কথাবার্ত্তা হয়। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'রামমোহন রায়কে স্মরণ আছে কি?' প্রথমে আমি রামমোহন রায়ের সঙ্গে প্রতাপচাঁদের সহিত আলাপ করিতে

নাই, তাহা প্রথমে আসামীর স্মরণ হইল না তাহার পর স্মরণ হইল। তখন তিনি আমাকে বলিলেন, 'তুমি সেই দিন একটা বন্দুকের মত বাক্স করিয়া একটা দূরবীণ আর একটা খাঁচায় দুইটা পাখী লইয়া গিয়াছিলে। আমরা একত্রে ছাদে গিয়া কথা কহি।' এ সকল কথা প্রকৃত। দূরবীণ প্রায় ৪০ ইঞ্চ লম্বা ছিল, তাহাও আসামীর স্মরণ আছে। আমার বিশ্বাস যে, এই আসামী প্রতাপচাঁদ বটে। আমি আর একবার পানিহাটি গ্রামে একটা নাচের নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম; সেখানে আসামীকে দেখিয়াছিলাম। তখন ইঁহার মুখের উপরিভাগ দেখিবাই আমার বোধ হইয়াছিল যে, এ ব্যক্তিকে আমি চিনি। কিন্তু ঐ সময় ইহার দাড়ি ছিল বলিয়া আমি ভাল চিনিতে পারি নাই। তাহার পর ওগলবির মোকর্দ্দমায় ইহাকে আমি সুপ্রিমকোর্টে সাক্ষ্য দিতে দেখি. দেখিয়াই ইহাকে প্রতাপচাঁদ বলিয়া আমার বোধ হইয়াছিল। সেইখানেই এই কথা আমি কৌন্সিলি স্মিথ সাহেবকে বলি। আমি অনেক দিন জনরবে শুনিয়াছিলাম যে, প্রতাপের মৃত্যু-সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ আছে।"

রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ বলিলেন. "আমার পিতার নাম মহারাজ চৈতন্য সিংহ. নিবাস বিষ্ণুপুর। তেজচাঁদ বাহাদুরের সহিত আমার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। আমি বর্দ্ধমানে সর্ব্বদা যাইতাম এবং এক একবার গিয়া দুই মাস করিয়া থাকিতাম। আসামী নিশ্চয়ই তেজচাঁদ বাহাদুরের পুত্র প্রতাপচাঁদ। পূর্ব্বে আমি প্রতাপের পলায়নবার্ত্তা শুনিয়াছিলাম। তাহার পর সাত আট বৎসর হইল, লাহোর-নিবাসী আমার একজন পাঠান দ্বারবান্ স্বদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আমাকে বলিয়াছিল, 'আমি রঞ্জিতসিংহের পুত্র খড়কসিংহের সহিত প্রতাপচাঁদকে এক হাতীতে চড়িয়া যাইতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি।' আসামী প্রায় তিন বৎসর হইল, একবার আমার বাটীতে গিয়াছিল। আমি যত্নপূর্ব্বক ইহাকে তথায় তিন মাস রাখি। সেই জন্য বাকুড়ার মেজেষ্টর আমাকে দেড় বৎসর আটক রাখেন আর বিস্তর অপমান করেন।"

জামকুড়িনিবাসী রাজা জয়সিংহ বলিলেন, "আমি বিষ্ণুপুরের রাজা গোষ্ঠীসম্ভূত। আমি আসামীকে চিনি, প্রতাপচাঁদ।"

হাকিম আলী উল্লা বলিলেন, "আমি আসামীকে চিনি। ইনি প্রতাপচাঁদ। পূর্ব্বে আমি ইঁহার চিকিৎসা করিয়াছি। আসগর আলি ইঁহার বেতনভোগী হাকিম ছিলেন। তাহার মুখে বিশেষ করিয়া শুনিয়াছিলাম যে, প্রতাপচাঁদ মরেন নাই, পলাইয়াছেন।"

কুঞ্জবিহারী ঘোষ বলিলেন, "আসামী আমার সাবেক মুনিব প্রতাপচাঁদ। ইনি যখন প্রথম গোলাপবাগে আসেন, আমি তখন ইঁহাকে দেখিয়া চিনিয়াছিলাম. এবং পরাণ-বাবুর পুত্র তারাচাঁদকে তাহা বলিয়াছিলাম।"

পিটর এমার সাহেব, ফ্রেজর সাহেব নাজীর গোলাম হোসেন, আগা ইস্পাহানী ও স্বরূপচন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি আরও অনেকে আসামীর পক্ষে এইরূপ জবানবন্দী দিলেন। প্রতাপচাঁদের পিসী তোতাকুমারী, আর তাঁহার দুই স্ত্রী সপিনা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেন।

জবানবন্দী প্রায় শেষ হইয়া আসিলে একদিন রাজা প্রতাপচাঁদের মাতুল হঠাৎ আদালতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মেদিনীপুর জেলার একজন রাজা ছিলেন। জালরাজা তাঁহাকে দেখিবামাত্র আহ্লাদে জজ সাহেবকে বলিয়া উঠিলেন, 'ঐ আমার মাতুল আসিয়াছেন। ইঁহার জবানবন্দী লওয়া হউক।' কিন্তু তাঁহার উকীল তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন, "সনাক্তসম্বন্ধে যে প্রমাণ আমরা দিয়াছি, এ মোকর্দ্দমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট, আর প্রমাণ দিব না।" জালরাজা তাহাতে কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করিলেন, উকীল সাহেব তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "উপস্থিত ফৌজদারী মোকর্দ্দমায়

দেওয়ানীর প্রমাণ অনাবশ্যক। যে প্রমাণ দেওয়া গিয়াছে, তাহাই অতিরিক্ত হইয়াছে। আমি যাহা দেখিতেছি, তাহাতে আর পাঁচ হাজার সাক্ষী আপনাকে সনাক্ত করিলেও জজ সাহেবের মত ফিরিবে না। আপনি প্রতাপচাঁদ কি না, এ কথার বিচার দেওয়ানী আদালতে ভিন্ন এখানে হইবে না, এখানে সে বিচার হইলেও কোন ফল দর্শিবে না। এখনকার বিচারে আপনি রাজত্ব পাইবেন না, আপনাকে আবার দেওয়ানীতে নালিস করিতে হইবে। তবে এখন সকল প্রমাণ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন কি?"

সা সাহেব এখানে ভুলিলেন। তিনি জানিতেন যে, গুটীকতক প্রধান প্রধান রাজ-কর্ম্মচারী একত্র হইয়া পূর্ব্বাহ্ণে পরামর্শ করিয়াছিলেন যে, জালরাজাকে আসামী ভিন্ন কখন মোকদ্দমায় ফরিয়াদী হইতে দেওয়া হইবে না এবং সেই পরামর্শ অনুসারে জালরাজাকে ফৌজদারীতে আসামী করা হইয়াছিল। এ কথা সা সাহেব নিজে লিখিয়া গিয়াছেন; তথাপি তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, অন্য লোকে দেওয়ানী আদালতে যেরূপ নালিস করে, জালরাজাও সেইরূপ নালিস করিতে পাইবেন। তাঁহার এ প্রত্যাশা অসঙ্গত। জালরাজার পক্ষে দেওয়ানীর দ্বার অভাবনীয় — অচিন্তনীয় ঘটনায় রোধ হইয়াছিল। সে কথা পরে বলা যাইবে।

১৩। প্রতাপচাঁদের মৃত্যু প্রকৃত কি না।

প্রতাপচাঁদের মৃত্যু প্রমাণ করিবার নিমিত্ত রাজবাটীর সাক্ষী রাধারমণ সরকার, বসন্তলাল-বাবু, নন্দবাবু, ভৈরব-বাবু প্রভৃতি পনের জন জবানবন্দী দিলেন। তাঁহাদের পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। তাঁহারা সকলেই রাজবাটীর বেতনভোগী এবং পরাণ-বাবুর আত্মীয়-কুটুম্ব। তাঁহারা কে কি বলিলেন, আনুপূর্ব্বিক সে পরিচয় দেওয়া অনর্থক। মোট কথা, তাঁহারা সকলেই এইরূপ বলিলেন যে, ১২২৭ সালের ২১শে পৌষ রাত্রি দেড় প্রহরের সময় কাল্‌নার রাজবাটী হইতে প্রতাপচাঁদকে পাল্কী করিয়া গঙ্গাযাত্রা করা হয়। তখন বড় অন্ধকার। পৌষমাসের রাত্রে বড় শীত। সেই শীতে প্রতাপচাঁদকে জলের নিকট রাখায় তাঁহার কম্প আসিল, কাজেই তাঁহাকে তাঁবুর ভিতর লইয়া যাইতে হইল। তাঁবু সেই স্থানে জলের ধারে পূর্ব্বেই খাটান হইয়াছিল। তাহার পর তথায় গীতাপাঠ আরম্ভ হইল। এ দিকে প্রতাপচাঁদ পালঙ্কে শুইয়া হাতী, ঘোড়া, ধন, ধান্য দান করিতে লাগিলেন। দান করা হইলে পর তাঁহার অন্তর্জ্জলি করা গেল। মোহন-বাবু তাঁহার পা জলে ডুবাইয়া ধরেন। প্রতাপচাঁদের মৃত্যু হইলে ঘাসিরাম তাঁহার মুখাগ্নি করেন। বাবলা ও চন্দন-কাষ্ঠে প্রতাপের শবদাহ হয়। সেই সময় ঘাটে দশ বারটা মসাল জ্বালা ছিল।

সাক্ষীরা এই সকল বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বলিলেন। কিন্তু তেজচাঁদ বাহাদুরের মৃত্যু কোন্ তারিখে বা কোন্ সময়ে হয়, তাহা সাক্ষীরা অনেকেই বলিতে পারিলেন না, অথচ প্রতাপের মৃত্যুর প্রায় ১২ বৎসর পরে তেজচাঁদের মৃত্যু হয়। কেহ বলিলেন, "তাহা স্মরণ নাই।" কেহ বলিলেন, "বধূ-রাণীদের মোকর্দ্দমায় এই সকল বিষয়ে আমি সাক্ষী দিয়াছিলাম, তাহাতেই প্রতাপ-চাঁদের মৃত্যু-বৃত্তান্ত আমার স্মরণ আছে। তেজচাঁদের মৃত্যু স্মরণ রাখিবার সেরূপ কোন কারণ ঘটে নাই।" সাক্ষীর এইরূপ নানা হেতু দর্শাইলেন।

কিন্তু এই সকল জবানবন্দীতে জজ সাহেবের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল। তিনি আপনার রায়ে লিখিলেন ঃ—

"The Proof here is of the strongest description of the testimony of the fact; viz. the deposition of the witnesses (fifteen in number) named in the margin, who have sworn positively to the death and cremation, and who are consistent in thei

narrative of the attendant particulars, their testimony would appear to be conclusive."

বিশ বৎসরের ঘটনা পনের জন সাক্ষীতে বর্ণন করিল. অথচ কেহ কাহার সহিত কোন অংশে অনৈক্য হইল না। কি কার্য্ দ্বারা শব দাহ হইয়াছিল, তাহা পর্য্যন্ত সাক্ষীরা একরূপ বলিয়াছিল, কোন অংশে অনৈক্য হয় নাই। সুতরাং তাহাদের জবানবন্দীর প্রতি জজ সাহেবের বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল।

জালরাজা জজকে বলিলেন, "পরাণের আত্মীয়কুটুম্বের কথায় নির্ভর করিয়া কেন আমার মাথা খাও? প্রতাপের মরণের সময় পরাণের কুটুম্ব, পরাণের চাকর, পরাণের অন্নদাস ব্যতীত কি আর কেহ ছিল না? প্রতাপের ত কুটুম্ব, আমলা, চাকর সকলই ছিল, কই, তাহাদের একজনকেও ত ডাকা হয় নাই?" জজ সাহেব এ সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

জালরাজা স্বীকার করেন যে, তাহাকে গঙ্গাযাত্রা করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি বলেন যে, তাহা তাঁহার নিজের ইচ্ছামত হইয়াছিল। তিনি আরও বলেন যে, "যে কোন পীড়া আমি অনুকরণ করিতে পারি; মৃত্যুও অনুকরণ করিতে পারি। কবিরাজেরা সে অনুকরণ ছন্দাংশে বুঝিতে পারিবে না।"

পীড়ার ভাণ সম্বন্ধে জালরাজার কথা কতদুর গ্রাহ্য, তাহা বলা যায় না। তবে বড় বড় ডাক্তার ও বিজ্ঞানবিদের মধ্যে দুই একজন বলেন যে, মৃত্যু অনুকরণ তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। ডাক্তার চেনি সাহেব বলেন যে, এক সময় কর্ণেল টাউনসেণ্ড পীড়িত ছিলেন। তিনি প্রত্যহ কর্ণেল সাহেবকে দুইবার করিয়া দেখিতে যাইতেন। একদিন কর্ণেল সাহেব তাঁহাকে বলিলেন, "কতদিন হইতে আমার কেমন একটা হইয়াছে, তাহা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না; আমায় তোমরা বুঝাইয়া দাও। আমি দেখিতেছি যে, মনে করিলে আমি মরিতে পারি, আবার চেষ্টা করিলে বাচিতে পারি।" সে স্থানে আর একজন ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার নাম বেনার্ড এবং আর একজন এপথিকারি ছিলেন, তাঁহার নাম স্কাইন। এই কয়েক জন কর্ণেল সাহেবের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, কতকটা অবিশ্বাসও করিলেন; কিন্তু কর্ণেল সাহেব এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইবার নিমিত্ত জেদ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিবার পূর্ব্বে ডাক্তার সাহেবেরা একে একে কর্ণেল সাহেবের নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। নাড়ী বেশ পরিস্কার, তবে একটু ক্ষীণ। তাহার পর বুকে হাত দিয়া দেখিলেন, তাহাও সহজমত টিপ্ টিপ্ করিতেছে। তাহার পর কর্ণেল সাহেব চিৎ হইয়া স্থিরভাবে শয়ন করিয়া থাকিলেন। ডাক্তার চেনি সাহেব তাঁহার দক্ষিণ হস্তের নাড়ী টিপিয়া ধরিলেন; ডাক্তার বেনার্ড বুকে হাত দিয়া থাকিলেন; আর স্কাইন সাহেব একখানি পরিষ্কার দর্পণ নাসার নিকট ধরিয়া রহিলেন। ক্রমে নাড়ী যাইতে লাগিল—শেষ তাহা একেবারে পাওয়া গেল না। হৃৎচালনা স্থগিত হইল, নিশ্বাস-প্রশ্বাসও স্থির হইয়া গেল। যে দর্পণ নাসাগ্রে ধরা হইয়াছিল, তাহাতে আর নিশ্বাসের ঘাম লাগিল না। তাহার পর ডাক্তারেরা একে একে সকলেই নাড়ী দেখিলেন, সকলেই বুকে হাত দিয়া দেখিলেন, সকলেই দর্পণ ধরিয়া দেখিলেন, জীবিতের চিহ্ন কেহই কিছু পাইলেন না। তখন তিনজনে অনেকক্ষণ ধরিয়া তর্কবিতর্ক করিলেন, এ সময়ের মধ্যে কর্ণেল সাহেবের আর চৈতন্য হইল না। শেষ তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কর্ণেল সাহেব নিশ্চয়ই মরিয়াছেন। এইরূপে অনেকক্ষণ গেল। তাহার পর তাঁহারা চলিয়া যাইবার উদ্‌যোগ করিতেছেন, এমন সময় কর্ণেল সাহেবের শরীর একটু নড়িল। ডাক্তারেরা নাড়ী দেখিলেন—নাড়ী হইয়াছে; বুকে হাত দিলেন—হৃৎপিণ্ডের গতি আরম্ভ হইয়াছে, নাসায় হাত দিলেন—নিশ্বাস বহিতেছে। শেষ কর্ণেল সাহেব ধীরে ধীরে কথা কহিতে লাগিলেন। ডাক্তারেরা অবাক্ হইয়া

থাকিলেন। কেহ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; অথচ মৃত্যু যে নিশ্চয়ই হইয়াছিল, সে বিষয়ে তাঁহাদের আর কোন সন্দেহ থাকিল না।

এরূপ আরও দুই চারিটী ঘটনার কথা শুনা যায়। ডাক্তার টানার সাহেব লিখিয়াছেন যে, দেহের উপর মনের একাধিপত্য অতি অসাধারণ। এ সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনার প্রমাণ আছে। যথা—সেল্‌সাস সাহেব বলিয়া গিয়াছেন যে, একজন পাদরী যখনই ইচ্ছা করিতেন, তখনই আপনার সংজ্ঞাকে স্বতন্ত্র করিয়া আপনি জ্ঞানশূন্য ও প্রাণশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকিতে পারিতেন।*

শুনা যায়, দেহ হইতে জীবাত্মাকে ইচ্ছামত স্বতন্ত্র করিবার পদ্ধতি আমাদের যোগশাস্ত্রে বিশেষ করিয়া লিখিত আছে। অনেকে বলেন, যোগিদের মধ্যে সে পদ্ধতির

---

* ডাক্তার চেনি এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ—

"colonel Townsend told us, he had sent for us to give him some account of an odd sensation, he had, for some time, observed and felt in himself : which was, that composing himself, he could die or expire, when he pleased, and yet by an effort or some how, he could come to life again which, it seems he had sometimes tried before he had sent for us. We heard this with surprize, but as it was not to be accounted for, form now common prinicples, we could hardly believe the fact as he related it, much less give any account of it : unless he should please to make the experiment before us, which we were unwilling he should do, lest, in his weak condition, he might carry it too far. He cotinued to talk very distinctly and sensibly above a quarter of an hour about this (to him) surprizing sensation and insisted so much on, our seeing the trial made, that we were at last forced to comply. We all three felt his puise first ; it was distinct, though small and thready : and his heart had its usual beating. He composed himself on his back, and lay in a still posture some time : while I held his right hand, Dr. Baynard laid his hand on his heart and Mr. Skrine held a clean looking-glass to his mouth, I found his pulse sink gradually till at last I could not feel any by the most exact and nice touch. Dr. Baynard could not feel the least motion in his heart. Mr. Skrine the least soil of breath on the bright mirror he held to his mouth ; then each of us by turns examined his arm, heart and breath, but could not by the nicest scruting discover the least symptom of life in him. We reasoned a long time about this odd appearance as well as we could, and all of us judging it inexplicable and-unaccountable, and finding he still continued in that conditon, we began to conclude that he had, indeed, carried the experinent too far, and at last were satisfied he was actually dead, and were just ready to leave him. This continued about half an hour. By nine O' clock in the morning in a autumn as we were going away we observed some motion about the body, and upon examination found his pulse and the motion of his heart gradually returning ; began to breathe gently and speak softly : we were all astonished to the last degree at this unexpected change, and after some further conversation with him and among ourselves, went away fully satisfied as to all the particulars of this fact but confounded and puzzled and not able to form any rational scheme that might account for it." Quoted by T. H. Tanner in his practice of Medicine 6th. Edition Vol. I.

* "The influence of the will over even the involuntary muscles is sometimes extraordinary as many remarkable cases attest. Thus Celsus speaks of priest who could separate himself from his senses

চৰ্চ্চা অদ্যাপি বিলক্ষণ প্রচলিত। ভূকৈলাসের যোগী ও রণজিৎ সিংহের যোগী এ কথার প্রমাণস্থল।

লোকে বলে, তাঁহারা উভয়েই এরূপ সংজ্ঞাহীন হইতে পারিতেন যে, ডাক্তারেরা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়াও জীবনের লক্ষণ কিছুই পাইতেন না। ডাক্তার ম্যাগ্রেগর সাহেব নিজে রণজিতের যোগীকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, সেই যোগীকে এক সিন্ধুকে আবদ্ধ করিয়া মৃত্তিকায় পুতিয়া চল্লিশ দিন রাখা হইয়াছিল; চল্লিশ দিনের পর মৃত্তিকা খনন করিয়া সিন্ধুক বাহির করা হইলে দেখা গেল, তাহার ভিতর যোগী সমাধি অবস্থায় আছেন, তাঁহার সংজ্ঞা নাই। ডাক্তার Mc Gregor সাহেব নাড়ী দেখিলেন—নাড়ী নাই। কিন্তু তাহার পর তাঁহার চেতনা হইল। ডাক্তার সাহেব "History of the Sikh war" গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেনঃ—

"A Faqueer, who arrived at Lahore, engaged to bury himself for any length of time, shut up in a box, and without either food or drink. Runjeet naturally disbelived the man's assertions and was, determined to put them to the test. For this purpose the Faqueer was shut up in a wooden box, which was placed in a small apartment below the middle of the round: there was a folding door to his ox, which was secured by a lock and a ey. Surrounding this apartment there as the garden-house the door of which was like-wise locked; and outside the hole a high wall, having its doorway built np with bricks and mud. In order to prevent any one from approaching the place, a life of sentries was placed, and relived at regular intervals. The strictest watch was kept up for the space of forty days and forty nights, at the expiration of which period the Maharajh, attended by his gradson and several of his Sirdars, as well as Generl Ventura, Captain Wade and myself, proceeded to disinter the Faqueer. the bricks and mud were removed from the outer doorway; the door of the gardenhouse was next unlocked, and lastly that of the wooden box containing the Faqueer. The latter was found covered with a white sheer, on removing which, the figure of the man presented itself in a siting posture. His hands and arms were pressed to his sides, and his legs and thighs crossed. The first step of the operation or resuscitaion consisted in pouring over his head a quantity of warm water. After this, a hot cake of atta was plaeed on the crown of his head · a plug was next removed from one of his nostrils and on this being done, the man breathed strongly through it. The mouth was now opend, and the tongue, which had been closely applied to the roof of the mouth, brought forwand, and both it and the lips anointed with ghee. During this part of the proceeding, I could not feel the pulsation of the wrist, though the temperature of the body was much above the natural standard of health The legs and arms being extended and the eyelids raised, the former were well rubbed and a little ghee applied to the latter. The eyelids presented a dimmed suffused appearance, like those of a corpse. The man now evinced signs of returnning animation; the pulse became perceptible at the wrist, whilst the unnatural tem-

---

when he chose, and lie like a man void of life and sense. Carden used to boast being able to do the same But the most surprising example of this kind is the well-known case of colonel Townsend related by Dr. George Cheyne." T. H. Taner's Practice of Medicine 6th Ed, vol. I, page 500.

perature of the body rapidly diminished. He made several ineffectual efforts to speak and at length uttered a few words in a tone so low and feeble as to render them inaudible. When the Eaqueer was able to converse, the completion of the feat was announced by the discharge of guns and other demonstration of joy.

হঠযোগ অভ্যাস করিলে এ সকল ভেল্কী অনায়াসে দেখান যাইতে পারে। জালরাজার তাহা অভ্যাস ছিল, এ কথা তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু জজ, উকীল প্রভৃতি তাহা বুঝিলেন না, সুতরাং বিশ্বাসও করিলেন না। খেচরী মুদ্রা দ্বারা শ্বাসরোধ করিয়া মৃত্যু অনুকরণ করা যাইতে পারে, এ কথা ইংরাজী বুদ্ধির অতীত— আমাদের বুদ্ধিরও অতীত। আমরা ইংরাজী গ্রন্থে যে সকল কথা দেখি না, সুতরাং সে সকল কথা বিশ্বাস করি না!

জালরাজার পীড়ার ভাণ-সম্বন্ধে উকীল সা সাহেব লিখিয়াছেন যে, তাঁহার এ বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল। তিনি বলেন যে, "প্রথমে আমার সংস্কার হইয়াছিল যে, এ প্রতাপচাঁদ সত্যই জাল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে সে সংস্কার যায়। ক্রমে নানা বিষয় দেখিতে দেখিতে বুঝিলাম যে, ইনি নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ। কিন্তু মৃত্যুর ভাণ-সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিল। পরে একদিন সে সন্দেহের কথা হুগলীর জেলখানায় বসিয়া গল্প করিতে করিতে জালরাজাকে বলিলে, জালরাজা হাসিয়া উত্তর করিলেন যে, 'এ পরীক্ষা অতি সহজ। তুমি ডাক্তার সাহেবকে এখনই আসিতে লেখ, আমি এখনই একটা পীড়ার ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকি।' তখন ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব হুগলীর সিবিল সার্জ্জন ছিলেন। তাঁহাকে পত্র লেখায় তিনি তৎক্ষণাৎ জেলখানায় আসিলেন এবং জালরাজাকে দেখিয়া রিপোর্ট করিলেন যে,জালরাজার বড় জ্বর হইয়াছে এবং পা ফুলিয়াছে, বোধ হয়, তাঁহার গোদ হইবে। আপাততঃ তিনি কিছু দিন আদালতে যাইতে পারিবেন না।" এ কথা প্রকৃত হইলে পীড়ার ভাণ করিবার ক্ষমতা জালরাজার ছিল বলিয়া বোধ হইতে পারে।

সে কথা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, ডাক্তার সাহেবের এই রিপোর্ট উপলক্ষ করিয়া সা সাহেব জজ সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, "জামিন লইয়া জাল-রাজাকে খালাস দেওয়া হয়, এবং আপাততঃ তাঁহাকে একখানি চারপাই আর একখানি গাত্রবস্ত্র দেওয়া হয়।" জজ সাহেব কেন উত্তর দিবার পূর্ব্বে বিগ্‌নেল সাহেব বলিলেন যে, "জেলের আসামীর জন্য এ সকল সরঞ্জাম দিবার কোন বিধি আইনে নাই। তবে যদি একান্ত তাহা আবশ্যক হয়,তাহা হইলে ডাক্তার সাহেব আসামীকে হাসপাতালে লইয়া যাইবার হুকুম দিতে পারেন।"জজ কার্টিস সাহেব বিগ্‌নেল সাহেবের অমতে কোন হুকুম দিতে সাহস করিতেন না তথাপি তিনি বলিলেন যে,"এ বিষয়ে দরখাস্ত করিলে বিবেচনা করা যাইবে।" আর জামিন লইয়া খালাস দেওয়া সম্বন্ধে নিজামতে দরখাস্ত করিতে আদেশ করিলেন। সা সাহেব সেইমত দুই আদালতে দুই দরখাস্ত করিলেন। কার্টিস সাহেব চারপাই দিতে হুকুম দিলেন এবং কিছু দিন পরে নিজামত হুকুম দিলেন যে,"জামিন লইয়া আসামীকে ছাড়িয়া দেওয়ার আপত্তি নাই।" কিন্তু জজ কার্টিস সাহেব নিজামতের সে হুকুম তামিল করিতে অসম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন, "এ অঞ্চলের লোকেরা জালরাজার জন্য যেরূপ মাতিয়া উঠিয়াছিল, এখন আর তত নাই। এ সময়ে তাহারা জালরাজাকে পাইলে আবার সেইরূপ মাতিয়া উঠিবে। সুতরাং জালরাজাকে ছাড়িয়া দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে।" নিজামত আদালত নিরুত্তর হইলেন।

রাজা প্রতাপচাঁদের মৃত্যু সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট পক্ষের প্রমাণ দেওয়া হইলে পর, জালরাজা তাহা খণ্ডন করিবার কোন বিশেষ চেষ্টা না করিয়া কেবল এইমাত্র দেখাইলেন যে, এই সময় রটনা হইয়াছিল যে, প্রতাপচাঁদ

মরেন নাই—অজ্ঞাতবাস গিয়াছেন। জাল-রাজার উকীলেরা জজ সাহেবকে বলিলেন, "যে স্থলে বড় বড় লোকে বলিতেছে,আসামী সত্যই প্রতাপচাঁদ, সে স্থলে মৃত্যুর প্রমাণ অন্যথা করিবার আর প্রয়োজন কি ?" জজ সাহেব সে কথার বিপরীত বলিলেন যে, "যখন প্রতাপচাঁদের মৃত্যু হওয়া স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে, তখন কেহ তাঁহাকে সনাক্ত করিলে আর কি হইবে ?"

মৃত্যু-ঘটনার হেতু জালরাজা এইরূপ বলেন—

"বিমাতা মহারাণী কমলকুমারী আমার পরম শত্রু ছিলেন। আমার বয়স যখন ষোল কি সতর, তখন তিনি আহারের সঙ্গে আমায় দুইবার বিষ দেন। একবার আমি তাহা ফেলিয়া দিই, আর একবার তাহা একটা ইন্দুরকে খাইতে দিই, ইন্দুর, তাহা খাইয়া তৎক্ষণাৎ মরে। সেই অবধি আমার অন্ন আমি স্বতন্ত্র পাক করাইতাম। পরাণ আর বসন্তলাল-বাবু আমার সর্ব্বনাশ করিবার নিমিত্ত সহস্র ফাঁদ পাতিতেন, আমি তাহা হইতে কৌশলে উদ্ধার হইতাম। কিন্তু শেষ তাঁহারা আমার পিতার মন এমন ভার করিয়া দিলেন যে, আমি তাহার আর কোন উপায় করিতে পারিলাম না।

"আমি সেই অবধি অধঃপাতে গেলাম। ক্রমেই মদ অধিক খাইতে লাগিলাম, শেষে অদৃষ্টদোষে গুরুতর পাপগ্রস্ত হইলাম। তখন কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট স্বকৃত মহা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি, জিজ্ঞাসা করায়, তিনি ব্যবস্থা দিলেন, 'এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুষা-নল ; তাহা অশক্তে চতুর্দ্দশ বৎসর অজ্ঞাত-বাস' ; এই সঙ্গে বলিয়া দিলেন যে, 'এরূপ ভাবে অজ্ঞাতবাস করিবে যেন, সকলেই জানে, তুমি—মরিয়াছ।' এই অজ্ঞাতবাস কিরূপে আরম্ভ করিব, প্রথমে ঠিক অনুভব করিতে পারি নাই ; সুতরাং প্রথমে কাহাকেও না বলিয়া পলাইলাম। সেবার আমার পিতা আমাকে রাজমহল হইতে ধরিয়া আনেন। মুন্সি আমীর উদ্দীন তাঁহাকে আমার সন্ধান বলিয়া দেয়। আমি ফিরিয়া আসিলে, পিতা মহাশয় পরাণের অত্যাচার ও পীড়নের কথা জানিতে পারিলেন, এবং সেই অবধি পরাণের উপর তিনি হাড়ে চটিয়া গেলেন ; আমাকেও অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু আমার প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক, আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। এবার ভাবি-লাম, কেবল পলাইলে হইবে না, যেরূপ ব্যবস্থাপত্র, সেইরূপ করা কর্ত্তব্য। আমি মরি-য়াছি সকলে জানা আবশ্যক। অতএব পীড়ার ভাণ করিয়া কাল্‌নায় গেলাম। কাল্‌নার ঘাটে কালীপ্রসাদ একখানি ভাউলিয়া আনিয়া রাখিবেন কথা ছিল; আর তাঁহাকে বলা ছিল, ভাউলিয়া পৌঁছিলে তিনি শঙ্খধ্বনি করি-বেন আমি শয্যায় শুইয়া সেই সঙ্কেত শুনি-লাম। তাহার পর ক্রমে বিকারের রোগীর ন্যায় ভ্রমবাক্য বলিতে লাগিলাম। সকলে আমায় পাল্কী করিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া গেল। শেষ অন্তর্জ্জলি করিল। অন্তর্জ্জলির পর যখন রাজবাটীর অধিকাংশ লোক শীতে কাতর হইয়া তাঁবুর ভিতর গিয়া আশ্রয় লইল, কেবল দুই চারিজন মাত্র আমার নিকট থাকিল, সেই সময় আমি তাহাদিগকে শপথ করাইয়া জলে সরিয়া পড়ি ; নিঃশব্দে সাঁতার দিয়া বজরায় উঠি ; রাত্রিশেষে সেই বজরায় মুরশিদাবাদ যাত্রা করি।"

এই সময় ঘটনাও হইয়াছিল,—রাজবাটীর লোকেরা ঘাটে শব না পাইয়া গঙ্গায় জাল ফেলিয়া অনুসন্ধান করে। সুতরাং লোকের বিশ্বাস হইয়াছিল যে,প্রতাপ পলাইয়াছেন—মরেন নাই।

১৪। জালরাজা গোয়াড়ির কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী কি না ?

এই মোকর্দ্দমার প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে, যশোর জেলানিবাসী শ্যামলাল তেও-যারি নামে একজন ব্রাহ্মণ গোয়াড়িতে আসিয়া একখানি কালীপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা

করেন। ক্রমে সেই প্রতিমা উপলক্ষ করিয়া তাঁহার দিনযাপন হইতে থাকে। লোকে তাঁহাকে ব্রহ্মচারী বলিত। তাঁহার তিন পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণলাল, মধ্যম রূপলাল, সর্ব্বকনিষ্ঠ গৌরলাল। ইহাদের মধ্যে পৈতৃক ব্যবসায়ে কৃষ্ণলালের একেবারে অনুরাগ ছিল না, তিনি চাকরী করিবেন, এই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তাহা জুটে নাই, তিনি কেবল উমেদারী করিয়া বেড়াইতেন। তথাকার পাদ্‌রী ডিয়ার সাহেব তাঁহার প্রতি সদয় ছিলেন, কৃষ্ণলাল তাঁহার বাটীতে প্রত্যহ একবার করিয়া গিয়া সেলাম করিয়া আসিতেন। কিছুদিন পরে পাদ্‌রী সাহেব একখানি সুপারিস চিঠি তথাকার মেজেষ্টর ব্যাটি সাহেবকে দেন। সেই সময় শান্তিপুরের দারোগাগিরী খালি ছিল। চিঠি পাইবামাত্র মেজেষ্টর সাহেব কৃষ্ণলালকে সেই দারোগাগিরী দিলেন; কিন্তু একদিন পরে আবার পরোয়ানা ফিরাইয়া লইলেন এবং সেই সঙ্গে পাদ্‌রী সাহেবকে লিখিলেন যে, "আমি শুনিলাম, কৃষ্ণলালের চরিত্র অতি মন্দ; এবং তাহার একজন খুড়া ডকাইত। সুতরাং উহাকে আমি চাকরী দিতে পারিলাম না।" পাদ্‌রী সাহেব পত্র পাইয়া কৃষ্ণলালকে ডাকাইয়া বলিলেন যে, "তুমি আর কখন আমার কুঠীতে আসিও না।" সেই অবধি কৃষ্ণলালের উমেদারী করা ফুরাইল।

সাক্ষীরা বলেন, "কৃষ্ণলাল তাহার পর ব্রহ্মচারী সাজিয়া এখানে ওখানে বুজরুকী দেখাইয়া দিনপাত করিতেন।"

পরাণ-বাবু মনে করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণলাল এই জালরাজা সাজিয়াছে। যখন জালরাজা বাঁকুড়ায় গ্রেপ্তার হন, তখন পরাণ বাবু তাঁহাকে কৃষ্ণলাল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি পাদ্‌রী ডিয়ার সাহেবের নিকটেও লোক পাঠাইয়াছিলেন, এবং অন্যান্য সাক্ষী জুটাইয়াছিলেন; কিন্তু সে সকল প্রমাণ তখন আদালতে বড় গ্রাহ্য হয় নাই। সেবার জালরাজা আলক শা বলিয়া প্রতিপন্ন হন। এবার খোদ মেজেষ্টর সামুয়েল সাহেব এ বিষয়ে উদ্‌যোগী, সুতরাং সাক্ষী অনেক জুটিয়াছিল।

সেই সকল সাক্ষী দ্বারা প্রকাশ হয় যে, কৃষ্ণলালের মুখে বসন্তের দাগ ছিল, তাহার এক পায়ে ছয়টী আঙ্গুল ছিল আর বয়সে রাজা প্রতাপচাঁদ অপেক্ষা কৃষ্ণলাল দশ বার বৎসরের ছোট ছিল।

এই মোকর্দ্দমার চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে কৃষ্ণলাল নিরুদ্দেশ হন। কেহ বলে, "তাহার মৃত্যু হয়," কেহ বলে, "তিনি আলিপুরের জেলে কয়েদ ছিলেন।" তাঁহার দুই সহোদরের অগ্রপশ্চাৎ লোকান্তর হয়। এই সময় তাঁহার পিতা শ্যামলালেরও মৃত্যু হয়, সুতরাং শ্যামলালের ত্যক্ত সম্পত্তি লাওয়ারিস বলিয়া আদালতে জব্দ থাকে।

গোয়াড়ির সাক্ষীরা জালরাজাকে কৃষ্ণলাল বলিয়া কিরূপ সনাক্ত করিল, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লেখা গেল।

(১) ফকিরচাঁদ তেওয়ারি—নিবাস যশোহর—বলিল, "আসামী আমার ভাগিনা কৃষ্ণলাল। আমি ইহাকে ৮ বৎসর দেখি নাই।"

(২) ঈশ্বরচন্দ্র তেওয়ারি বলিল, "আসামী কৃষ্ণলাল আমার পিসীপুত্র। যখন ইহার ১৫।১৬ বৎসর বয়স, তখন ইহাকে দেখিয়াছিলাম, তাহার পর আর দেখি নাই।"

(৩) গঙ্গাপ্রসাদ তেওয়ারি বলিল, "এই আসামী আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, ইহার নাম কৃষ্ণলাল। ইঁহার বয়স এখন ৬৩ বৎসর হইবে। আমার ভগিনীপতি বর্দ্ধমানের রাজবাটীতে চাকরী করিতেন, সম্প্রতি তিনি মরিয়াছেন। ইদানীং আমি কাল্‌নায় থাকি, রাজবাটীতে উমেদারী করি। কৃষ্ণলালের পায়ের আঙ্গুল পাঁচটা কি ছয়টা, তাহা আমি বলিতে পারি না।"

(৪) রামচন্দ্র বিশ্বাস—আবকারীর একজন খুচরা দোকানদার বলিল, "আমি আসামীকে চিনি, ইহার নাম কৃষ্ণলাল।

আমরা এক পাঠশালায় লিখিয়াছি।" (রাজা প্রতাপচাঁদের পৃষ্ঠে ঘোড়ার কামড়ের যে দাগ ছিল, সেইরূপ আসামীর পৃষ্ঠে একটা দাগ থাকায় সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কৃষ্ণলালের পৃষ্ঠে কোন দাগ ছিল কি না? সাক্ষী তাহাতে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল যে, "হাঁ, বিলক্ষণ দাগ ছিল।" কিন্তু পৃষ্ঠের কোন্ অংশে সে দাগ ছিল, তাহা জিজ্ঞাসা করায় সাক্ষী ইতস্ততঃ করিতেছে, এমত সময়ে সেরেস্তাদার মনসারাম আপনার পৃষ্ঠে হাত দিয়া সাক্ষীকে ইঙ্গিত করিলেন। সাহেব মনসারামের দশ টাকা জরিমানা করিতে বাধ্য হইলেন।)

(৫) পাল খ্রীষ্টান বলিল, "এই আসামী কৃষ্ণলাল বটে, আমি ইহাকে গোয়াড়িতে ১৮৩৪ সালে দেখিয়াছি। ইহার সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক করিয়াছি। ইহার পিতার নাম শ্যামলাল। হুগলীর জেলখানায় আসামীকে সনাক্ত করিবার নিমিত্ত আমাকে পাঠান হয়; তখন আমি যদিও ইহাকে চিনিয়াছিলাম, কিন্তু তখন সনাক্ত করি নাই। নিশ্চয় করিয়া বলিবার নিমিত্ত আমি দশ দিন সময় লইয়াছিলাম।" জেরায় বলিল, "গত রাত্রে মাণিক সিংহের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। তবে সেরেস্তাদার মনসারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল সত্য, আমি তাঁহার নিকট পথখরচা চাহিয়াছিলাম, তিনি জজ সাহেবের নিকট চাহিতে বলিয়াছিলেন।"

(৬) মহেশপণ্ডিত নামে একজন খ্রীষ্টান জবানবন্দীতে বলিলেন, "এই আসামীকে আমি গোয়াড়িতে ও বর্দ্ধমানে দেখিয়াছি। ইহার নাম কৃষ্ণলাল।" জেরায় বলিলেন, "আমি যখন মেজেষ্টর ও ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে জেলখানায় গিয়া এই আসামীকে দেখি, তখন আমি বলিয়াছিলাম বটে যে, এই ব্যক্তি কৃষ্ণলাল কি না, তাহা আমি দশ দিন পরে বলিব। আমি বর্দ্ধমানে থাকি, আমার নিবাস ঐ জেলার অন্তর্গত কালনা গ্রামে।"

(৭) গঙ্গাগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, "আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি—এই আসামী কৃষ্ণলাল। ইহার সঙ্গে এক পাঠশালায় লিখিয়াছি। ইহাকে গত ১৫।১৬ বৎসরের মধ্যে কেবল দুই তিন বার দেখিয়াছিলাম। কৃষ্ণলালের মুখে বসন্তের দাগ ছিল কি না, বলিতে পারি না।"

(৮) রামচাঁদ মিত্র বলিলেন, "আমি বর্দ্ধমানে কালেক্টরীর মহুরি। এই আসামী কৃষ্ণলাল, ইহাকে আমি চিনি। এ ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে আমার তৈলমাড়ুয়ের বাসায় গিয়া থাকিত। যখন এ ব্যক্তি বর্দ্ধমানে শেষে গিয়া প্রচার করে যে, 'আমি ছোট রাজা,' তখন আমি কাহাকেও ইহার প্রকৃত পরিচয় দিই নাই, কেবল ইহাকে গোপনে তিরস্কার করিয়াছিলাম। কিন্তু সে তিরস্কার এ ব্যক্তি শুনে নাই।"

(৯) ব্রজমোহন মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "আমি নদীয়া জেলার ফৌজদারীর পেস্কার। এই আসামীকে চিনি, ইনি কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী।"

(১০) রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (খ্রীষ্টান) বলিলেন, "এই আসামী কৃষ্ণলাল। ইনি ইতিপূর্ব্বে মহাপুরুষ সাজিয়াছিলেন। আমি ইহার চেলা হইয়াছিলাম। ইহার সঙ্গে শ্রীখণ্ড, কাটোয়া, মশাগ্রাম, বর্দ্ধমান, বরানগর প্রভৃতি নানা স্থানে বেড়াইয়াছি। আমি ইহার পাদকজল পর্য্যন্ত খাইয়াছি। আমি তখন ইহাকে দেবতা মনে করিতাম। যখন ইনি বর্দ্ধমানে রাজা হইবার কল্পনা করেন, তখন আমরা মশাগ্রামে ছিলাম। আপনাকে প্রতাপচাঁদ বলিয়া রাষ্ট্র করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণলাল তথা হইতে বর্দ্ধমানে গেলেন, আমি ও ইহার ভ্রাতা গৌরলাল উভয়ে মশাগ্রামে থাকিতাম। আসামী বর্দ্ধমান হইতে পলাইয়া বিষ্ণুপুরে যান। আমরা সে সংবাদ পাইয়া তথায় যাই। তাহার পর, আমরা একসঙ্গে বাকুড়ায় যাইতেছিলাম, এলিয়ট সাহেব আমাদের,

বলগমা ঘাঁটিতে গ্রেপ্তার করেন।* গৌরলাল পলাইয়াছিল, আমি ধরা পড়িয়াছিলাম। তিন মাস জেল খাটি। জেলখানায় কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইলে খালাসের অন্য উপায় না দেখিয়া মনে করিলাম, মেজেষ্টরের নিকট কৃষ্ণলালের প্রকৃত পরিচয় বলিয়া দিলে তিনি আমায় খালাস দিবেন। এই প্রত্যাশায় আমি তাঁহার নিকট দরখাস্ত করি। তিনি আমার এজেহার লইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে খালাস দেন নাই। তখন আমার নাম কৃপানন্দ ছিল। আমি কৃষ্ণলালের চেলা হইয়া ঐ নাম গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার প্রকৃত নাম রামকৃষ্ণ। আমি খালাস হইলে পর, পাদ্রী হিল সাহেব আমায় খৃষ্টান করিয়াছেন। আমি সেই অবধি আর মিথ্যা কথা বলি না। আমার পূর্ব্বচরিত্রের পরিচয় পাদ্রী সাহেবকে লিখিয়া দিয়াছি। তিনি তাহা বিলাতে ছাপাইতে পাঠাইয়াছেন। কৃষ্ণলালের পায়ে কয়টী অঙ্গুলি, তাহা বলিতে পারি না।" (অথচ এই সাক্ষী বলিয়াছেন, "আমি জালরাজার পাদকজল খাইতাম")।

(১১) প্রেমচাঁদ বন্দোপাধ্যায় বলিলেন, "আমি নদীয়াজেলার ফৌজদারী নাজির। এই আসামী গোয়াড়ির কৃষ্ণলাল। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না যে, এই ব্যক্তি কৃষ্ণলাল; কেন না, ইনি রাজা প্রতাপচাঁদ বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেছেন। কৃষ্ণলালের মুখে বসন্তের দাগ ছিল।" (এই সাক্ষীর চরিত্র সম্বন্ধে নানা গল্প অদ্যাপি গোয়াড়িতে প্রচলিত আছে)।

(১২) নীলকমল ঘোষ বলিলেন, "আমি নদীয়া জেলার ফৌজদারী সেরেস্তাদার। এই আসামী দেখিতেছি কৃষ্ণলালের মত, কিন্তু আমি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।"

(১৩) প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "আমি নদীয়া জেলার জজ আদালতের সেরেস্তাদার। এই আসামীকে কৃষ্ণলাল বলিয়া আমার বোধ হইতেছে, কিন্তু আমি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। কৃষ্ণলালের পিতা শ্যামলাল গত বৎসর মরিয়াছে। কেহ তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি অদ্যাপি দাবি করে নাই। কৃষ্ণলালের মুখে বসন্তের দাগ ছিল কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না।"

(১৪) হরচন্দ্র হাজরা বলিলেন, "আমি নদীয়া জজ আদালতের উকীল। এই আসামী গোয়াড়ির কৃষ্ণলাল। ইহাকে আমি চিনি, তবে ইহাকে আট বৎসর দেখি নাই।"

(১৫) ব্রজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "কৃষ্ণলালকে আমি বিলক্ষণ চিনি। সে আমার নিকটে অনেক দিন ধরিয়া উমেদার ছিল। এই আসামীর সহিত সে কৃষ্ণলালের বিস্তর প্রভেদ।"

(১৬) মুন্সী মকিম বলিলেন, "কৃষ্ণলালকে আমার ভাল স্মরণ নাই। এই আসামী কৃষ্ণলাল নহে। আমি শুনিয়াছি, কৃষ্ণলাল মরিয়াছে।"

(১৭) পাদ্রী ডিয়ার সাহেব (Revd. W. F Deere) বলিলেন, "আমি এখন কৃষ্ণনগরে থাকি, পূর্ব্বে কিছুদিন বর্দ্ধমানে ছিলাম। আমি কৃষ্ণলালকে ভাল চিনি। তাহার পিতা শ্যামলাল কৃষ্ণলালের চাকরীর নিমিত্ত আমায় অনুরোধ করে। কৃষ্ণলাল প্রত্যহ আমার বাটীতে আসিত। ব্যাটি সাহেবের

* এলিয়ট সাহেব কমিশনর হইয়া যখন বাকুড়ায় যান, তখন একদিন তথাকার সার্কিট হাউসের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, "এই তেঁতুলতলায় জালরাজাকে আমি গ্রেপ্তার করি।" যখন তিনি এই কথা বলেন, তখন লেখক নিজে উপস্থিত ছিলেন। এই সাক্ষী যাহা বলিলেন, সুতরাং তাহার সহিত এলিয়ট সাহেবের কথা মিলে না। কিন্তু অন্যান্য অনেকের নিকট শুনিয়াছি যে, জালরাজা বাকুড়া জেলায় বলগমা ঘাঁটিতে গ্রেপ্তার হন। এ জনরব কিরূপে জন্মিল, তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয়, এই সাক্ষীর জবানবন্দী দ্বারা এই রটনা হইয়া থাকিবে।

কৃষ্ণলালের নিমিত্ত আমি একখানি পত্র দিই। ব্যার্টি সাহেব তাহাকে চাকরী দেন নাই। ১৮৩৬ সালে (অর্থাৎ বাকুড়ায় মোকর্দ্দমার সময়) বৰ্দ্ধমানের পরাণ বাবু আমার নিকট দুইজন লোক পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা আমায় বলে, 'একবার হুগলী গিয়া জালরাজাকে সনাক্ত করিতে হইবে।' তাহারা আমায় পথখরচ বলিয়া টাকা দিতে চাহিয়াছিল, আমি তাহা লই নাই। আমি তাহাদিগকে বলিলাম,'যদি তোমরা কৃষ্ণলালের সন্ধান চাও,তাহা হইলে আমি এখনই সন্ধান আনিয়া দিতে পারি।'এই বলিয়া গোয়াড়িতে কৃষ্ণলালের নিকট একজন লোক পাঠাইয়া দিলাম। লোক আসিয়া সংবাদ দিল যে, শ্যামলাল ব্রহ্মচারী বলিলেন, কৃষ্ণলালকে টাকার নিমিত্ত শিষ্যবাটীতে পাঠাইয়াছেন, দশ বার দিনের মধ্যে সে আসিবে, আসিলে তাহাকে পাঠাইয়া দিব। তাহার পর সে না আসায়,পনর দিবস পরে, আবার শ্যামলালের নিকট লোক পাঠাইলাম। এবার শ্যামলাল বলিয়া পাঠাইলেন, কৃষ্ণলালকে যদি পাদ্রী সাহেবের এতই দরকার থাকে, তবে যেন তিনি নিজে তাহাকে তল্লাস করিয়া লন। এ আসামী কৃষ্ণলাল নহে। 'আমি কৃষ্ণলালকে ছয় বৎসর দেখি নাই। এই ব্যক্তি যদি কৃষ্ণলাল হয়, তবে ছয় বৎসরে ইহার অতিরিক্ত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কৃষ্ণলালের নাসাগ্র উর্দ্ধমুখছিল,আসামীর নাসাগ্র নিম্নমুখ। ১৮২১সালে আমি শুনিয়াছিলাম যে, রাজা প্রতাপচাঁদ এদেশে বিদ্রোহ উদ্ভাবন করিবার নিমিত্ত রণজিৎ সিংহের নিকট গিয়াছেন।"

(১৮) গৌরমোহন ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "আমি কৃষ্ণলালকে বিলক্ষণ চিনিতাম। সে ব্যক্তি যখন উমেদারী করিত, তখন ডিক্ সাহেবের কাছারীতে তাহাকে সর্ব্বদা দেখিতাম। তাহার পিতা শ্যামলালকে চিনিতাম। কৃষ্ণলালের আকৃতি এই আসামীর মত ছিল না।"

(১৯) কৃষ্ণমোহন সরকার (এই সাক্ষী জবানবন্দী দিবার সময় জজ-সাহেব বলিলেন, "আমি এই সাক্ষীকে চিনি, ইনি ভাল লোক, ভদ্র এবং সত্যবাদী") সওয়াল মতে বলিলেন, "আমি গোয়াড়িতে ওকালতী করি, কৃষ্ণলালকে চিনিতাম, এই আসামীকে কৃষ্ণলালের মত বোধ হয় না।"

(২০) রামধন খৃষ্টান বলিলেন, "আমি এই আসামীকে চিনি না,ইহাকে কখন দেখি নাই। আমি কৃষ্ণলালকে চিনিতাম, তাহার সহিত ইহার কিছু আদল আইসে বটে, কিন্তু এ ব্যক্তি সে নহে। কৃষ্ণলাল ইহা অপেক্ষা লম্বা ও গৌরবর্ণ। কৃষ্ণলালের নাসাগ্র উন্নত ছিল, এ ব্যক্তির তাহা নহে। আর তাহার চক্ষু ছোট ছিল।"

(২১) কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, "আমি এখন উত্তরপাড়ায় থাকি। পূর্ব্বে টোল-দারোগা ছিলাম। কৃষ্ণলাল আমার নিকট মধ্যে মধ্যে আসিত। এই আসামী কৃষ্ণলাল নহে, তাহার মুখ লম্বা ছিল, আর তাহার মুখে দাগ ছিল।"

গোয়াড়ির অন্য অন্য যে সকল লোক মেজেষ্টারিতে বলিয়াছিল যে, এই আসামী কৃষ্ণলাল নহে, দায়রায় তাহাদের জবানবন্দী লওয়া হয় নাই; সুতরাং আমরাও তাহাদের কথা আর উল্লেখ করিলাম না।

উভয় পক্ষের প্রমাণাদি দেখিয়া কাজি সাহেব রায় দিলেন যে, "আসামী কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী নহে। কৃষ্ণলালের আত্মীয় উল্লেখে যাহারা জবানবন্দী দিয়াছে, তাহাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। প্রাণকৃষ্ণ খৃষ্টানের কথাও সেইরূপ। সে বলে যে, সে তিন চারি বৎসর ধরিয়া কৃষ্ণলালের চেলা ছিল, অথচ সে জানে না যে, কৃষ্ণলালের পায়ে কয়টা অঙ্গুলি ছিল।"

জজ সাহেব রায়ে লিখিলেন যে, "জালরাজা যে কৃষ্ণলাল, এ কথা এক প্রকার প্রমাণ হইয়াছে।" আরও বলিলেন যে, "এ সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণের প্রয়োজনও নাই। প্রতাপচাঁদের মৃত্যু ও তাঁহার শবদাহ যখন বিশেষরূপে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, তখন এই

আসামী কৃষ্ণলাল প্রমাণ না হইলেও কিছু ক্ষতি নাই।" *

১৫। কাল্‌নায় জমিয়ৎবস্ত হইয়াছিল কি না?

আমরা পূর্ব্বেই বলিযাছি, এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ মেজেষ্টারিতে লওয়া হয় নাই। দায়রায়ও এ বিষয়ে প্রথমতঃ বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। স্বয়ং জজ সাহেব বলিয়াছিলেন যে, কাল্‌নায় জমিয়ৎবস্ত অতি সামান্য ব্যাপার। তথাপি শেষে কয়েক জন সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হইল। নাজির আসাদ্ আলি আর দারোগা মাহিবুল্লা প্রধান সাক্ষী। তাহারা অনেক কথা বলিলেন। কিন্তু কাল্‌নার চৌকীদারেরা সামান্য চাকর, কি বলা আবশ্যক, কি বলা অনাবশ্যক, তাহা কিছুই বুঝিল না; সুতরাং তাহারা অনেকে অম্লানবদনে বলিল যে, কাল্‌নায় কোন জমিয়ৎবস্ত হয় নাই।

জজ সাহেব রায়ে লিখিলেন যে, কাল্‌নায় জমিয়ৎবস্ত প্রমাণ হইয়াছে।—

"This charge I view, is substantiated by the evidence of Mahabollah Darogah and other Police officers, and by that of Asaadi Ali, the Burdwan Foujdary Nazir; but there is, I conceive, no proof of an affray or actual breach of the peace. I should say the only facts proved are, first that the prisoner No. 1. the soi-dissant Rajah did not disperse his armed followers on receiving orders from the police officer to that effect, after the Darogah had explained to him to nature of the Purwanah or orders issued from the Burdwan Magistrate, requiring him to disperse his armed followers. Secondly, that the prisoner No. 1, persisted in landing with a drawn sword in his hand, and visiting the shrine of Lalji Thakur at Culna; in the progress to which place, attended by a part of his follwers, he ordered some of his people to disarm the tow sepoys on gnard at the burying ground of the Burdwan Rajah, but on the remonstrance of the Darogah, he at

---

* "Combining all their testimonies, I cannot avoid the conclusion that the prisoner's identity is sufficiently established by a preson clearance of evidence above whatever has been adduced to impeach it Evidence in such a matter cannot be expected to amount to absolute demonstration Some dimness, and it may be doubt, will obscure the recital now of details wich occured at a remote date. But circumstances considered. I look upon the proofs as being on the whole satisfactory. It is true that in the main point the Law-Officer rejects the evidence on the grounds that there are several descripancies, which I admit, in the averments made by the witnesses who swears to the prisoner's identity with Kristo Lal * * * For the reasons which I have stated above, it appears to me the identity is established by tolerably good or I may say, sufficient evidence, although it may not be so satisfactory and decisive as the testimony to the Rajah's death. But I have a remark to make on this subject. After the prosecutor had proved the death and cremation of Rajah Protap Chunder, it was, I think, in no way incumbent on him to show who the prisoner really is. So long as the death, cremation, and non-identity remain, as I regard them firmly established, it would have béen a matter of no moment to the case had he failed to prove that the prisoner is Kristo Lal." Extract from No. 3 of the Calender for Sept, 1838.

last, desisted from this foolish freak; after which, the soi-dissant Rajah and his people returned to the boats."

জজ সাহেব যাহাই বলুন, আপীলে এ কথা রক্ষা হয় নাই। সে পরিচয় পরে দেওয়া যাইবে।

১৬। জাল-রাজার নিজ কথা।

আসামীর পক্ষে সকল সাক্ষী হাজির হইলেন না। প্রতাপচাঁদের রাণীরা জবানবন্দী দিয়াছিলেন, এবং জালরাজাকে তাঁহারা সনাক্ত করিয়াছিলেন, এইরূপ এ অঞ্চলের সর্ব্বত্র রটনা আছে; কিন্তু বাস্তবিক সে রটনা সত্য নহে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, জালরাজা তাঁহাদিগের সাক্ষী মানিয়াছিলেন, কিন্তু আদালতে আসিয়া সাক্ষ্য দিতে তাঁহারা অস্বীকার করেন। জজ সাহেব তাঁহাদের বলেন যে, তাঁহারা চুঁচুড়ার রাজবাটীতে আসিলে কমিসন দ্বারা তাঁহাদের জবানবন্দী লওয়া যাইবে। তাহাতে রাণীরা সম্মত হইলেন না। সুতরাং জালরাজা আর কোন চেষ্টা করিলেন না।' তাহার কিছুদিন পরে, রাণীরা হঠাৎ দরখাস্ত করিয়া পাঠাইলেন যে, আমরা সাক্ষী দিতে প্রস্তুত আছি। এবার জালরাজা তাহাতে আপত্তি করিলেন; বলিলেন, "আমি রাণীদের সাক্ষ্য চাহি না" ইহার হেতু কেহ বুঝিতে পারিল না। লোকে উপহাস করিয়া বলিতে লাগিল, 'এ সকল বুঝি কৃষ্ণ-রাধার মানকেলি। যখন জালরাজা উপযাচক হইয়াছিলেন, তখন রাণীরা মাথা নাড়িলেন; আবার যাই জালরাজা মান করিলেন, আর তাঁহারা থাকিতে পারিলেন না, আপনারা সাধিয়া সাক্ষ্য দিতে চাহিলেন।'

লোকে যে যাহা বলুক, আমরা শুনিয়াছি যে, রাণীরা সপিনা পাইয়া স্থির করিয়াছিলেন, "আসামীকে যদি বাস্তবিক ছোট মহারাজ বলিয়া আমরা চিনিতে পারি, তথাপি সে কথা আমরা মুখে আনিতে পারিব না, আসামীকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিলে পোড়া লোকে বলিবে যে, বৈধব্য ঘুচাইবার নিমিত্ত রাণীরা মিথ্যা বলিযাছে এবং হয় ত সেই কারণে জজ সাহেবও আমাদের কথা গ্রাহ্য করিবেন না। সুতরাং আমরা স্বামী পাইব না। তবে কেন কলঙ্কের পসরা মাথায় লইব? এই জন্য তাঁহারা সাক্ষ্য দিতে প্রথমে অস্বীকার করেন। তাহার পর যখন জালরাজা শুনিলেন যে, রাণীরা জবানবন্দী দিবার নিমিত্ত উপযাচক হইয়া দরখাস্ত করিয়াছেন, তখন তাঁহার সন্দেহ হইল। তিনি সা সাহেবকে বলিলেন, "কাহার দ্বারা এ দরখাস্ত আসিয়াছে, এবং সে ব্যক্তি কোথায় বাসা করিয়াছে, এই সকল তদন্ত করা আবশ্যক।" সা সাহেব তদন্ত করিয়া জানিলেন যে, পরাণ-বাবুর লোক এই দরখাস্ত আনিয়াছে, এবং পরাণবাবুর মোক্তারের বাসায় সে ব্যক্তি অবস্থিতি করিতেছে। জালরাজা উকীলকে বলিলেন, "এবার পরাণের অনুরোধে রাণীরা সাক্ষ্য দিতে সম্মত হইয়াছেন। সে অনুরোধের অর্থ এই যে, তাঁহারা আমাকে সনাক্ত না করেন, কিন্তু কি জানি, স্ত্রীজাতি; আমায় দেখিয়া যদি তাঁহারা সে অনুরোধ ভুলিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পথে দাঁড়াইতে হইবে। আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা হইয়া গিয়াছে, আবার তাঁহাদের কপাল কেন ভাঙ্গি? তাঁহারা সুখে আছেন, সুখে থাকুন। আমি তাঁহাদের সাক্ষ্য চাহি না।"

জালরাজার এই কথামতে রাণীদের এব্রা করা হইল। তাহাতে জজ সাহেব বিপরীত ভাবিলেন। তিনি বিবেচনা করিলেন যে, "আসামী নিশ্চয়ই জাল, তাই সে ভয় পাইয়াছে। রাণীরা কখনই মিথ্যা বলিবে না, এ কথা আসামী এখন বুঝিয়াছে।"

পূর্ব্বে ফৌজদারী মোকর্দ্দমা মুসলমানের সরামতে হইত, সুতরাং সরার ব্যবস্থা দিবার নিমিত্ত একজন করিয়া কাজি বিচারাসনে

বসিতেন। সেই কাজি, সমুদয় সাক্ষীদের জবানবন্দী হইয়া গেলে পর, জালরাজাকে বলিলেন, "তুমি মৃত্যুর ভাণ করিয়া পলাইয়াছিলে বলিতেছ, এখন আমি শুনিতে চাই যে, এই চতুর্দ্দশ বৎসর তুমি কোন্ কোন্ স্থানে ছিলে, এবং কি করিতে?" জালরাজা সে পরিচয় দিতে উদ্যত হইলে, তাঁহার উকীল তাঁহাকে নিষেধ করিলেন, এবং বলিলেন, "পোষকতা ব্যতীত সে পরিচয় কোন মতে গ্রাহ্য হইবে না এবং প্রমাণেরও পোষকতার আর সময় নাই।" জালরাজা তাহা শুনিলেন না, তিনি জজ সাহেবকে বলিলেন যে, "আগামী কল্য আমি এ বিষয়ের একখানি লিখিত ফর্দ্দ দিব।"

মোকর্দ্দমার শেষে তিনি একদিন সেই ফর্দ্দ আর তাহার সঙ্গে একখানি বাঙ্গালা দরখাস্ত নিজে লিখিয়া দাখিল করিলেন। তাহার স্থুল মর্ম্ম নিয়ে দেওয়া গেল।

"কাল্না হইতে পলাইয়া কালীপ্রসাদ আর আমি মুরসিদাবাদ ও ঢাকা হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে গিয়া তীর্থস্নান করি। তাহার পর চন্দ্রশেখর যাই। সেখান হইতে আদিনাথ দর্শন করিতে যাই। তথায় এক বৎসর থাকি। তাহার পর জৈন্তেশ্বরী ও ত্রিপুরেশ্বরী দর্শন করিয়া বাণেশনাথ মহাদেবের নিকট এক বৎসর থাকি। সেখান হইতে পশ্চিমাঞ্চলে যাই। কাশী, প্রয়াগ, চিত্রকূট, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, মথুরা, কুরুক্ষেত্র, পুষ্কর, প্রভাস, বদরিকাশ্রম, হরিদ্বার, হিঙ্গুলাজ, জালামুখী প্রভৃতি নানা তীর্থস্থান পর্য্যটন করি। পঞ্জাবে গিয়া লাহোর, অমৃতেশ্বর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করি, শেষ কাশ্মীরে যাই। সেইখানে জেনারেল আলার্ডের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। কাশ্মীরে আমি ছয় বৎসর থাকি। তাহার পর আবার হিন্দুস্থানে আসি। দিল্লীতে বিবি রামজে আমাকে দেখিয়া চিনিয়া ফেলেন। আমি ইতস্ততঃ যাইতাম, তাহাতে অনেকে আমায় চিনিয়াছিল। যেখানে আমার কথা লইয়া আন্দোলন হইত, আমি সেই স্থান তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিতাম। প্রায়ই আমি যোগীদের সঙ্গে বেড়াইতাম। যখন যাঁহাদের সাক্ষাৎ পাইতাম, তখন তাঁহাদের সঙ্গ লইতাম। তাঁহারা এক স্থানে স্থায়ী হইতেন না, সুতরাং দীর্ঘকাল কাহারও সঙ্গে থাকিতে পাই নাই। আমার একখানি ইয়াদদস্ত-বহি ছিল। যে দিন যেখানে গিয়াছিলাম, যেখানে যাহা আশ্চর্য্য দেখিয়াছি, তাহা সকলই ইয়াদদস্তে লিখিয়া রাখিয়াছি।* এলিয়ট সাহেব বাকুড়ায় যখন আমায় গেপ্তার করেন, তখন সেই ইয়াদদস্ত খানি হারায়। আমি সেখানির নিমিত্ত মেজেষ্টর সাহেবের নিকট বিস্তর মিনতি করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আর ফিরিয়া পাইলাম না; মেজেষ্টর তাহার অনুসন্ধানের নিমিত্ত কোন হুকুমও দিলেন না। আমি বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করিয়া প্রথমে কালীঘাটে যাই। তাহার পর বর্দ্ধমানে উপস্থিত হই, সেখানে গোলাপবাগে আমাকে অনেকে চিনিয়া মহা আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল।

"যদি আমি বাস্তবিক মরিতাম, তাহা হইলে কি আমার ত্যক্ত সম্পত্তির কোন বন্দোবস্ত করিয়া যাইতাম না? সামান্য লোকে সামান্য সম্পত্তির নিমিত্ত পোষ্যপুত্র লইবার অনুমতি দিয়া যায়, অথবা দানপত্র লিখিয়া যায়; কিন্তু আমার এত সম্পত্তি, আমি কি কোন একটা বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারিতাম না? আমি পীড়িত হইয়া ত অনেক দিন ছিলাম, আমার বাক্‌রোধ হয়

---

* রাজা প্রতাপচাঁদেরও এইরূপ ইয়াদদস্ত-বহি রাখা অভ্যাস ছিল। তিনি যে সময়ে যাহা করিতেন, তাহা নিত্য লিখিয়া রাখিতেন। অনেকে বলেন যে, "তাঁহার সেই ইয়াদদস্ত-বহি জালরাজা কোনরূপে হস্তগত করিয়াছিলেন, সেইজন্য প্রতাপচাঁদের সম্দায় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ঘটনা তিনি বলিতে পারিতেন।" কেহ বলে, "সে ইয়াদদস্ত-বহি রাজবাটীতে ছিল মোকর্দ্দমার সময় তাহা আদালতে দাখিল করা হইয়াছিল।"

নাই। আমার গঙ্গাযাত্রা করিলেও ত আমি অনেকদিন কাল্‌নায় ছিলাম; যদি সত্যই আমি মরিব, এরূপ হইত, তাহা হইলে আমি কি এই সময়মধ্যে পোষ্যপুত্রের অনুমতি দিয়া যাইতাম না? অথবা একখানা দানপত্র, কি উইল করিয়া যাইতাম না? এ সকল করিবার সময় ত যথেষ্ট ছিল?

"আর এক কথা, আমি যাইবার সময় একখানি প্রমাণ ছবি রাখিয়া গিয়াছিলাম, তাহা এখানে আনা হইয়াছে। লোকে বয়সে কেহ স্থূল হয়, ক্লেশে কেহ শুষ্ক হয়, কেহ কাল হয়; কিন্তু মাথায় কেহ ছোট হয় না, কেহ বড়ও হয় না। সেই ছবির সঙ্গে আমায় মাপিয়া দেখা হইয়াছে, লম্বায় চুল পরিমাণে ছবির মূর্ত্তি আমার সহিত প্রভেদ হয় নাই। এখন বিচারকর্ত্তা পরমেশ্বর, আর তাঁহার প্রতিনিধি আপনারা অধিক বলা বাহুল্য।"

১৭। দায়রার হুকুম।

অন্য সকল সাক্ষীদের জবানবন্দী হইয়া গেলে উভয় পক্ষের বক্তৃতা আরম্ভ হইল। কিন্তু বক্তৃতা মুখে হইল না, লিখিত দাখিল হইল। তাহার পর কাজি সাহেব ফতওয়া দিলেন। তিনি বলিলেন যে, সনাক্ত সম্বন্ধে সরকারের পক্ষে যে সকল প্রমাণ দাখিল হইয়াছে, তাহা আসামীর প্রমাণ অপেক্ষা গুরুতর নহে। আসামী বাস্তবিক কে, তাহা ফরিয়াদীর পক্ষ হইতে প্রমাণ হয় নাই। যতক্ষণ তাহাকে অপর ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন না হয়, ততক্ষণ প্রতাপচাঁদের নামধারণ অপরাধে তাহাকে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে না; কিন্তু জজ সাহেব অন্য প্রকার বিবেচনা করিলেন। তিনি বলিলেন যে, "আসামী কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী, সুতরাং প্রতাপের নামধারণ জন্য তাহাকে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে।" এইরূপে উভয়ের মত অনৈক্য হইল। সেই জন্য জজ সাহেব নিজামতকে জানাইলেন, এবং সেই সঙ্গে লিখিলেন যে "আসামীর বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, একটী ব্যতীত তাহার সমুদয় প্রমাণ হইয়াছে। অতএব তাহাকে পাঁচ বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা দেওয়া হয়, নূনকল্পে তিন বৎসর।" এ সম্বন্ধে নিজামত যে হুকুম দিলেন, তাহা পরে বলা যাইবে।

১৮। অন্য আসামীদের প্রতি দায়রার হুকুম।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আসামীশ্রেণীতে কাল্‌নায় ১৯৪ জন গ্রেপ্তার হয়। তাহার পর, ক্রমে ক্রমে আরও অনেকগুলিকে তাহাদের সামিল করা হয়। সেই সকল লোকের মধ্যে কেবল ৩১০ জনকে হুগলীতে পাঠান হইয়াছিল। হুগলীর মেজেষ্টর সামুয়েল সাহেব তাহাদের সাত জনকে দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়াছিলেন, বাকি ৩০৩ জনের সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পান নাই, অথচ তাহাদের খালাসও দেন নাই। তাহাদিগকে তিনি জেলখানায় রাখিয়াছিলেন। গ্রীষ্মকাল গেল, বর্ষা গেল, তাহার পর শীত পড়িল; তাহাদের গাত্রবস্ত্র নাই। তিন শত লোককে শীতবস্ত্র দেওয়া সহজ নহে; সুতরাং সে দিকে আর কেহ দৃষ্টিপাত করিল না। আসামীরা একে একে মরিতে আরম্ভ করিল। জালরাজা আপনার উকীলদিগকে বিস্তর অনুরোধ করিলেন যে, "এই হতভাগাদের রক্ষা করিবার নিমিত্ত কিছু চেষ্টা কর।" সা সাহেব মাথা নাড়িলেন, বলিলেন, এই "তিন শত লোকের জন্য গাত্রবস্ত্র কে দিবে?" জালরাজা বলিলেন, আমি আর দেখিতে পারি না। তোমরা না কর, আমি নিজে দরখাস্ত করিব।" শেষে সা সাহেব দরখাস্ত লিখিতে সম্মত হইলেন। জালরাজা লিখাইলেন, "হতভাগাদের এইমাত্র অপরাধ যে, তাহারা আমাকে রাজা প্রতাপচাঁদ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে। যদি আমি সত্যই জাল হই, তবে আমিই তাহাদের ঠকাইয়াছি, আমিই দণ্ডের যোগ্য। তাহাদের খালাস

দেওয়া হউক, অন্ততঃ গাত্রবস্ত্র দেওয়া হউক।" *

দরখাস্তের ফল কতক ফলিল।১৪০ জন খালাস পাইল, কিন্তু সাতমাসের পর খালাস পাইল। তাহাদের বিপক্ষে একজন সাক্ষীরও সাক্ষ্য লওয়া হয় নাই। তাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ ছিল না, অথচ তাহারা সাতমাস কারাবদ্ধ ছিল। তাহাদের খালাস দিবার সময় কেবল একখানি করিয়া মুচলেকা দস্তখত করাইয়া লওয়া হইল। তাহাদের আর কোন বিচার হইল না। বাকি ১৬৩ জন জেলে থাকিল, তাহার মধ্যে কতক লোক সেইখানেই মরিয়া গেল।

বে-আইনী কয়েদ রাখার নিমিত্ত সা সাহেব ওগলবি সাহেবের নামে যে নালিশ উপস্থিত করেন, তাহার বিচার সুপ্রিম কোর্টে ৯ই জানুয়ারি তারিখে আরম্ভ হয়। সেই মোকর্দ্দমায় হুগলীর মেজেষ্টর সাক্ষ্য দিতে গিয়াছিলেন। তথায় তাঁহাকে এই সকল আসামীদের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,"৩১০ জনের মধ্যে আমি ছয়মাসের পর ১৪০ জনকে খালাস দিয়াছি, বাকি ১৫০ কি ১৬০ জন বিচারের নিমিত্ত জেলখানায় অদ্যাপি আবদ্ধ আছে। যে ১৪০ জনের কথা বলিলাম, আমি তাহাদের বিচার করিয়াছিলাম,অর্থাৎ ওগলবি সাহেব বর্দ্ধমানে তাহাদের এজাহার লইয়া আমার নিকট দণ্ডের নিমিত্ত পাঠাইয়াছিলেন। আমি তাহাদিগকে ছয়মাস পরে ছাড়িয়া দিয়াছি, আদালতে তাহাদিগকে আনি নাই। আমার আদালত ঘর বড় ক্ষুদ্র, এত লোক সেখানে ধরিতে পারে না বলিয়া আদালতে তাঁহাদিগকে হাজির হইতে দিই নাই। সা সাহেব তাহাদের মোক্তার ছিলেন বলিয়া তাহাদের উপস্থিত হইবার আবশ্যকও হয় নাই। সা সাহেব তাহাদের পক্ষ হইতে কোন মোক্তারনামা দাখিল করেন নাই, আমিও দাখিল করিতে দিই নাই। সা সাহেব নিজে আসামী সুতরাং তিনি মোক্তার হইবার অধিকারী নহেন।

এ বিচারপদ্ধতি শুনিয়া সুপ্রিম কোর্টের অনেকে হাসিলেন। বোধ হয়, সামুয়েল সাহেব তাহা দেখিয়া ভাবিলেন,"ইহারা তবে বিচার কাহাকে বলে?" তিনি তখন বলিলেন,—

"What do you mean by a trial? There certainly has been no regular trial of those prisoners whom I released, nor of those who, I have said are now awaiting their sentence; those whom I released I considered less criminal than the others, and I thought the punishment they had already undergone was sufficient;—they had been in prisoned sixmonths—Yes I certainly without having any regular trial or sentence passed on them. By Regulation I cannot try after sixmonths' imprisonment."

আরও হাসি পড়িয়া গেল। যাহারা ছয় মাসের অধিক কাল জেলে থাকে, তাহাদের বিচার করিতে আইনে নিষেধ! সেই জন্য মেজেষ্টর বাহাদুর তাহাদের বিচার না করিয়া জেলে রাখিয়াছিলেন। যাহাদের বিচার করিতে নিষেধ, তাহাদিগকে জেলে রাখিতে নিষেধ নাই! ছয় মাসের স্থলে নয় মাস তাহারা জেলে আছে, আরও থাকিবে,

*Their whole crime consisted in believing me to be Rajah Protap Chand. If I am an impostor as alleged, I am guil y of having deceived them,and I may therefore be liable to punishment. Of these person only six have been thought criminal enongh to be sent for trial before you, and the others have been in custody for a period of nearly seven months without knowing the crime which they are alleged to have committed, without belng confronted with any of the witnesses for the prosecution, and without having been brought to trial. Of the remainder, thirteen are dead—two more, I understand are at the point of death and twenty-two are in the hospital. Extract from petition dated 30th November, 1838."

তাহাতে আইনে আপত্তি নাই। আইনের আপত্তি কেবল বিচার করার সম্বন্ধে; ছয় মাসের পর খবরদার আর যেন বিচার করা না হয়। ছয় মাসের পর যত দিন ইচ্ছা জেলে রাখ, কিন্তু বিচার করিও না। ইহা কোম্পানীর আইন।

যে সকল আসামীদের কথা বলা হইতেছিল, তাহারা কতদিন পরে খালাস পাইল, তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না। বোধ হয়, জালরাজার মোকর্দ্দমার পর মেজেষ্টর সাহেবের অবকাশ হইলে, তাহাদিগকে খালাস দেওয়া হইয়া থাকিবে। সামান্য লোকদিগকে জেলে রাখা তখন সামান্য ব্যাপার বলিয়া মেজেষ্টরদের বোধ ছিল। গরীব-দুঃখীরা কে খালাস পাইল কি না পাইল, তাহা লইয়া আন্দোলন করিতে কাহারও সাহস হইত না। "চাচা আপন বাচা" এই তখনকার প্রচলিত বুলি ছিল, তদ্ব্যতীত সকল দিকে দৃষ্টি করিবার অবকাশ মেজেষ্টরদের একেবারে ছিল না। তখন ডিপুটি মেজেষ্টর ছিল না, সবডিবিজন ছিল না, সকল কার্য্যই মেজেষ্টরকে নিজে করিতে হইত। সুতরাং কোন কার্য্যই হইয়া উঠিত না, অনেকটা আমলাদের উপর নির্ভর করিতে হইত। তাই দেওয়ান মনসারাম মিত্রের অসম্ভব প্রভুত্ব হইয়াছিল। তিনি মনে করিলে, এই আসামীদিগকে খালাস দিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার এ সামান্য বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিবার কোন হেতু উপস্থিত হয় নাই।

দায়রায় সাত জন আসামী সোপর্দ্দ হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে জালরাজার পক্ষে জজ সাহেব যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অপর ছয় জন সম্বন্ধে কোন প্রমাণ ছিল না, মেজেষ্টর সাহেবও কোন প্রমাণ নিজে লন নাই, দায়রায়ও কোন প্রমাণ পাঠান নাই। সুতরাং জজ সাহেব তাহাদিগকে খালাস দিলেন। *

এই ছয় জনকে কেন দায়রা সোপর্দ্দ করা হইয়াছিল, ইহার হেতু ঠিক বুঝা যায় না। ইহারা জালরাজার সঙ্গে ছিল সত্য; তাহাদের সকলকে সোপর্দ্দ কেন করা হইল না, কেবল এই ছয় জনকে সোপর্দ্দ করা হইল, তাহা লইয়া কেহ কেহ তর্ক করিয়াছিলেন। জালরাজার উকীল সা সাহেব উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "সাত সংখ্যা শুভপ্রদ, তাই সাত জনকে দায়রায় সোপর্দ্দ করা হইয়াছিল।"

১৯। ওগলবি সাহেব আবার আসামী।

একবার ওগলবি সাহেব খুনের মোকর্দ্দমায় আসামী হইয়াছিলেন, আবার তিনি আর এক মোকর্দ্দমায় আসামী হইলেন। এবার তাহাতে জালরাজার কিছু উপকার হইয়াছিল, এই জন্য সেই মোকর্দ্দমার সংক্ষেপে পরিচয় দিতেছি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কালনার হত্যাকাণ্ডের পরদিবস জালরাজার উকীল সা সাহেব পথ দিয়া যাইতেছিলেন

তিনি খালাস হইলেন বটে, কিন্তু লজ্জায় আর সমাজে মুখ দেখাইতে পারিলেন না। তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র বলিয়া তাঁহার বংশাভিমান কিছু অতিরিক্ত ছিল। এমন কি, তিনি কৃষ্ণনগরের রাজা গিরিশচন্দ্র অপেক্ষা আপনাকে সম্ভ্রান্ত মনে করিতেন। রাজা গিরিশচন্দ্রও তাঁহার প্রতি কতকটা জ্ঞাতিবৈরিতা দর্শাইতেন। একবার কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে নরহরিচন্দ্রের দুর্দ্দশা অনুকরণ করিয়া একটা যাত্রার "সং" দেওয়া হয়। তাহাতে গিরিশচন্দ্র বড় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখন প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে কিরূপ কুরুচি ছিল, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত আমরা এ পরিচয় দিলাম। রাজা গিরিশচন্দ্রের ন্যায় ব্যক্তি অন্যের দুর্ভাগ্য লইয়া রহস্য করিতে পারিতেন, এবং দেখিতে পারিতেন, ইহাই আশ্চর্য্যের কথা।

---

* এই ছয় জনের মধ্যে হরধামের রাজা রায় নরহরিচন্দ্র একজন আসামী ছিলেন;

এমত সময় বর্দ্ধমানের মেজেষ্টর তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কয়েদ রাখেন। সেই বে-আইনি কয়েদের বিচার, এত দিনের পর, ৯ই জানুয়ারী তারিখে আরম্ভ হইল। এবার চীফ্ জষ্টিস্ সার এডওয়ার্ড রায়ান সাহেব স্বয়ং বিচার করিতে বসিলেন। ওগলবি সাহেবের কপাল ভাঙ্গিল। জজ রায়ান উভয় পক্ষের প্রমাণ গ্রহণ করিয়া জুরিদের চার্জ্জ দিলেন। জুরিরা ওগলবি সাহেবকে অপরাধী করিলেন। চিফ্ জষ্টিস্ তাঁহার দুই হাজার টাকা জরিমানা করিলেন। সেই সময়ে জজ সাহেব ধীরে ধীরে যাহা বলিলেন, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"James Balfour Ogilvy—It is my painful duty to pass the sentence of this Court upon you. You have been found guilty of false imprisonment of the prosecutor Mr. Shaw. (The learned judge then recapitulated the facts of the case). The Darogah a most important witness as to the acts of Shaw and the necessity for his restraint, was not called by either party—why, I cannot understand, as he certainly could have given the best evidence, as to what took place, and whether Mr. Shaw was party to any disturbance of breach of the peace. But I must say that there is not a title of evidence, to show that Mr Shaw was guilty of sedition, or any other offence whatever. It is in evidence, that he knew only of one Purwanah being served on Protap* at Culna, and I must say, that his conduct on that occasion appears to me to have been judicious, regular, and proper He made his client write a letter offering submission to the order of the authorities and it was delivered to the Nazir that night. Mr. Shaw so far from committing any improper acts, gave the best advice as to how to get rid of the assembly, by telling the Nazir to point out who of the followers should be sent away. The treatment of Mr Shaw after his arrest was certainly exceedingly harsh, and is without justification either in law or in fact and he was made to undergo by you most unwarrantable and most unjustifiable imprisonment. The Court will not however cause you to suffer imprisonmet, because we must suppose that you have been actuated by motives arising from erroneous information and a mistaken zeal, by ardent wish to preserve peace and good order in your district (The lettets from Mr. Alexander the missionary and Captain Harrington were then read) It is probable that these letters excited considerable alarm in your mind. And after the importunate affray in the morning you may have imagined it necessary to arrest Mr. Shaw, but those letters, should have led you to enquire in to matters, before you proceeded to act as you have acted It appears that there was no disturbance whatever when the affray took place nor had there been any for a considerable time before the event took place But the Court believing, that you acted upon erroneous information, although rashly and unjustifiably, will give you in your sentence the benefit of that consideration, which they on that account extended towards you. Such cnnduct can

---

* চীফ জষ্টিস সার এডওয়ার্ড রায়ান সাহেব অম্লানবদনে "প্রতাপচাঁদের মোকর্দ্দমা" "প্রতাপচাঁদের গ্রেপ্তার" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কোম্পানীর জজ মেজেষ্টরগণ 'প্রতাপচাঁদ' নাম উচ্চারণ করিতে সাহস করেন নাই। জবানবন্দীতে হউক, রায়ে হউক, যেখানে প্রতাপচাঁদের নাম উল্লেখ করিতে হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহারা "Soi dissant Rajah," প্রভৃতি শব্দ বলিয়া গিয়াছেন। আমরাও সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কেবল "জালরাজা" বলিয়া আসিতেছি।

not, however be lightly passed over. Liberty is dear to all; you have deprived the prosecutor of his with every unnecessary and very considerable harshness. It will also serve as a warning to others who may at any future time be placed in situations similar in nature of yours. The sentence of the Court therefore is that you pay a fine to the Queen of two thousand Rupees, upon payment of which, you be discharged.

জরিমানার হুকুম দিবার সময় আসামীকে রায়ন সাহেব বলিলেন, "তোমায় কয়েদ দিলাম না, কারণ, তুমি ভ্রমে পড়িয়া মিথ্যাকথায় বিশ্বাস করিয়া এই অকার্য্য করিয়াছ।"

কয়েদের কথা উল্লেখ করাতেই যথেষ্ট হইয়াছিল। কোম্পানীর মেজেষ্টর অত্যাচার করিলে কেহ যে দণ্ড দিবার আছে, ইহা লোকে জানিত না। মহারাণীর আদালতে আর কোম্পানীর আদালতে যে কি প্রভেদ, তাহা লোকে এখন বুঝিতে পারিল। তাহাদের কতক ভরসা হইল। কিন্তু কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের মধ্যে বড় গোলযোগ বাধিয়া গেল। সে সকল পরিচয় দেওয়া এক্ষণে অপ্রয়োজন। তবে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে, কোম্পানী বাহাদুরের চক্ষে ওগলবি সাহেব দাগী হইলেন না। তিনি ফৌজদারীতে দণ্ড পাইয়াছেন বলিয়া মেজেষ্টারির আসনে বসিবার অযোগ্য হইলেন না। একটীন্ মেজেষ্টর ছিলেন, শীঘ্র পাকা মেজেষ্টর হইলেন।

২০। জালরাজা সম্বন্ধে নিজামত আদালতের হুকুম।

এই সময় হুগলীর জজ সাহেব জালরাজা সম্বন্ধে যে এস্তেমেজাজ করিয়াছিলেন, তাহা নিজামত আদালতে পেষ হইল। জজেরা বড় গোলে পড়িলেন, ভাবিতে লাগিলেন, "আসামীকে কি বলিয়া দণ্ড দেওয়া যায়? কাল্‌নার জমিয়ৎবস্ত হওয়ার অপরাধে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া এত দিন কয়েদ রাখা হইয়াছে, অথচ সেখানে কোন গোলযোগ হয় নাই। সুপ্রিমকোর্টের বিচারে প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে যে, কালনায় কোন গোলযোগ হয় নাই। এ বিচারের পর কাল্‌নার জমিয়ৎবস্ত বলিয়া দণ্ড দেওয়া ভাল দেখায় না। অন্য অপরাধে দণ্ড দিতে গেলে রাজা প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করা ব্যতীত আর কোন অপরাধ নাই। অন্যের নামগ্রহণ করাই বা কি এমন গুরুতর অপরাধ? বিশেষতঃ মৃত ব্যক্তির নাম ধরায় কাহারও কোন ক্ষতি হয় নাই। কেহ সে জন্য নালিশ উপস্থিত করে নাই। তবে এখন কি করা কর্ত্তব্য?" এই সময় নিজামতের কাজি সাহেব তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। তিনি ফতওয়া দিলেন যে, আত্ম-উপকারের নিমিত্ত যদি কেহ অন্যের নাম ব্যবহার করে, তাহা হইলে মহম্মদীয় ব্যবস্থানুসারে সে ব্যক্তি অপরাধী। জজেরা তখন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া হুকুম দিলেন যে, "মৃত মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করার নিমিত্ত আসামী আলক সা, ওরফে প্রতাপচাঁদ, ওরফে কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারীর এক হাজার টাকা জরিমানা করা যায়। অনাদায়ে তাহার ছয়মাস কারাবাস। আর প্রকাশ থাকে যে, অন্যান্য চার্জ হইতে তাহাকে মুক্তি দেওয়া গেল।

অন্যান্য অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইয়া জালরাজা দরখাস্ত করিলেন যে, "নানা অপরাধ আমার শিরে আরোপ করিয়া মেজেষ্টরেরা আমাকে এমনই গোলে ফেলিয়াছেন যে, তাহা অপ্রমাণ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষতঃ সেই সময় তাঁহারা আমাকে জেলে পুরিয়া আমায় নিশ্চেষ্ট করিয়াছিলেন। আমি কোথাও যাইতে পারি নাই, কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই। জেলে বদ্ধ থাকিয়া আমি কিরূপে এত বিষয়ের প্রমাণ সংগ্রহ

করিব? এক্ষণে সে সকল অভিযোগ হইতে হুজুর আদালত আমায় মুক্তি দিয়াছেন। বাকি যে অপরাধটী আমার স্কন্ধে রাখিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে আর একটু প্রমাণ গ্রহণ করুন, তাহা হইলেই দেখিবেন,আমি নিরপরাধী, আমি অন্যের নাম ব্যবহার করি নাই। আমি নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ, নিম্ন আদালতে আমি এ বিষয়ে সকল প্রমাণ দিই নাই, দিবার প্রয়োজন আছে, এমনও বিবেচনা করি নাই। আমি প্রতাপচাঁদ হইলেও হইতে পারি, এই সন্দেহ মাত্র ফৌজদারী হাকিমের মনে উদ্ভাবন করিয়া দিতে পারিলেই অব্যাহতি পাইব, এই মনে করিয়া আমি প্রমাণ দিয়াছিলাম। ফৌজদারী হইতে অব্যাহতি পাওয়াই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আমি নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ, অন্য কেহ নহি, এই কথার প্রমাণ দেওয়ানী আদালতে প্রয়োজন বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল। বিশেষতঃ আমার উকীলেরা আমায় বুঝাইয়াছিলেন যে, মৃত ব্যক্তির নাম ব্যবহার করা কোম্পানীর আইনানুসারে অথবা হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে কোন অপরাধই নহে। এই জন্য এই সম্বন্ধে এক প্রকার আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। এখন আমার ত্রুটি হইয়াছে বুঝিতেছি, তাহা মার্জ্জনা করুন, আমার বাকি প্রমাণ গ্রহণ করুন। তাহার পর, আমার প্রতি যে আজ্ঞা দিবেন, তাহাই আমার শিরোধার্য্য হইবে।"

কিন্তু নিজামত আদালত এই দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলেন। জজেরা বলিলেন যে, "দরখাস্তকারী যখন নিম্ন আদলতে আপনিই, ইচ্ছাপূর্ব্বক সম্পূর্ণ প্রমাণ দেয় নাই, তখন আর এখানে সে বিষয়ের কোন ওজর শুনা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ রাজা প্রতাপচাঁদের মৃত্যু সম্বন্ধে অতি সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং আর পুনর্ব্বিচারের কোন হেতু দেখা যায় না।"

এই হুকুমের পর জালরাজার পক্ষ হইতে আর এক দরখাস্ত দাখিল হইল। দরখাস্তখানি বোধ হয়, বড় রাগ করিয়া লেখা হইয়াছিল। তাহার মর্ম্ম এই—"দরখাস্তকারীর এক্ষণে জানিবার প্রার্থনা যে, কোন্ আইনমতে অপরাধী হওয়ায় তাহার ১০০০ জরিমানা হইয়াছে? কোন্ আইন-বিধিমতে হুগলীর জজ এ মোকদ্দমা হুজুর আদালতে সোপর্দ্দ করিয়াছেন? হুজুর আদালতের কাজি যে ফতওয়া দিয়াছেন, 'আত্ম-উপকারার্থ মৃত ব্যক্তির নাম ব্যবহার করা দণ্ডার্হ, তিনি তাহা কোথায় এবং কোন্ মুসলমান গ্রন্থে দেখিয়াছেন? দরখাস্তকারী এ অঞ্চলে বড় বড় মৌলবীদের দ্বারা বিশেষরূপে তদন্ত করাইয়াছে, কিন্তু সকলেই বলিয়াছেন যে, মৃত ব্যক্তির নাম ব্যবহার করা' অপরাধ বলিয়া কোন গ্রন্থে তাঁহারা পান নাই।"

নিজামত আদালত তাহাতে হুকুম দিলেন যে, মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর এ সম্বন্ধে কোন কথা শুনা যাইতে পারে না। দরখাস্তকারী ভবিষ্যতে প্রতাপচাঁদ বলিয়া দরখাস্ত করিলে তাহা গৃহীত হইবে না, কেন না, বিচারে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, দরখাস্তকারী প্রতাপচাঁদ নহে।" *

---

* নিজামতের এই সকল হুকুম জজ (W Bradden) ব্রডন সাহেব এবং (H. Tuker) টকর সাহেব একত্রে দিয়াছিলেন। টকর সাহেব একবার ফৌজদারী আদালতে নিজে আসামী হন। আমরা এ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলাম। এই জজদিগের শেষ হুকুমটী এইরূপ—

'The Court further remark that as they have judcially pronounced the petitioner not to be the Maharaja Protap Chand they cannot, in future, receive any petitions or applications from him under that name and title. Extract from order 19th July, 1839.

৩২। জালরাজার সর্ব্বনাশ।

এই হুকুমটী শুনিতে সামান্য, কিন্তু পরিণামে অতি গুরুতর হইয়া পড়িল। ওগলবি, সামুয়েল যাহা করিতে না পারিয়াছিলেন, নিজামতের এই হুকুমটী তাহা করিয়াছিল। "বিচারে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে যে, জাল-রাজা প্রতাপচাঁদ নহে, সুতরাং প্রতাপচাঁদ বলিয়া তিনি কোন দরখাস্ত করিলে আর তাহা গ্রহণ করা যাইবে না।" এই কথায় জালরাজার পক্ষে সকল দ্বার পাকতঃ রোধ হইল। তিনি দেওয়ানীতে প্রতাপচাঁদ বলিয়া সম্পত্তি দাবি করিলে তাঁহার আর্জি আর দাখিল হইবে না, এবং প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করার নিমিত্ত আবার তিনি দণ্ড পাইবেন, সুতরাং আর কোন আদালতে তিনি বিচার-প্রার্থী হইতে পাইলেন না, আপীল পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না। প্রতাপচাঁদ বলিয়া যে ব্যক্তি কোন আদালতে বিষয় দাবি করিতে আসিয়াছে, সে ব্যক্তি আর্জিতে আলক সা বা কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী বলিয়া দস্তখত করিতে পারেন না; করিলে সেইখানে তাঁহার দাবি শেষ হইবে। আবার প্রতাপচাঁদ বলিয়া দরখাস্ত করিলে সে দরখাস্ত দাখিল হইবে না, দরখাস্তকারীকে হয়ত দণ্ড পাইতে হইবে। সুতরাং এই সকল দেখিয়া শুনিয়া সকলের ধারণা হইল যে, জালরাজার পক্ষে দেওয়ানী আদালতের দ্বার রোধ করিবার জন্য জজেরা এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন।" কেহ কেহ বলেন," গবর্ণমেণ্টের কোন চতুর সেক্রেটারী এই কৌশল তাঁহাদিগকে শিখাইয়া দিয়াছেন।"

এই কৌশলের পর জালরাজা কপাল ঠুকিয়া আর এক দরখাস্ত নিজামতে দাখিল করিলেন। দরখাস্তে নাম দিলেন না, নামের পরিবর্ত্তে লিখিলেন, "The humble petition of one who hath been sued at the instance of Government by the name of Aluck Shaw alias Rajah Protap Chand, alias Kistolall Bromhacharee."

দরখাস্তখানি অতি দীর্ঘ, রাগে ভরা এবং ঠাট্টা বিদ্রূপে পরিপূর্ণ। তাহার কিছু পরিচয় দিবার নিমিত্ত কোন কোন অংশের মর্ম্ম উদ্ধৃত করা গেল—

১। দরখাস্তকারীকে কখন আলক সা বলিয়া, কখন কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী বলিয়া দণ্ড দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে, এখনও স্থির হয় নাই যে আদালত হইতে ভবিষ্যতে তাহার কি নাম কায়েমি রাখা হইবে। সুতরাং যে অবধি তাহা না রাখা হয়, সে অবধি দরখাস্তকারী কোম্পানী আদালত ভিন্ন অন্য সর্ব্বত্রে তাহার পূর্ব্বপরিচিত নামে পরিচয় দিবে। বে-আদবির ভয়ে সে নাম এখানে উল্লেখ করিতে পারিল না। কিন্তু এখনও দরখাস্তকারী জানিতে পারে নাই যে, কেহ সে নাম উল্লেখ করিয়া দরখাস্ত করিলে হুজুর আদালতের কি ক্ষতি হইবে।

২। হুজুর আদালত হইতে যে নূতন অপরাধ আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা—(is a crime unknown to the English Law, as well as to the Codes of Law of civilized Europe and was, till the gloss put upon it by your Court and its Mohammedan officer, unknown to Mohammedan Law, as it is still unknown to regulation Law-wide and sweeping as it is) কি বিলাতে, কি এ দেশে কেহ জানিত না। অন্যের নাম ব্যবহার করাকে গুরুতর অপরাধ করিয়া তোলা হইয়াছে, কেন না, মিথ্যা কথা ব্যবহার করা গুরুতর অপরাধ; কিন্তু হলপ করিয়া মিথ্যা কথা বলা ভিন্ন অন্য মিথ্যা কথার দণ্ড এ পর্য্যন্ত কখন হয় নাই।

৩। "এখন দরখাস্তকারী বুঝিয়াছে যে, প্রতাপচাঁদ নাম উল্লেখ করিয়া বর্দ্ধমান কি অন্য কোন মফঃস্বল আদালতে নালিশ করিলে আবার তাহাকে এই মিথ্যা কথার অপরাধে ফেলিয়া দণ্ড দেওয়া হইবে। সুতরাং তাহার পক্ষে দেওয়ানীর দ্বার রুদ্ধ করা হইয়াছে।

৪। "এখন তাহার মানস যে, একবার

ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট এ বিষয়ের আপীল করে; অতএব হুজুর আদালতের অনুমতি প্রার্থনা।"

এই প্রার্থিত অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল কি না, তাহা আমরা কোন কাগজপত্রে পাইলাম না। বোধ হয় দেওয়া হয় নাই। যে কারণেই হউক, বিলাতে আর আপীল হয় নাই।

এখানেও দেওয়ানী আদালতে আর কোন নালিশ করা হয় নাই। তাহা করিবার পক্ষে যে ব্যাঘাত নিজামতের জজেরা দিয়াছিলেন, তাহা ব্যতীত আরও এক ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। যাহারা জালরাজাকে মোকদ্দমা চালাইতে টাকা কর্জ্জ দিয়াছিল, তাহাদের সকলেরই ভ্রম হইয়াছিল যে, "গবর্ণমেণ্ট যে কোন কৌশলে হউক, এ ব্যক্তিকে বর্দ্ধমানের সম্পত্তি অধিকার করিতে দিবেন না।" সুতরাং তাহারা হাত গুটাইল—কেহ আর টাকা কর্জ্জ দিল না। জালরাজার আশা-ভরসা সকল ফুরাইল। তিনি যে সন্ন্যাসী ছিলেন, সে সন্ন্যাসী হইলেন।

২২। সাধারণের বিচার।

জজ সাহেবেরা যে যাহা বিচার করুন, বাঙ্গালীরা অনেকেই আপন আপন ঘরে বসিয়া জালরাজা সম্বন্ধে এক প্রকার মীমাংসা করিয়া লইল। যে যাহা জানিত না, এই মোকদ্দমা উপলক্ষে তাহা সকলেই জানিয়াছিল। কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিল যে, জাল-রাজা সত্যই প্রতাপচাঁদ; এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।" কেহ বলিল, "যদি এ ব্যক্তি প্রতাপচাঁদ না হইবে, তবে পরাণ-বাবুর এত ভয় হইবে কেন? তিনি সামান্য জুয়াচোরের নিমিত্ত রাজবাটীর পূর্ব্বসঞ্চিত সমুদয় ধন ব্যয় করিবেন কেন? *" কেহ বলিল, 'যদি এ ব্যক্তি সত্যই জাল হইবে, তবে গবর্ণমেণ্ট ইহার নিমিত্ত এত ব্যস্ত হইয়া আপন ব্যয়ে পরাণ-বাবুর মোকদ্দমা চালাইবেন কেন? মেজেষ্টরদের গোপনে পত্র লিখিবেন কেন? এবং এ সম্বন্ধে নানা অন্যায় কৌশল করিবেন কেন? অবশ্য এ ব্যক্তির জন্য গবর্ণমেণ্টের ভয় হইয়া-

---

* যে সময় প্রতাপচাঁদের মোকদ্দমা চলিতেছে, সে সময় পরাণ-বাবু বর্দ্ধমানের রাজ-সংক্রান্ত অধিকাংশ জমিদারীর খাজানা নিয়মিত সময়মধ্যে দিতে পারেন নাই। গবর্ণমেণ্ট সে সকল জমীদারী বিক্রয় না করিয়া তাহা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে আনিবার জন্য দুইজন সুদক্ষ ইংরেজ কর্ম্মচারীকে কমিসনর নিযুক্ত করিয়া বর্দ্ধমানে পাঠান। লোকে সন্দেহ করিল যে "পরাণ-বাবু এই মোকদ্দমা উপলক্ষে রাজবাটীর সমুদয় আয় ও সঞ্চিত ধন ব্যয় করিয়াছিলেন, তাই তিনি জমিদারীর খাজানা দিতে পারেন নাই।" বোধ হয় সেই-জন্য বিস্তর ঘুষের কথা রাষ্ট্র হইয়াছিল, এমন কি, ওগল্‌বি সাহেব খুনী মোকদ্দমার সময় বম্বেনগরে আপনার সহোদরকে পত্র লিখিয়া-ছিলেন যে, "লোকে বলে, আমি তিন লক্ষ টাকা ঘুষ লইয়াছি।" পত্রখানি বম্বের সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছিল, কিন্তু স্থানাভাব প্রযুক্ত কেবল তাহার কতকাংশ নিম্নে দেওয়া গেল।

"The lawyers of Calcutta are the natural and inveterate enemies of our service. The whole of the profession was up in arms against me. They knew not of course the right of the story, for that was an official secret, (এই কথাটী বাঙ্গালীরা অনেকেই বুঝিয়াছিলেন) * * * Besides this, all those Zemindars who were to join the pretender, and all who have lent him mony (and he had contrived to realise enormous) have al o deeply vowed to be recenged upon me, for all their chemes and hopes of all plunder have been defeated and these are the pary who pay the expense of the proceedings against me, whilst the lawyers conduct them, some of them positively acting without a fee contrary to all professional rule and precedent, the only reward they seek is to crush me

ছিল। গবর্ণমেণ্ট, পূর্ব্বে জানিতেন যে, প্রতাপচাঁদ মরেন নাই, রণজিৎ সিংহের সঙ্গে মিলিয়াছেন।” রণজিতের স্বপক্ষ ব্যক্তি এখন বাঙ্গালার মধ্যে বসিয়া অতুল ধনসম্পত্তি অধিকার করিলে, ভবিষ্যতে কোম্পানীর বিপদ ঘটিতে পারে। তাই গবর্ণমেণ্ট এক প্রকার চাতুর্য্য করিয়া প্রতাপচাঁদকে বঞ্চিত করিলেন।” এ সকল সন্দেহ যে অমূলক, তাহা বলা বাহুল্য।

---

if possible. It was by no means sufficient with them to vilify me in the papers as man was never before abused, but they would hang me if they could; and accordingly are trying to prove me guilty of murder * * The public have been taught to believe that I fired upon unresisting sleeping innocents. * * The papers have t that I am suspended but that is not the case, I am required to attend in Calcutta pending this business, but I continue to draw my salary and the Deputy Governor tells me that Govt. express no opinion one way or the other I understand that but for a blunder the case would have been dropped, long ago. To show you the spirit that is working against me I must tell you that I had notices of actions for damages fourteen civil actions with which I was threatened; one case of false imprisonment, one of contempt of Court, and one of murder. They tried also to get up a case of bribery and corruption, swearing I had taken a consideration of three lacs of Rupees; and I was also accused of subornation of perjury, Finding they could make out no case they have given up all but two—contempt of the Supreme Court and murder and these they only persevere in to keep up the odium against me and the agitation while the trial of Mr. Shaw and the pretender is pending. My being in difficulty gives great weight to them as it awes all the witnesses who have to give evidence for the prosecution.

এইরূপে যে ব্যক্তি যে কারণেই জাল-রাজাকে প্রতাপচাঁদ বলিয়া স্থির করুন, তাঁহার এই ঘটনা আপন আপন ধর্ম্মবুদ্ধির সহিত মিলাইয়া এক প্রকার তৃপ্তিলাভ করিলেন। যাঁহারা ধর্ম্মভীত, তাঁহারা ভাবিলেন, “ধর্ম্ম আছেন, প্রতাপচাঁদ মহাপাপ করিয়াছিল, সে যদি আবার রাজত্ব পাইত, তাহা হইলে বলিতাম, ধর্ম্ম মিথ্যা।” আর এক দল ভাবিলেন, “ধর্ম্ম মিথ্যা; কেন না, যথাশাস্ত্র চতুর্দ্দশ বৎসর ধরিয়া অজ্ঞাতবাস করিয়াও প্রতাপচাঁদ যখন রাজ্য পাইল না, তখন ধর্ম্ম মিথ্যা।”

কেহ বলিল, “অদৃষ্টই মূল। সকলই অদৃষ্ট-দোষে ঘটে। প্রতাপচাঁদ যে মহাপাপ করিয়াছিলেন, তাহাও অদৃষ্ট হেতু। তিনি যে আর রাজ্য পাইলেন না, তাহাও অদৃষ্ট-দোষে। যাহা অদৃষ্টে থাকে, তাহা কে খণ্ডাইতে পারে? যদি কোম্পানী বাহাদুর মনে করিতেন, তবুও প্রতাপচাঁদকে রাজ্য দেওয়াইতে পারিতেন না। প্রতাপের অদৃষ্টে না থাকিলে কোম্পানীর মনে এ কথা আসিবেই বা কেন?”

যাঁহারা কর্ম্মফলবাদী, অর্থাৎ যাঁহারা খাঁটি হিন্দু, তাঁহারা ভাবিলেন, “যেমন কর্ম্ম, তেমনিই ফল। ইহজন্মে হউক, পূর্ব্বজন্মে হউক, প্রতাপচাঁদ অবশ্য কাহাকেও বঞ্চিত করিয়া থাকিবেন, তাই আপনি বঞ্চিত হইলেন।”

এইরূপে সকলে এক একটা স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। যাঁহারা ধর্ম্ম কর্ম্মের বড় পক্ষপাতী নহেন, তাঁহারা বুঝিলেন, “কেনা সাহেবেরা পরাণবাবুর অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়াছেন।” তৎকালে লোকের বিশ্বাস ছিল যে “ইংরেজদের প্রত্যেককে ক্রয় করা যায়, প্রত্যেকে ক্রীত হইয়া থাকেন। কেহ কোন নূতন সাহেবের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করিলে অগ্রে জিজ্ঞাসা করিতেন, “ইনি কাহার সাহেব?” অর্থাৎ কাহার ক্রীত। যাঁহার “কেনা সাহেব” থাকিত, তাঁহার সম্মান বঙ্গসমাজে অতুল হইত।

তিনি মনে করিলে শত্রুর প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করিতে পারিতেন। "কেনা সাহেব" তাঁহাকে সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা করিত। সাহেব ক্রয় করার পদ্ধতির মধ্যে এইমাত্র একটু বিশেষ ছিল যে, সাহেব ক্রয় করিতে বাজারে যাইতে হইত না, যে সাহেবেরা বিক্রীত হইবেন, তাঁহারা আপনারাই বাটীতে আসিয়া শৃঙ্খল গলায় পরিয়া যাইতেন। তখন সাহেবের সংসারে বিস্তর ব্যয় ছিল, একে তাঁহাদের বিলাতী দ্রব্যাদি এদেশে অতি দুর্মূল্য ছিল, তাহাতে আবার তাঁহারা এক একটী ক্ষুদ্র নবাবের মত ধুমধামে থাকিতেন। তাঁহারা কোম্পানীর নিকট যে বেতন পাইতেন, তাহাতে সকল দিক্ কুলাইতে পারিতেন না। এই জন্য তাঁহারা কেহ কেহ বাটী হইতে টাকা আনাইতেন, কেহ কেহ বা এদেশে কর্জ্জ করিতেন, কিন্তু কর্জ্জ দুই চারি শত পরিমাণে নহে, একেবারে পঞ্চাশ হাজার, আশী হাজার, লক্ষ, এইরূপ পরিমাণে লওয়া হইত। যাহার আয়ের অতিরিক্ত ব্যয়, তাঁহার কর্জ্জ পরিশোধ করা অসাধ্য। এ কথা খাতক মহাজন উভয়েই জানিতেন, অথচ কর্জ্জ আদান-প্রদান হইত। যিনি কর্জ্জ লইতেন, তিনি জানিতেন, "উপকার করিয়া ঋণ পরিশোধ করিব।" যিনি কর্জ্জ দিতেন, তিনি জানিতেন, "আমি সময়ে সময়ে বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইব।" তখন পদে পদে লোকের বিপদ্ ঘটিত। বাঙ্গালীর মধ্যে আত্মীয়তা শত্রুতা উভয়ই তখন গুরুতর ছিল। এখন আর সে আত্মীয়তা নাই, সে শত্রুতাও নাই। বাঙ্গালী সমাজের স্রোত কিছু মন্দ পড়িয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহাতে একজন "কেনা সাহেব" সহায় থাকিলে বড় উপকার হইত। তাই ধনবানেরা বহু অর্থ কর্জ্জ দিয়া অর্থাৎ বহু অর্থ ক্ষতি করিয়া সাহেব ক্রয় করিতেন। অন্য উপায়ে কেহ কোন গুরুতর বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইলেও লোকে ভাবিত, এ ব্যক্তি "কেনা সাহেব" দ্বারা উদ্ধার হইয়াছে। এক্ষণকার ইংরেজ কর্ম্মচারীদের অপেক্ষা তখনকার সাহেবদের ক্ষমতা অনেক অংশে অধিক ছিল। তাঁহারা স্বপক্ষে হউক, বিপক্ষে হউক, যখনই যাহা মনে করিতেন, তখনই তাহা করিতে পারিতেন। তাহা আইনি হউক, বে আইনি হউক, সঙ্গত হউক, অসঙ্গত হউক, তাঁহারা অনায়াসে সকল কার্য্যই করিতেন। এখনকার ইংরেজ কর্ম্মচারীদের সেরূপ প্রবৃত্তি থাকিলেও ধরাধরির ভয়ে, তাহা আর পারেন না। এখন ধরাধরির ভয়, প্রকাশের ভয়, নালিশের ভয়, কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। বুঝি, দেশী সংবাদপত্র ইহার মূল হেতু।

"কেনা সাহেবের" কৌশলে জালরাজার দণ্ড হইয়াছে, এ কথা যাঁহারা না বলিলেন, তাঁহারা সকল দোষ গবর্ণমেণ্টের শিরে সমর্পণ করিলেন। গবর্ণমেণ্ট যে চাতুরী করিয়াছেন, অকার্য্য করিয়াছেন, অবিচার করিয়াছেন, অধর্ম্ম করিয়াছেন, ইহা সকলেই বলিতে লাগিলেন। যাঁহারা অদৃষ্টবাদী, যাঁহারা কর্ম্মফলবাদী, যিনি যে বাদী হউন, সকলে এই বিষয়ে একবাক্যে গবর্ণমেণ্টকে দোষী করিলেন। প্রতাপচাঁদ পাপী, প্রতাপচাঁদের অদৃষ্টের দোষ, এ কথা সত্য, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের দ্বারা যে এই অত্যাচার হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আর দ্বিমত থাকিল না। সুতরাং কোম্পানীর প্রতি সাধারণের অশ্রদ্ধা জন্মিল, পাদরীদের প্রতি লোকের ভক্তি না হউক, একরূপ শ্রদ্ধা জন্মিতেছিল। তাঁহারা সত্যবাদী, এ কথা সকলেই বলিত; সে শ্রদ্ধা আর বড় থাকিল না। কালনায় যে পাদরী ছিলেন, যিনি এই মোকর্দ্দমায় সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তাঁহাকে সে অঞ্চল ত্যাগ করিতে হইল। পূর্ব্বে লোকে যে সংখ্যায় খ্রীষ্টান হইতেছিল, সে সংখ্যার যেন হ্রাস হইতে লাগিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবল হইবার একটু সূচনা দেখা দিল। অন্যর মোকর্দ্দমা কুরাণ করিয়া লওয়ার রীতি বড় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাও একটু হ্রাস পাইল। সম্প্রতি মেকলে সাহেব পিনাল কোডের খসড়া করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আর দু

একটী ধারা সন্নিবেশিত হইল, এবং সেই ঙ্গে কার্য্যবিধি আইনের সূত্রপাত হইল।

২৩। জালরাজা ধর্ম্মপ্রণেতা।

মোকর্দ্দমা ফুরাইল। জালরাজা দেওয়াীতে নালিশ করিতে পারিলেন না। প্রথমতঃ স্থতি নাই, দ্বিতীয়তঃ, তথায় প্রতাপচাঁদ লিয়া নালিশ করিলে আবার জেলে যাইতে ইবে। সুতরাং নিরস্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া লিকাতায় বসিয়া থাকিলেন। পূর্ব্বে যাঁহারা াশেষ স্বপক্ষতা করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহ কহ একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, কি জানি, গবর্ণমেণ্টের যে গতিক দেখিচছি, আর সাহস হয় না।" কেহ বা সে থা অগ্রাহ্য করিয়া প্রকাশ্যে জালরাজার হিত আত্মীয়তা রাখিলেন। জালরাজা াহাদের নিষেধ করিতেন, কিন্তু তাঁহারা নিতেন না। তাঁহাদের যত্নে জালরাজার ষ্টকষ্ট—কোন কষ্টই ছিল না। ধনবানের ন্যায় খে স্বচ্ছন্দে তিনি দিনযাপন করিতেন।

প্রথমে তিনি কিছুদিন কলিকাতার পাতলায় ছিলেন। তার পর কলুটোলায় াবিন্দ প্রামাণিকের বাটীতে দুই তিন ন থাকেন। তাঁহার নিমিত্ত সে ব্যক্তি াপনার সর্ব্বস্ব ব্যয় করে। তাহার একান্ত রণা ছিল যে, জালরাজা সত্যই প্রতাপ-।

কলুটোলা হইতে জালরাজা শ্যামপুকুরে া থাকিলেন। কিছুদিন পরে, লাহোরের াই উপস্থিত হইল। এই সময় জালরাজার ন গবর্ণমেণ্টের আবার দৃষ্টি পড়িল। কু বুঝিয়া তিনি কোম্পানীর রাজ্য ত পলাইয়া প্রথমে চন্দননগরে বোড়াই-তলায় ফরাসিস আশ্রয়ে কয়েক বৎসর লেন। তাহার পর শ্রীরামপুরে যান। মপুর তথন কোম্পানীর রাজ্য হয় নাই। রে প্রায় ছয় সাত বৎসর ছিলেন। এই শুনিতাম, তিনি তথায় ঠাকুর সাজিয়া দিনযাপন করিতেন। নিত্য সন্ধ্যার সময় বেশ্যারা আসি। এক এক পঞ্চপ্রদীপ আর ঘণ্টা লইয়া সকলে একত্রে তাঁহাকে আরতি করিত, তিনি ঠাকুরের মত সিংহাসনে বসিয়া দীপের নৃত্য দেখিতেন। লোকে বলে, "সে সময় বড় সমারোহ হইত।"

এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া অনেকে বিবেচনা করিত যে, জালরাজার বুদ্ধির একটু গোলমাল হইয়াছে। তিনি সত্যই প্রতাপচাঁদ হইলে, এই দুর্ঘটনার পর তাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সহিত সর্ব্বদা সাক্ষাৎ করিতেন, তাহারা বলিয়া থাকেন যে, কথাবার্তায় কখন তাঁহার ভ্রান্তি বুঝা যায় নাই। বরং তখন তাঁহাকে অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ও সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া বোধ হইত। তিনি তৎসাময়িক কি ইংরেজী কি বাঙ্গালা—সমুদয় সংবাদপত্র নিত্য পাঠ করিতেন। যাঁহারা সে সময় উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহাদিগকে ফরাসিস্ Politics, রুসদেশীয় রাজনীতি পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিতেন। কেহ কেহ বলেন, বিলাতী রাজনীতিতে (European politics) তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। আরও শুনা যায়, তিনি রুসীয় রাজনীতি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বুঝিতেন এবং সেই দেশের কিছু পক্ষপাতীও ছিলেন। এদিকে বেদান্তশাস্ত্রে তিনি বড় পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীরামপুরে থাকিবার সময় দুই একজন অধ্যাপক তাঁহার নিকট বেদান্তের কথা শুনিতে যাইতেন; সুতরাং এ অবস্থায় বলা যায় না যে, তাঁহার কোন প্রকার চিত্তবৈকল্য জন্মিয়াছিল। অথচ আবার দেখা যায়, তিনি শালগ্রামশিলার ন্যায় সর্ব্বদা কারায় বসিয়া থাকিতেন, লোকের সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি লইতেন, পূজা গ্রহণ করিতেন, বৈকালি খাইতেন। তখন তাঁহার প্রকৃত অভিসন্ধি কেহ বুঝে নাই।

যাহারা তাঁহার পূজা করিতে আসিত, তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক,

গুলি বাবাজী তাঁহার দ্বারে পড়িয়া থাকিত। বোধ হয়, তাহাদের দ্বারাই জালরাজার অমানুষিক শক্তি দেশবিদেশে রাষ্ট হইত। স্ত্রীলোকদের ধারণা হইয়াছিল যে, এ ব্যক্তি সাক্ষাৎ দেবতা, অনেকে তাঁহাকে গৌরাঙ্গদেব মনে করিত।

তিনি অনেক লোককে মন্ত্রশিষ্য করিয়াছিলেন; এমন কি, পঞ্জাবী ও অপর হিন্দুস্থানী পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার অন্য চেলার সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না, স্ত্রীলোক শিষ্যার ত কথাই নাই। বাসগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে অন্তর্দ্ধান হইতেন। দূরস্থ পল্লীগ্রামে গিয়া অতি গোপনে স্ত্রীলোকদের মন্ত্র দিয়া আসিতেন। তিনি যে মন্ত্র দিতেন, তাহা বিষ্ণুমন্ত্র নহে, শক্তিমন্ত্রও নহে। তাঁহার দীক্ষাপ্রণালী, অর্চ্চনাপদ্ধতি নূতন প্রকার। অদ্যাপি তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যের মন্ত্র দিয়া বেড়ান। স্থানে স্থানে লোকে তাহাদের ঘোষপাড়ার দল বলিয়া জানে।

এই নূতন ধর্ম্মটী ক্রমে বিস্তার হইতেছে। ব্রাহ্ম-সম্প্রদায় অপেক্ষা জালরাজার শিষ্যের সংখ্যা বোধ হয়, এখন বহুগুণে অধিক।

অদ্যাপি লোকে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু কেহই জানেন না যে, জালরাজার প্রণীত ধর্ম্মে তাঁহারা উপদিষ্ট হইতেছেন। শিষ্যদের মধ্যে জালরাজার স্বতন্ত্র নাম সত্যনাথ।

২৪। জালরাজার মৃত্যু।

জালরাজার মূর্ত্তি বড় প্রশান্ত ছিল। যে দেখিয়াছে, সেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়াছে। সেই মূর্ত্তি ক্ষুদ্রচেতা জুয়াচোরের নহে। গল্প আছে, তিনি একবার কোন পল্লীগ্রামে শিষ্যদের দেখিতে গিয়া একটী গৃহস্থের বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সে বাটীতে কেহ পুরুষ থাকিত না, শিষ্যেরা সকলেই তথায় গোপনে গুরুদর্শনে আসিত। গ্রামস্থ লোকেরা পূর্ব্বে শুনিয়াছিল যে, একজন বদ্মায়েস্ মধ্যে মধ্যে গ্রামে আসিয়া অভিভাবকশূন্য স্ত্রীলোকদের লইয়া রঙ্গরস করিয়া যায়, সেই জন্য তাহারা সংকল্প করিয়াছিল যে, সে বদ্মায়েসকে একবার ধরিতে পারিলে তাহার অস্থি চূর্ণ করিবে। এখন সে সময় উপস্থিত হইল। বদ্মায়েসের সন্ধান পাইয়া তাহারা রাত্রিকালে আট দশ জন হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইল। প্রভু তখন শিষ্যাপরিবেষ্টিত হইয়া নবধর্ম্মানুশীলন করিতেছিলেন। গ্রামস্থ লোকেরা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক তুলিয়া লইয়া গেল। তিনি কোন আপত্তি করিলেন না। তাহার পর যখন তাহারা অভীষ্টস্থানে তাঁহাকে লইয়া ফেলিল, তখন তাঁহাকে প্রহার করা দূরে থাকুক, কেহ কোন রূঢ় কথাও বলিতে পারিল না। তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া সকলের শ্রদ্ধা হইল।

ইদানীং তিনি ঈষৎ স্থূলকায় হইয়াছিলেন। মোকদ্দমার সময় তাঁহার বর্ণ শ্যাম বলিয়া বোধ হইত, কিন্তু পরে সেই শ্যামবর্ণ উজ্জ্বল হইয়াছিল। তাঁহার চক্ষু এরূপ ছিল যে, তাঁহাকে দেখিতে গেলে প্রথমেই তাঁহার চক্ষের প্রতি দৃষ্টি পড়িত, অথচ সে চক্ষুতে প্রখরতা মাত্র ছিল না।

তিনি সকলকেই মিষ্টকথা বলিতেন, মিষ্টকথাই তাঁহার বশীকরণমন্ত্র ছিল।

মৃত্যুর আট দশ মাস পূর্ব্বে তিনি কলিকাতার উত্তর বরাহনগরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার দৈহিক অবস্থা বড় ভাল ছিল না, অর্থেরও কিছু অনটন হইয়া থাকিবে, কেন না, বাটীর ভাড়া একেবারে দিতে পারেন নাই। এই সময়ে বোধ হয়, তিনি নিজ অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতেন, তাই আপনাকে একা বলিয়া ভাবিতেন। একা আর থাকিতে পারিতেন না, একা থাকিতে তাঁহার বড় কষ্ট হইত। মধ্যে মধ্যে তিনি গ্রামের ভদ্রলোকদিগকে আহ্বান করিতেন, কেহ তাঁহার নিকটে আসিতেন, কেহ বা আসিতেন না। যাঁহারা আসিতেন, কাতরভাবে তাঁহাদের বলিতেন,

"আমি আর একা থাকিতে পারি না, আপনাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিলে যেন সুখে থাকি।"

এই প্রকার অবস্থায় তিনি ১৮৫২ সালে কি ৫৩ সালের প্রথমে ময়রাডাঙ্গা পল্লীতে একটী সামান্য বাটীতে সামান্য দুই তিনটী লোক পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার যাত্রার সময় চক্ষের জল মুছিবার কেহ ছিল না।

তাঁহাকে প্রতাপচাঁদ মনে করিলে, তাঁহার এই শেষ অবস্থার নিমিত্ত চক্ষে জল আইসে। পরের দোষে তাঁহার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। এই জন্য আরও কষ্ট হয়।

তাঁহাকে জালরাজা মনে করিলেও তাঁহার প্রতি রাগ থাকে না; তিনি যথেষ্ট কষ্ট পাইয়াছিলেন।

তিনি প্রতাপচাঁদ হউন, আর জালরাজাই হউন, অদ্বিতীয় লোক ছিলেন। তিনি কষ্ট পাইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে ভালবাসি। তিনি হাস্যমুখে সেই কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, এই জন্য আমরা তাঁহাকে ভক্তি করি।

সম্পূর্ণ।

রামেশ্বরের অদৃষ্ট।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ।

রামেশ্বরের অদৃষ্ট।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রামেশ্বর শর্ম্মার পঁচিশ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হইল। তিনি পিতাকে বড় ভালবাসিতেন। রামেশ্বরের পিতা যাহা কিছু রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সমুদয় রামেশ্বর শ্রাদ্ধে ব্যয় করিলেন। পিতার স্বর্গার্থে যে যাহা পরামর্শ দিল, তৎক্ষণাৎ তাহাই করিলেন। ক্রিয়া সমাপ্ত হইল। আত্মীয় কুটুম্বগণ স্ব স্ব গৃহে গেল। রামেশ্বর তখন জানিলেন যে, তাঁহার আর কিছুই নাই। পরিবারের ভরণপোষণ করা কঠিন হইল। তাঁহার ঘরে যুবতী ভার্য্যা পার্ব্বতী এবং তিন বৎসরের পুত্র আনন্দদুলাল একদিবস সকলেই উপবাসী রহিল। শিশু আহারের নিমিত্ত ক্রন্দন করিতে লাগিল; সন্তানের ক্রন্দন দেখিয়া পার্ব্বতী কাঁদিতে লাগিলেন। রামেশ্বর কিছু খাদ্য সংগ্রহের জন্য গিয়াছিলেন, নিষ্ফল হইয়া রিক্তহস্তে আসিয়া দেখিলেন, উভয়ে প্রতীক্ষায় দ্বারে বসিয়া আছে। দ্বারের কিঞ্চিৎ দূরে ব্রাহ্মণভোজনের শুষ্কপত্র, ভাঙ্গা হাঁড়ি প্রভৃতির স্তূপমধ্যে গ্রাম্য কুক্কুরেরা আহার অন্বেষণ করিতেছে। শিশু একাগ্রচিত্তে তাহাই দেখিতেছে। রামেশ্বরকে দেখিয়া শিশু দৌড়িয়া আসিল; জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! আমার জন্যে কি এনেছ?" রামেশ্বরের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল; দেখিয়া পার্ব্বতীর চক্ষু জলে পূরিল; শিশুর মুখপানে চাহিতে সে জল উছলিয়া পড়িল; তখনই আবার মুখ তুলিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিতে উভয়েই দুই একবার চাহিয়া শেষ কাঁদিয়া উঠিল। তিন জনে একত্রে অনেকক্ষণ কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতে শিশু নিদ্রা গেল। এই সময় প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, রামেশ্বর উঠিলেন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া চলিলেন। একস্থানে দেখিলেন, বালজ্যোৎস্নার আলোকে এক দীর্ঘিকাতীরে কতকগুলি অল্পবয়স্ক বাবু, তেড়িকাটা, কোট গায়ে কৌমুদীদীপ্ত স্বচ্ছবারির উপর পয়সা নিক্ষেপ করিয়া "ছিনিমিনি" খেলাইতেছেন। রামেশ্বর তাঁহাদের নিকট যোড়হাত করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে চারিটী পয়সা যাচ্ঞা করিলেন, "বেটা আমাদের পয়সা তোরে দিতে গেলাম কেন?" রামেশ্বর কাতর হইয়া বলিলেন, "আমি অন্নাভাবে সপরিবারে মারা যাই, আপনারা পয়সা জলে ফেলিয়া দিতেছেন।" বাবুরা বলিলেন, "আমাদের পয়সা আমরা জলে ফেলিব, তোর কি রে শ্যালা?" এই বলিয়া ঘুষা তুলিয়া একজন রামেশ্বরকে মারিতে গেলেন। রামেশ্বর শরবিদ্ধ সিংহের ন্যায় ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন, কিয়ৎ দূরে গিয়া মনে ভাবিলেন, "এই বানরগুলাকে এক একটা চড় মারিয়া পয়সা কাড়িয়া লইতে পারিতাম—কেন লইলাম না?" ক্ষুধার জ্বালায় রামেশ্বরের ধর্ম্মাধর্ম্মবোধ লুপ্ত হইতেছিল।

রামেশ্বর গ্রামান্তরে গেলেন; তথায় এক বাটীর পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। গৃহমধ্যে সকলে নিদ্রিত বোধ হইল; আনন্দদুলালের সেই ক্ষুধাপীড়িত, কাতর শৈশবসুকুমার মুখ মনে পড়িল, পার্ব্বতীর রোদন মনে পড়িল।

আমি একা ধর্ম্মপথে যাইব কেন?

তখন রামেশ্বর এক গৃহস্থের গৃহপ্রবেশ করিয়া পেটরা হইতে পয়সা চুরি করিলেন। পেটরায় তিনটী টাকা আর আট আনা পয়সা ছিল; রামেশ্বর কেবল সেই আট আনা পয়সা লইয়া আসিলেন। গৃহস্থেরা তাহা কেহই জানিতে পারিল না।

রামেশ্বর আসিতে আসিতে ভাবিলেন, পয়সা হইল, চাউল লবণ কোথায় পাইব? অতএব তাহা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আর এক গ্রামে গেলেন। নিকটস্থ পাঁচ সাত গ্রামের মধ্যে কেবল সেই গ্রামে একখানি দোকান ছিল। রামেশ্বর তথায় উপস্থিত হইয়া দোকানীকে পুনঃ পুনঃ ডাকিলেন; দোকানী স্থানান্তরে ছিল, অতএব কোন উত্তর পাইলেন না। অগত্যা তিনি দোকানের দ্বার মোচন করিয়া প্রবেশ করিলেন এবং রাত্রোপযোগী চাউল, লবণ, দাল সংগ্রহ করিয়া বস্ত্রাগ্রে তাহা দৃঢ়বদ্ধ করিলেন, তাহার উচিত মূল্য সেই স্থানে রাখিয়া বহির্গত হইলেন। পথে অত্যন্ত ভয় হইতে লাগিল, কিন্তু কোন বিঘ্ন ঘটিল না; বাটী আসিয়া পৌঁছিলেন। পার্ব্বতী পাক করিল, রামেশ্বর ও শিশু খাইল; পার্ব্বতী খাইলে পরদিনের জন্য কিছু থাকে না। পার্ব্বতী উপবাস করিয়া গোপনে নিজাংশ স্বামীপুত্রের জন্য হাঁড়িতে তুলিয়া রাখিল। রামেশ্বর তাহা জানিতে পারিলেন না।

পরদিবস রামেশ্বর পার্ব্বতীর সহিত পরামর্শ করিয়া নিজগ্রাম ত্যাগ করিয়া, ভাতিপুর গ্রামে সপরিবারে গেলেন। এই গ্রাম তাঁহার জন্মভূমি হইতে দুই দিবসের পথ দূর। এখানে তাঁহাকে কেহই জানিবার সম্ভাবনা ছিল না, অতএব ভাবিলেন, এখানে উগ্রক্ষত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়া অনায়াসে ইতর লোকের ন্যায় শারীরিক শ্রম দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করিতে পারিবেন। পার্ব্বতীও বলিলেন, তিনি কোন ভদ্র-সংসারে দাসীবৃত্তি করিবেন। এই পরামর্শ করিয়া তথায় ভদ্রাসন-বিক্রয়লব্ধ অর্থে একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া রহিলেন; কিন্তু অপরিচিত বলিয়া রামেশ্বরের অদৃষ্টে দাসত্বও ঘটিল না। যেখানেই যান, সেইখানেই জামিনের প্রস্তাব হয়। অপরিচিতের জামিন কে হইবে? নিজগৃহ বিক্রয়ে যে কয়েকটী টাকা আনিয়াছিলেন, তাহা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। এই অবস্থায় রামেশ্বর একদিন গ্রামের নায়েবের নিকট আপন দৈন্য জানাইয়া একটী পিয়াদাগিরী কর্ম্মের প্রার্থনা করিলেন: নায়েব বলিলেন, "সে কর্ম্ম এক্ষণে খালি নাই, কিন্তু আপাততঃ উপার্জ্জনের এক উপায় আছে। তোমার স্ত্রী আমার অন্দরে গত কল্য আসিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে সে কথা বলিয়াছিলাম; কিন্তু সে তাহা শুনিয়া বড় রাগিয়া উঠিল। তুমিও রাজি হইবে, বোধ হয় না। সে সব কাজ তোমা হইতে হইবে না। অতএব আর তোমাকে বলা বৃথা।"

রামেশ্বর এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "পেটের জ্বালায় আমার অসাধ্য কিছুই নাই। স্ত্রীলোকের মতামত সকল বিষয়েই অগ্রাহ্য; অতএব আমাকে বলুন, আমি তাহা বিবেচনা করিব।"

নায়েব বলিলেন, "তুমি শুনিয়া থাকিবে, প্রায় দুই মাস হইল, এই গ্রামে একটী স্ত্রী-হত্যা হইয়াছিল, কিন্তু কে হত্যা করিয়াছিল, তাহা স্থির করিতে পারা যায় নাই। দারোগা অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, আমিও বিশেষ যত্ন পাইয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। হত্যাকারীর স্থির না হওয়ায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব রুষ্ট হইয়া আমাদিগের অমনোযোগ অনুভব করিয়া জমীদারের দণ্ড করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই গ্রামে আবার একটী চুরি হইয়া গিয়াছে; তাহারও এ পর্য্যন্ত কোন উপায় হয় নাই। দারোগা একটী লোককে সন্দেহ করিয়াছেন, কিন্তু সে পলাইয়াছে। তাহার উদ্দেশ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই, শীঘ্র যে পাওয়া যাইবে, এমত সম্ভাবনা নাই। শীঘ্র একজন অপরাধী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট না পাঠাইলে আবার জমীদারের দণ্ড হইবে,

অথবা হয় ত, তাঁহার জমীদারী যাইবে, অতএব আসামী সাজাইয়া একজনকে পাঠান নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। যে আসামী সাজিবে, তাহার বিশেষ ভয় নাই। সামান্য পানপাত্র চুরি হইয়াছে, ইহার নিমিত্ত ঊর্দ্ধসীমা একমাস কারাবদ্ধ থাকিতে হইবে, অধিক নহে। কর্ম্মান্তরে, বিদেশে গেলে কখন কখন একমাস অধিককাল পরিবার ছাড়িয়া থাকিতে হয়। ইহাও সেইরূপ; অধিকন্তু বিদেশে গিয়া একমাসে যে উপার্জ্জন সম্ভব, তাহার দশগুণ অধিক উপার্জ্জন হইবে। জমীদার বলিয়াছেন যে, যে আসামী হইয়া যাইবে, তাহাকে পঞ্চাশ টাকা নগদ দিবেন। অতএব এই এক লাভের পন্থা আছে। আবার তুমি জেল হইতে অব্যাহতি পাইলেই তোমাকে এই সরকারে উপযুক্ত কর্ম্ম দিব।"

নায়েবের এই প্রস্তাব শুনিয়া রামেশ্বর নিজকৃত পূর্ব্বচুরি মনে করিয়া শিহরিলেন। ভাবিলেন, বুঝি, বিধাতা নিশ্চয়ই কারাগারই আমার কপালে লিখিয়াছেন, নহিলে সেদিন আমি পয়সা চুরি করিতাম না। সে পাপের ফল একদিন আমাকে অবশ্য ভোগ করিতে হইবে—তবে দুদিন অগ্র-পশ্চাতে কি আসিয়া যায়? কেনই আপন ইচ্ছায় জেল খাটিয়া সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিব? আপন ইচ্ছায় এ প্রায়শ্চিত্ত করিলে, দেবতা কি প্রসন্ন হইবেন না? যাহা হউক, উপস্থিত অন্নাভাব-নিবারণের উপায় ইহা অপেক্ষা আর কি কি হইবে?

রামেশ্বর উঠিয়া বলিলেন, "আমি সম্মত, আমায় পঞ্চাশ টাকা অগ্রিম দাও।" নায়েব তৎক্ষণাৎ টাকা দিয়া বলিলেন, "আর একটা কথা আছে। জেলায় যাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট এই চুরি স্বীকার করিতে হইবে, একরার না করিলে আবার আমাকে মিথ্যা প্রমাণ যোজনা করিয়া পাঠাইতে হইবে।"

রামেশ্বর উঠান হইতে মাথা নাড়িয়া নায়েবের কথার উত্তর দিয়া চলিয়া গেলেন, এবং বাটী পৌঁছিয়া পঞ্চাশ টাকা গণিয়া স্ত্রীর হাতে দিলেন। পার্ব্বতী টাকা হস্তে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কোথায় পেলে?" রামেশ্বর সবিস্তারে সকল বলিলেন।

পার্ব্বতী উহা শুনিবামাত্র টাকা দূরে নিক্ষেপ করিয়া স্বামীর পাদমূলে আসিয়া পদদ্বয় ধরিয়া ঊর্দ্ধমুখে সজলনয়নে বলিতে লাগিলেন, "এমন কর্ম্ম কখন করিও না, ছার টাকার জন্য সাধ করিয়া কয়েদী হইও না, আমি ভিক্ষা করিয়া খাওয়াইব; তুমি এমন কর্ম্ম করিও না, এই বিদেশে আমায় রাখিয়া যাইও না, আমার নিমিত্ত না ভাব, ছেলের মুখ-পানে চাও, ছেলের আর কে আছে, ছেলের রোগ হইলে আমি কোথায় যাব, কাহার দ্বারে দাঁড়াইব?" এই বলিতে বলিতে পতিবক্ষে মুখ লুকাইয়া অজস্র অশ্রু-বর্ষণ করিলেন। এই সময়ে শিশু দ্বারের নিকট কর্দ্দম লইয়া খেলা করিতেছিল, মার ক্রন্দনশব্দ তাহার কর্ণে গেল, ব্যস্ত হইয়া কর্দ্দম আপনার অঙ্গে মুছিতে মুছিতে উভয়ের প্রতি চাহিতে লাগিল; শেষে "বাবা টুই মাকে মাল্লি?" এই বলিয়া মার অঙ্গের উপর ঝাঁপ দিয়া শত শত মুখচুম্বন করিল, আর বলিতে লাগিল, "মা, টুমি কেঁডো না, বাবাকে খুব মালুব অকুন।" অমনি পার্ব্বতী সকল ভুলিয়া গেলেন, পুত্রকে কোলে লইয়া বলিলেন, "কৈ, ওরে মার আগে।" শিশু কোল হইতে উঠিয়া "এই মেলেসি" বলিয়া ক্ষুদ্র হাতে বাপের পিঠে মারিল, আবার তখনই গলা ধরিয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিতে লাগিল। পার্ব্বতী শিখাইয়া দিতে লাগিল, "আবার মার।" শিশু তৎক্ষণাৎ "আবার মেলেসি" বলিয়া আবার অমৃতমাখা কর পিতার পৃষ্ঠে ফেলিল। এইরূপ পবিত্র সুখে কিঞ্চিৎকাল অতিবাহিত হইলে রামেশ্বর উঠিয়া টাকাগুলি একত্রিত করিয়া শয্যার উপর রাখিয়া চলিয়া গেলেন; পার্ব্বতী সন্তান লইয়া অন্যমনে রহিলেন।

রামেশ্বর নায়েবের নিকট গিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমাকে চালান দিতে আর বড় বিলম্ব করিবেন না, বিলম্ব হইলে বুঝি আমার

খাওয়ার ব্যাঘাত হইবে। স্ত্রীর কাতরতা আর একবার দেখিতে গেলে আমার বোধাবোধ থাকিবে না, অতএব যাহা হয় করুন, আমি এখনও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আছি।” নায়েব ব্যস্ত হইয়া দারোগাকে সংবাদ পাঠাইলেন। দণ্ডেক কালের মধ্যেই পদাতিকগণ রামেশ্বরকে বেষ্টন করিয়া জেলায় লইয়া চলিল। তিনি আর স্ত্রীপুত্রকে দেখিয়া আসিলেন না।

তখন প্রথম রামেশ্বরের স্মরণ হইল, এ যে জেলে যাইতেছি! জেল! যেখানে ব্রহ্মঘ্ন, নারীঘ্ন, পাপাত্মারা থাকে—যেখানে ডাকাত, রাহাজান, ঠগ, পরস্পর বন্ধু—সেই জেলে! যেখানে মানুষকে গরু করিয়া ঘানিগাছে যোড়ে, সেই জেলে! যেখানে জাতি নাই, ব্রাহ্মণ মুসলমানে এক পংক্তিতে খায়; হাড়ী ডোমে এক শয্যায় শুইতে হয়, সেই জেলে! যেখানে বিচার নাই, তৎপরিবর্ত্তে কেবল বেত্রাঘাত আছে, সেই জেলে! কি অপরাধে? অপরাধ, খাইতে পাই না—অপরাধ স্ত্রীপুত্রের অন্নাভাবে মৃত্যু দেখিতে পারি না—এই অপরাধ।

এমন সময় শূন্যমার্গ বিদীর্ণ করিয়া পুষ্পবিশিষ্ট বৃক্ষ, লতা, শাখা, পত্র, গ্রাম্য প্রদেশ কম্পিত করিয়া তীব্র করুণ মর্ম্মভেদী রোদন ধ্বনি রামেশ্বরের কর্ণে প্রবেশ করিল; পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন যে, পার্ব্বতী প্রায় রুদ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে; কাঁদিয়া বলিতেছে, “একবার দাঁড়াও! তোমায় দেখি।” রামেশ্বর আর সহ্য করিতে পারিলেন না, ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, দৌড়িয়া ব্রাহ্মণীর নিকট আসিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পদাতিকেরা আসিতে দিল না, ধাক্কা মারিয়া লইয়া চলিল। দেখিলেন, কয়েকটী গ্রামবাসী আসিয়া পার্ব্বতীকে ধরিয়া রাখিয়াছে, পার্ব্বতী ধূলায় পড়িয়া চীৎকার করিতেছে আর কেশরাশি ধূলায় ধূসরিত হইতেছে। রামেশ্বর আর দেখিতে পাইলেন না, ক্রমে দূরতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, বায়ুসঙ্গে পত্নীর ক্রন্দনধ্বনি মধ্যে মধ্যে আসিতে লাগিল। তখন তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, যেন সাগর উছলিতেছে, জগৎ কাঁদিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পুলিসের পদাতিকগণ রামেশ্বরকে লইয়া গেলে পর রাত্রে দারোগা আর নায়েব উভয়ে আহারান্তে একত্রে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন; এমত সময় একজন দাসী সংবাদ দিল যে, রামেশ্বরের স্ত্রী কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়াছে, এক্ষণে যন্ত্রণা যে সহ্য করিতে পারিবে, এমন বোধ হইতেছে, সন্তানকে ঘুম পাড়াইয়া আপনি শুইয়াছে, কিন্তু এখনও ধীরে ধীরে কাঁদিতেছে।

নায়েব বলিলেন, “তাহার নিকট অদ্য যাহার থাকিবার কথা ছিল, সে স্ত্রীলোকটী এখনও যায় নাই?” দাসী উত্তর করিল, “সে সেখানে আছে; আমিও এ পর্য্যন্ত ছিলাম, এই মাত্র আসিতেছি।”

দাসী এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলে দারোগা বলিলেন, “যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, আসামী পলাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া থাকিবে, একান্ত না পলাইতে পারে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আর একরার করিবার সম্ভাবনা নাই।” নায়েব জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে এক্ষণে উপায়?” দারোগা বলিলেন যে, “আসামী একান্ত স্বীকার না করে, তবে অন্য প্রমাণ দিতে হইবে। আসামীর ঘর হইতে চুরির মাল বাহির করিতে হইবে; অতএব পূর্ব্বাহ্নে তাহা পুতিয়া রাখিয়া আসিতে হইবে। একটা জলপাত্র এই সময়ে আপনি স্বয়ং যাইয়া উহার স্ত্রীকে সম্মত করিয়া রাখিয়া আসুন।” নায়েব বলিলেন, “অদ্য রাত্র হইয়াছে; কল্য প্রাতে তাহা করা যাইবে।” দারোগা বলিলেন, “তাহা কদাচ হইবে না, প্রাতে অন্য লোক দেখিলে সকল কথা রাষ্ট্র হইয়া যাইবে। অতএব তুমি অবিলম্বে যাও।” নায়েব অগত্যা যাইতে স্বীকার করিলেন।

রামেশ্বরের অদৃষ্টশৃঙ্খল চারিদিক্ হইতে রামেশ্বরকে আঁটিয়া ধরিতেছিল। গভীর রাত্রে রামেশ্বর পদাতিকদিগের নিকট হইতে পলাইলেন। পাছে কেহ জানিতে পারে, এই ভয়ে সঙ্গোপনে আসিয়া গৃহের নিকট এক বৃক্ষপার্শ্বে দাঁড়াইয়া চারিদিক্ দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে পূর্ব্বদিক্ হইতে এক ব্যক্তি আসিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া রামেশ্বর লুকাইয়া থাকিয়া, তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, চিনিলেন যে, সে ব্যক্তি নায়েব। অতএব ভাবিলেন, এই সময়ে নায়েবের নিকট গিয়া তাঁহার পায়ে ধরিয়া টাকা ফিরাইয়া দিই। স্ত্রীর সুখসাধন নিমিত্ত এই কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি,যদি তাহারই কষ্ট হইল, তবে আর টাকায় প্রয়োজন কি? এই ভাবিতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন যে, নায়েব তাঁহার দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। তখনও পার্ব্বতী অতি মৃদুস্বরে কাঁদিতেছিল। প্রতিবাসিগণ বলিল, "ওগো, একটু নিদ্রা যাও, নতুবা পীড়া হইবে।" বলিবামাত্র পার্ব্বতী আরও অধিক কাঁদিয়া উঠিল। নায়েব দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া ক্রন্দনশব্দ শুনিয়া বলিলেন, "মা, একবার দ্বার খুলিয়া দাও। আমি তোমার স্বামীর কোন সংবাদ আনিয়াছি।" যেখানে বৃক্ষান্তরালে লুকাইয়া রামেশ্বর দেখিতেছিলেন, সেখান হইতে এ সকল কথাবার্ত্তা কিছুই শুনা যাইতেছিল না,—পার্ব্বতীর অস্ফুট রোদনশব্দও শুনা যাইতেছিল না। পার্ব্বতী নায়েবের কথা শুনিবামাত্র দ্রুতবেগে দ্বার খুলিয়া দিলেন, ভালমন্দ কিছুই ভাবিলেন না। নায়েব গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "অনেক কথা আছে। প্রথমে উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ কর, নতুবা কে শুনিতে পাইবে।" রামেশ্বর দূর হইতে দেখিলেন যে, নায়েব দ্বারে আসিয়া দ্বার নাড়িতে লাগিল, অস্ফুটস্বরে পার্ব্বতীকে ডাকিয়া কি দুই একটী কথা বলিল; তাহার নিশ্বাস খরতর বহিতে লাগিল; আবার দেখিলেন,অবিলম্বে পার্ব্বতী দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিলেন, নায়েব গৃহে প্রবেশ করিলে আবার দ্বার রুদ্ধ হইল। রামেশ্বর মনে করিলেন, তাঁহার বুঝিতে আর কিছুই বাকী রহিল না। ভাবিলেন, এই নিমিত্ত নায়েব আমাকে কৌশল করিয়া দারোগার হস্তে সমর্পণ করিয়াছে, অতএব ইহার প্রতিফল দিব। এই বলিয়া দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাহাদের কথাবার্ত্তার শব্দ শুনিতে পাইলেন। একবার ভাবিলেন, কি কথা হইতেছে শুনি; অমনি আপনার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া দ্বারে পদাঘাত করিলেন। গৃহাভ্যন্তর নিস্তব্ধ হইল। তখন মর্ম্মযন্ত্রণার একপ্রকার রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "আমি আসিয়াছি, তুমি যাহার জন্য কাঁদিতেছিলে, সেই আমি আসিয়াছি—তোমার উপপতি তোমার ঘরে আছে, এখন আমি চলিলাম।" পার্ব্বতী এই স্বর শুনিল,আহ্লাদে বুঝিতে পারিল না। উন্মত্তা হইয়া বহির্গত হইল, বহির্গত হইয়া প্রেমপূরিত স্বরে ডাকিতে লাগিল। রামেশ্বর বিস্মৃত হইলেন, আর কিছুই না বলিয়া চলিয়া গেলেন। পার্ব্বতী দ্বার খুলিয়া স্বামীকে না দেখিয়া ডাকিতে ডাকিতে উত্তর না পাইয়া, শেষে কাঁদিতে লাগিল।

রামেশ্বর আর কোন উত্তর না দিয়া ভাবিলেন,অন্যকে আর কষ্ট দিব না, আপনি আর কষ্ট পাইব না,এই ঘৃণিত পৃথিবী ত্যাগ করিব। এই সিদ্ধান্ত করিয়া চলিলেন। অপরাহ্ণে যে ক্রন্দনধ্বনি মর্ম্মভেদী বলিয়া বোধ হইয়াছিল, এক্ষণে সেই শব্দ পৈশাচিক বোধ হইতে লাগিল।

রামেশ্বর কিয়দ্দূরে গিয়া দেখিলেন, পদাতিকগণ ফিরিয়া আসিতেছে। তাহাদের সম্মুখে যাইয়া বলিলেন, "আমাকে বন্ধন কর; আমি আসিয়াছি।" রামেশ্বরের মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে ভয় পাইল, বন্ধন করিতে আর কাহারও সাহস হইল না। তিনি বলিলেন,"পরিবার দেখিবার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল, তাহাই গিয়াছিলাম। এখন চল, তোমাদের ভয় নাই। আমি নিজে আসিয়া ধরা দিয়াছি, তাহাই তোমাদের দারোগা আমাকে চালান দিতে পারিয়াছেন, নতুবা তাঁহার সাধ্য হইত না। সে দিবস খুন করিয়াছিলাম, আমি ধরা

দিই নাই বলিয়াই কেহ সন্ধানও পায় নাই।”

ইহা শুনিয়া জমাদ্দার অতি আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিল, “সে খুন কি তুমি করিয়াছিলে?” রামেশ্বর উত্তর করিলেন, “হাঁ! আমি সে খুন করিয়াছি।” জমাদ্দার আবার জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি আদালতে স্বীকার করিতে পারিবে?” রামেশ্বর বলিলেন, “অবশ্য স্বীকার করিব; কাহারে ভয়?”

আর কেহ কোন কথা বলিল না, সকলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

পরদিবস ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে আনীত হইয়া রামেশ্বর দাঁড়াইলেন। ম্যাজিষ্টেট সাহেব তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই কি সেই খুনী মামলার একরারী আসামী?” রামেশ্বর, “হাঁ” বলিয়া সেলাম করিলেন। তখন তাঁহার আন্তরিক যাতনা বড় গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল; কোনরূপে এ দেহ ত্যাগ করিতে পারিলেই ভাল, এই বিবেচনায় হত্যাকারী বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেন। জমাদ্দার আনুষঙ্গিক প্রমাণ যোগাড় করিয়া দিলেন, রামেশ্বর দায়রা-সোপর্দ্দ হইলেন। দায়রার বিচারে তাঁহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম হইল। কিছুদিন পরে নিজামত আদালত দণ্ড কমাইয়া দিলেন। তখন পিনাল কোড ছিল না; বিশ বৎসরের নিমিত্ত রামেশ্বর দ্বীপান্তরে গেলেন।

এদিকে পার্ব্বতী একবার স্বামীর কথার শব্দ শুনিয়া আর উত্তর না পাইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় তাঁহার সন্ধানে বনে বনে ছুটিতে লাগিল। কোথাও স্বামীর সাক্ষাৎ পাইল না; কত কাঁদিল—কেহ তাহাকে শান্ত করিল না। শেষে পদ্মানদীর ধারে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। তখন হঠাৎ মনে পড়িল যে, রামেশ্বর যখন চলিয়া যান, তখন তাঁহার কথায় কি একটী শব্দ ছিল—অতি নিষ্ঠুর, অতি ভয়ঙ্কর, একটী কথা ছিল—পার্ব্বতী তখন আহ্লাদে তাহাতে কাণ দেয় নাই, তখন রামেশ্বরের কথার অর্থ বুঝিতে পারে নাই; এখন সেই কথাটী মনে পড়িল—এখন তাহার অর্থ বুঝিল—এখন বুঝিল, রামেশ্বর কেন পলাইয়াছেন। বুঝিল—তাহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। বুঝিল—এ সংসারে আর স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। তখন তাহার চক্ষে আকাশ, নক্ষত্র, জল সকলই আঁধার হইয়া আসিল। নদীজলের একটী শব্দ হইল; জলে তরঙ্গ উঠিল, ক্রমে মিলাইয়া গেল, শেষ সকল স্তব্ধ হইল। পার্ব্বতী যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেখানে আর নাই—পার্ব্বতী জলমগ্না হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এই ঘোরনাদী সমুদ্রের বজ্রগম্ভীর কল্লোল শুনিতে শুনিতে বিশ বৎসর! এইরূপ বালুকাময় উপকূলারূঢ় নারিকেলবৃক্ষের সঙ্কীর্ণ ছায়ায় কোদালী হাতে, বিশ্রাম করিতে করিতে বিশ বৎসর। এই সাগর-প্রান্তব্যাপী ফেন-বিকীর্ণ ধূমমধ্যে আনন্দদুলালের হাসিভরা মুখের অন্বেষণ করিতে করিতে বিশ বৎসর! স্বেচ্ছা-নির্ব্বাসিত রামেশ্বর মনে করিয়াছিল, ‘মরিব’—মরিতে পারিল না—বিশ বৎসর যন্ত্রণা ভোগ করিতে আসিল। আমরা মনে করি, এই করিব, আর একজন মনে করেন, আমাদিগের কার্য্য দৃষ্ট; তাঁহার কার্য্য অদৃষ্ট!

যখন বিশ্বাসঘাতিনীর কথা মনে করিয়া, রামেশ্বর মরিতে চাহিয়াছিলেন, তখন ত আনন্দদুলালকে মনে পড়ে নাই। এখন দিবারাত্রি এই নির্ব্বাসিতের বাসদ্বীপে আনন্দদুলালের অকৃত্রিম সরল হাসিভরা মুখ, তাহার আধ আধ কথা, তাহার খেলা মনে পড়িতে লাগিল। যখন সমুদ্র শান্ত হইয়া মৃদু মৃদু ডাকে, রামেশ্বর ভাবে, আনন্দদুলাল কথা কহিতেছে। যখন দূরে অস্পষ্ট-লক্ষ্য একটী তরঙ্গ উঁচু হইয়া নাচে, রামেশ্বর মনে করেন যে, আনন্দদুলাল নাচিতেছে। রামেশ্বর মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি বিশ বৎসর বাঁচিবেন না—কিন্তু বিশ বৎসর বাঁচিলেন। কাল

পূর্ণ হইলে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। ভাতিপুরে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার সে কুটীর নাই, তাঁহার সে পত্নী নাই, কই, আনন্দদুলাল ত নাই! কেহ তাহাদের কথা বলিতে পারিল না। রামেশ্বর! রামেশ্বর কে? রামেশ্বরকে কেহ চেনে না।

কয়েক দিন রামেশ্বর সন্তানের নিমিত্ত উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমিলেন। একদা তিনি হাটে যাইবার পথে বসিয়া থাকিলেন; ভাবিলেন, হয় ত তাঁহার সন্তান অদ্য হাট করিতে আসিবে। রামেশ্বর যুবা পথিক মাত্রই সকলকে অতৃপ্তলোচনে দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ একটী স্ত্রীলোককে দেখিয়া রামেশ্বর শিহরিলেন; স্ত্রীলোককে দেখিয়া বোধ হইল বেশ্যা; আকার দেখিয়া, রামেশ্বরের বোধ হইল, সে পার্ব্বতী! রামেশ্বর যখন দ্বীপান্তরে যান, তখন পার্ব্বতীর বয়স বিশ বৎসর, এক্ষণে তাহার বয়স চল্লিশ হওয়ার কথা; ইহার সেই বয়স। যাহাকে বিশ বৎসর বয়সের পর আর দেখি নাই, তাহাকে চল্লিশ বৎসর বয়সে সহজে চেনা যায় না। যে পার্ব্বতীকে রামেশ্বর ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, এ সে পার্ব্বতী নহে বটে, কিন্তু রামেশ্বর মনে বুঝিলেন যে, যে বৈসদৃশ্য দেখা যাইতেছে, তাহা বয়োপরিবর্ত্তনে ঘটিয়াছে। বেশ্যা রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিয়া শুষ্ক বনফুলের মালা গলায় দিয়া তামাক খাইতে খাইতে একজন মুসলমানের সহিত কথা কহিতেছে; দেখিবামাত্র রামেশ্বর তাহার নিকট গিয়া গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার পুত্র কোথায়?" বেশ্যা আকাশমুখী হইয়া হাসিয়া উত্তর করিল, "কে তোর ছেলে?" রামেশ্বর বলিলেন, "আনন্দদুলাল।" নটী বলিল, "মরণ আর কি! তোমার দড়ী কলসী যোটে না?" রামেশ্বর বলিলেন, "শীঘ্র যুটিবে; এক্ষণে বল্, আনন্দদুলালকে কোথায় পাঠাইয়াছিস্?" বেশ্যা উত্তর করিল, "চুলায় পাঠাইয়াছি নদীর ঘাটে তারে পুতিয়া আসিয়াছি —তাহার ওলাউঠা হইয়াছিল—সে গিয়াছে, এক্ষণে তুমিও যাও।" রামেশ্বর আর সহ্য করিতে পারিলেন না; জোরে তাহার বক্ষে পদাঘাত করিয়া গেলেন।

গেলেন কোথায়? কোথায় যাইতেছিলেন, তাহা কিছুই জানিতে পারিলেন না। দ্বীপান্তরে বসিয়া এই পুত্রের মুখ ভাবিতেন। কবে আবার তারে দেখিবেন, বসিয়া বসিয়া কেবল তাহাই ভাবিতেন। এই আশা এ পৃথিবীর একমাত্র গ্রন্থি ছিল। এক্ষণে সে গ্রন্থি ছিন্ন হইল। এক্ষণে আর কোথায় যাইবেন, অথচ গেলেন।

পথে দেখিলেন, আর একজন স্ত্রীলোক একটী ছেলে কোলে করিয়া যাইতেছে। রামেশ্বর হঠাৎ তাহাকে এক চপেটাঘাত করিয়া তাহার ক্রোড় হইতে ছেলে কাড়িয়া নামাইয়া দিলেন। স্ত্রীলোক উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। রামেশ্বর বলিলেন, "তোরা রাক্ষসীর জাত! ছেলে মারিয়া ফেলিবি—ছেলে ছেড়ে দে।"

রামেশ্বর সমস্ত দিন পথে পথে বনে বনে কাঁদিয়া বেড়াইলেন। রাত্রে বড় ক্ষুধার্ত্ত হইলেন। সম্মুখে এক দোকান দেখিলেন। দোকানী ঝাঁপ ফেলিয়া শুইয়া আছে। রামেশ্বর ঝাঁপ ভাঙ্গিয়া, প্রবেশ পূর্ব্বক সম্মুখে যাহা পাইলেন, খাইতে আরম্ভ করিলেন। দোকানী উঠিয়া গালি দিতে আরম্ভ করিলেন। রামেশ্বর দোকানীর গলদেশে হস্ত দিয়া দোকানের বাহির করিয়া দিলেন।

দোকানী ফাঁড়ি হইতে বরকন্দাজ ডাকিয়া আনিল; রামেশ্বর বরকন্দাজের লাঠি কাড়িয়া তাহার মাথায় মারিল। বরকন্দাজের মাথা ফাটিয়া গেল।

শীঘ্র রটিল, একজন প্রসিদ্ধ দায়মালী, পিলোবিনাং হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেশ লুঠ করিতেছে, যাকে পাইতেছে, তাকে মারিতেছে। পুলিস শশব্যস্ত হইল; ম্যাজিষ্ট্রেট রামেশ্বরের গ্রেপ্তারীর জন্য দুই শত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়া দিলেন। রামেশ্বর দিনকত লুঠিয়া খাইয়া মানুষ ঠেঙ্গাইয়া লুকাইয়া দিনযাপন করিতে লাগিলেন। সকলে বন্য পশুর ন্যায় তাঁহাকে তাড়া করিয়া

বেড়াইতে লাগিল। যত বদ্‌মাস ডাকাইত, তাঁহার প্রতাপ শুনিয়া তাঁহার চারিপাশে জমিল। তখন রামেশ্বর ডাকাতের সর্দ্দার হইয়া, মনুষ্য-জাতির উপর ভয়ঙ্কর দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ; কেহ তাঁহাকে ধরিতে পারিল না ; কিন্তু একবার প্রায় ধরা পড়িয়াছিলেন। তিনি সদলে, বহু দূরে, এক ডাকাতী করিতে গিয়াছিলেন, গৃহরক্ষকেরা সতর্ক এবং বলবান্ ; রামেশ্বর গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্গিগণ তাঁহাকে বহিয়া আনিয়া গ্রামান্তরে এক জঙ্গলে ফেলিয়া গেল।

সেই গ্রামের লোক পরদিন প্রাতে সভয়ে দেখিল যে, একজন মৃতপ্রায়, আহত ব্যক্তি বনে পড়িয়া আছে। তাহারা পুলিসে সংবাদ দিতে যাইতেছিল। এমত সময়ে সেই দিন একজন ডাক্তার কোন ধনী ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য নিকটস্থ নগর হইতে সেই গ্রামে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "এ মুমূর্ষু। আমি আগে ইহাকে চিকিৎসা করিয়া বাঁচাই ; এক্ষণে ইহাকে পুলিসে লইয়া গেলে ইহার মৃত্যু হইবে। তোমরা পশ্চাৎ পুলিসে সংবাদ দিও।" লোকে ডাক্তারের কথা শুনিল, পুলিসে তখন সংবাদ দিল না। ডাক্তার তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া তাহার জীবনদান করিলেন। রামেশ্বরের উত্থানশক্তি হইবামাত্র তিনি ডাক্তারের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া পুলিসের হাত এড়াইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রামু সর্দ্দারের ভয়ে দেশ কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু আনন্দদুলালের শোক রামু ভুলিল না। শেষোক্ত ঘটনার চারি বৎসর পরে একদিন রামু বা রামেশ্বর দলবল সঙ্গে এক ডাকাইতীতে যাইতেছিল। রাত্রি প্রায় দুই প্রহর। প্রান্তরের বৃক্ষাগ্রে, নদীজলে চন্দ্রকিরণ কাঁপিতেছে। একখানি পাল্কী ধীরে ধীরে নদীর ধার দিয়া যাইতেছে। পাল্কীর মধ্যে বাবু শয়ন করিয়া আছেন। পাল্কীতে শয়ন করিয়া বাবু অন্যমনে নানা বিষয় ভাবিতেছিলেন। গৃহিণী, কন্যা, ইটের পাঁজা, নূতন বাগান নূতন বাগানের কেবলা মালীর দোরিঙ্গা দাড়ী, তাঁহার মালীর খাঁদা নাক, বাবুর চিন্তার ভাগী হ'ল। বাবু এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমত সময় হঠাৎ পাল্কী দুলিয়া উঠিল, দুই একপদ হটিল, শেষ ভূমিতে নামিল। বাবু পাল্কী হইতে মুখ বাহির করিলেন ; শিহরিয়া উঠিলেন—দেখিলেন, প্রায় পঁচিশ ত্রিশটী তরবারিফলকে চন্দ্রকিরণ জ্বলিতেছে এবং যাহাদের হস্তে সেই তরবারি ছিল, তাহারা গম্ভীর-পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে। বাবু তখন সকল বুঝিলেন। দস্যুরা পাল্কীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলে একজন হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক চুল ধরিয়া বাবুকে বাহির করিল। আর একজন আকর্ণ হস্ত তুলিয়া সড়কী সন্ধান পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিতেছিল, এমত সময় রামেশ্বর সেই সড়কীর ফলক ধরিয়া বাবুর প্রাণরক্ষা করিল এবং সকলকে বলিল, "তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি একবার বিশেষ করিয়া দেখি, এই ব্যক্তিকে বুঝি কোথায় দেখিয়াছি।" যে সড়কী নিক্ষেপ করিতেছিল, সে ক্রুদ্ধভাবে উত্তর করিল, "তুমি সকলকে দেখিয়াছ! সকলেই তোমার আত্মীয় কুটুম্ব, তুমি একটু সরিয়া দাঁড়াও, আমরা বাবুর পরিচয় লই।" রামেশ্বর তখন দর্পে তরবারি ঘুরাইয়া বলিলেন, "যা সকল তফাৎ যা, নহিলে কে পারিস হাতিয়ার লইয়া এগো।" এই কথা শুনিয়া সকলে সরিয়া দাড়াইল। তখন রামেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবু, আপনি কি ডাক্তার?" বাবু বলিয়া উঠিলেন, "আমি ডাক্তার, আমায় বাঁচাও, আমি চিরকাল তোমার ক্রীতদাস হইয়া থাকিব।" রামেশ্বর বলিল, "কোন ভয় নাই, আমিই আপনার ক্রীতদাস।" এই বলিয়া অন্য দস্যুদিগকে ডাকিয়া কি বলিল ; তাহার অমত দেখিয়া শেষ যে উদ্দেশে তাহারা যেখানে যাইতেছিল, সেই দিকে চলিয়া গেল।

তখন ডাক্তারবাবু দস্যুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপে তুমি আমাকে চিনিলে আর কেনই বা আমাকে রক্ষা করিলে, ইহার সবিশেষ জানিতে আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে।"

দস্যু বলিল, "কয়েক বৎসর হইল, আমি জখম হইয়া এক জঙ্গলে পড়িয়াছিলাম— আপনি আমাকে তুলিয়া লইয়া গিয়া প্রাণদান করিয়াছিলেন, গ্রাম্য লোকের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, পুলিসে দেন নাই। আমি আপনার নিকট চিরকাল বিকাইয়া আছি। চলুন, আমি আপনাকে ঘাঁটি পার করিয়া আখিয়া আসি।"

ডাক্তার বাবু দস্যুর এরূপ কৃতজ্ঞতা দেখিয়া বলিলেন, "তুমি স্বভাবতঃ মহাত্মা— কেন এ দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ?"

রামেশ্বর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন দেখিয়া, ডাক্তারবাবু বুঝিলেন, এ ব্যক্তি গুরুতর মনোদুঃখ পাইয়া দস্যু হইয়াছে—চেষ্টা করিলে ইহাকে কুপথ পরিত্যাগ করান যায়। মনে ভাবিলেন, এ আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছে— ইহার উদ্ধারের উপায় করা আমার কর্ত্তব্য। তখন ডাক্তারবাবু রামেশ্বরকে বলিলেন, "তুমি কে? কেন তোমার এ দস্যুবৃত্তি ঘটিয়াছে? তোমার বৃত্তান্ত জানিতে বড় কৌতূহল হইতেছে। যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে, তবে আমাকে পরিচয় দিয়া পরিতৃপ্ত কর। তুমি আমার জীবন রক্ষা করিলে, আমার দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।" দস্যু বলিল, "আপনিও একবার আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, অতএব আপনার দ্বারা যদি এক্ষণে সেই জীবনের কোন বিঘ্ন হয়, তাহাতেও আমার আক্ষেপ নাই।" এই বলিয়া পূর্ব্বপরিচয় দিতে আরম্ভ করিল। শেষ চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, "যদি আমার সন্তান জীবিত থাকিত! যদি তাহাকে আর দেখিতে পাইতাম!" এই বলিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। আবার তাহার চক্ষু দিয়া অজস্র জলধারা পড়িতে লাগিল। ডাক্তারও তাহার সঙ্গে কাঁদিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চক্ষুর জল মুছিয়া ডাক্তারবাবু বলিতে লাগিলেন, "আমি সেই ভাতিগ্রাম চিনি। সেখানে আমি চিকিৎসা করিতে গিয়া কিছুদিন ছিলাম। আপনার পূর্ব্ববৃত্তান্ত সবিশেষ আমি সেখানকার নায়েব ও অন্যান্য লোকের মুখে শুনিয়াছি। আপনার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ! সেই জন্য আপনি ভয়ঙ্কর ভ্রমে পতিত হইয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া দ্বীপান্তর গিয়াছিলে।"

রামেশ্বর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি?" ডাক্তার বলিলেন, "আপনি হাটের পথে যে বেশ্যাকে পার্ব্বতী মনে করিয়াছিলেন, সে পার্ব্বতী নহে।"

রামেশ্বর বলিল, "না হউক্—সমান কথা। সে পাপিষ্ঠাও কোথায় বেশ্যাবেশে কাল কাটাইতেছে।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে না, তিনি আপনার শোকে পদ্মার জলে ঝাঁপ দিয়াছিলেন।" রামেশ্বর এ কথায় অশ্রদ্ধা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

যে প্রকারে হউক, ডাক্তার-বাবু প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন। নায়েব ও দারোগার পরামর্শ হইতে পার্ব্বতীর পদ্মায় নিমজ্জন পর্য্যন্ত প্রকৃত কথা রামেশ্বরের নিকট সবিস্তারে বলিলেন। শুনিয়া রামেশ্বর আপন যজ্ঞোপবীত বাহির করিয়া ডাক্তার-বাবুর হাতে জড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "আমাকে প্রতারণা করিও না—শপথ করিয়া বল, এ কথা কি সত্য? মিথ্যা বল, তবে ব্রহ্মহত্যার পাপী হইবে—এ সকল কথা কি সত্য?"

ডাক্তার বলিলেন, "এ সকল কথা সত্য। তখন রামেশ্বর ধীরে ধীরে সেই চন্দ্রকরোজ্জ্বল কোমল পুষ্পশোভিত তীরভূমিতে উপবেশন করিলেন; দুই করে মুখমণ্ডল আবৃত করিলেন। ক্রমে তাঁহার দেহ কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল—ক্ষণকাল পরে রামেশ্বর, ভূমিতে লুটাইয়া "পার্ব্বতী পার্ব্বতী" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অসহ যন্ত্রণা দেখিয়াই ডাক্তারবাবু তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া, হাত ধরিয়া উঠাইলেন; বলিলেন, "আপনি কাঁদিবেন না। এই দুঃখের সময়ে

"আপনাকে আমি একটী সুসংবাদ দিব, আপনার পুত্র মরে নাই।"

রামেশ্বর বিদ্যুদ্বৎ বেগে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার দুলাল জীবিত আছে? শীঘ্র বল, সে আমার কোথায়?"

"আপনার পুত্র আপনার পাদমূলে।" এই বলিয়া ডাক্তারবাবু রামেশ্বরের পদতলে পড়িয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন, রামেশ্বর প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিল না; ক্রমে বুঝিল। দুই হস্তে সন্তানের মুখ তুলিয়া দেখিতে লাগিল; চক্ষের জলে কিছুই দেখিতে পাইল না; তখন সন্তানের মস্তক বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "সত্যই বটে এই আমার আনন্দদুলাল।" ক্ষণেক বিলম্বে পিতার বক্ষ হইতে মাথা তুলিয়া সন্তান বলিলেন, "আপনি এই পাল্কীতে চড়িয়া আমার গৃহে চলুন। কি প্রকারে আমি প্রতিপালিত হইলাম এবং লেখাপড়া শিখিলাম তাহার বিস্তারিত পরিচয় দিব।"

রামেশ্বর বুঝিলেন, তিনি এক্ষণে পুত্রের সঙ্গে গেলে পুত্রকে পদব্রজে যাইতে হইবে। অতএব বলিলেন, "তুমি আগে চল। আমাকে তোমার বাড়ীর ঠিকানা বলিয়া দিয়া যাও, আমি কাল প্রাতে পৌঁছিব।" আনন্দদুলাল বিশেষ অনুরোধ করাতেও রামেশ্বর শুনিলেন না, সুতরাং পুত্র অগ্রসর হইলেন। রামেশ্বর সেই নদীতটে বসিয়া সাধ্বী পার্ব্বতীর জন্য রোদন করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রাতে রামেশ্বর পুত্রের ভবনে উপস্থিত হইয়া পুত্রকে পুনরপি আলিঙ্গন করিলেন। সেই সময়ে অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবৃতা এক স্ত্রীলোক আসিয়া রামেশ্বরের পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। কণ্ঠস্বর শুনিয়াই রামেশ্বর চমকিল—এ কার গলা! দুই হস্তে তাহাকে তুলিয়া নিরীক্ষণ করিয়া চিনিল, ভূপতিতা পার্ব্বতী!

তখন রামেশ্বর পুত্রের মুখের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "সে কি! তুমি আমাকে বলিয়াছিলে, তোমার মাতা পদ্মায় ডুবিয়াছিলেন।"

আনন্দদুলাল বলিলেন, "আমি সত্যই বলিয়াছি। মা পদ্মায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন, কিন্তু মরেন নাই—জালিয়ারা তুলিয়াছিল। সে সকল কথা পশ্চাৎ শুনিবে।"

তখন তিনজনে একত্রে আহ্লাদে রোদন করিতে করিতে পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া পরস্পরকে শুনাইতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ

দামিনী।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

দামিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বহুকাল হইল একদিন সন্ধ্যার সময় সপ্ত-বৎসর-বয়স্কা একটি বালিকা ভাগীরথীতীরে দাঁড়াইয়া, অনিমেষ লোচনে স্রোতস্তাড়িত দীপমালা দেখিতে দেখিতে পশ্চাদ্বর্ত্তিনী এক বৃদ্ধাকে বলিল, "আয়ি, আমার দীপ ভাসিয়া গেল।" আয়ী উত্তর করিলেন, "তা যাক, এখন তুমি ঘরে চল, অন্ধকার হইল।" "আর একটু দেখি" বলিয়া বালিকা দাঁড়াইয়া রহিল।

বালিকাটির নাম দামিনী। বৃদ্ধা মাতামহী ব্যতীত দামিনীর আর কেহই ছিল না; সেই মাতামহীর সঙ্গে আসিয়া দামিনী এই প্রথমে দীপ ভাসাইল; দীপ ভাসিয়া গেল। অন্য বালিকার ন্যায় দামিনী হাসিল না, অন্য বালিকার ন্যায় "ঐ আমার দীপ যাইতেছে" বলিয়া আহ্লাদে সঙ্গিনীকে দেখাইল না; কেবল গম্ভীরভাবে একদৃষ্টিতে সেই দীপের প্রতি চাহিয়া রহিল।

সেই অকূল নদীতে দামিনীর দীপ একা ভাসিয়া চলিল। দামিনীর দীপ দামিনী আপনি ভাসাইয়াছে, এক্ষণে আর উপায় নাই, অতএব কাতর অন্তরে দামিনী বলিতে লাগিল, "হে ঠাকুর! আমার দীপকে রক্ষা কর।"

অন্ধকার ক্রমে ঘনীভূত হইতে লাগিল দেখিয়া, মাতামহী দামিনীকে গৃহে লইয়া চলিলেন। দামিনী গম্ভীরভাবে কেবল দীপের গতি ভাবিতে ভাবিতে গৃহে গেল। প্রাঙ্গণ-পার্শ্বে একটি কলসে জল ছিল; দামিনী সেই জলে আপন ক্ষুদ্র পদদ্বয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গুলি দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া শয়নঘরে প্রবেশ করিল। শয়নমাত্রেই নিদ্রা আসিল। নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, যেন মেঘ অন্ধকারে ভারী হইয়া নদীর উপর নামিয়া পড়িয়াছে। ঐ মেঘ দেখিয়া দামিনীর দীপ যেন ভয়ে অল্প অল্প জ্বলিতে জ্বলিতে পলাইতেছিল, এমত সময়ে পতনোন্মুখ ভয়ানক ভয়ানক তরঙ্গ আসিয়া তাহার চারিদিকে ঘেরিল। ঐ তরঙ্গের মধ্যে একটির চূড়ার উপর গম্ভীরভাবে একটি বিড়াল বসিয়া আছে। দামিনী চিনিল যে, সেইটি তাহাদের পাড়ার দুরন্ত বিড়াল; সেটি তাহাকে দেখিলেই নখাঘাত করিতে আসিত। দামিনী ঐ বিড়ালটা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে কেবল চক্ষু মুদিয়া চীৎকার করিত, কখনও পলাইতে পারিত না। এক্ষণে তরঙ্গচূড়ায় সেই বিড়ালকে দেখিয়া দামিনী ভয়ে মাতামহীর অঞ্চল ধরিয়া চক্ষু মুদিল। বৃদ্ধা যেন ক্রুদ্ধা হইয়া আপন অঞ্চল ছাড়াইয়া লইয়া দামিনীর ক্ষুদ্র দেহ সেই অগাধ জলে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন। দামিনী চীৎকার করিয়া উঠিল। মাতামহী "ভয় কি" বলিয়া নিদ্রিতা দামিনীকে ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন। দামিনী নিদ্রাভঙ্গে "আমার মা কোথায়" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। অভাগিনীর মা ছিল না; তিন বৎসর পূর্ব্বে তাহার মাতা নিরুদ্দেশ হইয়াছিল।

পরদিবস প্রাতে দ্বাদশবর্ষীয় একটি বালক পাঠশালায় যাইতেছিল; দামিনীর গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া পক্ষিশাবকের নিমিত্ত পতঙ্গ সংগ্রহ হইয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করিল। দামিনী একা বসিয়াছিল, বালকের প্রশ্নে কেবল মাথা

নাড়িয়া উত্তর দিল। বালক অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জ্বর হইয়াছে কি?" দামিনী আবার মাথা নাড়িল। বালক বলিল, "আয়ীর উপর রাগ করিয়াছ?" দামিনী কোন উত্তর দিল না। বালক বস্ত্রান্ত হইতে কতকগুলি পতঙ্গ দামিনীর নিকট রাখিয়া চলিয়া গেল।

বালকটির নাম রমেশ। দামিনীর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ ছিল না, প্রতিবাসী বলিয়া দামিনা তাহাকে রমেশ দাদা বলিয়া ডাকিত। দামিনী রমেশের বড় অনুগত ছিল। যে বিড়ালটিকে দামিনী বড় ভয় করিত, রমেশ তাহাকে দেখিলেই মারিত। স্নানের সময় রমেশ স্রোতে সন্তরণ করিয়া দামিনীর নিমিত্ত পুষ্প ধরিয়া আনিত; দামিনী তাহা লইয়া হাসিতে হাসিতে কেশে পরিত; পরা হইলে মাথা নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিত, "রমেশ দাদা, দেখ, হয়েছে?" রমেশ প্রায় ভাল বলিত, আবার মধ্যে মধ্যে মনোনীত না হইলে আপনি পরাইয়া দিত। রমেশ জানিত যে, গ্রামের সকল বালিকার অপেক্ষা দামিনী শান্ত আর দুঃখিনী। আর দামিনী ভাবিত যে, গ্রামের সকল বালক অপেক্ষা রমেশ দাদা তাহার আপনার জন। আর কেহ ত তাহার জন্য ফুল কুড়ায় না, পতঙ্গ ধরে না, বিড়াল মারে না। এই জন্য রমেশ দাদাকে দেখিলেই দামিনী দৌড়িয়া নিকটে যাইয়া দাঁড়াইত; হাসিমুখে সকল কথার উত্তর দিত। কিন্তু এই দিন রমেশকে দেখিয়া আর পূর্ব্বানুরূপ আহ্লাদ প্রকাশ করিল না। দামিনী শৈশব-গম্ভীর হইয়াছে।

দামিনী শৈশবে এত গম্ভীর-প্রকৃতি কেন? যে সুখী, সেই চঞ্চল, যে দুঃখী, সেই শান্ত, সেই ধীর, সেই গম্ভীর। এক দারুণ দুঃখে দামিনী এই শৈশবে কাতর। দামিনীর মা কোথায়? তাহার মা কি মরিয়াছেন? তা হইলে লোকে বলে না কেন? পাড়ায় সকল ছেলে মার কোলে শোয়, মার হাতে খায়, মার কথা শোনে, মার মুখপানে চায়, মার সঙ্গে গল্প করে, মার সঙ্গে কোন্দল করে, মার কাছে দৌরাত্ম্য করে, দামিনীর কপালে এই সকল হলো না কেন? আয়ী আছে—আয়ী বেশ—মার মত ভালবাসে—তবু মা! মার আদর কেমন! তিন বৎসর বয়সে দামিনী মা হারাইয়াছিল, দামিনীর মাকে একটু একটু মনে পড়িত।—একটু একটু—কেবল ছায়াটি—কেবল একখানি শরীর আর একখানি মুখ—তাতে আহ্লাদ আর হাসি—যেমন যে বাল্যকালে দুর্গোৎসব দেখিয়াছে—আর কখন দেখে নাই—তাহার যেমন প্রৌঢ়াবস্থায় সেই দুর্গাপ্রতিমা মনে পড়ে, দামিনীর তেমনি মাকে মনে পড়িত। দামিনী কত সময়ে মনে মনে মাকে গড়িত—বসনে, অলঙ্কারে, মনে মনে সাজাইত,—তাহার উপর হাসিতে, আদরে প্রতিমার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া সাজাইত—সাজাইয়া মনে মনে মা! মা! মা! বলিয়া ডাকিত।

আজি মার কথা ভাবিতে ভাবিতে, মার কথা, দীপের কথা, স্বপ্নের কথা, রমেশের কথা সব কেমন মিশাইয়া মনের ভিতর গোলমাল হইল। দামিনী ভাবিল, মরিত বেশ হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দশ বৎসর পরে আর একদিবস অপরাহ্নে একটি ক্ষুদ্র শয়নগৃহে দামিনী একা শয্যারচনা করিতেছিলেন। পশ্চিমদিকের ক্ষুদ্র বাতায়ন দিয়া সূর্য্যকিরণ শয্যায় পড়িয়া দামিনীর মুখকমলে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। তাঁহার নাসাগ্রে এবং কপালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর্ম্মবিন্দু ক্ষুদ্র মুক্তারাজির ন্যায় শোভা পাইতেছিল। দামিনী একখানি সিক্ত গাত্রমার্জ্জনী লইয়া গাত্রমার্জ্জন আরম্ভ করিলেন।

দামিনী আর ক্ষুদ্র বালিকা নাই; এক্ষণে সপ্তদশবর্ষীয়া যুবতী। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ এক্ষণে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে; শরীরে গুরুত্বানুরূপ আবার অঙ্গচালনার গাম্ভীর্য্য জন্মিয়াছে। দামিনী স্বভাবতঃ গৌরাঙ্গী, এক্ষণে সেই বর্ণ অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল হইয়াছে।

গাত্রমার্জ্জন সমাধা করিয়া দামিনী একখানি দর্পণ তুলিতেছিলেন, এমত সময় প্রাঙ্গণ হইতে একটী স্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। দামিনী অমনি চঞ্চল হইয়া দর্পণ ফেলিয়া দ্বারে যাইয়া দাড়াইলেন। বালিকা-বয়সে দামিনী যাঁহারে রমেশ দাদা বলিতেন, তিনি প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আপনার বিমাতার সহিত কথা কহিতেছেন। তাঁহার প্রতি সস্নেহ-লোচনে দামিনী চাহিয়া রহিলেন।

রমেশ দামিনীর স্বামী; দামিনীর সর্ব্বস্ব! কথা সমাধা হইলে রমেশ আপন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। শয্যায় দুই একটী পুষ্প পড়িয়া আছে দেখিয়া, দামিনীকে বলিলেন, "কোন্ চোরে আমার নামাবলী থেকে ফুল চুরি করেছে রে?"

দামিনী বলিল, "খুব করেছে. উনি ফুল এনে নামাবলীতে বেঁধে রাখতে পারেন, আর লোকে চুরি করতে পারে না? খুব করেছে—চুরি করেছে।"

রমেশ বলিলেন, "খুব করেছে বই কি? চোরকে এবার ধরিতে পারিলে বুঝিতে পারি।"

চোর আসিয়া ধরা দিল।

রমেশ দুই হস্তে দামিনীর দুই গাল ধরিলেন; দুই করে দামিনীর দুই কর্ণ আবরণ করিয়া মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন। দামিনী রমেশের দুই বাহু ধরিয়া ঊর্দ্ধমুখে রমেশকে দেখিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "আমার সর্ব্বস্ব!" দামিনীর চক্ষু অমনি জলে পূরিয়া আসিল; দামিনী কাঁদিয়া উঠিলেন।

রমেশ দামিনীকে ছাড়িয়া দিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন, "তুমি কি নিত্য কাঁদিবে?" দামিনী চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "তুমি নিত্য আদর কর কেন?"

এই সময়ে দ্বারের পার্শ্বে ঘন ঘন নিশ্বাসের শব্দ হইয়া উঠিল। যেন আর একজন কেহ কাঁদিল। দামিনী ও রমেশ উভয়ে ব্যস্ত হইয়া সেইদিকে দেখিতে গেলেন। দেখিলেন, একজন অপরিচিতা অর্দ্ধবয়স্কা স্ত্রীলোক অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে চলিয়া যাইতেছে। দামিনী তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন; বহির্দ্বার পর্য্যন্ত দামিনী গেলে স্ত্রীলোকটী ফিরিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ তাহাকে উন্মাদিনী বলিয়া বোধ হইল। দেখিয়া দামিনীর যেন কি মনে পড়িল। কিন্তু কি মনে পড়িল, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। উন্মাদিনী হঠাৎ দামিনীর গলা ধরিয়া তাহার বক্ষে মাথা দিয়া মা! মা! বলিয়া কাঁদিতে লাগিল—কত কি বলিল—কত আশীর্ব্বাদ করিল—দামিনী কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না,—কিন্তু তিনিও কাঁদিতে লাগিলেন।—কান্না দেখিলে কান্না পায় বলিয়া, কি কেন—তাহা জানি না। দামিনী ধীরে ধীরে উন্মাদিনীর আলিঙ্গন হইতে আপনাকে বিমুক্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ গা, তুমি কে গা?"

উন্মাদিনী কিছু বলিল না, "মা মা." বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। দামিনী বলিলেন, কাঁদিতেছ কেন?"

উন্মাদিনী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মা আছে?"

দামিনী কাঁদো কাঁদো হইয়া বলিলেন, "বিধাতা জানেন," বলিয়াই কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

পাগলী বলিল, "দেখ, তোমার মার নামেই তুমি কাঁদিতেছ—আমি আজি আমার মা পাইয়াছি—আমি কাঁদিব না?"

একটি কথা সহসা বিদ্যুতের মত দামিনীর মনের ভিতর চমকিল—"এই আমার মা নয় ত?"

হাঁ, সেই ত মা। দামিনীর মা। স্বামীর শোকে পাগল হইয়া পলাইয়াছিল। কোথায় গিয়াছিল, কোথায় ছিল, তাহা কে জানে? দিনকত ভৈরবী হইয়া ত্রিশূল ধরিয়া বেড়াইয়াছিল। আবার বহুকাল পরে সংসার মনে পড়িল—দামিনীকে দেখিতে আসিল—লুকাইয়া দামিনীকে দেখিতেছিল। দামিনীর মনে হঠাৎ উদয় হইল—"এই আমার মা নয় ত?"

এমন সময় পশ্চাৎ হইতে রমেশের বিমাতা ডাকিলেন। দামিনী চমকিয়া ফিরিলেন, পাগলী দাঁড়াইয়াছিল, সেদিকে আবার দেখিলেন, পাগলী চলিয়া গিয়াছে। একবার ভাবিলেন, তাহার অনুসরণ করি; দুই এক পদ অগ্রসর হইলেন। আবার কি ভাবিয়া ফিরিয়া আসিলেন। রমেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্ত্রীলোকটি কে?" দামিনী অন্যমনে মৃদুভাবে ভাবিতে ভাবিতে উত্তর করিলেন, "পাগল!"

রমেশ আর কোন কথা না বলিয়া বহির্ব্বাটীতে গেলেন। দামিনী শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া বালিশে মুখ লুকাইয়া নিঃশব্দে কাঁদিলেন, দুই একবার অস্ফুটস্বরে মা বলিয়া ডাকিলেন। শৈশবে মা হারাইয়াছেন, সেই অবধি মা বলিয়া ডাকেন নাই। এক্ষণে পাগলের কোলে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে বড় সাধ হইল। দামিনী বালিশে মুখ লুকাইয়া কত কাঁদিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যে গ্রামে রমেশ বাস করিতেন, তাহার দক্ষিণপ্রান্তে ভাগীরথীর তীরে একটি ভগ্ন অট্টালিকা ছিল। প্রবাদ আছে, পূর্ব্বকালে এক রাজা আপন মাতার গঙ্গাবাসের নিমিত্ত ঐ অট্টালিকা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, কিন্তু কোন দৈব ঘটনায় ঐ অট্টালিকায় একটী স্ত্রীহত্যা হওয়ায় রাজার মাতা উহা পরিত্যাগ করেন। সেই পর্য্যন্ত কেহ তথায় বাস করে নাই। অট্টালিকার ক্রমে ভৌতিক অপবাদ জন্মিল। শেষে দিবাভাগেও কেহ এ অট্টালিকার নিকট দিয়া গতিবিধি করিতে সাহস করিত না।

পাগলী দেখিল যে, এই ভয়ানক ভগ্ন অট্টালিকা তাহার বাসোপযোগী। অতএব গোপনে তথায় বাস করিতে লাগিল। দামিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পাগলের অনেক মতিস্থির হইয়াছিল; তথাপি মধ্যে মধ্যে দামিনীকে চুরি করিয়া এই গোপনীয় স্থানে আনিয়া একা দেখিবে, এই মনে মনে স্থির করিত। আবার পরক্ষণেই ইহার অকর্ত্তব্যতা বুঝিতে পারিত। পাছে চাঞ্চল্য প্রযুক্ত আত্মপরিচয় দিয়া জামাতার কলঙ্ক রটায়, এই ভয়ে আর দামিনীর বাটীতে যাইত না। একা ভগ্ন অট্টালিকায় বসিয়া আপনা আপনি উদ্দেশে দামিনীকে আদর করিত, দামিনীকে কিরূপে রমেশ আদর করিতেছিল, আবার তাহাই ভাবিত।

একদিবস রাত্রি দুই প্রহরের সময় পাগল স্নিগ্ধ গঙ্গাজলে অবগাহন করিয়া ভগ্ন অট্টালিকার ছাদের উপর বসিয়া অন্ধকারে কেশ শুকাইতেছিল। কেশরাশি নানাদিকে নানা ভঙ্গীতে তুলিতেছিল, ফেলিতেছিল। এমন সময়ে পূর্ব্বদিকের অশ্বত্থরক্ষমূলে হঠাৎ এক অশ্বের চীৎকার শুনিতে পাইল। দক্ষিণকরে কেশগুচ্ছ ধরিয়া অতি তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে বৃক্ষমূল প্রতি চাহিয়া রহিল। দেখিল, ক্রমে দুই একটী মসাল জ্বালিত হইল, এবং তদালোকে কতকগুলি অস্ত্রধারী সৈনিক আর এক অশ্বারোহী পুরুষ দৃষ্ট হইল। পাগলী প্রথমে ভাবিল, ইহারা ডাকাইত; পাছে, ইহারা আমার দামিনীর ঘরে ডাকাতি করে, এই আশঙ্কায় দ্রুতবেগে ছাদের উপর হইতে অবতরণ করিয়া ডাকাতদিগের নিকটে যাইতে ইচ্ছা করিল। ফিরিয়া ঝটিতি গৃহে আসিয়া ভৈরবীবেশ ধারণ করিয়া, করাল ত্রিশূল হস্তে লইয়া সদর্পে চলিল। কথঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হইয়া একখানি পাল্কী দেখিয়া ভাবিল, ইহারা ডাকাত নহে, ডাকাতের সঙ্গে পাল্কী থাকে না। ইহারা বরযাত্রী হইবে। পাগলী তাহাদের সঙ্গে চলিল। দামিনীর বিবাহ সে দেখিতে পায় নাই, অতএব বিবাহ দেখিব মনে করিয়া পরম আহ্লাদ পূর্ব্বক পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। অন্ধকারে তাহাকে কেহই প্রথমে দেখিতে পায় নাই, শেষ কতদুর গেলে একজন শিবিকাবাহক তাহাকে দেখিয়া রুষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কে রে,

তুই এমত সময় আমাদের সঙ্গে যাইতেছিস্?" পাগলী উত্তর করিল, "আমি তোমাদের সঙ্গে বিবাহ দেখিতে যাইতেছি, তোমাদের সঙ্গে বাদ্যকর নাই কেন?"

বাহক উত্তর করিল, "এ বড় ভয়ানক বিবাহ, এ বিবাহে বাদ্য থাকে না।" পাগলী এ কথায় মনোনিবেশ না করিয়া আপন ইচ্ছানুরূপ জিজ্ঞাসা করিল, "কাহার বাড়ীর বর, কাহার বাড়ীর কনে?" বাহক কহিল, হিন্দুর কনে, মুসলমানের বর।" পাগলী উত্তর করিল, "মিছে কথা।" বাহক দেখিল যে, স্ত্রীলোকটী পাগল, অতএব তাহার সঙ্গে রঙ্গ করিতে লাগিল। "কে বর?" এই কথা উন্মাদিনী পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করায় বাহক অশ্বারোহীকে দেখাইয়া দিল। উন্মাদিনী দেখিল, অসম্ভব নহে, বয়স অল্প, জরির কাপড় পরিধান। আর কোন শব্দ না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

সঙ্গীদিগের পরিচয় দিতে বাহকের প্রতি বিশেষ নিষেধ ছিল, কিন্তু সে নিষেধ তাহার পক্ষে ক্রমে ভার হইয়া উঠিতেছিল। পাগলীকে পাইয়া বাহক মনে করিয়াছিল যে, সে ভার নামাইবে; কিন্তু পাগলী আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করায় তাহার আশা পরিতৃপ্ত করিবার ব্যাঘাত জন্মিল। শেষ বাহক পাগলীকে বলিল, "তুমি স্ত্রীলোক, আমাদের সঙ্গে যাওয়া ভাল নহে, এখনই কাটাকাটি হইবে, অতএব তুমি পালাও।" পাগলী বলিল, "বিবাহ শুভকর্ম্ম, ইহাতে কাটাকাটি হইবে কেন?" বাহক উত্তর করিল, "এ ব্যাপার বিবাহের নহে। যিনি তাজ পরিয়া তরবারি লইয়া ঘোড়ার উপর যাইতেছেন, উনি আমাদের ফৌজদারের পুত্র। এই গ্রামে একটী অদ্ভুত সুন্দরী আছে শুনিয়া তাহাকে কাড়িয়া লইতে যাইতেছেন; তাই বলিতেছিলাম, কাটাকাটি হইবে।"

পাগলী শিহরিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাহার কন্যা লইয়া যাইবে?" বাহক বলিল, "আমি সবিশেষ জানি না, শুনিয়াছি, কোন ভট্টাচার্য্যের পুত্রবধূ; যুবতীর স্বামী না কি অদ্য কয়েক দিন হইল শিষ্যালয়ে গিয়াছে। সুন্দরীর নাম বুঝি দামিনী।"

এই কথা শুনিবামাত্র পাগলী ফণিনীর ন্যায় বাহকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পথরোধ করিল; দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল তুলিল। সে মূর্ত্তি দেখিয়া বাহক ভয়ে বলিল, "আমি দরিদ্র বাহক, পেটের জ্বালায় সকল করি; আমাকে মারিলে কি হইবে? আমি হিন্দু, অতএব হিন্দুর অত্যাচার আমার ইচ্ছা নয়। এক্ষণে গোলযোগ করিলে এই যবনেরা তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে, অতএব আমার পরামর্শ শুন। তুমি অন্য পথ দিয়া দ্রুত যাইয়া গ্রামবাসীদিগকে জাগ্রত কর; সকলে একত্র প্রতিবন্ধক হইলে সফল হইতে পারিবে; নতুবা আর উপায় নাই।"

পাগলী শুনিবামাত্র ছুটিল; গ্রামের মধ্যে যাইয়া দ্বারে দ্বারে চীৎকার করিতে লাগিল, বলিতে লাগিল, "হিন্দুর হিন্দুত্ব যায়, সকলে উঠ; সতীর সতীত্ব যায়, একবার সকলে উঠ। অদিতি ভট্টাচার্য্যের সর্ব্বনাশ হয়, একবার সকলে উঠ। ফৌজদারের পুত্র আসিয়া তাহার পুত্রবধূকে হরণ করে, একবার সকলে উঠ।"

কেহই উঠিল না। কেহ বলিল, "যাউক শত্রু পরে পরে।" কেহ বলিল, "পরের নিমিত্ত মাথা দিবার আমার কি প্রয়োজন, পড়িয়াছে?" কেহ বলিল, "অদিতির সর্ব্বনাশ হয় যদি, তাহাতে আমার কি ক্ষতি?"

ক্ষতি আছে। আমরা ভিন্ন তাহা অপরদেশীয় সকলে বুঝে। বিপদ্ অদ্য আমার, কল্য তোমার; অত্যাচার এক ঘরে প্রবেশ করিতে পাইলে সকল ঘরে পথ পায়। অগ্নি এক ঘরে লাগিলে সকল ঘর আক্রমণ করে। পরের ঘরের অগ্নি যে নিবায়, কেবল সেই আপনার ঘর রক্ষা করে। এ "বোধ" বাঙ্গালা হইতে অনেক কাল অন্তর্হিত হইয়াছে; অতএব পাগলীর চীৎকারে কেহই উঠিল না।

দুর্বৃত্ত যবনের অত্যাচার কেহ নিবারণ করিল না; রমেশের পিতা অদিতি বিশারদ

একা, তাহে বৃদ্ধ; দামিনীকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। যবনেরা দ্বার ভাঙ্গিয়া মূর্চ্ছিতা দামিনীকে লইয়া গেল।

পাগলা দেখিল, কেহই উঠিল না; কেহই সহায়তা করিল না। রমেশের গৃহদ্বারে আসিয়া দেখিল, সকল ফুরাইয়াছে; দামিনীকে লইয়া গিয়াছে! তখন পাগলার কপোলমধ্যে যেন অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। পাগলা পূর্ব্বমত উন্মত্ত হইয়া সিংহের ন্যায় ক্ষণেক দাড়াইল। শেষ ত্রিশূল তুলিয়া ছুটিল।

যবনেরা এক প্রান্তরের মধ্য দিয়া দামিনীকে লইয়া যাইতেছিল। পাল্কীর চারিদিকে অস্ত্রধারী পদাতিক। সর্ব্বপশ্চাতে ফৌজদারপুত্র অশ্বারোহণে যাইতেছিল। পাগলা বায়ুবেগে তথায় উপস্থিত হইয়া ত্রিশূল নিক্ষেপ করিল। ত্রিশূল ফৌজদারপুত্রের পৃষ্ঠদেশে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে ঈষৎ দেখা দিল। ফৌজদার পুত্রের শরীর প্রথমে দুলিল, শেষে অশ্বপৃষ্ঠচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। পাগলা বিকট হাসি হাসিল; অশ্ব চমকিয়া উঠিল। পদাতিকেরা ফিরিয়া দেখিল।

পাগলা আবার বিকট হাসি হাসিতে হাসিতে ছুটিল। দামিনীকে আর তাহার স্মরণ হইল না। সেই অবধি পাগলাকেও আর কেহ দেখিতে পাইল না। পদাতিকেরা দেখিল যে, ফৌজদারপুত্র সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন; অতএব তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া পাল্কীতে তুলিল। পাল্কী হইতে দামিনীকে ফেলিয়া দিয়া গেল। দামিনী একা প্রান্তরে পড়িয়া রহিলেন। নবপল্লবিত পুষ্পিত লতা বৃক্ষ হইতে ছিঁড়িয়া পথে ফেলিয়া গেলে যেমন বাতাসে তাহা উলটি পালটি করিতে থাকে, প্রান্তরে পড়িয়া দামিনীর সেইরূপ দশা ঘটিল। বাতাসে তাহার অঞ্চল উলটি-পালটি করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রভাত হইল। রমেশের পিতা অদিতি বিশারদ নামাবলী স্কন্ধে লইয়া বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। প্রাতঃসন্ধ্যা হয় নাই; দামিনী নাই। সন্ধ্যার আয়োজন আর কে করিয়া দিবে? বিশারদ অতি বিমর্ষভাবে একা বসিয়া রহিলেন; ক্রমে প্রতিবাসিগণ, গ্রামবাসিগণ, আত্মীয়-কুটুম্বগণ আত্মীয়তা করিতে আসিতে লাগিলেন। কেহ আসিয়া বলিলেন, "কি বিপদ্, কি বিপদ্!" কেহ বলিলেন, "কখন্ কাহার কি ঘটে, কে বলিতে পারে?" কেহ বলিলেন, "অদৃষ্টই মূল।" অদিতি বিশারদ ইহার কোন কথাতেই উত্তর করিলেন না দেখিয়া গণেশচন্দ্র নামে জনৈক মধ্যবয়স্ক স্থূলশরীর প্রতিবাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "পূর্ব্বে ইহার কোন সূচনা ছিল না? অর্থাৎ পূর্ব্বে কি মহাশয় কিছুই জানিতে পারেন নাই?" অদিতি বিশারদ ধীরে ধীরে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "যদি পূর্ব্বে জানিতে পারিব, তবে এমন ঘটিবেই বা কেন? রমেশকেই বা বিদেশে যেতে দিব কেন? এই রাত্রে রমেশ থাকিলে শৃগালের সাধ্য কি যে, সিংহের গৃহে প্রবেশ করে?"

গণেশচন্দ্র বলিলেন, "রমেশের প্রয়োজন কি? আমরাই যে আপনার পুত্রবধূকে রক্ষা করিতে পারিতাম। তবে কি জানেন, সকল সময় সাহস হয় না; যবনেরা প্রায় বিশ জন, আমরা একা; বিশেষতঃ তখন যদি সদরবাড়ীতে থাকিতাম, তবে যাহা হয় একখানা করিয়া বসিতাম। কিন্তু আপনার দুর্ভাগ্যবশতঃ অথবা রমেশের দুরদৃষ্টবশতঃ আমি তখন অন্দরে শয়ন করিয়াছিলাম। শয়ন করিলে সহজে উঠা যায় না; তথাপি ব্রাহ্মণীর কথায় উঠিলাম, ভাল ক'রে কাপড় পরিলাম, সেই অন্ধকারে অনুসন্ধান করিয়া নস্য-শম্বুক বাহির করিলাম, এক টিপ বিলক্ষণ করিয়া গ্রহণ করিলাম; এ সকল কার্য্যে নস্য আবশ্যক। তাহার পর দেখি, আমি

ঘর্ম্মাক্তকলেবর। এ সকল কার্য্যে ঘর্ম্ম ভাল নহে; কি জানি পাছে যবনেরা পিছলে পালায়, এই মনে করিয়া গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা বিলক্ষণ করিয়া ঘর্ম্ম পরিষ্কার করিলাম; সকল বিষয় এককালে স্মরণ হয় না; গাত্র-মার্জ্জনী রাখিলে অস্ত্রের কথা মনে পড়িল। আমি বলিলাম, 'পুঁতির তক্তা আন।' ব্রাহ্মণী বলিলেন, 'তাহার কর্ম্ম নহে।' শেষে একটি শিশু, আমার সপ্তম সন্তান, একটি ইট আনিয়া দিল। আমি সেই ইট হাতে করিয়া ছাদে আসিয়া দেখি, দুর্ব্বৃত্তেরা তখন ফিরিয়া যাইতেছে, আমি অমনি সেই ইট ছুড়িলাম।"

প্রতিবাসী এইরূপ আত্মবীরত্বের পরিচয় দিতেছেন, এমত সময় একজন কৃষক আসিয়া বলিল যে, ফৌজদারপুত্র পথে মারা পড়িয়াছে। কে তাহারে মারিয়াছে, তাহার স্থির নাই।

গণেশচন্দ্র আহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন, "তবে সে আমারই ইটে মরিয়াছে; নিশ্চয় বলিতেছি, আমিই যবন মারিয়াছি। আমার অব্যর্থ সন্ধান।"

আর একজন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "ওরূপ কথা মুখে আনা ভাল নহে। যিনি মরিয়াছেন, তিনি ফৌজদারের একমাত্র পুত্র; সে পুত্রকে যে মারিয়াছে, তাহার অদৃষ্টে নিশ্চয় শূল আছে।"

গণেশ অমনি ভয়ে জড়বৎ হইলেন। কম্পান্বিত-স্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমি উপহাস করিতেছিলাম; আমি তা বলি নাই; আমি কি বলিতেছি, কিছুই নহে। আমার দ্বারা হাকিমের অনিষ্ট হইবে, কখন সম্ভব নহে। আমি বরং বলিতেছি যে, এত ডাকাডাকি করেছে, তথাপি আমি কথা কই নাই। রমেশ বড়, না হাকিম বড়?" এই বলিতে বলিতে তিনি পলাইলেন।

যে ব্যক্তি ফৌজদারপুত্রের মৃত্যুসংবাদ আনিয়াছিল, সে অদিতি বিশারদকে বলিল যে, মহাশয়ের পুত্রবধূ বাড়ী ফিরে আসিতেছেন। এই কথা শুনিবামাত্র বিশারদ সকলের মুখ প্রতি চাহিলেন। কেহ কিছু বলিলেন না। শেষে অদিতি বিশারদ আপনিই সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? আমার পুত্রবধূ যবনস্পৃষ্টা হইয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাকে গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না?" সকলে উত্তর করিল যে, মহাশয় অদ্বিতীয় পণ্ডিত, ইহার ইতিকর্ত্তব্যতা আপনিই মীমাংসা করুন।" অদিতি বিশারদ কিঞ্চিৎ ভাবিলেন, শেষে অন্দরে যাইয়া গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

গৃহিণী বলিলেন, "সেই বউকে আবার ঘরে? তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি স্বতন্ত্র গৃহে লইয়া সংসার কর।"

কর্ত্তা বলিলেন, "কেন, তাহার ত কোন দোষ নাই।"

গৃ। দোষ তবে সকল আমার?

ক। না, তোমার দোষ দিই নাই। আমি জিজ্ঞাসা করি, পুত্রবধূকে গ্রহণ করিতে কি দোষ হইতে পারে?

গৃ। দোষ অনেক। প্রথমে লোকে গালে কালিচূণ দিবে, দ্বিতীয়তঃ শিষ্যেরা ত্যাগ করিবে, তখন আমার এই শিশু সন্তানের কি উপায় হইবে?

ক। কেন লোকেরা দোষ দিবে? আমাদের পুত্রবধূ কুলত্যাগী নহে, ইচ্ছা-পূর্ব্বক যায় নাই, যবনগৃহেও যায় নাই, পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে।

গৃ। কুলত্যাগী নহে? ইচ্ছাপূর্ব্বক যায় নাই, এ কথা তোমায় কে বলিল? তুমি সকল সংবাদই প্রায় জান। কয় দিবস পর্য্যন্ত এক মাগী পাগলের বেশ ধরিয়া যাতায়াত করিতেছিল; সে দিবস সন্ধ্যার সময় বধূকে লইয়া পলাইতেছিল, আমি যাইয়া ফিরাইয়া আনিলাম। ফিরে এসে বালিশ মুখে দিয়া যে আবার মেয়ের কান্না! আমি কি সকল কথা তোমায় বলি। তোমার পুত্রবধূ যখন দেখিল যে, আমি থাকিতে আর পলাইতে পারিবে না, তখন এই পরামর্শ করিয়া লোকজন আনাইয়া চলিয়া গেল।

গৃহিণীর বাক্য শুনিয়া কর্ত্তা বিস্মিত হইলেন, দুই একবার বলিলেন, "শাস্ত্র মিথ্যা হয়

না, স্ত্রীচরিত্র কে বুঝিতে পারে?" শেষে বলিলেন, "তুমি যাহা বলিলে, তাহা আমার বিশ্বাস হইল। আমি কদাচ তাহাকে আর গ্রহণ করিব না।"

অদিতি বিশারদ বহির্ব্বাটীতে আসিয়া সকলকে বলিলেন, "আমার ভ্রম হইয়াছিল, মনে করিয়াছিলাম, আমার পুত্রবধূ নির্দ্দোষী, এক্ষণে জানিলাম, তাহা নহে। তোমরা আমার আত্মীয়, তোমাদিগের নিকট বলিতে লজ্জা কি? আমার পুত্রবধূ কুলটা। অনেকদিন পর্য্যন্ত গৃহত্যাগ করিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু গৃহিণীর সতর্কতা হেতু সফল হইতে পারেন নাই। সম্প্রতি আমার এই ঘর-দ্বার ভগ্ন হওয়া, সে সকল আমার কুলবধূর পরামর্শ ও কৌশলে হইয়াছে। সে যাহা হউক, যদি তাঁহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া আমরা স্বীকার করি, তথাপি তিনি যে যবনস্পৃষ্টা হইয়াছেন, সে বিষয়ে ত আর সন্দেহ নাই। অতএব শাস্ত্রানুসারে তাঁহারে আর কেমন করিয়া গ্রহণ করি? শাস্ত্রে সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে, এ পাপেরও অবশ্য আছে; কিন্তু বধূকে গ্রহণ করিলে আর একটি বিপদ আছে ফৌজদার মনে করিবেন যে, আমরা তাঁহার পুত্রকে হত্যা করিয়া বধূকে ঘরে আনিয়াছি। আমি কি, যে কেহ বধূকে আশ্রয় দিবে, তাহারই প্রতি সেই সন্দেহ হইবে। অতএব আত্মরক্ষা মনুষ্যের প্রধান ধর্ম্ম; শাস্ত্রে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। এক্ষণে স্থির করিয়াছি, পুত্রবধূ গৃহে আসিতে চাহিলে আর আমি তাঁহাকে স্থান দিব না। তোমরা এ পরামর্শে কি বল?"

সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "এ ভাল যুক্তি করিয়াছেন, আমরাও এ পরামর্শানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিব। আমরাও কেহ আপনার পুত্রবধূকে স্থান দিব না; অন্য কেহ স্থান দিতে চাহিলে নিবারণ করিব। কেন একটা পাপিষ্ঠার নিমিত্ত গ্রামস্থ সকলে বিপদ্‌গ্রস্ত হই? বিশেষতঃ কুলটাকে গ্রামে স্থান দেওয়া উচিত নহে, এখানে স্থান না পাইলে সে আপনিই অন্যত্র যাইবে।"

সকলে এই পরামর্শ করিয়া আপন আপন গৃহে সাবধান করিতে উঠিয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সকলে স্ব স্ব গৃহে গেলে পর কিঞ্চিৎ বিলম্বে গৃহিণী কর্ত্তাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার দেশ-উজ্জ্বল মুখ-উজ্জ্বল কুলবধূ আসিতেছেন, এখন কি বলিতে হয়, যাইয়া বল।" ইহা শুনিয়া অদিতি বিশারদ খিড়কিদ্বারের নিকট যাইয়া দাঁড়াইলেন। দামিনী মুখ ঢাকিয়া অধোমুখে ধীরে ধীরে আসিতেছেন, দ্বারে শ্বশুরকে দেখিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া উঠিলেন, বড় যন্ত্রণা পাইয়াছেন! অন্যদিন হইলে সে ক্রন্দন দেখিয়া অদিতি বিশারদ আপনিও কাঁদিতেন, কিন্তু এ সময় তিনি কাঁদিলেন না; চক্ষে জল আসিয়াছিল, স্ত্রীর প্রতি অলক্ষ্যে চাহিয়া তাহা সংবরণ করিলেন। পরে নস্য-শম্বুক বাহির করিয়া দুই একবার তাহাতে অঙ্গুলীর আঘাত করিয়া, শেষ দীর্ঘ টানে এক টিপ টানিয়া চক্ষু মুদিয়া বলিলেন, "বৎসে! আমি সকল দিক্ ভাবিয়া দেখিলাম, তোমায় আর গ্রহণ করিতে পারি না; তুমি যবনস্পৃষ্টা হইয়াছ; ব্রাহ্মণগৃহে আর তুমি স্থান পাইতে পার না; অতএব স্থানান্তরে যাও।" এই বলিয়া অদিতি বিশারদ দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন; দামিনী প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না; ক্রমে শ্বশুরের প্রত্যেক বাক্য স্মরণ করিয়া অর্থ বুঝিলেন, কিন্তু তাহা বিশ্বাস করিলেন না। ভাবিলেন, ইহা স্বপ্ন হইবে। স্বপ্ন কি না স্থির করিবার নিমিত্ত চারিদিক্ চাহিয়া দেখিলেন। নিকটে তিন্তিড়ীবৃক্ষ, তাহার শুষ্ক ডালে একটি চিল বসিয়া আছে, খিড়কি পুষ্করিণীর কাল জলে ডাহুক সাতার দিতেছে; ঘাটের নিকট জলে উচ্ছিষ্ট পাত্র রহিয়াছে; যে দাসী তাহা জলে

রাখিয়া গিয়াছে, তাহার জলসিক্ত পদচিহ্ন সোপানে স্পষ্ট রহিয়াছে। শ্বশুর যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এখনও তাহা রুদ্ধ রহিয়াছে। দামিনী একবার সেই দ্বারে হাত দিয়া দেখিলেন, পরে আপনার গাত্রে, চক্ষে হাত দিয়া দেখিলেন, স্বপ্ন নহে—সকলই সত্য! গৃহে প্রবেশ করিতে নিষেধ সত্য—দামিনী 'ব্রাহ্মণের অগ্রাহ্য' এই কথা যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাও স্বপ্ন নহে। দামিনীর চক্ষে সূর্য্য নিবিয়া গেল, সকলই অন্ধকার হইল, দামিনী পড়িয়া গেলেন।

ক্ষণকাল বিলম্বে পাড়ার অনেকগুলি বৃদ্ধা, মধ্যবয়স্কা, যুবতী, বালিকা সকলে আসিয়া দামিনীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। দামিনী তখন মতিস্থির করিতে পারেন নাই। যেখানে পড়িয়া গিয়াছিলেন, সেইখানে নতমুখে বসিয়া একটী দূর্ব্বাদল নখদ্বারা অন্যমনস্কে ছিঁড়িতেছিলেন। অন্যমনস্কে হউক, আর সমনস্কে হউক, তাহার নয়ন হইতে বারিধারা বহিতেছিল।

প্রতিবাসিদিগের মধ্যে একটি বৃদ্ধা বলিলেন, "এমনও কপাল ক'রে ভারতে এসেছিলে! আহা! কি অদৃষ্ট! কি দুর্ভাগ্য!" দামিনী ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া বৃদ্ধার মুখ প্রতি ব্যথিতা হরিণীর ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। বৃদ্ধা বলিলেন, "এ মুখ প্রতি পোড়া শ্বশুর একবার ফিরে চাহিল না? ধর্ম্ম বড় হ'ল না, জাত বড় হ'ল, আরে পোড়া বিধাতা। কপালে মন্দ লিখিতে আর কি লোক পেলে না? এই বয়সে এই কষ্ট! আহা! মরি মরি মরি! মেয়ে ত নয়, যেন স্বর্ণলতা!"

আর একজন মধ্যবয়স্কা বলিলেন, "আহা! দামিনী আমাদের চিরদুঃখিনী। বুড়া মাতামহী দামিনীর বিবাহ দিয়া বলিয়াছিল যে, 'এতদিনে আমার দামিনীর উপায় হইল, এখন আমি নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিব।' আহা! যদি বুড়ী বেঁচে থাকিত, তবে দামিনী দাঁড়াইবার একটা স্থান পাইত। এখন আর দামিনীর দাঁড়াইবার স্থান নাই।"

দামিনীর অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিল, শেষে দামিনী মাতামহীর জন্য কাঁদিয়া উঠিলেন। উদ্দেশে মাতামহীকে ডাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, "আয়ি! আমায় কার কাছে ফেলে আপনি চ'লে গেলে?" এই ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া তাঁহার শাশুড়ী রাগভরে সশব্দে খিড়কীর দ্বার খুলিয়া তিরস্কার আরম্ভ করিলেন। "বলি বউ! তোমার কেমন আক্কেল আচরণ! এক দুই প্রহর বেলায় গৃহস্থের দ্বারে বসিয়া মরাকান্না আরম্ভ করিলে? জান না কি এতে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়?" প্রতিবাসিনীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আর তোমাদেরই বা কি আচরণ! আপনার ঝি-বউ ঘরে রেখে পরের বউ নাচাতে এলে। এখন সকলে সময় পাইয়াছ। ভাল, পরমেশ্বর আমাকেও একদিন দিবেন, আমিও একদিন পাব।"

কেহ কোন উত্তর করিল না; সকলেই একে একে চলিয়া গেল। দামিনীও চক্ষের জল মুছিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। প্রতিবাসিনীরা আপন আপন গৃহকার্য্যে গেল। তাহাদের একজন সমবয়স্কা একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। রমেশের বিমাতা পূর্ব্বমত দ্বার রুদ্ধ করিলে দামিনীর নিকট আসিয়া বলিলেন, "একবার উঠ ত।" দামিনী বলিলেন, আমি আর কোথাও যাব না; কোথাও যাইব? আর আমার স্থান নাই; কেহ আর আমায় স্থান দিবে না।" সমবয়স্কা কহিল, "তবে কি এইখানে মরিবি?" দামিনী উত্তর করিলেন, "এইখানেই মরিব। আমার স্থান কোথা? তিনি আমায় এইখানে রাখিয়া গেছেন, আমি এইখানেই থাকিব; যত দিন তিনি না আসেন, ততদিন যেমন ক'রে পারি বাঁচিব। আমি তাঁরে না দেখে মরিতে পারিব না।"

এই বলিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন। সমবয়স্কা বলিলেন, "অন্যত্র না যাও, এই বৃক্ষমূলে আসিয়া ব'স; রৌদ্র অসহ্য হইয়াছে, আমরা আর দাঁড়াইতে পারিব না।" দামিনী এই কথায় ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনার গৃহে যাও, তোমার গৃহ আছে, গৃহে তোমায়

না দেখিলে তোমার মা ব্যস্ত হবেন, আবার বুড় মানুষ, এই রৌদ্রে তোমায় খুঁজিতে আসিবেন।"

প্রতিবাসিনী গৃহে গেলেন, কিন্তু বিস্তর-ক্ষণ থাকিতে পারিলেন না; অপরাহ্ন না হইতে হইতেই অদিতি ভট্টাচার্য্যের বাটীর পশ্চাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, দামিনী পূর্ব্বমত একা বৃক্ষমূলে বসিয়া অন্যমনস্কে একটি পক্ষী দেখিতেছেন। আর চক্ষে জল নাই।

প্রতিবাসিনী আসিয়া দামিনীর নিকটে বসিলেন। পরস্পর কেহই ক্ষণকাল পর্য্যন্ত কথা কহিলেন না। পরে দামিনী বলিলেন, "যদি এই রাত্রে তিনি আসেন।"

প্র। কে? তোমার স্বামী? তা আসেন ত ভালই হয়। যাহা হউক, ভাল মন্দ একটা স্থির হইয়া যায়।

দা। তিনি যদি আসিয়া পথ হইতে ফিরিয়া যান?

প্র। সে কি! তা কি হ'তে পারে?

দা। পারে। পথে যদি তাঁরে কেহ কোন কথা না শুনায়। তিনিও কি আমায় ত্যাগ করিবেন?

প্র; কি জানি ভাই? পুরুষের মন কখন্ কেমন থাকে, তা কে বলিতে পারে?

দা। তিনি আমায় কত ভালবাসেন। আমায় দেখিতে দেখিতে কাঁদেন। আমার দেখিবার তাঁর কত সাধ। দেখিবার নিমিত্ত কত ছল ক'রে আমার কাছে আসিয়া বসেন, কতবার কতদিকে ব'সে দেখেন। আবার কপালে হাত দিয়া দেখেন; দাড়িতে হাত দিয়া দেখেন; ওষ্ঠে হাত দিয়া দেখেন। দেখিয়া আর তাঁহার পরিতৃপ্তি হয় না। রাত্রে নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া আমার মুখের উপর চাহিয়া থাকেন, আমি পোড়া চক্ষু বুজিয়া ঘুমাইয়া থাকি।

এই বলিতে বলিতে দামিনীর নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল। দামিনী কাঁদিতে লাগিলেন। প্রতিবাসিনী বলিলেন, "সন্ধ্যা হইল, রাত্রি-যাপন কিরূপে হইবে? কোথা থাকিবে?"

দামিনী প্রথমে বলিলেন, "কি জানি," পরক্ষণেই বলিলেন, "এইখানেই থাকিব। কে আমায় স্থান দিবে?"

প্রতিবাসিনী শিহরিয়া বলিলেন, "তা কি স্ত্রীলোকের সাধ্য? এই অন্ধকার বনমধ্যে একা পুরুষে থাকিতে পারে না, তুমি কেমন করিয়া থাকিবে? রাত্রের নিমিত্ত ঘরে না হউক, বাটীর অন্য কোন চালায় শ্বশুর শাশুড়ী কি স্থান দিবেন না? অবশ্যই দিবেন।"

দামিনীও সেই আশা করিয়াছিলেন। তিনি নিশ্চয় মনে করিয়াছিলেন যে, রাত্রে কেহ তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া যাইবে, কিন্তু রাত্রি হইল, প্রতিবাসিনী চলিয়া গেল। কেহ তাহার তত্ত্ব করিল না। খিড়্কীদ্বার এতক্ষণ মুক্ত ছিল, শেষে তাহাও বন্ধ হইল।

দামিনী একা অন্ধকারে বসিয়া রহিলেন। রাত্রি ক্রমে গভীর হইল। দূরে যে দুইটি দীপালোক দেখা যাইতেছিল, তাহা একে একে নিবিয়া গেল। গ্রামবাসীরা নিশ্চিন্ত হইয়া সকলে নিদ্রা গেলেন, দামিনীর ভাবনা কেহ ভাবিল না। দামিনী আপনার ভাবনা ভাবিতে লাগিল। ক্রমে দুই একবার ভয় পাইতে লাগিল। একা থাকা বিষম হইয়া উঠিল। একে সমস্ত দিন অনাহার, তাহে আবার সমস্ত দিন কাঁদিয়াছেন, শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল, দামিনী ধূলায় শয়ন করিলেন, শীঘ্র নিদ্রা আসিল। স্বপ্নে যেন শুনিলেন, কে ডাকিল "মা!" স্বপ্নে যেন উত্তর দিলেন, "মা!" স্বপ্নে যেন বোধ হইল, তাঁহার মা বলিতেছেন, "উঠ মা! এ ঘরে আর কাজ কি?"

পরদিন প্রাতে উঠিয়া কেহ আর দামিনীকে দেখিতে পাইল না।

—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দশ বারো দিবস পরে রমেশ বাটী আসিয়া সকল শুনিলেন। পিতাকে কিছু বলিলেন না, বিমাতার প্রতি দোষারোপ করিলেন না, কাহাকেও কিছু না বলিয়া ব. হইতে চলিয়া গেলেন। গ্রামে গ্রামে পথে পথে পাঁচ সাত দিবস ভ্রমণ করিলেন, কোথাও দামিনীর সংবাদ পাইলেন না। শেষে এক দিবস রাত্রিশেষে বিষণ্ণভাবে বাটী প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, নদীতীরে ভগ্ন অট্টালিকা দেখিয়া দাঁড়াইলেন। ভগ্ন অট্টালিকার অবস্থা-সহিত আপনার সাদৃশ্য দেখিলেন।—অট্টালিকার আলিসা ছাদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; স্থানে স্থানে অশ্বথ বট প্রভৃতি বৃক্ষ আপন আপন মূল বিদ্ধ করিয়া সাহঙ্কারে দুলিতেছে। দুর্ব্বল অট্টালিকা একা নদীতীরে দাঁড়াইয়া তাহা সহ্য করিতেছে।

রমেশ অগ্রসর হইলেন, দ্বারে যাইয়া দাঁড়াইলেন। দ্বার মুক্ত ছিল, গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সমাগমশব্দে অসংখ্য চামচিকা বাদুড় অন্ধকারে উড়িতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে ক্রমে ক্রমে তাহাদের শব্দ থামিল। ঘর ভয়ানক গম্ভীর হইল। রমেশ দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরক্ষণেই কক্ষান্তরে মনুষ্য-কণ্ঠনিঃসৃত একটি মৃদু শব্দ শুনিলেন। রমেশের শরীর কণ্টকিত হইল। রমেশ সাবধানে নিঃশব্দে সেই দিকে গেলেন, অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে দেখিলেন, মৃত্যুশয্যায় একটি রুগ্ন মনুষ্যদেহ পড়িয়া রহিয়াছে।

রমেশ কি ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নরদেহ সংজ্ঞাহীন হয় নাই, তাহার কণ্ঠস্বর আবার অল্পে অল্পে নিঃসৃত হইতে লাগিল, "আসি? এলে? বসো, আর বিলম্ব করিব না, কেবল একবার রমেশকে দেখে আসি।"

রমেশ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "দামিনী, দামিনী! আমি এসেছি, আর কখন তোমা ছাড়া হব না।"

[illegible] উত্তর দিল না। রমেশ আছড়াইয়া [illegible]ড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, "আবার কথা কও; অনেক দিন কথা শুনি নাই, আবার কথা কও।" আর কোন উত্তর নাই; সকল নিঃশব্দ। রমেশ কতক বুঝিলেন, রুদ্ধশ্বাসে গ্রামমধ্যে গেলেন। তথা হইতে দীপ জ্বালিবার দ্রব্যাদি লইয়া আসিলেন। দীপ জ্বালিলেন। দেখিলেন, সেখানে আর একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বসিয়া দামিনীর প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। দামিনী এ জন্মের মত চক্ষু মুদিয়াছেন।

রমেশকে দেখিয়া বৃদ্ধা হাসিয়া উঠিল, সে ভীষণ হাসি দেখিয়া রমেশের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। বৃদ্ধা উঠিল, দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে রমেশের দিকে চাহিয়া রহিল। রমেশ চিনিলেন যে, এই পূর্ব্বপরিচিতা পাগলী।

পাগলী একবার ওষ্ঠে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "চুপ, আমার দামিনী ঘুমাইতেছে—ঘুমাইতেছে!" পরক্ষণেই আবার বিকট হাসি হাসিয়া রমেশের উপর পড়িয়া রমেশের গলদেশ বজ্রবৎ টিপিয়া বলিল, "আমি চিনিয়াছি, তুই রমেশ; তোর জন্যই আমার দামিনী মরিয়াছে।"

রমেশের শ্বাসরুদ্ধ হইল; চক্ষুর শিরা সকল উঠিল। রমেশ বাক্যরহিত, শক্তিরহিত, শেষে দামিনীর পার্শ্বে পড়িয়া গেলেন। পাগলী আবার রমেশের গলদেশ পূর্ব্বমত ধরিল। এবার সকল ফুরাইল।

সম্পূর্ণ।

পালামৌ।

প্রথম প্রবন্ধ।

বহুকাল হইল, একবার আমি পালামৌ প্রদেশে গিয়াছিলাম, প্রত্যাগমন করিলে পর সেই অঞ্চলের বৃত্তান্ত লিখিবার নিমিত্ত দুই এক জন বন্ধুবান্ধব আমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেন, আমি তখন তাঁহাদের উপহাস করিতাম। এক্ষণে আমায় কেহ অনুরোধ করে না অথচ আমি সেই বৃত্তান্ত লিখিতে বসিয়াছি। তাৎপর্য্য বয়স। গল্প করা এ বয়সের রোগ, কেহ শুনুন বা না শুনুন, বৃদ্ধ গল্প করে।

অনেক দিনের কথা লিখিতে বসিয়াছি, সকল স্মরণ হয় না। পূর্ব্বে লিখিলে যাহা লিখিতাম, এক্ষণে যে তাহাই লিখিতেছি, এমত নহে। পূর্ব্বে সেই সকল নির্জ্জন পর্ব্বত, কুসুমিত কানন প্রভৃতি যে চক্ষে দেখিয়াছিলাম, সে চক্ষু আর নাই। এখন পর্ব্বত কেবল প্রস্তরময়, বন কেবল কণ্টকাকীর্ণ, অধিবাসীরা কেবল কদাচারী বলিয়া স্মরণ হয়। অতএব যাঁহারা বয়োগুণে কেবল শোভা-সৌন্দর্য্য প্রভৃতি ভালবাসেন, বৃদ্ধের লেখায় তাঁহাদের কোন প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইবে না।

যখন পালামৌ আমার যাওয়া একান্ত স্থির হইল, তখন জানি না যে, সে স্থান কোন্ দিকে কত দূর, অতএব ম্যাপ দেখিয়া পথ স্থির করিলাম। হাজারিবাগ হইয়া যাইতে হইবে, এই বিবেচনায় ইন্‌ল্যাণ্ড ট্র্যান্‌জিট কোম্পানির (Inland Transit company) ডাকগাড়ী ভাড়া করিয়া রাত্রি দেড় প্রহরের সময় রাণীগঞ্জ হইতে যাত্রা করিলাম। প্রাতে বরাকর নদীর পূর্ব্বপারে গাড়ী থামিল। নদী অতি ক্ষুদ্র, তৎকালে অল্পমাত্র জল ছিল, সকলেই হাঁটিয়া পার হইতেছে, আমার গাড়ী ঠেলিয়া পার করিতে হইবে, অতএব গাড়োয়ান কুলি ডাকিতে গেল।

পূর্ব্বপার হইতে দেখিলাম যে, অপর পারে ঘাটের উপরেই একজন সাহেব বাঙ্গালায় বসিয়া পাইপ টানিতেছেন, সম্মুখে একজন চাপরাসী একরূপ গৈরিক মৃত্তিকা হস্তে দাঁড়াইয়া আছে। যে ব্যক্তি পারার্থ সেই ঘাটে আসিতেছে, চাপরাসী তাহার বাহুতে সেই মৃত্তিকা দ্বারা কি অঙ্কপাত করিতেছে। পারার্থীর মধ্যে বন্য লোকই অধিক, তাহাদের যুবতীরা মৃত্তিকারঞ্জিত আপন আপন বাহুর প্রতি আড়নয়নে চাহিতেছে, আর হাসিতেছে, আবার অন্যের অঙ্গে সেই অঙ্কপাত কিরূপ দেখাইতেছে, তাহাও এক একবার দেখিতেছে। শেষ যুবতীরা হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়া নদীতে নামিতেছে। তাহাদের ছুটাছুটিতে নদীর জল উচ্ছ্বাসিত হইয়া কূলের উপর উঠিতেছে।

আমি অন্যমনস্কে এই রঙ্গ দেখিতেছি, এমত সময় কুলিদের কতকগুলি বালকবালিকা আসিয়া আমার গাড়ী ঘেরিল; "সাহেব একটা পয়সা" "সাহেব একটা পয়সা" এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ধুতি-চাদর পরিয়া আমি নিরীহ বাঙ্গালী বসিয়া আছি, আমায় কেন সাহেব বলিতেছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত বলিলাম, "আমি সাহেব নহি।" একটী বালিকা আপন ক্ষুদ্র নাসিকাস্থ অঙ্গুরীবৎ অলঙ্কারের মধ্যে নখ নিমজ্জন

করিয়া বলিল, "হাঁ, তুমি সাহেব।" আর একজন জিজ্ঞাসা করিল, "তবে তুমি কি?" আমি বলিলাম, "আমি বাঙ্গালী।" সে বিশ্বাস করিল না, বলিল, "না, তুমি সাহেব। তাহারা মনে করিয়া থাকিবে যে, যে গাড়ী চড়ে, সে অবশ্য সাহেব।

এই সময় একটি দুইবৎসরবয়স্ক শিশু আসিয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল। কেন হাত পাতিল, তাহা সে জানে না, সকলে হাত পাতিয়াছে দেখিয়া সেও হাত পাতিল। আমি তাহার হস্তে একটি পয়সা দিলাম, শিশু তাহা ফেলিয়া দিয়া আবার হাত পাতিল, অন্য বালক সে পয়সা কুড়াইয়া লইলে শিশুর ভগিনীর সহিত তাহার তুমুল কলহ বাধিল। এই সময় আমার গাড়ী অপর পারে গিয়া উঠিল।

বরাকর হইতে দুই একটি ক্ষুদ্র পাহাড় দেখা যায়। বঙ্গবাসীদের কেবল মাঠ দেখা অভ্যাস, মৃত্তিকার সামান্য স্তূপ দেখিলেই তাহাদের আনন্দ হয়, অতএব সেই ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি দেখিয়া যে তৎকালে আমার যথেষ্ট আনন্দ হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? বাল্যকালে পাহাড়-পর্ব্বতের পরিচয় অনেক না ছিল, বিশেষতঃ একবার এক বৈরাগীর আখড়ায় চূণকাম করা এক গিরিগোবর্দ্ধন দেখিয়া পাহাড়ের আকার অনুভব করিয়াছিলাম। কৃষক-কন্যারা শুষ্ক গোময় সংগ্রহ করিয়া যে স্তূপ করে, বৈরাগীর গোবর্দ্ধন তাহা অপেক্ষা কিছু বড়। তাহার স্থানে স্থানে চারি পাঁচখানি ইষ্টক গাঁথিয়া এক একটি চূড়া করা হইয়াছে। আবার সর্ব্বোচ্চ চূড়ার পার্শ্বে এক সর্পফণা নির্ম্মাণ করিয়া তাহা হরিত, পীত, নানাবর্ণে চিত্রিত করা হইয়াছে, পাছে সর্পের প্রতি লোকের দৃষ্টি না পড়ে, এই জন্য ফণাটী কিছু বড় করিতে হইয়াছে। কাজেই পর্ব্বতের চূড়া অপেক্ষা ফণাটী বড় হইয়া পড়িয়াছে, তাহা নির্ম্মাতার গুণ নহে, বৈরাগীর দোষ নহে। সর্পটী কালিয়দমনের কালিয়; কাজেই যে পর্ব্বতের উপর কালিয় উঠিয়াছে, সে পর্ব্বতের চূড়া অপেক্ষা তাহার ফণা যে কিছু বৃহৎ হইবে, ইহার আর আশ্চর্য্য কি? বৈরাগীর এই গিরিগোবর্দ্ধন দেখিয়াই বাল্যকালে পর্ব্বতের অনুভব হইয়াছিল। বরাকরের নিকটস্থ পাহাড়গুলি দেখিয়া আমার সেই বাল্যসংস্কারের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইল।

অপরাহ্নে দেখিলাম, একটী সুন্দর পর্ব্বতের নিকট দিয়া গাড়ী যাইতেছে। এত নিকট দিয়া যাইতেছে যে, পর্ব্বতস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরের ছায়া পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। গাড়োয়ানকে গাড়ী থামাইতে বলিয়া আমি নামিলাম। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল "কোথা যাইবেন?" আমি বলিলাম, "একবার এই পর্ব্বতে যাইব।" সে হাসিয়া বলিল "পাহাড় এখান হইতে অধিক দূর, আপনি সন্ধ্যার মধ্যে তথায় পৌঁছিতে পারিবেন না।" আমি এ কথা কোনরূপে বিশ্বাস করিলাম না, আমি স্পষ্ট দেখিতেছিলাম, পাহাড় অতি নিকট, তথা যাইতে আমার পাঁচ মিনিটও লাগিবে না, অতএব গাড়োয়ানের নিষেধ না শুনিয়া আমি পর্ব্বতাভিমুখে চলিলাম। পাঁচ মিনিটের স্থলে ১৫ মিনিটকাল দ্রুত পাদবিক্ষেপে গেলাম, তথাপি পর্ব্বত পূর্ব্বমত সেই পাঁচ মিনিটের পথ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; তখন আমার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া গাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। পর্ব্বতসম্বন্ধে দূরতা স্থির করা বাঙ্গালীর পক্ষে বড় কঠিন, ইহার প্রমাণ পালামৌ গিয়া আমি পুনঃ পুনঃ পাইয়াছিলাম।

পরদিবস প্রায় দুই প্রহরের সময় হাজারিবাগ পৌঁছিলাম। তথায় গিয়া শুনিলাম, কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে আমার আহারের আয়োজন হইতেছে। প্রায় দুই দিবস আহার হয় নাই, অতএব আহার সম্বন্ধীয় কথা শুনিবামাত্র ক্ষুধা অধিকতর প্রদীপ্ত হইল। যিনি আমার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছেন, তিনি আমার আগমন-বার্ত্তা কিরূপে জানিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিবার আর সাবকাশ হইল না, আমি তৎক্ষণাৎ

তাঁহার বাটীতে গাড়ী লইয়া যাইতে অনুমতি করিলাম। যাঁহার বাটীতে যাইতেছি, তাঁহার সহিত আমার কখনও চাক্ষুষ হয় নাই, তাঁহার নাম শুনিয়াছি, সুখ্যাতিও যথেষ্ট শুনিয়াছি, সজ্জন বলিয়া তাঁহার প্রশংসা সকলেই করে। কিন্তু সে প্রশংসায় কর্ণপাত বড় করি নাই, কেন না, বঙ্গবাসীমাত্রেই সজ্জন; বঙ্গে কেবল প্রতিবাসীরাই দুরাত্মা, যাহা নিন্দা শুনা যায়, তাহা কেবল প্রতিবাসীর। প্রতিবাসীরা পরশ্রীকাতর, দাম্ভিক, কলহপ্রিয়, লোভী, কৃপণ, বঞ্চক। তাহারা আপনাদের সন্তানকে ভাল কাপড়, ভাল জুতা পরায়, কেবল আমাদের সন্তানকে কাঁদাইবার জন্য। তাহারা আপনাদের পুত্রবধূকে উত্তম বস্ত্রালঙ্কার দেয়, কেবল আমাদের পুত্রবধূর মুখভার করাইবার নিমিত্ত। পাপিষ্ঠ, প্রতিবাসীরা! যাহাদের প্রতিবাসী নাই, তাহাদের ক্রোধ নাই। তাহাদের নাম ঋষি। ঋষি কেবল প্রতিবাসিপরিত্যাগী গৃহী। ঋষির আশ্রম-পার্শ্বে প্রতিবাসী বসাও, তিনদিনের মধ্যে ঋষির ঋষিত্ব যাইবে। প্রথম দিন প্রতিবাসীর ছাগলে পুষ্পবৃক্ষ নিষ্পত্র করিবে। দ্বিতীয় দিনে প্রতিবাসীর গোরু আসিয়া কমণ্ডলু ভাঙ্গিবে, তৃতীয় দিনে প্রতিবাসীর গৃহিণী আসিয়া ঋষিপত্নীকে অলঙ্কার দেখাইবে। তাহার পর ঋষিকে ওকালতীর পরীক্ষা দিতে হইবে, নতুবা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটীর দরখাস্ত করিতে হইবে।

এক্ষণে সে সকল কথা যাক্; যে বঙ্গবাসীর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতে যাইতেছিলাম; তাঁহার উদ্যানে গাড়ী প্রবেশ করিলে তাহা কোন ধনবান্ ইংরাজের হইবে বলিয়া আমার প্রথমে ভ্রম হইল। পরক্ষণেই সে ভ্রম গেল। বারান্দায় গুটিকত বাঙ্গালী বসিয়া আমার গাড়ী নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহাদের নিকটে গিয়া গাড়ী থামিলে আমি গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। আমাকে দেখিয়া তাঁহারা সকলেই সাদরে অগ্রসর হইলেন। না চিনিয়া যাঁহার অভিবাদন আমি সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তিনিই বাটীর কর্ত্তা। তিনি শতলোক সমভিব্যাহারে থাকিলেও আমার দৃষ্টি বোধ হয় প্রথমেই তাঁহার মুখের প্রতি পড়িত। যদ্রূপ প্রসন্নতা-ব্যঞ্জক ওষ্ঠ আমি অতি অল্প দেখিয়াছি। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বোধ হয় পঞ্চাশ অতীত হইয়াছিল, বৃদ্ধের তালিকায় তাঁহার নাম উঠিয়াছিল, তথাপি তাঁহাকে বড় সুন্দর দেখিয়াছিলাম। বোধ হয়, সেই প্রথম আমি বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, আমি তখন নিজে যুবা; অতএব সে বয়সে বৃদ্ধকে সুন্দর দেখা ধর্ম্মসঙ্গত নহে। কিন্তু সে দিবস এরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য ঘটিয়াছিল। এক্ষণে আমি নিজে বৃদ্ধ, কাজেই প্রায় বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি। একজন মহানুভব বলিয়াছিলেন যে, মনুষ্য বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না, এক্ষণে আমি তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করি।

প্রথম সম্ভাষণ সমাপন হইলে পর স্নানাদি করিতে যাওয়া গেল। স্নান গোছলখানায় ইংরেজীমতেই হইল, কিন্তু আহার ঠিক হিন্দু-মতে হয় নাই; কেন না, তাহাতে পলাণ্ডুর আধিক্য ছিল। পলাণ্ডু হিন্দুধর্ম্মের বড় বিরোধী। তদ্ভিন্ন আহারের আর কোন দোষ ছিল না, সঘৃত অন্নপান, আর দেবীদুর্লভ ছাগমাংস, এই দুই-ই নির্দ্দোষী।

পাকসম্বন্ধে পলাণ্ডুর উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু পিঁয়াজ উল্লেখ করাই আমার ইচ্ছা ছিল। পিঁয়াজ যাবনিক শব্দ, এই ভয়ে পলাণ্ডুর উল্লেখ করিয়া সাধুগণের মুখ পবিত্র করিয়াছি; কিন্তু পিঁয়াজ পলাণ্ডু এক দ্রব্য কি না, এ বিষয়ে আমার বহুকালাবধি সংশয় আছে। একবার পঞ্জাব অঞ্চলের একজন বৃদ্ধরাজা জগন্নাথ দর্শন করিতে যাইবার সময় মেদিনীপুরে দুই একদিন অবস্থিতি করেন। নগরের ভদ্রলোকেরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা করিলে তিনি কি প্রধান, কি সামান্য, সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নানাপ্রকার আলাপ করিতেছিলেন, এমত সময় তাঁহাদের মধ্যে একজন যোড়হস্তে বলি-

লেন, "আমরা শুনিয়াছিলাম যে, মহারাজ হিন্দুচূড়ামণি, কিন্তু আসিবার সময় আপনার পাকশালার সম্মুখে পলাণ্ডু দেখিয়া আসিয়াছি।" বিস্ময়াপন্ন রাজা 'পলাণ্ডু!' এই শব্দ বার বার উচ্চারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তদারকের নিমিত্ত স্বয়ং উঠিলেন, নগরস্থ ভদ্রলোকেরাও তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। রাজা পাকশালার সম্মুখে দাঁড়াইলে, একজন বাঙ্গালী পিঁয়াজের স্তূপ দেখাইয়া দিল। রাজা তখন হাসিয়া বলিলেন, "ইহা পলাণ্ডু নহে; ইহাকে পিঁয়াজ বলে। পলাণ্ডু অতি বিষাক্ত সামগ্রী, তাহা কেবল ঔষধে ব্যবহার হয়। সকল দেশে তাহা জন্মে না; যে মাঠে জন্মে, মাঠের বায়ু দূষিত হইয়া যায়, এই ভয়ে সে মাঠ দিয়া কেহ যাতায়াত করে না। সে মাঠে আর কোন ফসল হয় না।"

রাজার এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অনেকে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। পলাণ্ডু আর পিঁয়াজ এক সামগ্রী কি না, পশ্চিম প্রদেশে অনুসন্ধান হইতে পারে। বিশেষতঃ যে সকল বঙ্গবাসীরা সিন্ধুদেশ অঞ্চলে আছেন, বোধ হয়, তাঁহারা অনায়াসেই এই কথার মীমাংসা করিয়া লইতে পারেন।

আহারান্তে বিশ্রামগৃহে বসিয়া বালকদিগের সহিত গল্প করিতে করিতে বালকদের শয়নঘর দেখিতে উঠিয়া গেলাম। ঘরটি বিলক্ষণ পরিসর, তাহার চারিকোণে চারিখানি খাট পাতা, মধ্যস্থলে আর একখানি খাট রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করায় বালকেরা বলিল, "চারি কোণে আমরা চারি জন শয়ন করি আর মধ্যস্থলে মাষ্টার মহাশয় থাকেন।" এই বন্দোবস্ত দেখিয়া বড় পরিতৃপ্ত হইলাম। দিবারাত্র বালকদের কাছে শিক্ষক থাকার আবশ্যকতা অনেকে বুঝেন না।

বালকদের শয়নঘর হইতে বহির্গত হইয়া আর একঘরে দেখি, এক কাঁদি সুপক্ব মর্ত্তমান রম্ভা দোদুল্যমান রহিয়াছে, তাহাতে একখানি কাগজ ঝুলিতেছে, পড়িয়া দেখিলাম, নিত্য যত কদলী কাঁদি হইতে ব্যয় হয়, তাহাই তাহাতে লিখিত হইয়া থাকে। লোকে সচরাচর ইহাকে ক্ষুদ্র দৃষ্টি, ছোট নজর ইত্যাদি বলে; কিন্তু আমি তাহা কোনরূপে ভাবিতে পারিলাম না যেরূপ অন্যান্য বিষয়ের বন্দোবস্ত দেখিলাম, তাহাতে "কলাকাঁদির হিসাব" দেখিয়া বরং আরও চমৎকৃত হইলাম। যাহাদের দৃষ্টি ক্ষুদ্র, তাহার কেবল সামান্য বিষয়ের প্রতিই দৃষ্টি রাখে, অন্য বিষয় দেখিতে পায় না। তাহারা যথার্থই নীচ। কিন্তু আমি যাঁহার কথা বলিতেছি, দেখিলাম, তাঁহার নিকট বৃহৎ সূক্ষ্ম সকলই সমভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অনেকে আছেন, বড় বড় বিষয় মোটামুটি দেখিতে পারেন, কিন্তু সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি একেবারে পড়ে না। তাঁহাদের প্রশংসা করি না। যাহারা বৃহৎ সূক্ষ্ম একত্র দেখিয়া কার্য্য করেন, তাঁহাদেরই প্রশংসা করি। কিন্তু এরূপ লোক অতি অল্প "কলাকাঁদির ফর্দ্দ" সম্বন্ধে বালকদের সহিত কথা কহিতে কহিতে জানিলাম, এক দিন একজন চাকর লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া দুইটা সুপক্ব রম্ভা উদরস্থ করিয়াছিল, গৃহস্থের সকল বিষয়েই দৃষ্টি আছে, সকল বিষয়েরই হিসাব থাকে, কাজেই চুরি ধরা পড়িল। তখন তিনি চাকরকে ডাকিয়া চুরির জন্য জরিমানা করিলেন। পরে তাহার লোভ পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত যত ইচ্ছা কাঁদি হইতে রম্ভা খাইতে অনুমতি করিলেন। চাকর উদর ভরিয়া রম্ভা খাইল।

অপরাহ্নে আমি উদ্যানে পদচারণ করিতেছি. এমত সময় গৃহস্থ 'কাছারী' হইতে প্রত্যাগত হইলেন। পরে আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া বাগান, পুষ্করিণী সমুদায় দেখাইতে লাগিলেন; যে স্থান হইতে যে বৃক্ষটী আনাইয়াছেন, তাহারও পরিচয় দিতে লাগিলেন মধ্যাহ্নকালে "কলাকাঁদি" সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি, তাহা তখনও আমার মনে পুনঃ পুনঃ আলোচিত হইতেছিল; কাজেই আমি কদলীবৃক্ষের প্রসঙ্গ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

বলিলাম, "আমার ধারণা ছিল, এ অঞ্চলে রম্ভা জন্মে না; কিন্তু আপনার বাগানে যথেষ্ট দেখিতেছি।" তিনি উত্তর করিলেন, "এখানে বাজারে কলা পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে কাহারও বাটীতে পাওয়া যাইত না, লোকের সংস্কার ছিল যে, এই প্রস্তরময় মৃত্তিকায় কলার গাছ রস পায় না, শুকাইয়া যায়। আমি তাহা বিশ্বাস না করিয়া দেশ হইতে 'তেড়' আনিয়া পরীক্ষা করিলাম। এক্ষণে আমার নিকট হইতে 'তেড়' লইয়া সকল সাহেবই বাগানে লাগাইয়াছেন। এখন আর এখানে কদলীর অভাব নাই।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে আমরা উদ্যানের এক প্রান্তভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলাম. তথায় দুইটী স্বতন্ত্র ঘর দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করায় গৃহস্থ, বলিলেন. "উহার একটিতে আমার নাপিত থাকে, অপরটিতে আমার ধোপা থাকে। উহারা সম্পূর্ণ আমার বেতনভোগী চাকর নহে, তবে উভয়কে আমার বাটীতে স্থান দিয়া এক প্রকারে আবদ্ধ করিয়াছি. এখন যখনই আবশ্যক হয়, তখনই তাহাদের পাই। ধোপা-নাপিতের কষ্ট পূর্ব্বে আর কোন উপায়ে নিবারণ করিতে পারি নাই।"

সন্ধ্যার পর দেখিলাম, শিক্ষক-সম্মুখে বালকেরা যে টেবিলে বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছে, তথায় একত্র একস্থানে তিনটি সেজ জ্বলিতেছে। অন্য লোকে যাঁহারা কদলীর হিসাব রাখেন না, তাহারা বালকদের নিমিত্ত একটা সেজ দিয়া নিশ্চিন্ত হন, আর যিনি কদলীর হিসাব রাখেন, তিনি এই অতিরিক্ত ব্যয় কেন স্বীকার করিতেছেন, জানিবার নিমিত্ত আমার কৌতূহল জন্মিল। শেষে আমি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "ইহা অপব্যয় নহে, অল্প আলোকে অধ্যয়ন করিলে বালকদের চক্ষু দুর্ব্বল হইবার সম্ভাবনা। যথেষ্ট আলোকে অধ্যয়ন করিলে চল্লিশের পরে 'চালসা' ধরে।"

উচ্চপদস্থ সাহেবেরা সর্ব্বদাই তাঁহার বাটীতে আসিতেন, এবং তাঁহার সহিত কথা-বার্ত্তায় পরমাপ্যায়িত হইতেন। বাঙ্গালীরা ছোট বড় সকলেই তাঁহার সৌজন্যে বাধ্য ছিলেন। যে কুঠীতে তিনি বাস করিতেন, সেরূপ কুঠী সাহেবদেরও সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না; কুঠীটি যেরূপ পরিষ্কৃত ও সুসজ্জীভূত ছিল, তাহা দেখিলে যথার্থই সুখ হয়, মনও পবিত্র হয়। মনের উপর বাসস্থানের আধিপত্য বিলক্ষণ আছে। যাহারা অপরিষ্কৃত ক্ষুদ্র ঘরে বাস করে, প্রায় দেখা যায়, তাহাদের মন সেইরূপ অপরিষ্কৃত ও ক্ষুদ্র। যিনি বিশ্বাস না করেন, তিনি বলিতে পারেন যে, যদি এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে প্রায় অধিকাংশ বাঙ্গালীর মন ক্ষুদ্র ও অপরিষ্কৃত হইত। আমরা এ কথা লইয়া কোন তর্ক করিব না, আমরা যেমন দেখিতে পাই, সেইমত লিখিয়াছি। যাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছি, তাঁহার মন, "কুঠী"র উপযোগী ছিল। সেরূপ কুঠীর ভাড়ায় যে ব্যক্তি বহু অর্থ ব্যয় করে, সে ব্যক্তি যদি কদলীর হিসাব রাখে, তাহা হইলে কি বুঝা কর্ত্তব্য?

রাত্রি দেড় প্রহরের সময় বাহকস্কন্ধে আমি ছোটনাগপুর যাত্রা করিলাম। তথা হইতে পালামৌ দুই চারি দিনের মধ্যে পৌঁছিলাম। পথের পরিচয় আর দিব না, এই কয়েক ছত্র লিখিয়া অনেককে জ্বালাতন করিয়াছি, আর বিরক্ত করিব না. এবার ইচ্ছা রহিল, মূল বিবরণ ভিন্ন অন্য কথা বলিব না, তবে যদি দুই একটি অতিরিক্ত কথা বলিয়া ফেলি, তাহা হইলে বয়সের দোষ বুঝিতে হইবে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

সেকালের হরকরা নামক ইংরেজী পত্রিকায় দেখিতাম, কোন একজন 'মিলিটারী সাহেব, "পেরেড" বৃত্তান্ত, "ব্যাণ্ডের" বাদ্যচর্চ্চা প্রভৃতি নানা কথা পালামৌ হইতে লিখিতেন। আমি তখন ভাবিতাম, পালামৌ

প্রবল সহর, সাহেবসমাকীর্ণ সুখের স্থান। তখন জানিতাম না যে, পালামৌ সহর নহে, একটি প্রকাণ্ড পরগণা মাত্র। সহর সে অঞ্চলে নাই, নগর দূরে থাকুক, তথায় একখানি গণ্ডগ্রামও নাই, কেবল পাহাড় ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ।

পাহাড় আর জঙ্গল বলিলে কে কি অনুভব করেন, বলিতে পারি না। যাঁহারা "কৃষ্ণচন্দ্র কর্ম্মকার-কৃত" পাহাড় দেখিয়াছেন, আর যাঁহাদের গৃহপার্শ্বে শৃগালশ্রান্তিসংবাহক ভাঁটভেরাণ্ডার জঙ্গল আছে, তাঁহারা যে এ কথা সমগ্র অনুভব করিয়া লইবেন, ইহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্য পাঠকের জন্য সেই পাহাড়-জঙ্গলের কথা কিঞ্চিৎ উত্থাপন করা আবশ্যক হইয়াছে। সকলের অনুভবশক্তি ত সমান নহে।

রাঁচি হইতে পালামৌ যাইতে যাইতে যখন বাহকগণের নির্দ্দেশমত দূর হইতে পালামৌ দেখিতে পাইলাম, তখন আমার বোধ হইল যেন মর্ত্ত্যে মেঘ করিয়াছে। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া সেই মনোহর দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। ঐ অন্ধকার মেঘমধ্যে এখনই যাইব, এই মনে করিয়া আমার কতই আহ্লাদ হইতে লাগিল। কতক্ষণে পৌঁছিব মনে করিয়া আবার কতই ব্যস্ত হইলাম।

পরে চারি পাঁচ ক্রোশ অগ্রসর হইয়া আবার পালামৌ দেখিবার নিমিত্ত পাল্কী হইতে অবতরণ করিলাম। তখন আর মেঘভ্রম হইল না, পাহাড়গুলি স্পষ্ট চেনা যাইতে লাগিল; কিন্তু জঙ্গল ভাল চেনা গেল না। তার পর আরও দুই এক ক্রোশ অগ্রসর হইলে তাম্রাভ অরণ্য চারিদিকে দেখা যাইতে লাগিল; কি পাহাড়, কি তলস্থ স্থান সমুদায় যেন মেষদেহের ন্যায় কুঞ্চিত লোমরাজি দ্বারা সর্ব্বত্র সমাচ্ছাদিত বোধ হইতে লাগিল। শেষ আরও কতদূর গেলে বন স্পষ্ট দেখা গেল। পাহাড়ের গায়ে, নিম্নে সর্ব্বত্র জঙ্গল, কোথাও আর ছেদ নাই। কোথাও কর্ষিত ক্ষেত্র নাই গ্রাম নাই, নদী নাই, পথ নাই, কেবল বন—ঘন নিবিড় বন।

পরে পালামৌ প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, নদী গ্রাম সকলই আছে, দূর হইতে তাহা কিছুই দেখা যায় নাই। পালামৌ পরগণায় পাহাড় অসংখ্য, পাহাড়ের পর পাহাড়, তাহার পর পাহাড়, আবার পাহাড়, যেন বিচলিত নদীর সংখ্যাতীত তরঙ্গ। আবার বোধ হয় যেন, অবনীর অন্তরাগ্নি একদিনেই সেই তরঙ্গ তুলিয়াছিল। এখন আমার ঠিক স্মরণ হয় না, কিন্তু বোধ হয় যেন দেখিয়াছিলাম, সকল তরঙ্গগুলি পূর্ব্বদিক্ হইতে উঠিয়াছিল, কোন কোনটি পূর্ব্বদিক্ হইতে উঠিয়া পশ্চিমদিকে নামে নাই। এইরূপ অর্দ্ধ পাহাড় লাতেহারগ্রামপার্শ্বে একটি আছে। আমি প্রায় নিত্য তথায় গিয়া বসিয়া থাকিতাম। এই পাহাড়ের পশ্চিমভাগে মৃত্তিকা নাই; সুতরাং তাহার অন্তরস্থ সকল স্তর দেখা যায়। এক স্তরে নুড়ি, আর এক স্তরে কাল পাথর, ইত্যাদি। কিন্তু কোন স্তরই সমসূত্র নহে, প্রত্যেকটি কোথাও উঠিয়াছে, কোথাও নামিয়াছে। আমি তাহা পূর্ব্বে লক্ষ্য করি নাই, লক্ষ্য করিবার কারণ পরে ঘটিয়াছিল। একদিন অপরাহ্লে এই পাহাড়ের মূলে দাঁড়াইয়া আছি, এমত সময় আমার একটা নেমোকহারাম ফরাসিস কুক্কুর (poodle) আপন ইচ্ছামত তাঁবুতে চলিয়া গেল, আমি রাগত হইয়া চীৎকার করিয়া তাহাকে ডাকিলাম। আমার পশ্চাতে সেই চীৎকার অত্যাশ্চর্য্যরূপে প্রতিধ্বনিত হইল। পশ্চাৎ ফিরিয়া পাহাড়ের প্রতি চাহিয়া আবার চীৎকার করিলাম, প্রতিধ্বনি আবার পূর্ব্বমত হ্রস্ব দীর্ঘ হইতে হইতে পাহাড়ের অপর প্রান্তে চলিয়া গেল। আবার চীৎকার করিলাম, শব্দ পূর্ব্ববৎ পাহাড়ের গায়ে লাগিয়া উচ্চ নীচ হইতে লাগিল। এইবার বুঝিলাম, শব্দ কোন একটি বিশেষ স্তর অবলম্বন করিয়া যায়; সেই স্তর যেখানে উঠিয়াছে বা নামিয়াছে শব্দও সেইখানে উঠিতে নামিতে থাকে। কিন্তু শব্দ দীর্ঘকাল কেন স্থায়ী হয়, যতদূর পর্য্যন্ত সেই স্তরটি আছে, ততদূর পর্য্যন্ত কেন যায়, তাহা কিছুই

বুঝিতে পারিলাম না; ঠিক যেন সেই সুরটি শব্দ কণ্ডক্টার (conductor); যে পর্য্যন্ত ননকণ্ডক্টরের সঙ্গে সংস্পর্শ না হয়, সে পর্য্যন্ত শব্দ ছুটিতে থাকে।

আর একটি পাহাড় দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। সেটি একশিলা, সমুদয়ে একখানি প্রস্তর। তাহাতে একেবারে কোথাও কণামাত্র মৃত্তিকা নাই, সমুদয় পরিষ্কার ঝর্‌ঝর্ করিতেছে। তাহার এক স্থান অনেকদূর পর্য্যন্ত ফাটিয়া গিয়াছে, সেই ফাটার উপর বৃহৎ এক অশ্বত্থগাছ জন্মিয়াছে। তখন মনে হইয়াছিল, অশ্বত্থবৃক্ষ বড় রসিক, এই নীরস পাষাণ হইতেও রসগ্রহণ করিতেছে। কিছুকাল পরে আর একদিন এই অশ্বত্থগাছ আমার মনে পড়িয়াছিল, তখন ভাবিয়াছিলাম, বৃক্ষটী বড় শোষক, ইহার নিকট নীরস পাষাণেরও নিস্তার নাই। এখন বোধ হয়, অশ্বত্থগাছটী আপন অবস্থানুরূপ কার্য্য করিতেছে; সকল বৃক্ষই যে বাঙ্গালার রসপূর্ণ কোমল ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া বিনা কষ্টে কালযাপন করিবে, এমত সম্ভব নহে। যাহার ভাগ্যে কঠিন পাষাণ, পাষাণই তাহার অবলম্বন। এখন আমি অশ্বত্থটির প্রশংসা করি।

এক্ষণে সে সকল কথা যাউক, প্রথমদিনের কথা দুই একটি বলি। অপরাহ্নে পালামৌয়ে প্রবেশ করিয়া উভয়পার্শ্বস্থ পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতে দেখিতে বনমধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম। বাঁধা পথ নাই, কেবল এক সঙ্কীর্ণ গোপথ দিয়া আমার পাল্কী চলিতে লাগিল। অনেক স্থলে উভয়পার্শ্বস্থ লতাপল্লব পাল্কী স্পর্শ করিতে লাগিল। বনবর্ণনায় যেরূপ, "শাল তাল তমাল হিন্তাল" শুনিয়াছিলাম, সেরূপ কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাল হিন্তাল একেবারেই নাই, কেবল শাল বন, অন্য বন্য গাছও আছে। শালের মধ্যে প্রকাণ্ড গাছ একটীও নাই, সকলগুলিই আমাদের দেশী কদম্ববৃক্ষের মত, না হয় কিছু বড়, কিন্তু তাহা হইলেও জঙ্গল অতি দুর্গম। কোথাও তাহায় ছেদ নাই, এই জন্য ভয়ানক। মধ্যে মধ্যে যে ছেদ আছে, তাহা অতি সামান্য। এইরূপ বন দিয়া যাইতে যাইতে এক স্থানে হঠাৎ কাষ্ঠঘণ্টার বিস্ময়কর শব্দ কর্ণগোচর হইল। কাষ্ঠঘণ্টা পূর্ব্বে মেদিনীপুর অঞ্চলে দেখিয়াছিলাম। গৃহপালিত পশু বনে পথ হারাইলে, শব্দানুসরণ করিয়া তাহাদের অনুসন্ধান করিতে হয়; এইজন্য গলঘণ্টার উৎপত্তি। কাষ্ঠঘণ্টার শব্দ শুনিলে প্রাণের ভিতর কেমন করে। পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে সে শব্দে আরও যেন অবসন্ন করে; কিন্তু সকলকে করে কি না, তাহা বলিতে পারি না।

পরে দেখিলাম, একটি মহিষ সভয়ে মুখ তুলিয়া আমার পাল্কীর প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে; তাহার গলায় কাষ্ঠঘণ্টা ঝুলিতেছে। আমি ভাবিলাম, পালিত মহিষ যখন নিকটে, তখন গ্রাম আর দূরে নহে। অল্পবিলম্বেই কিংশুক-তরুবৃত একটি ক্ষুদ্র প্রান্তর দেখা গেল, এখানে সেখানে দুই একটি মধু বা মৌয়াবৃক্ষ ভিন্ন সে প্রান্তরে অন্য কি লতা কিছুই নাই, সর্ব্বত্র অতি পরিষ্কার। পর্ব্বতচ্ছায়ায় সে প্রান্তর আরও রম্য হইয়াছে; তথায় কতকগুলি কোলবালক একত্র মহিষ চরাইতেছিল, সেরূপ কৃষ্ণবর্ণ কান্তি আর কখনও দেখি নাই; সকলের গলায় পুঁতির সাতনরী, ধুক্‌ধুকীর পরিবর্ত্তে এক একখানি গোল আরসী; পরিধানে ধড়া; কর্ণে বনফুল, কেহ মহিষপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া আছে; কেহ কেহ নৃত্য করিতেছে। সকলগুলিই যেন ব্রজগোপাল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যেরূপ স্থান, তাহাতে এই পাতুরে ছেলেগুলি উপযোগী বলিয়া বিশেষ সুন্দর দেখাইতেছিল, চারিদিকে কাল পাতর, পশুও পাতুরে, তাহাদের রাখালও সেইরূপ। এই স্থলে বলা আবশ্যক, এ অঞ্চলে মহিষ ভি গোরু নাই। আর বালকগুলি কোলে সন্তান।

এই অঞ্চলে প্রধানতঃ কোলের বাস কোলেরা বন্য জাতি, খর্ব্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ দেখিতে কুৎসিত কি রূপবান্, তাহা আ

মীমাংসা করিতে পারি না। যে সকল কোল কলিকাতা আইসে বা চা-বাগানে যায়, তাহাদের মধ্যে কাহাকেও রূপবান্ দেখি নাই; বরং অতি কুৎসিত বলিয়া বোধ করিয়াছি। কিন্তু স্বদেশে কোলমাত্রেই রূপবান্, অন্ততঃ আমার চক্ষে। বন্যেরা বনে সুন্দর; শিশুরা মাতৃ-ক্রোড়ে।

প্রান্তরের পর এক ক্ষুদ্র গ্রাম, তাহার নাম স্মরণ নাই; তথায় ত্রিশ বত্রিশটী গৃহস্থ বাস করে। সকলেরই পর্ণ কুটীর। আমার পাল্কী দেখিতে যাবতীয় স্ত্রীলোক ছুটিয়া আসিল। সকলেই আবলুসের মত কাল, সকলেই যুবতী, সকলেরই কটিদেশে একখানি করিয়া ক্ষুদ্রকাপড় জড়ান সকলেরই কক্ষ, বক্ষ আবরণশূন্য। সেই নিরাবৃত বক্ষে পুঁতির সাতনরী, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরসী ঝুলিতেছে; কর্ণে ক্ষুদ্রক্ষুদ্র বনফুল, মাথায় বড় বড় বনফুল। যুবতীরা পরস্পর কাঁধ ধরাধরি করিয়া দেখিতে লাগিল, কিন্তু দেখিল কেবল পাল্কী আর বেহারা; পাল্কীর ভিতরে কে বা কি, তাহা কেহই দেখিল না। আমাদের বাঙ্গালায়ও দেখিয়াছি, পল্লীগ্রামে বালক-বালিকারা প্রায় পাল্কী আর বেহারা দেখিয়া ক্ষান্ত হয়। তবে যদি সঙ্গে বাদ্য থাকে, তাহা হইলে, "বরকনে" দেখিবার নিমিত্ত পাল্কীর ভিতর দৃষ্টিপাত করে। যিনি পাল্কী চড়েন, সুতরাং তিনি দুর্ভাগ্য, কিন্তু গ্রাম্যবালক-বালিকারাও অতি নিষ্ঠুর, অতি নির্দ্দয়।

তাহার পর আবার কতকদূর গিয়া দেখিলাম, পথশ্রান্ত যুবতীরা মদের ভাঁটিতে বসিয়া মদ্য পান করিতেছে। গ্রামমধ্যে যে যুবতীদের দেখিয়া আসিয়াছি, ইহারাও আকারে অলঙ্কারে অবিকল সেইরূপ যেন তাহারাই আসিয়া বসিয়াছে। যুবতীরা উভয় জানু দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া দুই হস্তে শালপত্রের পাত্র ধরিয়া মদ্য পান করিতেছে, আর ঈষৎ হাস্য-বদনে সঙ্গীদের দেখিতেছে। জানু স্পর্শ করিয়া উপবেশন করা কোলজাতির স্ত্রীলোকদিগের রীতি; বোধ হয় যেন, সাঁওতালদিগেরও এই রীতি দেখিয়াছি। বনের মধ্যে যেখানে সেখানে মদের ভাঁটি দেখিলাম, কিন্তু বাঙ্গালায় ভাঁটিখানায় যেরূপ মাতাল দেখা যায়, পালামৌ পরগণায় কোন ভাঁটিখানায় তাহা দেখিলাম না। আমি পরে তাহাদের আহার-ব্যবহার সকলই দেখিতাম, কিছুই তাহারা আমার নিকট গোপন করিত না, কিন্তু কখন স্ত্রীলোকদের মাতাল হইতে দেখি নাই, অথচ তাহারা পানকুণ্ঠ নহে। তাহাদের মদের মাদকতা নাই, এ কথাও বলিতে পারি না। সেই মদ পুরুষেরা খাইয়া সর্ব্বদা মাতাল হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে কয়েকবার কেবল যুবতীর কথাই বলিয়াছি, ইচ্ছাপূর্ব্বক বলিয়াছি, এমন নহে। বাঙ্গালার পথে, ঘাটে, বৃদ্ধাই অধিক দেখা যায়, কিন্তু পলামৌঅঞ্চলে যুবতীই অধিক দেখা যায়। কোলের মধ্যে বৃদ্ধা অতি অল্প, তাহারা অধিকবয়সা হইলেও যুবতীই থাকে, অশীতি-পরায়ণ না হইলে তাহারা লোলচর্ম্ম হয় না। অতিশয় পরিশ্রমী বলিয়া গৃহকার্য্য কৃষিকার্য্য সকল কার্য্যই তাহারা করে, পুরুষেরা স্ত্রীলোকের ন্যায় কেবল বসিয়া সন্তান রক্ষা করে, কখন কখন চাটাই বুনে। আলস্য জন্য পুরুষেরা বঙ্গমহিলাদের ন্যায় শীঘ্র বৃদ্ধ হইয়া যায়; স্ত্রীলোকেরা শ্রমহেতু স্থিরযৌবনা থাকে।

লোকে বলে, পশুপক্ষীর মধ্যেই পুরুষ-জাতিই বলিষ্ঠ ও সুন্দর; মনুষ্যমধ্যেও সেই নিয়ম। কিন্তু কোলদের দেখিলে তাহা বোধ হয় না, তাহাদের স্ত্রীজাতিরাই বলিষ্ঠ ও আশ্চর্য্য কান্তিবিশিষ্টা। কিন্তু তাহাদের বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদের গায়ে খড়ি উড়িতেছে, চক্ষে মাছি উড়িতেছে, মুখে হাসি নাই, যেন সকলেরই জীবনশক্তি কমিয়া আসিয়াছে। আমার বোধ হয়, কোলজাতির ক্ষয় ধরিয়াছে। ব্যক্তিবিশেষের জীবনীশক্তি যেরূপ কমিয়া যায়, জাতিবিশেষেরও সেইরূপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, ক্রমে ক্রমে লোপ পায়। মনুষ্যের মৃত্যু আছে, জাতিরও লোপ আছে।

এই পরগণার পর্ব্বতের স্থানে স্থানে অসুরেরা বাস করে, আমি তাহাদের দেখি নাই, তাহারা কোলেদের সহিত বা অন্য কোন বন্য জাতিদের সহিত বাস করে না। শুনিয়াছি, অন্যজাতীয় মনুষ্য দেখিলে তাহারা পলায়; পর্ব্বতের অতি নিভৃত স্থানে থাকে বলিয়া তাহাদের অনুসন্ধান করা কঠিন। তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বকালে যখন আর্য্যেরা প্রথমে ভারতবর্ষে আসেন, তখন অসুরগণ অতি প্রবল ও তাহাদের সংখ্যা অসীম ছিল। অসুরেরা আসিয়া আর্য্যগণের গরু কাড়িয়া লইয়া যাইত, ঘৃত খাইয়া পলাইত, আর্য্যেরা নিরুপায় হইয়া কেবল ইন্দ্রকে ডাকিতেন, কখন কখন দলবল জুটিয়া লাঠালাঠিও করিতেন। শেষে বহুকাল পরে যখন আর্য্যগণ উন্নত ও শক্তিসম্পন্ন হইলেন, তখন অসুরগণকে তাড়াইয়াছিলেন। পরাজিত অসুরগণ ভাল ভাল স্থান আর্য্যদের ছাড়িয়া দিয়া আপনারা দুর্গম পাহাড়-পর্ব্বতে গিয়া বাসস্থাপন করে। অদ্য পর্য্যন্ত সেই পাহাড়-পর্ব্বতে তাহারা আছে, কিন্তু আর তাহাদের বল-বীর্য্য নাই; আর সে অসীম সংখ্যাও তাহাদের নাই। এক্ষণে যেরূপ অবস্থা, তাহাদের অসুরকুল ধ্বংস হইয়াছে বলিলেও অন্যায় হয় না; যে দশ পাঁচ জন এখানে সেখানে বাস করে, আর কিছুদিনের পর তাহারাও থাকিবে না।

জাতিলোপ মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে; অনেক আদিম জাতির লোপ হইয়া গিয়াছে, অদ্যাপি হইতেছে। জাতিলোপের হেতু দর্শনবিদ্‌গণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, পরাজিত জাতিরা বিজয়ী কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া অতি অযোগ্য স্থানে গিয়া বাস করিলে, পূর্ব্বস্থানে যে সকল সুবিধা ছিল, তাহার অভাবে ক্রমে তাহারা অবনত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। এ কথা অনেক স্থলে সত্য সন্দেহ নাই, অসুরগণের পক্ষে তাহাই খাটিয়াছিল বোধ হয়। কিন্তু সাঁওতালেরাও এক সময় আর্য্যগণ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া দামিনীকোতে পলায়ন করিয়াছিল। সেই অবধি অনেক কাল তথায় বাস করে, অদ্যাপি তথায় সাঁওতালেরা বাস করিতেছে, পূর্ব্বাপেক্ষা তাহাদের যে কুলক্ষয় হইয়াছে, এমত শুনা যায় না।

মারকিন ও অন্যান্য দেশে যেখানে সাহেবেরা গিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছে, সেখানকার আদিমবাসীরা ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে, তাহার কারণ কিছুই অনুভব হয় না। রেড ইণ্ডিয়ান, নাটিক ইণ্ডিয়ান, নিউ জিলাণ্ডার, নিউ হলাণ্ডার, তাস্মানীয় প্রভৃতি কত জাতি লোপ পাইতেছে। মৌরিনামক আদিম জাতি বলিষ্ঠ, বুদ্ধিমান্, কর্ম্মঠ বলিয়া পরিচিত, তাহারাও সাহেবদের অধিকারে ক্রমে লোপ পাইতেছে। ১৮৪৮ সালে তাহাদের সংখ্যা এক লক্ষ ছিল, বিশ বৎসর পরে ৩৮ হাজার হইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে সে জাতির অবস্থা কি, তাহা জানি না। বোধ হয়, এত দিনে লোপ পাইয়া থাকিবে; অথবা যদি এতদিন থাকে, তবে অতি সামান্য অবস্থায় আছে। মৌরি দুর্ব্বল নহে তৎসম্বন্ধে একজন সাহেব লিখিয়াছেন যে, "He is the noblest of savages, not equalled by the best of Red Indians. তথাপি এ জাতি লোপ পায় কেন? তুমি বলিবে, সাহেবদের অত্যাচার। তাহা কদাচ নহে, ক্যানেডার অধিবাসীসম্বন্ধে সাহেবেরা কতই যত্ন করিয়াছিলেন, কিছুতেই তাহাদের কুলক্ষয় রক্ষা করিতে পারেন নাই। ডাক্তার গিকি লিখিয়াছেন যে,

"In Canada for the last fifty years Indians have been treated with paternal kindness but the wasting never stops * * * * The government has built them houses, furnished them with ploughs, supplied them constantly with rifles, ammunition, and clothes, paid their medical attendants * * * but the result is merely this that their extinction goes on more slowly

than it otherwise would." সমাজোপযোগী ভাল স্থান ত্যাগ করিয়া বিপরীত স্থানে ত এই জাতিদের যাইতে হয় নাই, তবে তাহাদের কুললোপ হইল কেন?

কেহ কেহ বলেন যে, সাহেবদের সংস্পর্শে দোষ আছে। প্রধান জাতির সংস্পর্শে আসিলে সামান্য জাতিরা অবশ্য কতকটা উদ্যমভঙ্গ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। এ কথার প্রত্যুত্তরে একজন সাহেব লিখিয়াছেন যে ভারতবর্ষে কতই সামান্য জাতি বাস করে, কিন্তু শ্বেতকায় জাতির সংস্পর্শে তাহাদের ত কুলবৃদ্ধির ব্যাঘাত হয় না।

আমরা এ কথা সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে পারি যে, ভারতবর্ষের আদিম জাতিদের কুলক্ষয় অনেক দিন আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু ইংরেজদের সমাগমের পর কোন জাতির ক্ষয় ধরিয়াছে, এমত নিশ্চয় বলিতে পারি না। তবে কোলদের সম্বন্ধে আর কিছু সন্দেহ করা যাইতে পারে; তাহার কারণ আর এক সময় সমালোচনা করা যাইবে। এক্ষণে এ সকল কথা যাউক, অনেকের নিকট ইহা শিবের গীত বোধ হইবে। কিন্তু এ বয়সে যখন যাহা মনে হয়, তখনই তাহা বলিতে ইচ্ছা যায়। লোকের ভাল লাগিবে না, এ কথা মনে তখন থাকে না। যাহাই হউক, আগামী বারে সতর্ক হইব, কিন্তু যে কথার আলোচনা আরম্ভ করা গিয়াছিল, তাহা শেষ হয় নাই। ইচ্ছা ছিল, এই উপলক্ষে বাঙ্গালার কথা কিছু বলি; কিন্তু চারিদিকে বাঙ্গালীর উন্নতি লইয়া বাহবা পড়িয়া গিয়াছে, বাঙ্গালা ইংরেজী শিখিতেছে উপাধি পাইতেছে, বিলাত যাইতেছে; বাঙ্গালী সভ্যতার সোপানে উঠিতেছে, বাঙ্গালীর আর ভাবনা কি? এ সকল ত বাহ্যিক ব্যাপার। বঙ্গসমাজের আভ্যন্তরিক ব্যাপার কি, একবার অনুসন্ধান করিলে ভাল হয় না? শুনিতেছি, গণনায় বঙ্গবাসীদের সংখ্যা বাড়িতেছে। বড়ই ভাল!

তৃতীয় প্রবন্ধ।

পূর্ব্বে একবার 'লাতেহার' নামক পাহাড়ের উল্লেখ করিয়াছিলাম। সেই পাহাড়ের কথা আবার লিখিতে বসিয়াছি বলিয়া আমার আহ্লাদ হইতেছে। পুরাতন কথা বলিতে বড় সুখ। আবার বিশেষ সুখ এই যে, আমি শ্রোতা পাইয়াছি। তিন চারিটি নিরীহ ভদ্রলোক, বোধ হয়, তাঁহাদের বয়স হইয়া আসিতেছে, পুরাতন কথা বলিতে শীঘ্র আরম্ভ করিবেন, এমন উমেদ রাখেন, বঙ্গদর্শনে আমার লিখিত পালামৌ পর্য্যটন পড়িয়াছেন, আবার ভাল বলিয়াছেন। প্রশংসা অতিরিক্ত। তুমি প্রশংসা কর, আর না কর, বৃদ্ধ বসিয়া তোমার পুরাতন কথা শুনিবে, শুন বা না শুন, সে তোমায় কথা শুনাবে, পুরাতন কথা এইরূপে থেকে যায় সমাজের পুঁজি বাড়ে। আমার গল্পে কাহার পুঁজি বাড়িবে না, কেন না, আমার নিজের পুঁজি নাই। তথাপি গল্প করি, তোমরা শুনিয়া আমায় চিরবাধিত কর।

নিত্য অপরাহ্লে আমি লাতেহার পাহাড়ের ক্রোড়ে গিয়া বসিতাম, তাঁবুতে শত কার্য্য থাকিলেও আমি তাহা ফেলিয়া যাইতাম। চারিটা বাজিলে আমি অস্থির হইতাম, কেন, তাহা কখন ভাবিতাম না; পাহাড়ে কিছুই নূতন নাই; কাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না; কোন গল্প হইবে না; তথাপি কেন আমায় সেখানে যাইতে হইত, জানি না; এখন দেখি, এ বেগ আমার একার নহে। যে, সময় উঠানে ছায়া পড়ে, নিত্য সে সময় কুলবধূর মন মাতিয়া উঠে, জল আনিতে যাইবে, জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া জল আনিতে যাইবে; জলে যে যাইতে পারিল না, সে, অভাগিনী, সে গৃহে বসিয়া দেখে; উঠানে ছায়া পড়িতেছে, আকাশে ছায়া পড়িতেছে, পৃথিবীর রং ফিরিতেছে, বাহির হইয়া সে তাহা দেখিতে পাইল না, তাহার কত দুঃখ। বোধ

হয়, আমিও পৃথিবীর রং ফেরা দেখিতে যাইতাম। কিন্তু আর একটু আছে, সেই নির্জ্জন স্থানে মনকে একা পাইতাম, বালকের ন্যায় মনের সহিত ক্রীড়া করিতাম।

এই পাগড় অতি নির্জ্জন, কোথাও ছোট জঙ্গল নাই, সর্ব্বত্র ঘাস। অতি পরিষ্কার, তাহাও বাতাস আসিয়া নিত্য ঝাড়িয়া দেয়। মৌয়া-গাছ তথায় বিস্তর। কতকগুলি একত্রে গলাগলি ক'রে বাস করে, আর কতকগুলি বিধবার ন্যায় এখানে সেখানে একাকী থাকে। তাহারই মধ্যে একটিকে আমি বড় ভালবাসিতাম, তাহার নাম "কুমারী" রাখিয়াছিলাম। কখন তাহার ফল কি ফুল হয় নাই; কিন্তু তাহার ছায়া বড় শীতল ছিল। আমি সেই ছায়ায় বসিয়া "দুনিয়া" দেখিতাম। এই উচ্চ স্থানে বসিলে পাঁচ সাত ক্রোশ পর্য্যন্ত দেখা যাইত। দূরে চারিদিকে পাহাড়ের পরিখা, যেন সেইখানে পৃথিবীর শেষ হইয়া গিয়াছে। সেই পরিখার নিম্নে গাঢ় ছায়া, অল্প অন্ধকার বলিলেও বলা যায়। তাহার পর জঙ্গল। জঙ্গল নামিয়া ক্রমে স্পষ্ট হইয়াছে। জঙ্গলের মধ্যে দুই একটি গ্রাম হইতে ধীরে ধীরে ধূম উঠিতেছে. কোন গ্রাম হইতে হয় ত বিষণ্ণভাবে মাদল বাজিতেছে, তাহার পরে আমার তাঁবু যেন একটি শ্বেত কপোতী জঙ্গলের মধ্যে একাকী বসিয়া কি ভাবিতেছে। আমি অন্যমনস্কে এই সকল দেখিতাম; আর ভাবিতাম, এই আমার "দুনিয়া।"

একদিন এই স্থানে সুখে বসিয়া চারিদিকে দেখিতেছি, হঠাৎ একটি লতার উপর দৃষ্টি পড়িল; তাহার একটি ডালে অনেক দিনের পর চারি পাঁচটি ফুল ফুটিয়াছিল। লতা আহ্লাদে তাহা গোপন করিতে পারে নাই, যেন কাহারে দেখাইবার জন্য ডালটি বাড়াইয়া দিয়াছিল। একটি কালো কালো বড় গোচের ভ্রমর তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, আর এক একবার সেই লতায় বসিতেছিল। লতা তাহাতে নারাজ, ভ্রমর বসিলেই অস্থির হইয়া মাথা নাড়িয়া উঠে। লতাকে এইরূপ সচেতনের ন্যায় রঙ্গ করিতে দেখিয়া আমি হাসিতেছিলাম, এমত সময়ে আমার পশ্চাতে উচ্চারিত হইল,

"রাধে মন্মুং পরিহর হরিঃ পাদমূলে তবায়ম্।"

আমি পশ্চাৎ ফিরিলাম, দেখিলাম, কেহই নাই, চারিদিক্ চাহিলাম, কোথাও কেহ নাই। আমি আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেছি, এমত সময় আবার আর এক দিকে শব্দিত হইল,

"রাধে মন্মুং ইত্যাদি।"

আমার শরীর রোমাঞ্চ হইল, আমি সেই দিকে কতক সভয়ে কৌতূহলপরবশে গেলাম। সে দিকে গিয়া আর কিছু শুনিতে পাইলাম না, কিয়ৎপরেই "কুমারীর" ডাল হইতে সেই শ্লোক আবার উচ্চারিত হইল, কিন্তু তখন শ্লোকের স্পষ্টতা আর পূর্ব্বমত বোধ হইল না, কেবল সুর আর ছন্দ শুনা গেল। "কুমারীর" মূলে আসিয়া দেখি, হরিয়াল ঘুঘুর ন্যায় একটি পক্ষী আর একটির নিকট মাথা নাড়িয়া এই ছন্দে আস্ফালন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে, পক্ষিণী তাহাকে ডানা মারিয়া সরিয়া যাইতেছে, কখন কখন অন্য ডালে গিয়া বসিতেছে। এবার আমার ভ্রান্তি দূর হইল, আমি মন্দাক্রান্তাচ্ছন্দের একটি মাত্র শ্লোক জানিতাম, ছন্দটি উচ্চারণ মাত্রেই শ্লোকটি আমার মনে আসিল, সঙ্গে সঙ্গে কর্ণেও তাহার কার্য্য হইয়াছিল, আমি তাহাই শুনিয়াছিলাম "রাধে মন্মুং।" কিন্তু পক্ষী বর্ণ উচ্চারণ করে নাই, কেবল ছন্দ উচ্চারণ করিয়াছিল। তাহা যাহাই হউক, আমি অবাক্ হইয়া পক্ষীর মুখে সংস্কৃত ছন্দ শুনিতে লাগিলাম। প্রথমে মনে হইল, যিনি "উদ্ধবদূত" লিখিয়াছেন, তিনি হয় ত এই জাতি পক্ষীর নিকট ছন্দ পাইয়াছিলেন। শ্লোকটির সঙ্গে এই "কুঞ্জকীরানুবাদের" বড় সুসঙ্গতি হইয়াছে। শ্লোকটি এই—

"রাধে মন্মুং পরিহর হরিঃ পাদমূলে তবায়ং,
জাতং দৈবাদসদৃশমিদং বারমেকং ক্ষমস্ব।

এতানাকর্ণয়সি নয়বন্ কুঞ্জকীরানুবাদান্,
এভিঃ ক্রূরৈর্বয়মবিরতং বঞ্চিতা বঞ্চিতাঃ স্মঃ॥"

উদ্ধব মথুরা হইতে বৃন্দাবনে আসিয়া রাধার কুঞ্জে উপস্থিত হইলে গোপীগণ আপনাদের দুঃখের কথা তাঁহার নিকট বলিতেছেন, এমন সময় কুঞ্জের একটা পক্ষী বৃক্ষশাখা হইতে বলিয়া উঠিল, "রাধে আর রাগ করিও না। চেয়ে দেখ, স্বয়ং হরি তোমার পাদতলে। দৈবাৎ যাহা হইয়া গিয়াছে, একবার তাহা ক্ষমা কর।" গোপীরা এতবার এই কথা রাধিকাকে বলিয়াছে যে, কুঞ্জ-পক্ষীরা তাহা শিখিয়াছিল। যাহা শিখিয়াছিল, অর্থ না বুঝিয়া পক্ষীরা তাহা সর্ব্বদাই বলিত। গোপীরা উদ্ধবকে বলিলেন, "শুন্‌লে —কুঞ্জের ঐ পাখী কি বলিল—শুন্‌লে? একে বিধাতা আমাদের বঞ্চনা করেছেন, আবার দেখ, পোড়া পক্ষীও কত দগ্ধাচ্ছে।"

পক্ষী আবার বলিল, "রাধে মন্যুং পরিহর হরিঃ পাদমূলে তবায়ম্" তাহাই বলিতে ছিলাম, বিহঙ্গচ্ছন্দে বিহঙ্গের উক্তি বড় সুন্দর হইয়াছিল।

ছন্দ কি গীত শিখাইলে অনেক পক্ষী তাহা শিখিতে পারে, কিন্তু ছন্দ যে কোন পক্ষীর স্বরে স্বাভাবিক আছে, তাহা আমি জানিতাম না, সুতরাং বন্য পক্ষীর মুখে ছন্দ শুনিয়া বড় চমৎকৃত হইয়াছিলাম। পক্ষীটির সঙ্গে কতই বেড়াইলাম, কতবার এই ছন্দ শুনিলাম. শেষ সন্ধ্যা হইলে তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম। পথে আসিতে আসিতে মনে হইল, যদি এখানে কেহ ডারউইন সাহেবের ছাত্র থাকিতেন, তিনি ভাবিতেন, নিশ্চয়ই এই পক্ষীটি রাধাকুঞ্জের শিক্ষিত পক্ষীর বংশ, বৈজিক কারণে পূর্ব্বপুরুষের অভ্যস্ত শ্লোক ইহার কণ্ঠে আপনি আসিতেছে। বৈষ্ণবদের উচিত, এ বংশকে আপন আপন কুঞ্জে স্থান দেন। রাধাকুঞ্জের সকল গিয়াছে, সকল ফুরাইয়াছে, কেবল এই বংশ আছে। আমার ইচ্ছা আছে, একটি হরিয়াল পালন করি, দেখি, সে "রাধে মন্যুং পরিহর" বলে কি না বলে।

আর একদিনের কথা বলি, তাহা হইলেই লাতেহার পাহাড়ের কথা আমার শেষ হয়। যেরূপ নিত্য অপরাহ্নে এই পাহাড়ে যাইতাম, সেইরূপ আর একদিন যাইতেছিলাম, পথে দেখি, একটি যুবা বীরদর্পে পাহাড়ের দিকে যাইতেছে, পশ্চাতে কতকগুলি স্ত্রীলোক তাহাকে সাধিতে সাধিতে সঙ্গে যাইতেছে। আমি ভাবিলাম; যখন স্ত্রীলোক সাধিতেছে, তখন যুবার রাগ নিশ্চয় ভাতের উপর হইয়াছে। আমি বাঙ্গালী, সুতরাং এ ভিন্ন আর কি অনুভব করিব? এককালে এরূপ রাগ নিজেও কতবার করিয়াছি, তাহাই অঙ্গের বীরদর্প বুঝিতে পারি।

যখন আমি নিকটবর্ত্তী হইলাম, তখন স্ত্রীলোকেরা নিরস্ত হইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় যুবা সদর্পে বলিল, "আমি বাঘ মারিতে যাইতেছি। এইমাত্র আমার গরুকে বাঘে মারিয়াছে; আমি ব্রাহ্মণসন্তান; সে বাঘ না মারিয়া কোন্ মুখে আর জলগ্রহণ করিব?" আমি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, "চল, তোমার সঙ্গে যাইতেছি।" আমার অদৃষ্টদোষে বগলে বন্দুক, পায়ে বুট, পরিধানে কোট-পেন্টলেন, বাস তাঁবুতে; সুতরাং এ কথা না বলিলে ভাল দেখায় না! বিশেষতঃ অনেকে আমায় সাহেব বলিয়া জানে অতএব সাহেবি ধরণে নিঃসঙ্কোচ-চিত্তে চলিলাম। আমি স্বভাবতঃ বড় ভীত, তাহা বলিয়া ব্যাঘ্র-ভল্লুক সম্বন্ধে আমার কখন ভয় হয় নাই। বৃদ্ধ শীকারীরা কতদিন পাহাড়ে একাকী যাইতে আমায় নিষেধ করিয়াছে কিন্তু আমি তাহা কখনও গ্রাহ্য করি নাই; নিত্য একাকী যাইতাম; বাঘ আসিবে আমায় ধরিবে, আমায় খাইবে, এ সকল কথা কখনও আমার মনে আসিত না। কেন আসিত না, তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারি না। সৈনিক পুরুষদের মধ্যে অনেকে আপনার ছায়া দেখিয়া ভয় পায় অথচ অম্লানবদনে রণক্ষেত্রে গিয়া রণ করে।

লা কি তরবার তাহার অঙ্গে প্রবিষ্ট হইবে, এ কথা তাহাদের মনে আইসে না। যত দিন তাহাদের মনে এ কথা না আইসে, তত দিন লোকের নিকট তাহারা সাহসী; যে বিপদ্ না বুঝে, সেই সাহসিক। আদিম অবস্থায় সকল পুরুষই সাহসী ছিল, তাহাদের তখন ফলাফলজ্ঞান হয় নাই, জঙ্গলীদের মধ্যে অদ্যাপি দেখা যায়, সকলেই সাহসী; ইউরোপীয় সভ্যদের অপেক্ষাও অনেক অংশে সাহসী; এই হেতু ফলাফল বোধ নাই। আমি তাহাই আমার সাহসের বিশেষ গৌরব করি না। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সাহসের ভাগ কমিয়া আইসে; পেনাল কোড যত ভাল হয়, সাহস তত অন্তর্হিত হয়। এখন এ সকল কচকচি যাক।

যুবার সঙ্গে কতদূর গেলে সে আমায় বলিল, "আমি বাঘটি স্বহস্তে মারিব।" আমি হাসিয়া সম্মত হইলাম। যুবা আর কোন কথা না বলিয়া চলিল, তখন হইতে নিজের প্রতি আমার কিঞ্চিৎ ভালবাসার সঞ্চার হইল, "স্বহস্তে মারিব" এই কথায় বুঝাইয়াছিল যে, পরহস্তে বাঘ মারা সম্ভব; আমি সাহেবের বেশধারী, অবশ্য বাঘ মারিলে মারিতে পারি, যুবা এ কথা নিশ্চয় ভাবিয়াছিল। তাহাতে আমি কৃতার্থ হইয়াছিলাম। তাহার পর কতদূর গিয়া উভয়ে পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। যুবা অগ্রে, আমি পশ্চাতে। যুবার স্কন্ধে টাঙ্গী, সে একবার তাহা স্কন্ধ হইতে নামাইয়া তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাহার পর কতদূর গিয়া মৃদুস্বরে আমাকে বলিল, "আপনি জুতা খুলুন, শব্দ হইতেছে।" আমি জুতা খুলিয়া খালি পায়ে চলিতে লাগিলাম, আবার কতদূর গিয়া বলিল, "আপনি এইখানে দাঁড়ান, আমি একবার অনুসন্ধান করিয়া আসি।" আমি দাঁড়াইয়া থাকিলাম, যুবা চলিয়া গেল। প্রায় দণ্ডেক পরে যুবা আসিয়া অতি প্রফুল্ল বদনে বলিল, "হইয়াছে, সন্ধান পাইয়াছি, শীঘ্র আসুন, বাঘ নিদ্রা যাইতেছে।" আমি সঙ্গে গিয়া দেখি, পাহাড়ের এক স্থানে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার ন্যায় একটি গর্ত্ত বা গুহা আছে, তাহার মধ্যস্থানে প্রস্তর-নির্ম্মিত একটি কুটীর, চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান তাহার প্রাঙ্গণস্বরূপ। যুবা সেই গর্ত্তের নিকটে এক স্থানে দাঁড়াইয়া অতি সাবধানে ব্যাঘ্র দেখাইল। প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে ব্যাঘ্র নিরীহ ভাল মানুষের ন্যায় চোখ বুজিয়া আছে, মুখের নিকট সুন্দর নখর-সংযুক্ত একটি থাবা দর্পণের ন্যায় ধরিয়া নিদ্রা যাইতেছে। বোধ হয় নিদ্রার পূর্ব্বে থাবাটি একবার চাটিয়াছিল, যে দিকে ব্যাঘ্র নিদ্রিত ছিল, যুবা সেই দিকে চলিল; আমায় বলিল, "মাথা নত করিয়া আসুন, নতুবা প্রাঙ্গণে ছায়া পড়িবে।" তদনুসারে আমি নতশিরে চলিলাম; শেষ একখানি বৃহৎ প্রস্তরে হাত দিয়া বলিল, "আসুন, এইখান ঠেলিয়া তুলি।" উভয়ে প্রস্তরখানিকে স্থানচ্যুত করিলাম। তাহার পর যুবা গর্ত্তের প্রান্তে নিঃশব্দে লইয়া গেল, একবার ব্যাঘ্রের প্রতি চাহিল, তাহার পর প্রস্তর ঘোরববে প্রাঙ্গণে পড়িল; শব্দে কি আঘাতে তাহা ঠিক জানি না, ব্যাঘ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল; তাহার পর পড়িয়া গেল। এ নিদ্রা আর ভাঙ্গিল না। পরদিবস বাহকস্কন্ধে ব্যাঘ্রটী আমার তাঁবু পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন; কিন্তু তখন তিনি মহানিদ্রাচ্ছন্ন বলিয়া বিশেষ কোন প্রকার আলাপ হইল না।

চতুর্থ প্রবন্ধ।

আবার পালামৌর কথা লিখিতে বসিয়াছি। কিন্তু ভাবিতেছি, এবার কি লিখি! লিখিবার বিষয় এখন ত কিছুই মনে হয় না, অথচ কিছু না কিছু লিখিতে হইতেছে! ব্যাঘ্রের পরিচয় ত আর ভাল লাগে না; পাহাড়-জঙ্গলের কথাও হইয়া গিয়াছে, তবে আর লিখিবার আছে কি? পাহাড়, জঙ্গল, বাঘ, এই লইয়াই পালামৌ। যে সকল ব্যক্তিরা তথায় বাস করে, তাহারা জঙ্গলী

কুৎসিত, কদাকার জানোয়ার, তাহাদের পরিচয় লেখা বৃথা।

কিন্তু আবার মনে হয়, পালামৌ-জঙ্গলে কিছুই সুন্দর নাই, এ কথা বলিলে লোকে আমায় কি বিবেচনা করিবে? সুতরাং পালামৌ সম্বন্ধে দুটা কথা বলা আবশ্যক।

একদিন সন্ধ্যার পর চিকপর্দ্দা ফেলিয়া তাঁবুতে একা বসিয়া সাহেবী ঢঙ্গে কুক্কুরী লইয়া ক্রীড়া করিতেছি, এমত সময় একজন কে আসিয়া বাহির হইতে আমায় ডাকিল, "খাঁ সাহেব!" আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। এখন হাসি পায়, কিন্তু তখন বড়ই রাগ হইয়াছিল। রাগ হইবার অনেক কারণও ছিল; কারণ নম্বর এক এই যে, আমি মান্য ব্যক্তি; আমাকে ডাকিবার সাধ্য কাহার? আমি যাঁহার অধীন, অথবা যিনি আমা অপেক্ষা অতি প্রধান, কিংবা যিনি আমার বিশেষ আত্মীয়, কেবল তিনিই আমাকে ডাকিতে পারেন। অন্য লোকে "শুনুন" বলিলে সহ্য হয় না।

কারণ নম্বর দুই যে, আমাকে "খাঁ সাহেব" বলিয়াছে। বরং "খাঁ বাহাদুর" বলিলে কতক সহ্য করিতে পারিতাম, ভাবিতাম, হয় ত লোকটা আমাকে মুসলমান বিবেচনা করিয়াছে, কিন্তু পদের অগৌরব করে নাই। "খাঁ সাহেব" অর্থে যাহাই হউক, ব্যবহারে তাহা আমাদের "বোস মশায়" বা "দাস মশায়" অপেক্ষা অধিক মান্যের উপাধি নহে। হারম্যান কোম্পানী যাহার কাপড় সেলাই করে, ফরাসী দেশে যাহার জুতা সেলাই হয়, তাহাকে "বোস মহাশয়" বা "দাস মহাশয়" বলিলে সহ্য হইবে কেন? "বাবু মহাশয়" বলিলেও মন উঠে না। অতএব স্থির করিলাম, এ ব্যক্তি যেই হউক, আমাকে তুচ্ছ করিয়াছে, আমাকে অপমান করিয়াছে।

সেই মুহূর্ত্তে তাহাকে ইহার বিশেষ প্রতিফল পাইতে হইত, কিন্তু "হারামজাদ্", "বদ্জাত" প্রভৃতি সাহেবস্বভাবসুলভ গালি ব্যতীত আর তাহাকে কিছুই দিই নাই, এই আমার বাহাদুরী। বোধ হয়, সে রাত্রে বড় শীত পড়িয়াছিল, তাহাই তাঁবুর বাহিরে যাইতেই সাহস করি নাই। আগন্তুক গালি খাইয়া আর কোন উত্তর করিল না। বোধ হয়, চলিয়া গেল। আমি চিরকাল জানি, যে গালি খায়, সে হয় ভয়ে মিনতি করে, নতুবা গালি অকারণ দেওয়া হইয়াছে প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত তর্ক করে, তাহা কিছুই না করায় আমি ভাবিলাম, এ ব্যক্তি "চমৎকার লোক।" সেও হয় ত ভাবিল, "চমৎকার লোক।" নাম জানে না, পদ জানে না, কি ব'লে ডাকিবে, তাহা জানে না; সুতরাং দেশীয় প্রথা অনুসারে সম্ভ্রম করিয়া 'খাঁ সাহেব' বলিয়া ডাকিয়াছে, তাহার উত্তরে যে 'হারামজাদ্' বলিয়া গালি দেয়, তাহাকে "চমৎকার লোক" ব্যতীত আর কি মনে করিবে?

দণ্ডেক পরে আমার "খানসামা বাবু" তাঁবুর দ্বারে আসিয়া ঈষৎ কণ্ঠকণ্ডূয়ন-শব্দ দ্বারা আপনার আগমনবার্ত্তা জানাইল। আমার তখনও রাগ আছে, "খানসামা বাবু"ও তাহা জানিত, এই জন্য কলিকা-হস্তে তাঁবুতে প্রবেশ করিল, কিন্তু অগ্রসর হইল না, দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া, অতি গম্ভীরভাবে কলিকায় "ফুঁ" দিতে লাগিল। আমি তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া ভাবিতেছি, কতক্ষণে কলিকা আলবোলায় বসাইয়া দিবে। এমন সময়ে দ্বারে পার্শ্বে কি নড়িল, চাহিয়া দেখিলাম, সেদিকে কিছুই নাই, কেবল নীল আকাশে নক্ষত্র জ্বলিতেছে; তাহার পরেই দেখি, দুইটি অস্পষ্ট মনুষ্যমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে। টেবিলের বাতি সরাইলাম, আলোক তাহাদের অঙ্গে পড়িল, দেখিলাম, একটি বৃদ্ধ আবক্ষ শ্বেতশ্মশ্রুতে পরিপ্লুত, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ী, তাহার পার্শ্বে একটি স্ত্রীলোক, বোধ হয় যেন যুবতী। আমি তাহাদের প্রতি চাহিবামাত্র উভয়ে দ্বারের নিকট অগ্রসর হইয়া যোড়-হস্তে নতশিরে আমায় সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। যুবতীর মুখ দেখিয়া বোধ হইল যেন, বড় ভয় পাইয়াছে, অথচ ওষ্ঠে ঈষৎ হাসি আছে

তাহার যুগ্মভ্রূ দেখিয়া আমার মনে হইল যেন, অতি ঊর্দ্ধে নীল আকাশে কোন বৃহৎ পক্ষী পক্ষ বিস্তার করিয়া ভাসিতেছে। আমি অনিমিষলোচনে সুন্দরী দেখিতে লাগিলাম; কেন আসিয়াছে, কোথায় বাড়ী এ কথা তখন মনে আসিল না। আমি কেবল তাহার রূপ দেখিতে লাগিলাম, তাহাকে দেখিয়াই প্রথমে একটি রূপবতী পক্ষিণী মনে পড়িল; "গেঙ্গোখালি মোহনায়" যেখানে ইংরেজেরা প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন, সেইখানে একদিন অপরাহ্নে বন্দুক স্কন্ধে পক্ষী শীকার করিতে গিয়াছিলাম, তথায় কোন বৃক্ষের শুষ্কডালে একটি ক্ষুদ্র পক্ষী অতি বিষণ্ণভাবে বসিয়াছিল, আমি তাহার সম্মুখে গিয়া দাড়াইলাম। আমায় দেখিয়া পক্ষী উড়িল না, মাথা হেলাইয়া আমায় দেখিতে লাগিল। ভাবিলাম, "জঙ্গলী পাখী হয় ত কখন মানুষ দেখে নাই. দেখিলে বিশ্বাসঘাতককে চিনিত।" চিনাইবার নিমিত্ত আমি হাসিয়া বন্দুক তুলিলাম; তবু পক্ষী উড়িল না, বুক পাতিয়া আমার মুখ প্রতি চাহিয়া রহিল। আমি অপ্রতিভ হইলাম, তখন ধীরে ধীরে বন্দুক নামাইয়া অনিমিষলোচনে পক্ষীকে দেখিতে লাগিলাম। তাহার কি আশ্চর্য্য রূপ! সেই পক্ষিণীতে যে রূপরাশি দেখিয়াছিলাম, এই যুবতীতে ঠিক তাহাই দেখিলাম। আমি কখন কবির চক্ষে রূপ দেখি নাই, চিরকাল বালকের মত রূপ দেখিয়া থাকি, এই জন্য আমি যাহা দেখি, তাহা অন্যকে বুঝাইতে পারি না। রূপ যে কি জিনিস, রূপের আকার কি, শরীরের কোন্ কোন্ স্থানে তাহার বাস, এ সকল বার্ত্তা আমাদের বঙ্গকবিরা বিশেষ জানেন, এই জন্য তাঁহারা অঙ্গ বাছিয়া বাছিয়া বর্ণনা করিতে পারেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি তাহা পারি না। তাহার কারণ, আমি কখন অঙ্গ বাছিয়া রূপ তল্লাস করি নাই। আমি যে প্রকারে রূপ দেখি, নির্লজ্জ হইয়া তাহা বলিতে পারি। একবার আমি দুই বৎসরের একটী শিশু গৃহে রাখিয়া বিদেশে গিয়াছিলাম। শিশুকে সর্ব্বদাই মনে হইত, তাহার ন্যায় রূপ আর কাহারও দেখিতে পাইতাম না। অনেক দিনের পর একটী ছাগশিশুতে সেই রূপরাশি দেখিয়া আহ্লাদে তাহাকে বুকে করিয়াছিলাম। আমার সেই চক্ষু! আমি রূপরাশি কি বুঝিব? তথাপি যুবতীকে দেখিতে লাগিলাম।

বাল্যকালে আমার মনে হইত যে, ভূত প্রেত যে প্রকার নিজে দেহহীন, অন্যের দেহ আবির্ভাবে বিকাশ পায়, রূপও সেই প্রকার অন্য দেহ অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়, কিন্তু প্রভেদ এই যে. ভূতের আশ্রয় কেবল মনুষ্য, বিশেষতঃ মানবী। কিন্তু বৃক্ষ, পল্লব, নদ ও নদী প্রভৃতি সকলেই রূপ আশ্রয় করে। যুবতীতে যে রূপ, লতায় সেই রূপ, নদীতেও সেই রূপ, পক্ষীতেও সেই রূপ, ছাগেও সেই রূপ; সুতরাং রূপ এক। তবে পাত্রভেদ। আমি পাত্র দেখিয়া ভুলি না, দেহ দেখিয়া ভুলি না; ভুলি কেবল রূপে। সে রূপ লতায় থাক অথবা যুবতীতে থাক, আমার মনের চক্ষে তাহার কোন প্রভেদ দেখি না। অনেকের এই প্রকার রুচিবিকার আছে যাঁহারা বলেন, যুবতীর দেহ দেখিয়া ভুলিয়াছেন, তাঁহাদের মিথ্যাকথা।

আমি যুবতীকে দেখিতেছি, এমন সময় আমার খানসামা বাবু বলিল, "এরা বাই, এরাই তখন খাঁ সাহেব বলিয়া ডাকিয়াছিল। শুনিবামাত্র আবার রাগ পূর্ব্বমত গর্জ্জিয়া উঠিল, চীৎকার করিয়া আমি তাহাদের তাড়াইয়া দিলাম; সেই অবধি আর তাহাদে[র] কথা কেহ আমায় বলে নাই। পরদিবস অপ[র]রাহ্নে দেখি, এক বটতলায় ছোট বড় কতক[গু]লা স্ত্রীলোক বসিয়া আছে, নিকটে দু-একট[া] "বেতো" ঘোড়া চরিতেছে; জিজ্ঞাসা করা[য়] জানিলাম, তাহারাও "বাই"; ব্যয়-লাঘ[ব] করিবার নিমিত্ত তাহারা পালামৌ দিয়া যাই[]তেছে। এই সময় পূর্ব্বরাত্রের বাইকে আমা[র] স্মরণ হইল, তাহার গীত শুনিব মনে করি[য়া] তাহাকে ডাকিতে পাঠাইলাম। কিন্তু লো[ক] ফিরিয়া আসিয়া বলিল, অতি প্রত্যূষে [] চলিয়া গিয়াছে। আমি আর কোন ক[]

কহিলাম না-দেখিয়া একজন রাজপুত প্রতি-বাসী বলিল, "সে কাঁদিয়া গিয়াছে।"

আ। কেন?

প্র। এই জঙ্গল দিয়া আসিতে আসিতে তাহার সঙ্গীরা সকলে মরিয়াছে, মাত্র এক-জন বৃদ্ধ সঙ্গে ছিল, খরচাও ফুরাইয়াছে। দুই দিন উপবাস করেছে, আরও কত দিন উপবাস করিতে হয়, বলা যায় না। এ জঙ্গল-পাহাড়মধ্যে কোথা ভিক্ষা পাইবে? আপ-নার নিকট ভিক্ষার নিমিত্ত আসিয়াছিল, আপনিও ভিক্ষা দেন নাই।

এ কথা শুনিয়া আমার কষ্ট হইল, তাহার বিপদ্ কতক অনুভব করিতে পারিলাম, নিজে সেই অবস্থায় পড়িলে কি যন্ত্রণা পাই-তাম, তাহা কল্পনা করিতে লাগিলাম। জঙ্গলে অন্নাভাব, আর অপার নদীতে নৌকা-ডুবি একই প্রকার। আমি তাহাকে অনায়াসে দুই পাঁচ টাকা দিতে পারিতাম, তাহাতে নিজের কোন ক্ষতি হইত না, অথচ সে রক্ষা পাইত। আমি তাহাকে উদ্ধার করিলাম না, তাড়াইয়া দিলাম; এ নিষ্ঠুরতার ফল এক-দিন আমায় অবশ্য পাইতে হইবে, এইরূপ কথা আমার সর্ব্বদা মনে হইত। দুই চারি দিনের পর একটি সাহেবের সহিত আমার দেখা হইল। তিনি দশ ক্রোশ দূরে একা থাকিতেন, গল্প করিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে আমার তাঁবুতে আসিতেন। গল্প করিতে করিতে আমি তাঁহাকে যুবতীর কথা বলি-লাম। তিনি কিয়ৎক্ষণ রহস্য করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "আমি স্ত্রীলোকটির কথা শুনিয়াছি; সে এ জঙ্গল অতিক্রম করিতে পারে নাই, পথেই মরিয়াছে।" এ কথা সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, আমার বড়ই কষ্ট হইল; আমি কেবল অহঙ্কারের চাতুরীতে পড়িয়া "খাঁ সাহেব" কথায় চটিয়া-ছিলাম। তখন জানিতাম না যে, একদিন আপনার অহঙ্কারে আপনি হাসিব।

সাহেবকে বিদায় দিয়া অপরাহ্নে যুব-তীর কথা ভাবিতে ভাবিতে পাহাড়ের দিকে যাইতে লাগিলাম, পথিমধ্যে কতকগুলি কোলকন্যার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহারা "দাড়ি" হইতে জল তুলিতেছিল। এই অঞ্চলে জলাশয় একেবারেই নাই. নদী শীতকালে একেবারে শুষ্কপ্রায় হইয়া যায়, সুতরাং গ্রাম্যলোকেরা এক এক স্থানে "পাতকোয়ার" আকারে ক্ষুদ্র খাদ খনন করে—তাহা দুই হাতের অধিক গভীর করিতে হয় না—সেই খাদে জল চুঁইয়া জমে। আট দশ কলস তুলিলে. আর কিছুই থাকে না। আবার জল ক্রমে আসিয়া জমে। এই ক্ষুদ্র খাদগুলিকে দাড়ি বলে।

কোলকন্যারা আমাকে দেখিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের মধ্যে একটি লম্বোদরী—সর্ব্বা-পেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা—মাথায় পূর্ণ কলস দুই হস্তে ধরিয়া হাস্যমুখে আমায় বলিল, "রাত্রে নাচ দেখিতে আসিবেন?" আমি মাথা হেলা-ইয়া স্বীকার করিলাম, অমনি সকলে হাসিয়া উঠিল। কোলের যুবতীরা যত হাসে, যত নাচে, বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোন জাতির কন্যারা তত হাসিতে নাচিতে পারে না, আমাদের দুরন্ত ছেলেরা তাহার শতাংশে পারে না।

সন্ধ্যার পর আমি নৃত্য দেখিতে গেলাম। গ্রামের প্রান্তভাগে এক বটবৃক্ষতলে গ্রামস্থ যুবারা সমুদয়ই আসিয়া একত্র হইয়াছে। তাহারা "খোঁপা" বাঁধিয়াছে. তাহাতে দুই তিনখানি কাঠের "চিরুণী" সাজাইয়াছে কেহ মাদল আনিয়াছে, কেহ বা লম্বা লাঠি আনিয়াছে, রিক্তহস্তে কেহই আসে নাই বয়সের দোষে সকলেরই দেহ চঞ্চল, সকলে নানা ভঙ্গীতে আপন আপন বলবীর্য্য দেখাই-তেছে। বৃদ্ধেরা বৃক্ষমূলে উচ্চ মৃণ্ময় মঞ্চের উপর বসিয়া আছে, তাহাদের জানু প্রায় স্কন্ধ ছাড়াইয়াছে, তাহারা বসিয়া নানা ভঙ্গীতে কেবল ওষ্ঠক্রীড়া করিতেছে। আমি গিয়া তাহাদের পার্শ্বে বসিলাম।

এই সময় দলে দলে গ্রামস্থ যুবতীরা আসিয়া জমিতে লাগিল; তাহারা আসি-য়াই যুবাদিগের প্রতি উপহাস আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে বড় হাসির ঘটা পড়িয়া

গেল। উপহাস আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, কেবল অনুভবে স্থির করিলাম যে, যুবারা ঠকিয়া গেল। ঠকিবার কথা, যুবা দশ বারটী, কিন্তু যুবতীরা প্রায় চল্লিশ জনে হাসিলে, হাইলণ্ডের পলটন ঠকে।

হাস্য-উপহাস্য শেষ হইলে নৃত্যের উদ্‌যোগ আরম্ভ হইল। যুবতী সকলে হাত ধরাধরি করিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রেখা বিন্যাস করিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে বড় চমৎকার হইল। সকলগুলিই পাথুরে কাল; সকলেরই অনাবৃত দেহ; সকলেরই সেই অনাবৃত বক্ষে আরসির ধুক্‌ধুকি চন্দ্রকিরণে একবার জ্বলিয়া উঠিতেছে। আবার সকলের মাথায় বনপুষ্প, কর্ণে বনপুষ্প, ওষ্ঠে হাসি। সকলেই অ হ্লাদে পরিপূর্ণ, আহ্লাদে চঞ্চল, যেন তেজঃপুঞ্জ অশ্বের ন্যায় সকলেই দেহবেগ সংযম করিতেছে।

সম্মুখে যুবারা দাঁড়াইয়া, পশ্চাতে মৃণ্ময়-মঞ্চোপরি বৃদ্ধেরা এবং তৎসঙ্গে এই নরাধম। বৃদ্ধেরা ইঙ্গিত করিলে যুবাদের দলে মাদল বাজিল, অমনি যুবতীদের দেহ যেন শিহরিয়া উঠিল; যদি দেহের কোলাহল থাকে, তবে যুবতীদের দেহে কোলাহল পড়িয়া গেল, পরেই তাহারা নৃত্য আরম্ভ করিল। তাহাদের নৃত্য আমাদের চক্ষে নূতন; তাহারা তালে তালে পা ফেলিতেছে, অথচ কেহ চলে না; দোলে না, টলে না। যে যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সে সেইখানে দাঁড়াইয়া তালে তালে পা ফেলিতে লাগিল, তাহাদের মাথার ফুলগুলি নাচিতে লাগিল, বুকের ধুক্‌ধুকি দুলিতে লাগিল।

নৃত্য আরম্ভ হইলে পর একজন বৃদ্ধ মঞ্চ হইতে কম্পিতকণ্ঠে একটী গীতের "মহড়া" আরম্ভ করিল, অমনি যুবারা সেই গীত উচ্চৈঃস্বরে গাইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে যুবতীরা তীব্র তানে "ধুয়া" ধরিল। যুবতীদের স্বরের ঢেউ নিকটের পাহাড়ে গিয়া লাগিতে লাগিল। আমার তখন স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল যেন, স্বর কখন পাহাড়ের মূল পর্য্যন্ত, কখন পাহাড়ের বুক পর্য্যন্ত গিয়া ঠেকিতেছে। তাল পাহাড়ে ঠেকা অনেকের নিকট রহস্যের কথা, কিন্তু আমার নিকট তাহা নহে, আমার লেখা পড়িতে গেলে এরূপ প্রলাপবাক্য মধ্যে মধ্যে সহ্য করিতে হইবে।

যুবতীরা তালে তালে নাচিতেছে, তাহাদের মাথার বনফুল সেই সঙ্গে সঙ্গে উঠিতেছে, নামিতেছে, আবার সেই ফুলের দুটী একটী ঝরিয়া তাহাদের স্কন্ধে পড়িতেছে। শীতকাল, নিকটে দুই তিন স্থানে হু হু করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে, অগ্নির আলোকে নর্ত্তকীদের বর্ণ আরও কাল দেখাইতেছে; তাহারা তালে তালে নাচিতেছে, নাচিতে নাচিতে ফুলের পাপড়ির ন্যায় সকলে এক একবার "চিতিয়া" পড়িতেছে; আকাশ হইতে চন্দ্র তাহা দেখিয়া হাসিতেছে, আর বটমূলের অন্ধকারে বসিয়া আমি হাসিতেছি।

নৃত্যের শেষ পর্য্যন্ত আর থাকিতে পারিলাম না; বড় শীত; অধিকক্ষণ থাকা গেল না।

পঞ্চম প্রবন্ধ।

কোলের নৃত্য-সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলা হইয়েছে, এবার তাহাদের বিবাহের পরিচয় দিতে ইচ্ছা হইতেছে। কোলের অনেক শাখা আছে। আমার স্মরণ নাই, বোধ হয় যেন, উরাঙ, মুণ্ডা, খেরওয়ার এবং দোসাদ এই চারি জাতি তাহার মধ্যে প্রধান। ইহার এক জাতির বিবাহে আমি বরযাত্রী হইয়া কতক দূর গিয়াছিলাম। বরকর্ত্তা আমার পাল্‌কী লইয়া গেল, কিন্তু আমায় নিমন্ত্রণ করিল না। ভাবিলাম, না করুক, আমি রবাহূত যাইব। সেই অভিপ্রায়ে অপরাহ্নে পথে দাঁড়াইয়া থাকিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি, পাল্‌কীতে বর আসিতেছে। সঙ্গে দশ বার জন পুরুষ আর পাঁচ ছয় জন যুবতী, যুবতীগণও বরযাত্রী। পুরুষেরা আমায় কেহ ডাকিল না, স্ত্রীলোকের চক্ষুলজ্জা আছে, তাহারা হাসিয়া আমায়

ডাকিল, আমিও হাসিয়া তাহাদের সঙ্গে চলিলাম, কিন্তু অধিক দূর যাইতে পারিলাম না; তাহারা যেরূপ বুক ফুলাইয়া, মুখ তুলিয়া, বায়ু ঠেলিয়া মহাদম্ভে চলিতেছিল, আমি দুর্ব্বল বাঙ্গালী, আমার সে দম্ভ, সে শক্তি কোথায়? সুতরাং কতদূর গিয়া পিছাইলাম; তাহারা তাহা লক্ষ্য করিল না; হয় ত দেখিয়াও দেখিল না; আমি বাঁচিলাম। তখন পথপ্রান্তে এক প্রস্তরস্তূপে বসিয়া ঘর্ম্ম মুছিতে লাগিলাম, আর রাগভরে পাতুরে মেয়েগুলাকে গালি দিতে লাগিলাম। তাহাদিগকে সিপাই বলিলাম, সিদ্ধেশ্বরীর পাল বলিলাম, আর কত কি বলিলাম। আর একবার বহু পূর্ব্বে এইরূপ গালি দিয়াছিলাম। একদিন বেলা দুই প্রহরের সময় টিটাগড়ের বাগান 'লসিংটন লজ' হইতে গজেন্দ্রগমনে আমি আসিতেছিলাম —তখন রেলওয়ে ছিল না; সুতরাং এখনকার মত বেগে পথ চলা বাঙ্গালীর মধ্যে বড় ফেসন হয় নাই—আসিতে আসিতে পশ্চাতে একটা টক্ টক্ শব্দ শুনিতে পাইলাম, ফিরে দেখি, গবর্ণর জেনেরেল কাউন্সলের অমুক মেম্বারের কুলকন্যা একা আসিতেছেন। আমি তখন বালক, ষোড়শ বৎসরের অধিক আমার বয়স নহে, সুতরাং বয়সের মত স্থির করিলাম, স্ত্রীলোকের নিকট পিছাইয়া পড়া হইবে না; অতএব যথাসাধ্য চলিতে লাগিলাম। হয় ত যুবতীও তাহা বুঝিলেন। আর একটু অধিক বয়স হইলে এদিকে তাঁহার মন যাইত না। তিনি নিজে অল্পবয়স্কা; আমার অপেক্ষা কিঞ্চিৎমাত্র বয়োজ্যেষ্ঠা; সুতরাং এই উপলক্ষে বাইচ খেলার আমোদ মনে আসা সম্ভব। সেইজন্য একটু যেন জোরে বাহিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে পশ্চিমের মেঘের মত আমাকে ছাড়াইয়া গেলেন; যেন সেই সঙ্গে একটু 'দুয়ো' দিয়া গেলেন—অবশ্য তাহা মনে মনে, তাঁহার [illegible] শ্রী একটু হাসি ছিল, তাহাই বলিতে[illegible] লজ্জিত হইয়া নিকটস্থ বটমূলে বসিয়া [illegible]দের উপর রাগ করিয়া নানা কথা বলিতে লাগিলাম। যাহারা এত জোরে পথ চলে, তাহারা আবার কোমলাঙ্গী? তোমামুদেরা বলে, তাহাদের অলকদাম সরাইবার নিমিত্ত বায়ু ধীরে ধীরে বহে;—কলাগাছে ঝড়, আর শিমুল গাছে সমীরণ? সে সকল রাগের কথা এখন যাক্; যে হারে, সেই রাগে। কোলের কথা হইতেছিল। তাহাদের সকল জাতির মধ্যে একরূপ বিবাহ নহে। এক জাতি কোল আছে, তাহারা উরাঙ কি, কি, স্মরণ নাই, তাহাদের বিবাহ-প্রথা অতি পুরাতন। তাহাদের প্রত্যেক গ্রামের প্রান্তে একখানি করিয়া বড় ঘর থাকে। সেই ঘরে সন্ধ্যার পরে একে একে গ্রামের সমুদয় কুমারীরা আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই ঘর তাহাদের ডিপো। বিবাহযোগ্যা হইলে আর তাহারা পিতৃগৃহে রাত্রিযাপন করিতে পায় না। সকলে উপস্থিত হইয়া শয়ন করিলে গ্রামের অবিবাহিত যুবারা ক্রমে ক্রমে সকলে সেই ঘরের নিকটে আসিয়া রসিকতা আরম্ভ করে; কেহ গীত গায়, কেহ নৃত্য করে, কেহ বা রহস্য করে। যে কুমারীর বিবাহের সময় হয় নাই, সে অবাধে নিদ্রা যায়, কিন্তু যাহাদের সময় উপস্থিত, তাহারা বসন্তকালের পক্ষিণীর ন্যায় অনিমিষলোচনে সেই নৃত্য দেখিতে থাকে। একাগ্রচিত্তে সেই গীত শুনিতে থাকে। হয় ত থাকিতে না পারিয়া শেষ ঠাট্টার উত্তর দেয়, কেহ বা গালি পর্য্যন্ত দেয়। গালি আর ঠাট্টা উভয়ে প্রভেদ অল্প, বিশেষ যুবতীর মুখ-বিনির্গত হইলে যুবার কর্ণে উভয়ই সুধা বর্ষণ করে। কুমারীরা গালি আরম্ভ করিলে কুমারেরা আনন্দে মাতিয়া উঠে।

এইরূপে প্রতি রাত্রিতে কুমার-কুমারীর বাক্‌চাতুরী হইতে থাকে। শেষে তাহাদের প্রণয় উপস্থিত হয়। প্রণয় কথাটী ঠিক নহে। কোলেরা প্রেম প্রীতের বড় সম্বন্ধ রাখে না। মনোনীত কথাটি ঠিক। নৃত্য হাস্য-উপহাস্যের পর পরস্পর মনোনীত হইলে সঙ্গীসঙ্গিনীরা তাহা কাণাকাণি করিতে

থাকে। ক্রমে গ্রামে রাষ্ট হইয়া পড়ে। রাষ্ট কথা শুনিয়া উভয় পক্ষের পিতৃকুল সাবধান হইতে থাকে। সাবধানতা অন্য বিষয়ে নহে, কুমারীর আত্মীয়-বন্ধুরা বড় বড় বাঁশ কাটে, তীর ধনুক সংগ্রহ করে; অস্ত্রশস্ত্রে শাণ দেয় আর অনবরত কুমারের আত্মীয়বন্ধুকে গালি দিতে থাকে। চীৎকার আর আস্ফালনের সীমা থাকে না। আবার এদিকে উভয় পক্ষে গোপনে গোপনে বিবাহের আয়োজনও আরম্ভ করে।

শেষ একদিন অপরাহ্নে কুমারী হাসি হাসি মুখে বেশবিন্যাস করিতে বসে। সকলে বুঝিয়া চারি পার্শ্বে দাঁড়ায়। হয় ত ছোট ভগিনী বন হইতে নূতন ফুল আনিয়া মাথায় পরাইয়া দেয়, বেশবিন্যাস হইলে কুমারী উঠিয়া গাগরী লইয়া একা জল আনিতে যায়। অন্য দিনের মত নহে, এ দিনে ধীরে ধীরে যায়, তবু মাথার গাগরী টলে। বনের ধারে জল যেন কতই দূর! কুমারী যাইতেছে আর অনিমেষলোচনে বনের দিকে চাহিতেছে। চাহিতে চাহিতে বনের দুই একটী ফল দুলিয়া উঠিল, তাহার পর এক নবযুবা সখা সুবলের মত লাফাইতে লাফাইতে সেই বন হইতে বহির্গত হইল। সঙ্গে সঙ্গে হয় ত দুটা চারিটা ভ্রমরও ছুটিয়া আসিল। কোল-কুমারীর মাথা হইতে গাগরী পড়িয়া গেল। কুমারীকে বুকে করিয়া যুবা তখনি ছুটিল। কুমারী সুতরাং এ অবস্থায় চীৎকার করিতে বাধ্য, চীৎকারও সে করিতে লাগিল, হাত-প আছড়াইল এবং চড়টা চাপড়টাও যুবাকে মারিল; নতুবা ভাল দেখায় না। কুমারীর চীৎকারে তাহার আত্মীয়েরা মার মার রবে আসিয়া পড়িল। যুবার আত্মীয়েরাও নিকটে এখানে সেখানে লুকাইয়া ছিল, তাহারা বাহির হইয়া পথ রোধ করিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধ রুক্মিণীহরণের যাত্রার মত, সকলের তীর আকাশমুখী। কিন্তু শুনিয়াছি, দুই একবার নাকি সত্য সত্যই মাথা কাটাকাটিও হইয়া গিয়াছে। যাহাই হউক, শেষ যুদ্ধের পর আপোষ হইয়া যায় এবং তৎক্ষণাৎ উভয় পক্ষে একত্র আহার করিতে বসে। এইরূপ কন্যাহরণ করাই তাহাদের বিবাহ, আর স্বতন্ত্র কোন মন্ত্র নাই। আমাদের শাস্ত্রে এই বিবাহকে আসুরিক বিবাহ বলে। এক সময় পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই বিবাহ প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশে, স্ত্রী আচারের সময় বরের পৃষ্ঠে বাঁউটিবেষ্টিত নানা ওজনের করকমল যে সংস্পর্শ হয়, তাহাও এই মারপিট প্রথার অবশেষ। হিন্দুস্থান অঞ্চলে বরকন্যার মাসী পিসী একত্র জুটিয়া নানা ভঙ্গীতে, নানা ছন্দে, মেছুয়া-বাজারের ভাষায় পরস্পরকে যে গালি দিবার রীতি আছে, তাহাও এই মারপিটের প্রথার নূতন সংস্কার। ইংরেজদের বরকন্যা গির্জ্জা হইতে গাড়ীতে উঠিবার সময় পুষ্পবৃষ্টির ন্যায় তাহাদের অঙ্গে যে জুতা-বৃষ্টি হয়, তাহাও এই পূর্ব্বপ্রথার অন্তর্গত। *

কোলদের উৎসব সর্ব্বাপেক্ষা বিবাহে। তদুপলক্ষে ব্যয়ও বিস্তর। আট টাকা, দশ টাকা, কখন কখন পনর টাকা ব্যয় হয়। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা অতি সামান্য; কিন্তু বন্যের পক্ষে অতিরিক্ত। এত টাকা তাহারা কোথায় পাইবে? তাহাদের এক পয়সাও সঞ্চয় নাই, কোন উপার্জ্জনও নাই, সুতরাং ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত কর্জ্জ করিতে হয়। দুই চারি গ্রাম অন্তর একজন হিন্দুস্থানী মহাজন বাস করে, তাহারাই কর্জ্জ দেয়। এই হিন্দুস্থানীরা মহাজন কি মহাপিশাচ, সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। তাহাদের নিকট একবার কর্জ্জ করিলে আর উদ্ধার নাই। যে একবার পাঁচ টাকা-মাত্র কর্জ্জ করিল, সে সেই দিন হইতে আপন গৃহে আর কিছুই লইয়া যাইতে পারিবে না, যাহা উপার্জ্জন করিবে, তাহা মহাজনকে আনিয়া দিতে হইবে। খাদকের ভূমিতে দুই মণ কার্পাস কি চারি মণ যব জন্মিয়াছে; মহাজনের নিকটে তাহা আনীত

* যে আসুরিক বিবাহের পরিচয় দিলাম, তাহা শাস্ত্রীয় নহে। কেন না, ইহা স্বজাতি বিবাহ

হইবে। তিনি তাহা ওজন করিবেন, পরীক্ষা করিবেন, কত কি করিবেন, শেষ হিসাব করিয়া বলিবেন যে,আসল পাঁচ টাকার মধ্যে এই কার্পাসে কেবল এক টাকা শোধ গেল, আর চারি টাকা বাকী থাকিল। খাদক, 'যে আজ্ঞা' বলিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু তাহার পরিবার খায় কি? চাষে যাহা জন্মিয়াছিল, মহাজন তাহা সমুদয় লইল। খাদক হিসাব জানে না, এক হইতে দশ গণনা করিতে পারে না, সকলের উপর তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। মহাজন যে অন্যায় করিবে, ইহা তাহার বুদ্ধিতে আইসে না, সুতরাং মহাজনের জালে বদ্ধ হইল। তাহার পর পরিবার আহার পায় না, আবার মহাজনের নিকট খোরাকী কর্জ্জ করা আবশ্যক, সুতরাং খাদক জন্মের মত মহাজনের নিকট বিক্রীত হইল। যাহা সে উপার্জ্জন করিবে, তাহা মহাজনের। মহাজন তাহাকে যৎসামান্য খোরাকি দিবে। এই তাহার শেষ এ জন্মের বন্দোবস্ত।

কেহ কেহ এই উপলক্ষে 'সামকনামা' লিখিয়া দেয়। সামকনামা অর্থাৎ দাসখত। যে ইহা লিখিয়া দিল সে রীতিমত গোলাম হইল। মহাজন গোলামকে কেবল আহার দেন, গোলাম বিনা বেতনে তাঁহার সমুদয় কর্ম্ম করে; চাষ করে, মোট বহে, সর্ব্বত্র সঙ্গে যায়। আপনার সংসারের সঙ্গে আর তাহার কোন সম্বন্ধ থাকে না। তাহাদের সংসারও অন্নাভাবে শীঘ্রই লোপ পায়।

কোলদের এই দুর্দ্দশা অতি সাধারণ। তাহাদের এক উপায় আছে—পলায়ন। অনেকেই পলাইয়া রক্ষা পায় যে না পলাইল, সে জন্মের মত মহাজনের নিকট বিক্রীত থাকিল।

পুত্রের বিবাহ দিতে গিয়া যে কেবল কোলের জীবনযাত্রা বৃথা হয়, এমত নহে, আমাদের বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকের দুর্দ্দশা পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে অথবা পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধ উপলক্ষে। সকলেই মনে মনে জানেন, আমি বড়লোক, আমি ধুমধামে না করিলে লোকে আমার নিন্দা করিবে। সুতরাং কর্জ্জ করিয়া সেই বড়লোকত্ব রক্ষা করেন, তাহার পর যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সে কর্জ্জ হইতে উদ্ধার হওয়া ভার হয়। প্রায় দেখা যায়,"আমি, ধনবান্" বলিয়া প্রথমে অভিমান জন্মিলে শেষ দারিদ্র্যদশায় জীবন শেষ করিতে হয়।

কোলেরা সকলেই বিবাহ করে। বাঙ্গালা শস্যশালিনী, এখানে অল্পেই গুজরান চলে, তাহাই বাঙ্গালায় বিবাহ এত সাধারণ। কিন্তু পালামৌ অঞ্চলে সম্পূর্ণ অন্নাভাব, সেখানে বিবাহ এরূপ সাধারণ কেন, তদ্বিষয়ে সমাজতত্ত্ববিদেরা কি বলেন, জানি না। কিন্তু বোধ হয়, হিন্দুস্থানী মহাজনেরা তথায় বাস করিবার পূর্ব্বে কোলদের এত অন্নাভাব ছিল না, তাহাই বিবাহ সাধারণ হইয়াছিল এক্ষণে মহাজনেরা তাহাদের সর্ব্বস্ব লয়। তাহাদের অন্নাভাব হইয়াছে, সুতরাং বিবাহ আর পূর্ব্বমত সাধারণ থাকিবে না বলিয়া বোধ হয়।

কোলের সমাজ এক্ষণে যে অবস্থায় আছে দেখা যায়, তাহাতে সেখানে মহাজনের আবশ্যক নাই, যদি হিন্দুস্থানী সভ্যতা তথায় প্রবিষ্ট না হইত, তাহা হইলে অদ্যাপি কোলের মধ্যে ঋণের প্রথা উৎপত্তি হইত না। ঋণের সময় হয় নাই। ঋণ উন্নত সমাজের সৃষ্টি। কোলদিগের মধ্যে সে উন্নতির বিলম্ব আছে। সমাজের স্বভাবতঃ যে অবস্থা হয় নাই, কৃত্রিম উপায়ে সে অবস্থা ঘটাইতে গেলে, অথবা সভ্য দেশের নিয়মাদি অসময়ে অসভ্য দেশে প্রবিষ্ট করাইতে গেলে, ফল ভাল হয় না। আমাদের বাঙ্গালায় এ কথার অনেক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এক সময়ে ইহুদি মহাজনেরা ঋণদানের সভ্য নিয়ম অসভ্য বিলাতে প্রবেশ করাইয়া অনেক অনিষ্ট ঘটাইয়াছিল। এক্ষণে হিন্দুস্থানী মহাজনেরা কোলেদের সেইরূপ অনিষ্ট ঘটাইতেছে।

কোলের নববধূ আমি কখন দেখি নাই। কুমারী একরাত্রের মধ্যে নববধূ দেখিতে আশ্চর্য্য! বাঙ্গালার দুরন্ত ছুঁড়ীরা ধূলাখেলা

করিয়া বেড়াইতেছে, ভাইকে পিটাইতেছে, পরের গোরুকে গাল দিতেছে, পাড়ার ভাল-খাকীদের সঙ্গে কোঁদল করিতেছে, বিবাহের কথা উঠিলে ছুঁড়ী গালি দিয়া পলাইতেছে। তাহার পর একরাত্রে ভাবান্তর। বিবাহের পরদিন প্রাতে আর সে পূর্ব্বমত দুরন্ত ছুঁড়ী নাই। এক রাত্রে তাহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আমি একটী এইরূপ নববধূ দেখিয়াছি। তাহার পরিচয় দিতে ইচ্ছা হয়।

বিবাহের রাত্রি আমোদে গেল। পরদিন প্রাতে উঠিয়া নববধূ ছোট ভাইকে আদর করিল, নিকটে মা ছিলেন, নববধূ মার মুখ প্রতি একবার চাহিল। মার চক্ষে জল আসিল। নববধূ মুখাবনত করিল, কাঁদিল না। তাহার পর ধীরে ধীরে এক নির্জ্জন স্থানে গিয়া দ্বারে মাথা রাখিয়া অন্যমনস্কে দাঁড়াইয়া শিশিরসিক্ত সামিয়ানার প্রতি চাহিয়া রহিল। সামিয়ানা হইতে টোপে টোপে উঠানে শিশির পড়িতেছে। সামিয়ানা হইতে উঠানের দিকে তাহার দৃষ্টি গেল। উঠানের এখানে সেখানে পূর্ব্বরাত্রের উচ্ছিষ্টপত্র পড়িয়া রহিয়াছে, রাত্রের কথা নববধূর মনে হইল। কত আলো! কত বাদ্য! কত লোক! কত কলরব! যেন স্বপ্ন! এখন সেখানে ভাঙ্গা ভাঁড়, ছেঁড়া পাতা। নববধূর সেই দিকে দৃষ্টি গেল। একটী দুর্ব্বলা কুক্কুরী—নবপ্রসূতি—পেটের জ্বালায় শুষ্কপত্রে ভগ্ন পাত্রে আহার খুঁজিতেছে। নববধূর চক্ষে জল আসিল। জল মুছিয়া নববধূ ধীরে ধীরে মাতৃকক্ষে গিয়া লুচি আনিয়া কুক্কুরীকে দিল। এই সময় নববধূর পিতা অন্দরে আসিতেছিলেন, কুক্কুরীভোজন দেখিয়া একটু হাসিলেন। নববধূ পূর্ব্বমত আর দৌড়িয়া পিতার কাছে গেল না, অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। পিতা বলিলেন, "ব্রাহ্মণভোজনের পর কুক্কুর-ভোজনই হইয়া থাকে, রাত্রে তাহা হইয়া গিয়াছে, অদ্য আবার এ কেন মা?" নববধূ কথা কহিল না। কহিলে হয় ত বলিত, "এই কুক্কুরী সংসারী।"

পূর্ব্বে বলিয়াছি, নববধূ লুচি আনিতে যাইবার সময় ধীরে ধীরে গিয়াছিল, আর দুই তিন দিন পূর্ব্বে হইলে দৌড়িয়া যাইত। যখন সেই ঘরে গেল, তখন দেখিল, মাতার সম্মুখে কতকগুলি লুচি সন্দেশ রহিয়াছে। নববধূ জিজ্ঞাসা করিল, "মা, লুচি নেব?" মাতা লুচিগুলি হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, "কেন মা, আজ চাহিয়া নিলে? যাহা তোমার ইচ্ছা, তুমি আপনি লও, ছড়াও, ফেলিয়া দাও, নষ্ট কর, কখন কাহাকেও ত জিজ্ঞাসা ক'রে লও না? আজ কেন মা চাহিয়া নিলে? তবে সত্যই আজ থেকে কি তুমি পর হ'লে? আমায় পর ভাবিলে?" বলিয়া মা কাঁদিতে লাগিলেন। নববধূ বলিল, "না মা! বলি, বুঝি কার জন্যে রেখেছ।" নববধূ হয় ত মনে করিল, পূর্ব্বে আমায় "ওই" বলিতে, আজ কেন তবে আমায় "তুমি" বলিয়া কথা কহিতেছ?

নববধূর পরিবর্ত্তন সকলের নিকট স্পষ্ট নহে সত্য, কিন্তু যিনি অনুধাবন করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, পরিবর্ত্তন অতি আশ্চর্য্য! একরাত্রের পরিবর্ত্তন বলিয়া আশ্চর্য্য! নববধূর মুখশ্রী একরাত্রে একটু গম্ভীর হয়, অথচ তাহাতে একটু আহ্লাদের আভাস থাকে। তদ্ব্যতীত যেন একটু সাবধান, একটু নম্র, একটু সঙ্কুচিত বলিয়া বোধ হয়। ঠিক যেন শেষ রাত্রের পদ্ম। বালিকা কি বুঝিল যে, মনের এই পরিবর্ত্তন হঠাৎ একরাত্রের মধ্যে হইল।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী।

প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই জীবিতকালে আপন আপন কৃত কার্য্যের পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অনেকের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। যাঁহাদের কার্য্য দেশ-কালের উপযোগী নহে, বরং তাহার অগ্রগামী, তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে না। যাঁহারা লোকরঞ্জন অপেক্ষা লোকহিতকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তাঁহাদের ভাগ্যেও ঘটে না। যাঁহাদের প্রতিভার এক অংশ উজ্জ্বল, অপরাংশ ম্লান, কখন ভস্মাচ্ছন্ন, কখন প্রদীপ্ত, তাঁহাদের ভাগ্যেও ঘটে না; কেন না, অন্ধকার কাটিয়া দীপ্তির প্রকাশ পাইতে দিন লাগে।

ইহার মধ্যে কোন্ কারণে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় * তাঁহার জীবিতকালে, বাঙ্গালা সাহিত্যসভায় তাঁহার উপযুক্ত আসন প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাহা এ জীবনী পাঠে পাঠক বুঝিতে পারেন। কিন্তু তিনি যে এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে আপনার উপযুক্ত আসন প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাহা যিনি তাঁহার গ্রন্থগুলি যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিবেন, তিনিই স্বীকার করিবেন। কালে সে আসন প্রাপ্ত হইবেন। আমি বা চন্দ্রনাথবাবু এক এক কলম লিখিয়া, তাঁহাকে এক্ষণে সে স্থান দিতে পারিব, এমন ভরসায় আমি উপস্থিত কর্ম্মে ব্রতী হই নাই। তবে আমাদের এক অতি বলবান্ সহায় আছে—কাল, আমাদের সহায়। কালক্রমে ইহা অবশ্য ঘটিবে। আমরাও কালের অনুচর; তাই কালসাপেক্ষ কার্য্যের সূত্রপাতে এক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

৺সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমার সহোদর। আমি ভ্রাতৃস্নেহ বশতঃ তাঁহার জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হই নাই। আমি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দিনবন্ধু মিত্র এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের জন্য যাহা করিয়াছি, আমার অগ্রজের জন্য তাহাই করিতেছি। তবে ভ্রাতৃস্নেহসুলভ পক্ষপাতের পরিবাদভয়ে তাঁহার গ্রন্থ সমালোচনার ভার আমি গ্রহণ করিলাম না। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার ও আমার পরমসুহৃৎ বিখ্যাত সমালোচক বাবু চন্দ্রনাথ বসু এই ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে ও পাঠকবর্গকে বাধিত করিয়াছেন।

জীবনী লিখিবারও আমি উপযুক্ত পাত্র নহি। যাঁহার জীবনী লেখা যায়, তাঁহার দোষ-গুণ উভয় কীর্ত্তন না করিলে, জীবনী লোকশিক্ষার উপযোগী হয় না—জীবনী লেখার উদ্দেশ্য সফল হয় না। সকল মানুষেরই দোষ গুণ দুই থাকে; আমার অগ্রজেরও ছিল। কিন্তু তাঁহার দোষ-কীর্ত্তনে আমার প্রবৃত্তি হইতে পারে না, আমি তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিলে লোকে বিশ্বাস করিবে না, ভ্রাতৃস্নেহজনিত পক্ষপাতের ভিতর ফেলিবে।

---

* ইহাঁর প্রকৃত নাম সঞ্জীবনচন্দ্র, কিন্তু সংক্ষেপানুরোধে সঞ্জীবচন্দ্র নামই ব্যবহৃত হইত। প্রকৃত নামের আশ্রয় লইয়াই এই সংগ্রহের নাম দিয়াছি, সঞ্জীবনী সুধা।

কিন্তু তাঁহার জীবনের ঘটনা সকল আমি ভিন্ন আর কেহ সবিশেষ জানে না। সুতরাং আমিই লিখিতে বাধ্য।

লিখিতে গেলে, দোষগুণের কথা কিছুই লিখিব না, এমন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা যায় না, কেন না, কিছু কিছু দোষ-গুণের কথা না বলিলে, ঘটনাগুলি বুঝান যায় না। যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে তাঁহার দোষে বা তাঁহার গুণে ঘটিয়াছিল। কি দোষে কি গুণে ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতে হইবে। তবে যাহাতে গুণ-দোষের কথা খুব কম বলিতে হয়, সে চেষ্টা করি।

অবসতি গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় একশ্রেণীর ফুলিয়া কুলীনদিগের পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহার বাস ছিল হুগলী জেলার অন্তঃপাতী দেশমুখো। তাঁহার বংশীয় রামজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ কাঁটাল-পাড়াগ্রামনিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতামহের বিষয় প্রাপ্ত হইয়া কাঁটালপাড়ায় বাস করিতে লাগিলেন। সেই অবধি রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের বংশীয় সকলেই কাঁটালপাড়ায় বাস করিতেছেন। এই ক্ষুদ্র লেখকই কেবল স্থানান্তরবাসী।

সেই কাঁটালপাড়া সঞ্জীবচন্দ্রের জন্মভূমি।* তিনি কথিত রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র, পরামারাধ্য ৺যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। ১৭৫৬ শকে বৈশাখ মাসে ইহাঁর জন্ম। যাঁহারা জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত, তাঁহাদের কৌতূহল নিবারণার্থ ইহা লেখা আবশ্যক যে, তাঁহার জন্মকালে; তিনটী গ্রহ, অর্থাৎ রবি, চন্দ্র, রাহু তুঙ্গী, এবং শুক্র স্বক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে, লগ্নাধিপতি ও দশমাধিপতি অস্তমিত। দেখিবেন, ফল মিলিয়াছে কি না।

সে সময়ে গ্রাম্য প্রদেশে পাঠশালার গুরুমহাশয় শিক্ষামন্দিরের দ্বাররক্ষক ছিলেন; তাঁহার সাহায্যে সকলকেই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিতে হইত। অতএব সঞ্জীবচন্দ্র যথাকালে এই বেত্রপাণি দৌবারিকের হস্তে সমর্পিত হইলেন। গুরুমহাশয় যদিও সঞ্জীবচন্দ্রের বিদ্যা-শিক্ষার উদ্দেশেই নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তথাপি হাট-বাজার করা ইত্যাদি কার্য্যে তাঁহার মনোভিনিবেশ বেশী ছিল, কেন না, তাহাতে উপরি লাভের সম্ভাবনা। সুতরাং ছাত্রও বিদ্যার্জ্জনে তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না। লাভের ভাগটা গুরুরই গুরুতর রহিল।

এই সময়ে আমাদিগের পিতা, মেদিনীপুরে ডেপুটী কালেক্টরী করিতেন। আমরা সকলে কাঁটালপাড়া হইতে তাঁহার সন্নিধানে নীত হইলাম। সঞ্জীবচন্দ্র মেদিনীপুরের স্কুলে প্রবিষ্ট হইলেন। কিছুকালের পর আবার আমাদিগকে কাঁটালপাড়ায় আসিতে হইল। এবার সঞ্জীবচন্দ্র হুগলী কলেজে প্রেরিত হইলেন। তিনি কিছু দিন সেখানে

---

* জীবনী লিখিবার অনুরোধে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেও কেবল সঞ্জীবচন্দ্র বলিয়া লিখিতে বাধ্য হইতেছি। প্রথাটা অত্যন্ত ইংরাজি রকমের, কিন্তু যখন আমার পরমসুহৃদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তখন 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।' বিশেষ তিনি আমারই "দাদা মহাশয়"; কিন্তু পাঠকের কাছে সঞ্জীবচন্দ্র মাত্র। অতএব দাদা মহাশয়, দাদা মহাশয় পুনঃ পুনঃ পাঠকের রুচিকর না হইতে পারে।

অধ্যয়ন করিলে আবার একজন "গুরু মহাশয়" নিযুক্ত হইলেন। আমার ভাগ্যোদয়ক্রমেই এই মহাশয়ের শুভাগমন; কেন না, আমাকে ক, খ, শিখিতে হইবে, কিন্তু বিপদ্ অনেক সময়েই সংক্রামক। সঞ্জীবচন্দ্রও রামপ্রাণ সরকারের হস্তে সমর্পিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমরা আট দশ মাসে এই মহাত্মার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মেদিনীপুর গেলাম। সেখানে সঞ্জীবচন্দ্র আবার মেদিনীপুরে ইংরেজি স্কুলে প্রবিষ্ট হইলেন।

সেখানে তিন চারি বৎসর কাটিল। সঞ্জীবচন্দ্র অনায়াসে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রদিদের মধ্যে স্থান লাভ করিলেন। এইখানে তিনি তখনকার প্রচলিত Junior Scholarship পরীক্ষা দিলে, তাঁহার বিদ্যোপার্জ্জনের পথ সুগম হইত; কিন্তু বিধাতা সেরূপ বিধান করিলেন না। পরীক্ষার অল্পকাল পূর্ব্বেই আমাদিগকে মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইল। আবার কাঁটালপাড়ায় আসিলাম, সঞ্জীবচন্দ্রকে আবার হুগলী কলেজে প্রবিষ্ট হইতে হইল। Junior Scholarship পরীক্ষার বিলম্ব পড়িয়া গেল।

এই সকল ঘটনাগুলিকে গুরুতর শিক্ষাবিভ্রাট বলিতে হইবে। আজি এ স্কুলে কাল ও স্কুলে, আজি গুরু মহাশয়, কালি মাষ্টার, আবার গুরু মহাশয়, আবার মাষ্টার, এরূপ শিক্ষাবিভ্রাট ঘটিলে কেহই সুচারুরূপে বিদ্যোপার্জ্জন করিতে পারে না। যাঁহারা গবর্ণমেণ্টে উচ্চতর চাকরী করেন, তাঁহাদের সন্তানগণকে প্রায় সচরাচর এইরূপ শিক্ষাবিভ্রাটে পড়িতে হয়। গৃহকর্ত্তার বিশেষ মনোযোগ, অর্থব্যয় এবং আত্মসুখের লাঘবস্বীকার ব্যতীত ইহার সদুপায় হইতে পারে না।

কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, দুই দিকেই বিষম সঙ্কট। বালক-বালিকাদিগের শিক্ষা অতিশয় সতর্কতার কাজ; এক দিকে পুনঃ পুনঃ বিদ্যালয়-পরিবর্ত্তনে বিদ্যা-শিক্ষার অতিশয় বিশৃঙ্খলতার সম্ভাবনা; আর দিকে আপনার শাসনে বালক না থাকিলে বালকদের বিদ্যাশিক্ষায় আলস্য বা কুসংসর্গ ঘটনা খুব সম্ভব। সঞ্জীবচন্দ্র প্রথমে, প্রথমোক্ত বিপদে পড়িয়াছিলেন, এক্ষণে অদৃষ্টদোষে দ্বিতীয় বিপদেও তাঁহাকে পড়িতে হইল। এই সময়ে পিতৃদেব বিদেশে, আমাদিগের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সহোদরও চাকরী উপলক্ষে বিদেশে। মধ্যম সঞ্জীবচন্দ্র বালক হইলেও কর্ত্তা—

Lord of himself; that heritage of woe!

কাজেই কতকগুলা বিদ্যানুশীলনবিমুখ ক্রীড়াকৌতুকপরায়ণ বালক—ঠিক বালক নহে, বয়ঃপ্রাপ্ত যুবা, আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিল।

সঞ্জীবচন্দ্র চিরকাল সমান উদার, প্রীতি-পরবশ। প্রাচীন বয়সেও আশ্রিত অনুগত ব্যক্তি কুস্বভাবাপন্ন হইলেও তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারিতেন না। কৈশোরে যে তাহা পারেন নাই, তাহা বলা বাহুল্য। কাজেই, বিদ্যাচর্চ্চার হানি হইতে লাগিল। নিম্নলিখিত ঘটনাটীতে তাহা কিছুকালের জন্য একেবারে বন্ধ হইল।

হুগলী কলেজে পুনঃপ্রবিষ্ট হওয়ার পর প্রথম পরীক্ষার সময় উপস্থিত। একদিন হেড মাষ্টার গ্রেব্‌স সাহেব আসিয়া কোন্ দিন কোন্ ক্লাসের পরীক্ষা হইবে, তাহা বলিয়া দিয়া গেলেন। সঞ্জীবচন্দ্র কালেজ হইতে বাড়ী আসিয়া স্থির করিলেন, এ দুই দিন বাড়ী থাকিয়া ভাল করিয়া পড়া শুনা করা যাউক, কালেজে যাইব না, পরীক্ষার দিন যাইব। তাহাই করিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁহাদিগের

ক্লাসের পরীক্ষার দিন বদল হইল—অবধারিত দিবসের পূর্ব্বদিন পরীক্ষা হইবে স্থির হইল। আমি সে সন্ধান জানিতে পারিয়া, অগ্রজকে তাহা জানাইলাম। বুঝিলাম যে,তিনি পরীক্ষা দিতে কালেজে যাইবেন। কিন্তু পরীক্ষার দিন, কালেজে যাইবার সময় দেখিলাম,তিনি উপরিলিখিত বানর-সম্প্রদায়ের মধ্যে একজনের সঙ্গে সতরঞ্চ খেলিতেছেন। বিদ্যার মধ্যে এইটী তাহারা অনুশীলন করিত, এবং সঞ্জীবচন্দ্রকে এ বিদ্যা দান করিয়াছিল। আমি তখন পরীক্ষার, কথাটা সঞ্জীবচন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দিলাম। কিন্তু বানর-সম্প্রদায় সেখানে দলে ভারী ছিল; তাহারা বাদানুবাদ করিয়া প্রতিপন্ন করিল যে, আমি অতিশয় দুষ্ট বালক, কেন না, লেখাপড়া করার ভান্ করিয়া থাকি,এবং কখন কখন গোয়েন্দাগিরী করিয়া বানর-সম্প্রদায়ের কীর্ত্তিকলাপ মাতৃদেবীর শ্রীচরণে নিবেদন করি। কাজেই ইহাই সম্ভব যে, আমি গল্পটা রচনা করিয়া বলিয়াছি। সরলচিত্ত সঞ্জীবচন্দ্র তাহাই বিশ্বাস করিলেন। পরীক্ষা দিতে গেলেন না। তৎকালে প্রচলিত নিয়মানুসারে কাজেই উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন না। ইহাতে এমন ভগ্নোৎসাহ হইলেন যে, তৎক্ষণাৎ কালেজ পরিত্যাগ করিলেন, কাহারও কথা শুনিলেন না।

তখন পিতাঠাকুর বর্দ্ধমানে ডেপুটী কালেক্টর। তখন রেল হয় নাই; বর্দ্ধমান দূরদেশ, এই সংবাদ যথাকালে তাঁহার কাছে পৌঁছিল। তাঁহার বিজ্ঞতা অসাধারণ ছিল, তিনি এই সংবাদ পাইযা পুত্রকে আপনার নিকট লইয়া গেলেন। তাঁহার স্বভাবচরিত্র বিলক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিলেন যে, ইহাকে তাড়না করিয়া আবার কালেজে পাঠাইলে এখন কিছু হইবে না, যখন স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া বিদ্যোপার্জ্জন করিবে, তখন সুফল ফলিবে।

তাহাই ঘটিল। সহসা সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা জ্বলিয়া উঠিল। যে আগুন এতদিন ভস্মাচ্ছন্ন ছিল,হঠাৎ তাহা জ্বালাবিশিষ্ট হইয়া চারিদিক্ আলো করিল। এই সময়ে আমাদিগের সর্ব্বাগ্রজ ৺শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় বারাকপুরে চাকরী করিতেন। তখন সেখানে গবর্ণমেণ্টের একটী উত্তম ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল ছিল। প্রধান শিক্ষকের বিশেষ খ্যাতি ছিল। সঞ্জীবচন্দ্র Junior Scholarship পরীক্ষা দিবার জন্য প্রথম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন, পরীক্ষা দিবার জন্য তিনি এরূপ প্রস্তুত হইলেন যে, সকলেই আশা করিল যে,তিনি পরীক্ষায় বিশেষ যশোলাভ করিবেন; কিন্তু বিধিলিপি এই যে, পরীক্ষায় তিনি চিরজীবন বিফলযত্ন হইবেন। এবার পরীক্ষার দিন তাঁহার গুরুতর পীড়া হইল; শয্যা হইতে উঠিতে পারিলেন না। পরীক্ষা দেওয়া হইল না।

তার পর আর সঞ্জীবচন্দ্র কোন বিদ্যালয়ে গেলেন না। বিনা সাহায্যে,নিজ প্রতিভাবলে অল্পদিনে ইংরেজি সাহিত্যে, বিজ্ঞানে এবং ইতিহাসে অসাধারণ শিক্ষা লাভ করিলেন। কালেজে যে ফল ফলিত, ঘরে বসিয়া তাহা সমস্ত লাভ করিলেন।

তখন পিতৃদেব বিবেচনা করিলেন যে, এখন ইহাকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। তিনি সঞ্জীবচন্দ্রকে বর্দ্ধমান কমিশনরের আপিসে একটী সামান্য কেরাণীগিরী করিয়া দিলেন। কেরাণীগিরীটী সামান্য,কিন্তু উন্নতির আশা অসামান্য। তাঁহার সঙ্গে যে যে সে আপিসে কেরাণীগিরী করিত,সকলেই পরে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইয়াছিল। ইনিও হইতেন, উপায়ান্তরে হইয়াছিলেন। কিন্তু এ পথে আমি একটা প্রতিবন্ধক উপস্থিত করি-

লাম। তিনি যে একটী ক্ষুদ্র কেরাণীগিরী করিতেন, ইহা আমার অসহ্য হইত। তখন নূতন প্রেসিডেন্সি কলেজ খুলিয়াছিল; তাহার "Law class" তখন নূতন। আমি তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। তখন যে কেহ তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারিত। আমি অগ্রজকে পরামর্শ দিয়া কেরাণীগিরীটী পরিত্যাগ করাইয়া ল ক্লাসে প্রবিষ্ট করাইলাম। আমি শেষ পর্য্যন্ত রহিলাম না; দুই বৎসর পড়িয়া চাকরী করিতে গেলাম। তিনি শেষ পর্য্যন্ত রহিলেন; কিন্তু পড়াশুনায় আর মনোযোগ করিলেন না। পরীক্ষায় সুফল বিধাতা তাঁহার অদৃষ্টে লিখেন নাই। পরীক্ষায় নিষ্ফল হইলেন। তখন প্রতিভা ভস্মাচ্ছন্ন।

তখন উদারচেতা মহাত্মা, এ সকল ফলাফল কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া, কাঁটালপাড়ায় মনোহর পুষ্পোদ্যান রচনায় মনোযোগ দিলেন। পিতা ঠাকুর মনে করিলেন, পুত্র পুষ্পোদ্যানে অর্থব্যয় করা অপেক্ষা, অর্থ উপার্জ্জন করা ভাল। তিনি যাহা মনে করিতেন, তাহা করিতেন। তখন উইলসন সাহেব নূতন ইন্কমটেক্স বসাইয়াছেন। তাহার অবধারণ জন্য জেলায় জেলায় আসেসর নিযুক্ত হইতেছিল। পিতাঠাকুর সঞ্জীবচন্দ্রকে আড়াই শত টাকা বেতনের একটী আসেসরিতে নিযুক্ত করাইলেন। সঞ্জীবচন্দ্র হুগলী জেলায় নিযুক্ত হইলেন।

কয়েক বৎসর আসেসরি করা হইল। তার পর পদটা এবলিশ হইল। পুনশ্চ কাঁটালপাড়ায় পুষ্পপ্রিয়, সৌন্দর্য্যপ্রিয়, সুখপ্রিয় সঞ্জীবচন্দ্র আবার পুষ্পোদ্যান রচনায় মনোযোগ দিলেন। কিন্তু এবার একটা বড় গোলযোগ উপস্থিত হইল। জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অভিপ্রায় করিলেন যে, পিতৃদেবের দ্বারা নূতন শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করাইবেন। তিনি সেই মনোহর পুষ্পোদ্যান ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহার উপর শিবমন্দির প্রস্তুত করিলেন। দুঃখে সঞ্জীবচন্দ্রের ভস্মাচ্ছাদিত প্রতিভা আবার জ্বলিয়া উঠিল—সেই অগ্নিশিখায় জন্মিল—"Bengal Ryot."

এই পুস্তকখানি ইংরেজিতে লিখিত। এখনকার পাঠক জানেন না যে, এ জিনিসটা কি? কিন্তু একদিন এই পুস্তক হাইকোর্টের জজদিগেরও হাতে ফিরিয়াছে। এই পুস্তকখানি প্রণয়নে সঞ্জীবচন্দ্র বিস্ময়কর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। প্রত্যহ কাঁটালপাড়া হইতে দশটার সময়ে ট্রেণে কলিকাতায় আসিয়া রাশি রাশি প্রাচীন পুস্তক ঘাঁটিয়া অভিলষিত তত্ত্ব সকল বাহির করিয়া সংগ্রহ করিয়া লইয়া সন্ধ্যাকালে বাড়ী যাইতেন। রাত্রে তাহা সাজাইয়া লিপিবদ্ধ করিয়া প্রাতে আবার কলিকাতায় আসিতেন। পুস্তকখানির বিষয়, (১) বঙ্গীয় প্রজাদিগের পূর্ব্বতন অবস্থা, (২) ইংরেজের আমলে প্রজাদিগের সম্বন্ধে যে সকল আইন হইয়াছে, তাহার ইতিবৃত্ত ও ফলাফল বিচার, (৩) ১৮৫৯ সালের দশ আইনের বিচার, (৪) প্রজাদিগের উন্নতির জন্য যাহা কর্ত্তব্য।

পুস্তকখানি প্রচারিত হইবামাত্র, বড় বড় সাহেবমহলে বড় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। রিবিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী চাপমান্ সাহেব স্বয়ং কলিকাতা রিবিউতে ইহার সমালোচনা করিলেন। অনেক ইংরেজ বলিলেন যে, ইংরেজও এমন গ্রন্থ লিখিতে পারে নাই। হাইকোর্টের জজেরা ইহা অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ঠাকুরাণী দাসীর মোকর্দ্দমায় ১৫জন জজ ফুলবেঞ্চে বসিয়া প্রজাপক্ষে যে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, এই গ্রন্থ অনেক পরিমাণে তাহার প্রবৃত্তিদায়ক। গ্রন্থখানি দেশের অনেক মঙ্গল সিদ্ধ করিয়া এক্ষণে লোপ পাইয়াছে, তাহার কারণ, ১৮৫৯ সালের দশ আইন রহিত

হইয়াছে; Hills vs, Iswar Ghose মোকদ্দমার ব্যবস্থা রহিত হইয়াছে। এই দুই ইহার লক্ষ্য ছিল।

গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর সাহেব সঞ্জীবচন্দ্রকে একটী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী পদ উপহার দিলেন। পত্র পাইয়া সঞ্জীবচন্দ্র আমাকে বলিলেন, "ইহাতে পরীক্ষা দিতে হয়; আমি কখন পরীক্ষা দিতে পারি না; সুতরাং এ চাকরী আমার থাকিবে না।"

পরিশেষে তাহাই ঘটিল, কিন্তু এক্ষণে সঞ্জীবচন্দ্র কৃষ্ণনগরে নিযুক্ত হইলেন। তখনকার সমাজের ও কাব্যজগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র দিনবন্ধু মিত্র তখন তথায় বাস করিতেন। ইহাঁদের পরস্পরে আন্তরিক, অকপট বন্ধুতা ছিল; উভয়ে উভয়ের প্রণয়ে অতিশয় সুখী হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরের অনেক সুশিক্ষিত মহাত্মা ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের নিকট সমাগত হইতেন; দিনবন্ধু ও সঞ্জীবচন্দ্র উভয়েই কথোপকথনে অতিশয় সুরসিক ছিলেন। সরস কথোপকথন-তরঙ্গে প্রত্যহ আনন্দ-স্রোত উচ্ছলিত হইত। কৃষ্ণনগর-বাসকালই সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা সুখের সময় ছিল। শরীর নীরোগ, বলিষ্ঠ; অভিলষিত পদ, প্রয়োজনীয় অর্থাগম, পিতামাতার অপরিমিত স্নেহ; ভ্রাতৃগণের সৌহৃদ্য, পারিবারিক সুখ, এবং বহু সৎসুহৃদ্‌সংসর্গসঞ্জাত অক্ষুণ্ণ আনন্দপ্রবাহ। মনুষ্য যাহা চায়, সকলই তিনি এই সময়ে পাইয়াছিলেন।

দুই বৎসর এইরূপে কৃষ্ণনগরে কাটিল। তাহার পর গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কোন গুরুতর কার্য্যের ভার দিয়া পালামৌ পাঠাইলেন। পালামৌ তখন ব্যাঘ্র-ভল্লুকের আবাসভূমি; বন্যপ্রদেশ মাত্র। সুহৃদ্‌প্রিয় সঞ্জীবচন্দ্র সে বিজন বনে একা তিষ্ঠিতে পারিলেন না। শীঘ্রই বিদায় লইয়া আসিলেন। বিদায় ফুরাইলে আবার যাইতে হইল, কিন্তু যে দিন পালামৌ পৌঁছিলেন, সেই দিনই পালামৌর উপর রাগ করিয়া বিনা বিদায়ে চলিয়া আসিলেন। আজিকার দিনে, এবং সে কালেও এরূপ কাজ করিলে চাকরী থাকে না। কিন্তু তাঁহার চাকরী রহিয়া গেল, আবার বিদায় পাইলেন। আর পালামৌয়ে গেলেন না। কিন্তু পালামৌয়ে যে অল্পকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহার চিহ্ন বাঙ্গালা সাহিত্যে রহিয়া গেল। "পালামৌ" শীর্ষক যে কয়টী মধুর প্রবন্ধ এই সংগ্রহে সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা সেই পালামৌ-যাত্রার ফল। প্রথমে ইহা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। প্রকাশকালে, তিনি নিজের রচনা বলিয়া ইহা প্রকাশ করেন নাই। "প্রমথনাথ বসু" ইতি কাল্পনিক নামের আদ্যক্ষর সহিত ঐ প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার সম্মুখে বসিয়াই তিনি এগুলি লিখিয়াছিলেন, অতএব এগুলি যে তাঁহার রচনা, তদ্বিষয়ে পাঠকের সন্দেহ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

এবার বিদায়ের অবসানে তিনি যশোহরে প্রেরিত হইলেন। সে স্থান অস্বাস্থ্যকর, তথায় সপরিবারে পীড়িত হইয়া আবার বিদায় লইয়া আসিলেন। তার পর অল্প দিন আলিপুরে থাকিয়া পাবনায় প্রেরিত হইলেন।

ডিপুটীগিরীতে দুইটা পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষা-বিষয়ে তাঁহার যে অদৃষ্ট, তাহা বলিয়াছি। কিন্তু এবার প্রথম পরীক্ষায় তিনি কোনরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। কর্ম্ম গেল। তাঁহার নিজমুখে শুনিয়াছি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার মার্ক তাঁহার হইয়াছিল। কিন্তু

বেঙ্গল আফিসের কোন কর্ম্মচারী ঠিক ভুল করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার অনিষ্ট করিয়াছিল। বড় সাহেবদিগকে এ কথা জানাইতে আমি পরামর্শ দিয়াছিলাম; জানানও হইয়াছিল, কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নাই।

কথাটা অমূলক কি সমূলক, তাহা বলিতে পারি না। সমূলক হইলেও গবর্ণমেণ্টের এমন একটা গলৎ সরকারের স্বীকার করা প্রত্যাশা করা যায় না। কোন কেরাণী যদি কোন কৌশল করে, তবে সাহেবদিগের তাহা ধরিবার উপায় অল্প। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এ কথার আন্দোলনে যেরূপ ব্যবহার করিলেন, তাহা দুই দিক্ রাখা রকমের। সঞ্জীবচন্দ্র ডিপুটীগিরী আর পাইলেন না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তুল্য বেতনের আর একটী চাকরী দিলেন। বারাসতে তখন একজন স্পেশিয়াল সবরেজিষ্ট্রার থাকিত। গবর্ণমেণ্ট সেই পদে সঞ্জীবচন্দ্রকে নিযুক্ত করিলেন।

যখন তিনি বারাসতে, তখন প্রথম সেন্সস্ হইল। এ কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব Inspector General of Registration এর উপরে অর্পিত। সেন্সসের অঙ্ক সকল ঠিকঠাক্ দিবার জন্য হাজার কেরাণী নিযুক্ত হইল। তাহাদের কার্য্যের তত্ত্বাবধান জন্য সঞ্জীবচন্দ্র নির্ব্বাচিত ও নিযুক্ত হইলেন।

এ কার্য্য শেষ হইলে পরে, সঞ্জীবচন্দ্র হুগলীর Special Sub-Registrar হইলেন। ইহাতে তিনি সুখী হইলেন, কেন না, তিনি বাড়ী হইতে আপিস করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে হুগলীর সব রেজিষ্ট্রারী পদের বেতন কমান গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় হওয়ায় সঞ্জীবচন্দ্রের বেতনের লাঘব না হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি বর্দ্ধমানে প্রেরিত হইলেন।

বর্দ্ধমানে সঞ্জীবচন্দ্র খুব সুখে ছিলেন। এইখানে থাকিবার সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার প্রকাশ্য সম্বন্ধ জন্মে। বাল্যকাল হইতেই সঞ্জীবচন্দ্রের বাঙ্গালা রচনায় অনুরাগ ছিল। কিন্তু তাঁহার বাল্যরচনা কখন প্রকাশিত হয় নাই, এক্ষণেও বিদ্যমান নাই। কিশোরবয়সে শ্রীযুক্ত কালিদাস মৈত্র সম্পাদিত 'শশধর' নামক পত্রে তিনি দুই একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রশংসিতও হইয়াছিল; তাহার পর অনেক বৎসর বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে বড় সম্বন্ধ রাখেন নাই। ১২৭৯ সালের ১লা বৈশাখ আমি বঙ্গদর্শন সৃষ্টি করিলাম। ঐ বৎসর ভবানীপুরে উহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে লাগিল; কিন্তু ইত্যবসরে সঞ্জীবচন্দ্র কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে একটী ছাপাখানা স্থাপিত করিলেন। নাম দিলেন 'বঙ্গদর্শন প্রেস।' তাঁহার অনুরোধে আমি বঙ্গদর্শন ভবানীপুর হইতে উঠাইয়া আনিলাম। বঙ্গদর্শন প্রেসে বঙ্গদর্শনের ছাপা হইতে লাগিল। সঞ্জীবচন্দ্রও বঙ্গদর্শনে দুই একটা প্রবন্ধ লিখিলেন। তখন আমি পরামর্শ স্থির করিলাম যে, আর একখানা ক্ষুদ্রতর মাসিক পত্র বঙ্গদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হওয়া ভাল। যাঁহারা বঙ্গদর্শনের মূল্য দিতে পারে না, অথবা বঙ্গদর্শন যাহাদের পক্ষে কঠিন, তাহাদের উপযোগী একখানি মাসিক পত্র প্রচার বাঞ্ছনীয় বিবেচনায়, তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম যে, তাদৃশ কোন পত্রের স্বত্ব ও সম্পাদকতা তিনি গ্রহণ করেন। সেই পরামর্শানুসারে তিনি 'ভ্রমর' নামে মাসিক পত্র প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। পত্রখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল; এবং তাহাতে বিলক্ষণ লাভও হইত। এখন আবার তাঁহার তেজস্বিনী প্রতিভা পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

প্রায় তিনি একাই ভ্রমরের সমস্ত প্রবন্ধ লিখিতেন, আর কাহারও সাহায্য গ্রহণ সচরাচর করিতেন না। এই সংগ্রহে যে দুটী উপন্যাস দেওয়া গেল, তাহা ভ্রমরে প্রকাশিত হইয়াছিল।

এক কাজ তিনি নিয়মমত অধিকদিন করিতে ভালবাসিতেন না। ভ্রমর লোকান্তরে উড়িয়া গেল। আমিও ১২৮২ সালের পর বঙ্গদর্শন বন্ধ করিলাম। বঙ্গদর্শন এক বৎসর বন্ধ থাকিলে পর তিনি আমার নিকটে ইহার স্বত্বাধিকার চাহিয়া লইলেন। ১২৮৪ সাল হইতে ১২৮৯ সাল পর্য্যন্ত তিনি বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা করেন। পূর্ব্বে আমার সম্পাদকতার সময়ে, বঙ্গদর্শনে যেরূপ প্রবন্ধ বাহির হইত, এখনও তাহাই হইতে লাগিল। সাহিত্যসম্বন্ধে বঙ্গদর্শনের গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিল। যাঁহারা পূর্ব্বে বঙ্গদর্শনে লিখিতেন, এখনও তাঁহারা লিখিতে লাগিলেন। অনেক নূতন লেখক, যাহারা এক্ষণে খুব প্রসিদ্ধ, তাঁহারাও লিখিতে লাগিলেন। "কৃষ্ণকান্তের উইল", "রাজসিংহ", "আনন্দমঠ", "দেবী" তাঁহার সম্পাদকতাকালেই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তিনি নিজেও তাঁহার তেজস্বিনী প্রতিভার সাহায্য গ্রহণ করিয়া, "জাল প্রতাপচাঁদ", 'পালামৌ", "বৈজিক তত্ত্ব" প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু বঙ্গদর্শনের আর তেমন প্রতিপত্তি হইল না। তাহার কারণ, ইহা কখনও সময়ে প্রকাশিত হইত না। সম্পাদকের অমনোযোগে এবং কার্য্যাধ্যক্ষের কার্য্যের বিশৃঙ্খলতায় বঙ্গদর্শন কখনও আর নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাহির হইত না। এক মাস, দুই মাস, চারি মাস, ছয় মাস, এক বৎসর বাকি পড়িতে লাগিল।

বর্দ্ধমানেরও স্পেসিয়াল সবরেজিষ্ট্রার বেতন কমিয়া গেল। এবার সঞ্জীবচন্দ্রকে যশোহর যাইতে হইল। তাঁহার যাওয়ার পরে, বার্টন নামা একজন নরাধম ইংরেজ কালেক্টর হইয়া সেখানে আসিল। যে কালেক্টর সেই ম্যাজিষ্ট্রেট, সেই রেজিষ্ট্রার। ভারতে আসিয়া বার্টনের একমাত্র ব্রত ছিল—শিক্ষিত বাঙ্গালী কর্ম্মচারীকে কিসে অপদস্থ ও অপমানিত করিবেন বা পদচ্যুত করাইবেন, তাহাই করা। অনেকের উপর তিনি অসহ্য অত্যাচার করিয়াছিলেন, সঞ্জীবচন্দ্রের উপরও আরম্ভ করিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র বিরক্ত হইয়া বিদায় লইয়া বাড়ী আসিলেন।

বাড়ী আসিলে পর, আমাদিগের পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিলেন। এত দিন তাঁহার ভয়ে, আপনার মনের বাসনা চাপিয়া রাখিযাছিলেন, পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের পর আমরা দুই জনে দুইটী সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিলাম। আমি কাঁটালপাড়া ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় উঠিয়া আসিলাম—সঞ্জীবচন্দ্র চাকরী ত্যাগ করিলেন। বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয় ও কার্য্যালয় কলিকাতায় উঠাইয়া আনিলেন।

কিন্তু আর বঙ্গদর্শন চলা ভার হইল। বঙ্গদর্শনের কোন কোন কর্ম্মচারী এমন ছিল যে, তাহাদিগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক ছিল। পিতাঠাকুর মহাশয় যত দিন বর্ত্তমান ছিলেন, তত দিন তিনি সে দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে কাহার শস্য কাহার গৃহে যাইতে লাগিল, তাহার ঠিক নাই। যিনি মালিক, তিনি উদারতা এবং চক্ষুলজ্জাবশতঃ কিছুই দেখেন না। টাকা কড়ি "মুস্থুরিবাটা" হইতে লাগিল। প্রথমে ছাপাখানা গেল—শেষে বঙ্গদর্শনের অপঘাতমৃত্যু হইল।

তার পর সঞ্জীবচন্দ্র, কাঁটালপাড়ার

বাড়ীতে বসিয়া রহিলেন। কয়েক বৎসর কেবল বসিয়া রহিলেন। কোন মতে কোন কার্য্যে কেহ প্রবৃত্ত করিতে পারিল না। সে জ্বালাময়ী প্রতিভা আর জ্বলিল না। ক্রমশঃ শরীর রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। পরিশেষে ১৮১১ শকে বৈশাখ মাসে জ্বরবিকারে তিনি দেহত্যাগ করিলেন।

তাঁহার প্রণীত গ্রন্থাবলীমধ্যে (১) মাধবীলতা, (২) কণ্ঠমালা, (৩) জাল-প্রতাপচাঁদ,) (৪) রামেশ্বরের অদৃষ্ট, (৫) যাত্রা সমালোচন, (৬) Bengal Ryot, এই কয়খানি পৃথক্ ছাপা হইয়াছে। অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি প্রকাশ করিতে আমি প্রবৃত্ত হইলাম। "রামেশ্বরের অদৃষ্ট" এক্ষণে আর পাওয়া যায় না, এজন্য তাহাও এই সংগ্রহভুক্ত হইল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

(দামিনী, পালামৌ ও রামেশ্বরের অদৃষ্ট।)

এক স্থান হইতে আর এক স্থানে যাইতে হইলে প্রায় সকলেই যতদূর সম্ভব সোজা গিয়া থাকে। যেখানে না দাঁড়াইলে চলে না, কেবল সেইখানে এক একবার দাঁড়ায়। কিন্তু সঞ্জীববাবু তেমন করিয়া পথে চলেন না। তিনি যাইতে যাইতে প্রায়ই দাঁড়ান, একটা গাছ দেখিবার জন্য, একটা লতা দেখিবার জন্য, একটা পাখী দেখিবার জন্য, একটা পাতা দেখিবার জন্য, একটা ফুল দেখিবার জন্য, একটা পাখী দেখিবার জন্য, একটা ঘাস দেখিবার জন্য, প্রায়ই দাঁড়ান। কখনও বা পথ ছাড়িয়া একটু এদিকে একটু ওদিকেও যান। এইরূপে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এদিক্ ওদিক্ করিয়া, এটা সেটা দেখিতে দেখিতে যাইতে তিনি বড় ভালবাসেন। তাঁহার কণ্ঠমালা ও মাধবীলতাতে তাঁহাকে এইরূপ চলা-ফেরা করিতে দেখিতে পাই। এ প্রণালীর দোষগুণ দুই আছে। কিন্তু দোষে গুণে এই যে একটা প্রণালী, বোধ হয়, বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহা এক সঞ্জীববাবুরই প্রণালী, আর কাহারও নয়। সঞ্জীববাবুর যথেষ্ট নিজত্ব (Originality) আছে।

এ প্রণালীর দোষ কিছু আছে। যে বেশী থামিয়া থামিয়া এটা সেটা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে যায়, সকলের তাহার সঙ্গে যাইতে ভাল লাগে না, অনেকে তাহার সঙ্গে অধিক দূর যাইতে পারেও না। কিন্তু কণ্ঠমালাও মাধবীলতাতে এ দোষের পরিমাণ যতই থাকুক, পালামৌতে ইহা নাই বলিলেই হয়। পালামৌ এই প্রণালী লিখিত; কিন্তু উপন্যাস না হইয়াও পালামৌ উৎকৃষ্ট উপন্যাসের ন্যায় মিষ্ট বোধ হয়। পালামৌ ন্যায় ভ্রমণকাহিনী বাঙ্গালা সাহিত্যে আ নাই। আমি জানি, উহার সকল কথা প্রকৃত, কোন কথাই কল্পিত নয়, কি মিষ্টতা মনোহারিত্বে উহা সুরচিত উপন্যাসে লক্ষণাক্রান্ত ও সমতুল্য।

এ প্রণালীর অর্থ—সচরাচর লোকে যা দেখে না, বা যেরূপে দেখে না, তাহাই দে বা সেইরূপ দেখা। সচরাচর লোকে যা দেখে না বা যেরূপ দেখে না, সঞ্জীব তাহা দেখিতে এবং সেইরূপেই দেখিতে ভালবাসি তেন, এবং তাহা সেইরূপ দেখিবার শক্তি তাঁহার যথেষ্ট ছিল। অপরাহ্নে লাতেহ পাহাড়ের, "ক্রোড়ে" গিয়া বসিবার জ সঞ্জীববাবু বড় ব্যস্ত হইতেন। সে ব্যস্ত কেমন! না, এইরূপ—

"যে সময়ে উঠানে ছায়া পড়ে, নিত্য সময় কুলবধূর মন মাতিয়া উঠে, জল আনি যাইবে; জল আছে বলিলেও তাহারা ফেলিয়া আনিতে যাইবে"—

ছোট ছোট সামান্য সামান্য নিত্য ঘ বোধ হয় অনেকে এমন করিয়া দেখে না "জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফে জল আনিতে যায়"—আমাদের মেয়েদের আনা এমন করিয়া কয় জন লক্ষ্য করে? সঞ্জী বাবু এইরূপ বিষয় সকল এমনি করিয়া ল করিতে ভালবাসিতেন, লক্ষ্য করিতে পা তেন, লক্ষ্য করিতে জানিতেন। এই দর্শনকার্য্যে তাঁহার অসাধারণ আসক্তি ও নিবেশ ছিল। পালামৌতে যে নববিবা

মেয়েটীর কথা আছে—যাহার কথা, অতি সামান্ত হইলেও পড়িতে চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইয়া পড়ে—বোধ হয়, সঞ্জীববাবু না লিখিলে সে মেয়েটীকে আমরা পাইতাম না। এইরূপ কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা সঞ্জীববাবু লিখিয়া গিয়াছেন. এমন করিয়া দেখায়, যে ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি সূচিত হয়, সঞ্জীববাবুতে তাহা যত দেখি, অন্য কোন বাঙ্গালা লেখকে তত দেখি না। এইরূপে দেখা সঞ্জীববাবুর হাত এবং এই ধাত সঞ্জীববাবুর নিজস্ব।

আর এমনি করিয়া দেখাও যেমন সঞ্জীববাবুর ধাত, সঞ্জীববাবুর ভাষাও সঞ্জীববাবুর হাত। তাঁহার ন্যায় সরল ভাষা বাঙ্গালা সাহিত্যে অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার ভাষা বালকের কথার ন্যায় সহজ, সরল, মিষ্ট, কারুকার্য্যহীন। আর এই যে, বালকের ন্যায় ভাষা, সঞ্জীব ইহাতে তাঁহার সামান্য সামান্য কথাও যেমন লিখিয়াছেন, তাঁহার বড় বড় কথাও তেমনি লিখিয়াছেন। সৌন্দর্য্যতত্ত্ব খুব একটা বড় কথা, কিন্তু পালামৌতে তিনি তাঁহার সৌন্দর্য্যতত্ত্ব কেমন সরল ভাষায় সরলভাবে বুঝাইয়াছেন, দেখুন:—

"আমি কখন কবির চক্ষে রূপ দেখি নাই, চিরকাল বালকের মত রূপ দেখিয়া থাকি, এই জন্য আমি যাহা দেখি, তাহা অন্যকে বুঝাইতে পারি না। রূপ যে কি জিনিস, রূপের আকার কি, শরীরের কোন্ কোন্ স্থানে তাহার বাসা, এ সকল বার্ত্তা আমাদের বঙ্গকবিরা বিশেষ জানেন, এই জন্য তাঁহারা অঙ্গ বাছিয়া বাছিয়া বর্ণন করিতে পারেন; দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি তাহা পারি না। * * আমি যে প্রকারে রূপ দেখি, নির্লজ্জ হইয়াও তাহা বলিতে পারি। একবার আমি দুই বৎসরের একটী শিশু গৃহে রাখিয়া বিদেশে গিয়াছিলাম। শিশুকে সর্ব্বদাই মনে হইত, তাহার ন্যায় রূপ আর কাহারও দেখিতে পাইতাম না। অনেক দিনের পর একটী ছাগশিশুতে সেই রূপরাশি দেখিয়া আহ্লাদে তাহাকে বুকে করিয়াছিলাম। আমার সেই চক্ষু! আমি রূপরাশি কি বুঝিব! তথাপি যুবতীকে দেখিতে লাগিলাম।

"বাল্যকালে আমার মনে হইত যে, ভূতপ্রেত যে প্রকার নিজে দেহহীন—অন্যের দেহ আবির্ভাবে বিকাশ পায়, রূপও সেই প্রকার অন্য দেহ অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়, কিন্তু প্রভেদ এই যে, ভূতের আশ্রয় কেবল মনুষ্য, বিশেষতঃ মানবী। কিন্তু বৃক্ষ, পল্লব, নদ ও নদ প্রভৃতি সকলেই রূপ আশ্রয় করে। যুবতীতে যেরূপ, লতায় সেইরূপ, নদীতেও সেইরূপ, পক্ষীতেও সেইরূপ, ছাগেও সেইরূপ। সুতরাং রূপ এক, তবে পাত্রভেদ। আমি পাত্র দেখিয়া ভুলি না, দেহ দেখিয়া ভুলি না, কেবল রূপে। সে রূপ লতায় থাক্ অথবা যুবতীতে থাক্, আমার মনের চক্ষে তাহার কোন প্রভেদ দেখি না। অনেকের এই প্রকার রুচিবিকার আছে।"

সৌন্দর্য্যতত্ত্বের ইহা অতি উচ্চ কথা। এমন উচ্চ কথা, এত সহজ, সরল ও পরিষ্কার ভাষায় অতি অল্প লোকেই কহিতে পারে, কিন্তু ছোট বড় সকল কথাই এইরূপে কওয়া সঞ্জীববাবুর স্বভাব। এই চমৎকার স্বভাব সঞ্জীববাবুর নিজস্ব এই স্বভাবের গুণে তাঁহার সকল লেখাই আবেগশূন্য আয়াসশূন্য, ধীরগতি, শান্তভাবাপন্ন। তিনি তাঁহার অতিশয় মর্ম্মস্পর্শী কথাও যেন অন্যমনে মৃদুভাবে ভাবিতে ভাবিতে লিখিয়াছেন। তিনি বৃদ্ধের জ্ঞান শান্তস্বভাব বালকের ভাষায় ও ভঙ্গীতে প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে নিজত্বে তাঁহার সমান অতি অল্পই দেখিতে পাই।

সঞ্জীব-বাবুর সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ভাল করিয়া না বুঝিলে তাঁহার লেখাও ভাল করিয়া বুঝা যায় না—ভাল করিয়া সম্ভোগ করা যায় না। কারণ, তাঁহার সৌন্দর্য্যতত্ত্ব কেবলমাত্র তত্ত্ব নয়, তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিবার রীতি বা প্রণালীও বটে। এই জন্যই তিনি পালামৌর সেই বাইজীতে গেলোখালির মোহানার

সেই পাষাণীর রূপরাশি দেখিয়াছিলেন, এই জন্যই তিনি কোলকামিনীদিগের দেহে "কোলাহল" দেখিয়াছিলেন এবং এই জন্যই যখন সমুদ্র শান্ত হইয়া মৃদু মৃদু ডাকিত, তখন তাঁহার রামেশ্বর ভাবিত, তাহার আনন্দ-দুলাল কথা কহিতেছে; এবং যখন সেই সমুদ্রে অস্পষ্টলক্ষ্য একটী তরঙ্গ উঁচু হইয়া নাচিত, তখন তাঁহার রামেশ্বর মনে করিত, তাহার আনন্দদুলাল নাচিতেছে। সৌন্দর্য্যের এই সুবিস্তৃত সুপ্রসারিত জাতিভেদশূন্য সর্ব্বসমন্বয়কারী ভাব বড়ই মধুর, বড়ই উদার। এই ভাব সঞ্জীববাবু তাঁহার সেই অতুলনীয় মৃদু মধুর ভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

কণ্ঠমালা ও মাধবীলতা যে প্রণালীতে লিখিত, দামিনী ও রামেশ্বরের অদৃষ্ট সে প্রণালীতে লিখিত নয়। শেষোক্ত দুইটীই অতি ক্ষুদ্র গল্প, অতএব কোনটীতেই কণ্ঠমালা বা মাধবীলতার প্রণালী খাটিত না। এই ক্ষুদ্র গল্পে সঞ্জীববাবুর বেশ ত্বরিতগতি দেখা যায়, স্থানে স্থানে তাঁহার স্বাভাবিক মৃদুতার পরিবর্ত্তে বিলক্ষণ আবেগ ও উদ্দামভাবও পরিলক্ষিত হয়। রামেশ্বরের ও দামিনী পাগলীতে এই খর উদ্দামভাব বেশ পরিস্ফুট। সঞ্জীববাবু পাগল পাগলী গড়িতে বড় ভালবাসিতেন। মাধবীলতায় পিতম পাগলা আছে, কিন্তু পিতমের পাগলামী দেখিতে দেখিতে কিছু শ্রান্তি বোধ হয়। রামেশ্বরের অদৃষ্টে স্বয়ং রামেশ্বরকে একবার পাগলপ্রায় দেখি। সে পাগলামী ক্ষণকালের নিমিত্ত এবং দেখিতেও অতি উত্তম। কারণ, উহা উৎকট দাম্পত্যপ্রেমের বিকট প্রতিধ্বনি। দামিনীতেও এক পাগলী দেখিতে পাই, সে বড় বিষম পাগলী। পতিশোকে সে আপনি পাগলিনা। তাই যে পতিপ্রাণা পতির জন্য মরে, তাহার পতিকে সে গলা টিপিয়া মারিয়া তাহারই সঙ্গে পরলোকে পাঠাইয়া দেয়।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ।

যাত্রা-সমালোচনা।

যাত্রা

—*—

বিদ্যাসুন্দরের কথা।

এক্ষণকার প্রচলিত যাত্রা বিদ্যাসুন্দর। গ্রায় সকলেই এই যাত্রায় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এমন কি, যে গ্রামে এক-বার এই যাত্রা হইয়াছে, সে গ্রামবাসিগণ সময় পাইলে কখন কখন তদ্বিষয়ে স্পর্দ্ধা করিতে ত্রুটি করেন না। অন্য যাত্রাপেক্ষা ক্ষণেকবিদ্যাসুন্দরের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে এবং বাঙ্গালার রসজ্ঞতা-বিষয় বিচার করিতে হইলে, এই বিদ্যাসুন্দর যাত্রা দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।

নায়ক-নায়িকাদিগের প্রেমালাপ, বিচ্ছেদ, মিলন ইত্যাদির অভিনয় করিয়া শ্রোতাদিগের চিত্তরঞ্জন করা প্রায় সকল যাত্রার উদ্দেশ্য। কি কাব্য, কি নাটক, কি নাটকাভিনয় এ সকলেরই উদ্দেশ্য মনুষ্য-হৃদয়ের চিত্র। মনুষ্যচিত্তবৃত্তিমধ্যে, বিশেষ বেগবতী এবং সুখকরী যে বৃত্তি, তাহা স্নেহ, অনুরাগ, প্রণয় ইত্যাদি নামে পরিচিতা। একজনের প্রতি অন্যের আত্মাপেক্ষা আন্তরিক সমা-দরকে এই নাম দেওয়া যায়। এই বৃত্তির প্রভেদে, বৈষ্ণবেরা সখ্য-বাৎসল্যাদি নানা প্রকার নাম দিয়াছেন এবং সে সকল নাম সাধারণেও চলিত। যে কারণেই হউক, তাহার মধ্যে দাম্পত্যপ্রণয়ই সর্ব্বদেশে সর্ব্ব-কালে সকল কবি কর্তৃক বর্ণিত এবং সকল নাটকে অভিনীত হইয়া আসিয়াছে। বিদ্যা-সুন্দর যাত্রারও সেই উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রণয় কি পদার্থ, তাহার শক্তি কি প্রকার, যাহাকে একবার স্পর্শ করে, তাহাকে সাধারণ অপেক্ষা কিরূপ উন্নত করে, তাহার হর্ষ কিরূপ, বিষাদ কিরূপ, আকাঙ্ক্ষা কিরূপ, চাঞ্চল্য কিরূপ, ধর্ম্ম কিরূপ, জগতের সমস্ত পদার্থের সহিত তাহার সহৃদয়তা কিরূপ, তদ্বিষয়ে বিদ্যাসুন্দর যাত্রার কিছুই দেখা যায় না এবং তাহা দেখাইবার স্থানও এ যাত্রায় নাই। বকুলতলায় সুন্দরের সহিত মালিনীর সাক্ষাৎ, মালিনীর বাটীতে তাঁহার বাস এবং দৌত্য-কর্ম্মে মালিনীর প্রবৃত্তি, এই কয়েকটী অংশ লইয়া সচরাচর যাত্রা হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে কোন্ অংশে রসোদ্ভাবনের সম্ভাবনা? ইহার মধ্যে কোন্ স্থানে প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইবে? যাত্রায় এই অংশের শেষভাগে কখন কখন বিদ্যাসুন্দরের মিলন পর্য্যন্ত অভিনীত হইয়া থাকে। ইহা রসসৃষ্টির উপযুক্ত স্থান বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রায় এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়, সূর্য্যকিরণ প্রচণ্ড হইয়া উঠে; মা মা করিয়া দুইটা ঠাকুরাণী-বিষয়ক গীত গাইয়া যাত্রাকরেরা শেষ করিয়া দেয়। অতএব বিদ্যাসুন্দরের প্রথম আলাপ কিরূপ হইল, তাহা কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না।

আদিরসের তীব্রতা নাই। রসমধ্যে করুণরসের তীব্রতাই অধিক। সুতরাং করুণরসে যাদৃশ মনুষ্য-চিত্তকে আলোড়িত করে, কেবল আদিরসে তাহা হয় না। এই জন্য জনসাধারণ আদিরসপ্রিয় হইলেও, সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে কবিগণ তাহার সহিত কৌশলক্রমে করুণরস মিশ্রিত করিয়া কাব্যাদির মনোহারিত্ব বিধান করেন। যে কৌশলের দ্বারা ইহা সম্পন্ন হয়, সচরাচর

তাহাকে বিরহ বা বিচ্ছেদ বলে। বিদ্যা-সুন্দরের মিলন-সম্বন্ধে কিছুই দেখিতে পাওয়া গেল না, এক্ষণে বিচ্ছেদ কিরূপ, দেখা যাউক।

বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে বিচ্ছেদ অতি অল্প। সুন্দরের আসিতে যেটুকু বিলম্ব হয়, সেই-টুকু বিদ্যার বিচ্ছেদ যন্ত্রণা! বিলম্ব দেখিলে বিদ্যা কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হইয়া থাকেন; নাচিয়া তদ্বিষয়ক দুই একটা গীত গাইয়া থাকেন. অথবা অধীরা হইলে হীরা মালিনীর সহিত দুইটা রহস্য করিয়া মন অতিবাহিত করেন। বিদ্যার বিচ্ছেদ এইরূপ। এতদ্ভিন্ন যদি অন্যরূপ বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহাও সামান্য। সে বিচ্ছেদে কেহ তাপিত হয় না, কাহারও নয়নাশ্রু পতিত হয় না, বিদ্যাও কাঁদে না, শ্রোতৃগণও কাঁদে না। "আমার উড়ু উড়ু কচ্ছে প্রাণ" এই কথায় বা তদনুরূপ কথায় যতটুকু যন্ত্রণা প্রকাশ হয়, বিদ্যার বিচ্ছেদযন্ত্রণা ততটুকু হইয়াছিল, তাহার বেশী নহে।

সামান্য বিচ্ছেদ-সম্বন্ধে এইরূপ। আবার যখন যাবজ্জীবনের মত বিচ্ছেদ সম্ভাবনা হইয়াছিল. অর্থাৎ যখন মস্তকচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত সুন্দরকে মশানে লইয়া চলিল, বিদ্যা তখন উঠিয়া, কঙ্কাল দোলাইয়া, নয়ন ঠারিয়া, নাচিতে নাচিতে আড়খেম্‌টার শোক করিতে থাকে। নৃত্য দেখিয়া দর্শকমণ্ডলীতে রসের স্রোত বহিতে থাকে, অমনি বাহবার ঘটা পড়িয়া যায়। বিদ্যা আরও ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে থাকে, রসিক শ্রোতাদিগের আর আহ্লাদের সীমা থাকে না। বিদ্যার কঙ্কাল কেমন দুলিতেছে! বেশ্যাস্বভাবানুকরণে সুপটু নট, কেমন নয়ন, হৃদয় ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাচাইতেছে, ইহা দেখিয়া শ্রোতারা দুর্ভাগ্য সুন্দরের বিষাদ একবারে ভুলিয়া যায়।

এক্ষণকার রুচির এই এক পরিচয়। শোকাকুলা নাচিয়া হাসিয়া চোক ঠারিয়া শোক করিতেছে, আর আমাদিগের চিত্ত আর্দ্র হইতেছে। শ্রোতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছে, 'বড় আশ্চর্য্য যাত্রা হইতেছে। এমন যাত্রা না শুনিয়া অরসিক বৃদ্ধেরা কৃষ্ণবিষয়ক কীর্ত্তন শুনিতে ইচ্ছা করেন কেন?' কেহ উত্তর করিতেছেন যে, 'তাঁহারা ধর্ম্মার্থে কালিয়দমন যাত্রা শুনিয়া থাকেন, সুখার্থ নহে।' এরূপ শ্রোতাদিগের বুঝাইতে চেষ্টা করা বৃথা, তথাপি বিদ্যাসুন্দর যাত্রার সঙ্গে কৃষ্ণযাত্রার এক স্থানের তুলনা করিতে ইচ্ছা করি।

কিন্তু কৃষ্ণযাত্রারও উল্লেখ করিতে সঙ্কুচিত হই। কেন না, কৃষ্ণযাত্রা নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া আপত্তি হইতে পারে। তবে ইহা বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা এতদংশেও কিছু ভাল, এই জন্যই আমরা সে প্রসঙ্গ করিতে সাহস পাইতেছি। বিশেষ যে দেশে কৃষ্ণ প্রধান দেবতা, কৃষ্ণলীলার কথা প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র, যেখানে গুরু, কর্ণে কৃষ্ণমন্ত্র দিতেছেন, পুরোহিত মন্দিরে মন্দিরে কৃষ্ণলীলা দেখাইতেছেন. কথক গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণলীলা কহিয়া বেড়াইতেছেন—যেখানে আবাল বৃদ্ধ, আপামর সাধারণ, দোকানী গোসাঞি, অবসর পাইলেই কৃষ্ণলীলার গ্রন্থ লইয়া পড়িতে বসে, যে দেশের লোকের হাড়ে হাড়ে কৃষ্ণলীলা ঢুকিয়াছে,—যাহাদের কথায় রাধাকৃষ্ণ, চিন্তায় রাধাকৃষ্ণ, উৎসবে রাধাকৃষ্ণ, সঙ্গীতে রাধাকৃষ্ণ,—যে দেশে মাঠে ঘাটে, বনে, বাজারে, মন্দিরে, নাট্যশালায়, বৈঠকখানায় বেশ্যালয়ে চাষা চুয়াড় নট নটী বাবু বেশ্যা ইতর সাধারণ সকলেই অহরহ কৃষ্ণগীত গাহিতেছে,—যেখানে গৃহচিত্রে কৃষ্ণ, গাত্রবস্ত্রে কৃষ্ণ, দোকানের খাতায় পর্য্যন্ত কৃষ্ণ, সেখানে একা যাত্রাওয়ালার প্রাণ বধিয়া কি ফল?

নাটকগুণাংশে কৃষ্ণযাত্রা বিদ্যাসুন্দর যাত্রা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। বাবুদিগের মুখ চাহিয়া বিদ্যাসুন্দরের দুই একটী গীত উদ্ধৃত করিয়াছি—বৃদ্ধ ও বৈষ্ণবদিগের মুখ চাহিয়া কৃষ্ণযাত্রার একটী গীতের উল্লেখ করিলাম। কৃষ্ণ মথুরাধিপতি, গোপকন্যা বৃন্দা দূতী তাঁহা[illegible] আনয়নে যাইতেছে, তাহার কথায় রাজা[illegible] গোচারণে পুনরাগমন করিবার সম্ভাবনা না[illegible] —এ জন্য দূতী গর্ব করিয়া বলিল যে, [illegible]

কৃষ্ণ না আসেন, তবে তাঁহাকে বাঁধিয়া আনিব।"

কৃষ্ণকে বাঁধিবে! রাধার এ কথা অসহ্য হইল—

"আমি মুরি মরিব, তারে বেঁধ না,
হে দূতি তোর পায়ে ধরি, তারে বেঁধ না,
সে আমারি প্রিয়।
সে যেখানে সেখানে থাকুক,
তাহারে কেহ রাধানাথ বই তো বলিবে না।"

ইত্যাদি গীত সকলেরই অভ্যস্ত আছে, এ জন্য সমুদায়াংশ উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নাই।

রাধার এই কথায় অনেককে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে হয়। কৃষ্ণকে বাঁধিবে, এইটী কেবল কথায় মাত্র বলা হইয়াছিল; রাধা তাহাতে ব্যথা পাইলেন। কিন্তু সুন্দরকে কেবল কথায় নহে, প্রকৃত প্রস্তাবে রজ্জু-সংযুক্ত করিয়া বাঁধিল, মশানে কাটিতে পর্য্যন্ত লইয়া গেল, তথাপি বিদ্যার কণামাত্রও দুঃখ হইল না, শ্রোতাদিগেরও দুঃখ হইল না; অশ্রুপাতের ত কথাই নাই। বিদ্যাসুন্দর-ভক্তগণ, বোধ হয়, এই তুলনায় বুঝিতে পারিবেন যে, বিদ্যার প্রণয় অতি প্রগাঢ় বলিয়া যাত্রায় বর্ণিত হয় নাই। এই তুলনায় আরও বুঝিতে পারিবেন যে, পূর্ব্বকালের কীর্ত্তন কি যাত্রা এখনকার অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ছিল। উহার প্রণেতৃগণ কবি ছিলেন এবং শ্রোতৃগণ অপেক্ষাকৃত সজ্জ ছিলেন। ক্রমে উভয়েরই এক্ষণে অধঃপতন হইয়াছে। অধিক কি, পূর্ব্বে যাত্রায় প্রথমে দেবতা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ দেবতুল্য এবং ঋষি সাজা হইত, এক্ষণে সেই স্থলে মহত্তর মেতরাণী সাজিয়া শ্রোতাদিগের মনোরঞ্জন করে।

সচরাচর যেরূপ চিত্তবৃত্তির বেগ দেখা যায়, তাহাতে আমাদের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অসাধারণ চাই। বস্তুতঃ কিঞ্চিৎ স্বর্গীয় সুখসৌরভ-মাখা অকৃত্রিম পবিত্র চিত্তের পরিচয় পাইলেও [illegible] কিন্তু সে পরিচয় কবি ভিন্ন আর কাহারও দিবার সাধ্য নাই। তাহাতে কবির কল্পনাশক্তি আবশ্যক। যদি অপরে চেষ্টা করে, তাহা হইলে এই যাত্রায় যেরূপ বিদ্যা-সুন্দরের পরিচয় আছে, সে রূপ হইয়া পড়ে অর্থাৎ মাহাত্মের পরিবর্ত্তে রহস্য হইয়া পড়ে।

বাস্তবিক এই যাত্রায় রহস্যের ভাগ অধিক। মালিনী-সুন্দরের কথাবার্ত্তা, কি বিদ্যাসুন্দরের কথাবার্ত্তা উভয়ই সমভাবে রহস্য পরিপূরিত। কখন কখন প্রণয়ীদিগের মধ্যে রহস্য কি কৌতুকালাপ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহা অতি সাধারণ। যে স্থলে প্রণয় গভীর, সে স্থলে উপহাস রহস্যাদি স্থান পায় না, কিন্তু এই যাত্রায় যদি রহস্যের ভাগ ত্যাগ করা যায়, তবে সুন্দরের বাক্‌রোধ হয়, মালিনীর ত কথাই নাই। বিদ্যার কথা-বার্ত্তা সহজেই অল্প; রহস্যের উত্তর না দিতে হইলে, তাঁহার গীতের ভাগ অর্দ্ধেক কমিয়া যায়।

এই যাত্রায় মালিনীই প্রধানা, তাহার রঙ্গরস লইয়াই এই যাত্রা। কাজেই ইহাতে হাস্যরস ব্যতীত আর কোন রসের প্রবলতা নাই। নায়ক-নায়িকা অর্থাৎ বিদ্যাসুন্দর উপলক্ষ্য মাত্র। বিদ্যাতে মালিনীর যৎকিঞ্চিৎ ছায়া আছে, কিন্তু বিদ্যা কিছুই নহে, না প্রণয়িনী, না উন্মাদিনী, না জড়, না অন্য।

বাঙ্গালায় পূর্ব্বে করুণরস প্রবল ছিল। এই যাত্রা দ্বারা বোধ হইতেছে যে, এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে এদেশে হাস্যরসের প্রাধান্য জন্মিয়াছে। নতুবা বিদ্যাসুন্দর যাত্রা কোনক্রমেই সাধারণপ্রিয় হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

এই যাত্রা সাধারণপ্রিয় হইবার আর দুই একটী কারণ আছে। যে ভাষায় ইহার গীত-গুলিন রচিত হইয়াছে, তাহা সরল, অনায়াসেই অপর-সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করে, তদ্ভিন্ন সঙ্গীতেরও কিঞ্চিৎ পারিপাট্য আছে। আর অনেকে সন্দেহ করিয়া থাকেন যে এই যাত্রায় যতটুকু সামান্য কাব্যরস আছে, তাহাই এক্ষণকার শ্রোতাদিগের বোধোপযোগী, তদতিরিক্ত হইলে তাহাদিগের

বোধাতীত হইত। যে রচনায় রসগ্রহ হয়, তাহাই ভাল লাগে।

আমরা এ পর্য্যন্ত বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় কবিত্ব এবং শ্রোতাদিগের রসজ্ঞতার আলোচনা করিয়াছি, এক্ষণে এই যাত্রার নীতি-সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু তাহার অধিক প্রয়োজন নাই; আমরা যাহা বলিব, তাহা অনেকেই বলিয়া থাকেন। মালিনী, সুন্দর ও বিদ্যা এই তিনটী লইয়া যাত্রা হইয়া থাকে। এই তিন জনের মধ্যে কোন্‌টী অনুকরণীয়? কে প্রার্থনা করে যে, বিদ্যার ন্যায় তাহার কন্যার চরিত্র হউক্ অথবা সুন্দরের ন্যায় তাহার পুত্রের স্বভাব হউক্। কেহ বা প্রার্থনা করে যে, মালিনীর ন্যায় তাহার গৃহিণী হউক্ অথবা দাসী হউক্। লোকের এরূপ প্রার্থনা করা দূরে থাকুক বরং তাহাতে অবমাননা বোধ করে। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, এই তিনটীর মধ্যে কোনটীও আদর্শযোগ্য নহে, বরং সচরাচর লোক অপেক্ষা অপকৃষ্ট। যদি বাস্তবিক তাহা হয়, তবে অপকৃষ্ট ব্যক্তির চরিত্র হইতে অপকর্ষ ব্যতীত আর কি শিক্ষা হইতে পারে? কখন কখন কবিরা অপকৃষ্ট ব্যক্তিকে এমত ভয়ানক করিয়া চিত্রিত করেন যে, তদ্দ্বারা অপকৃষ্টতার প্রতি ঘৃণা এবং ভয় উভয়ই অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। সে স্থলে অপকৃষ্ট হইতে উৎকর্ষ শিক্ষা হইল, কিন্তু বিদ্যাসুন্দরে অপকর্ষ সেরূপ চিত্রিত হয় নাই। কাজেই বিদ্যাসুন্দর হইতে যে শিক্ষা পাওয়া যাইতে পারে, তাহা অপকৃষ্ট ব্যতীত আর কি হইবে?

অনেকে ভাবিতে পারেন যে, যাত্রা কি নাটক উভয়ের কোনটীই শিক্ষার নিমিত্ত নহে, ইহা হইতে সৎশিক্ষা প্রত্যাশা করা অন্যায়। বিশেষতঃ যে স্থলে নায়ক-নায়িকা বর্ণনা করা ইহার উদ্দেশ্য, সে স্থলে ইহা [illegible] আর কি শিক্ষা হইতে পারে? কিন্তু এটী তাঁহাদের ভুল। যাত্রার বর্ণিত বিষয়, ধর্ম-বিষয়ক হউক, নীতি-বিষয়ক হউক্ [illegible] অধিক [illegible] হয়। সাহায্য করে। আর "আদিরস" বর্ণন থাকিলেই যাত্রা দ্বারা কুশিক্ষা প্রদত্ত হইল, এমত নহে। কেবল বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় নায়ক-নায়িকা হইলেই সেরূপ শিক্ষা সম্ভব। অত-এব যাত্রা-নাটকের নায়ক-নায়িকা দ্বারা যে নীতি কি ধর্ম্মশিক্ষা হয় না, এমত নহে।

আমাদিগের দেশে সাধারণ লোকদিগের শিক্ষা কেবল পুরাণব্যবসায়ী কথক আর যাত্রাকরের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। পুরাণ-ব্যবসায়ীরা ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছেন। এক্ষণে যাত্রাওয়ালারা দেশের শিক্ষক দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু যে যাত্রার আলোচনা আমরা করিলাম, সে যাত্রা যেখানে সমাদৃত, তথাকার শিক্ষা যত উৎকৃষ্ট হইবে, তাহা এক প্রকার অনুভূত হইতে পারে। পল্লীগ্রাম অনু-সন্ধান করিলে এই যাত্রার ফলভোগী অনেককে পাওয়া যাইতে পারে। মালিনী মাসী দৌত্যক্রিয়ার অধ্যাপিকা; তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যক্রমে দেশ ব্যাপিতেছে। ছোট খা[illegible] সুন্দরের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। বিদ্যা[illegible] বংশবৃদ্ধি কিরূপ হইয়াছে, তাহা বিশেষ জান[illegible] যায় নাই; কিন্তু বোধ হয় নিতান্ত অল্প [illegible] হইতে পারে। পল্লীগ্রামের যৌবনোন্মুখ সরলা যুবতীগুলি বিদ্যার মুখে নিম্নলিখি[illegible] বা তদনুরূপ গীত শুনিলে তাহাদের শি[illegible] কিরূপ হয়?

"এখন উপায় আয়ি, কর তারে আনিতে।
কামানল জ্বেলে ছলে ভুলে আছ মনেতে
কবে সে সুদিন হবে, সুধাকর প্রকাশিবে
বারিবিন্দু বরষিবে, চাতকীরে বাঁচাতে।"

আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এইরূপ গীত পি[illegible] পুত্র লইয়া, মাতা কন্যা লইয়া শুনে[illegible] তাহাতে লজ্জা বোধ করেন না; কিন্তু [illegible] পুত্র-কন্যা জ্ঞানবান্ হইলে পিতা-মাতা কিরূপ ভাবিবেন, সে দিকে দৃষ্টিপাত ক[illegible] উচিত।

সকলপ্রকার যাত্রার কথা।

কলিকাতায়, এবং তন্নিকটস্থ প্রদেশে, ভদ্রলোক এক্ষণে যাত্রার প্রতি হতাদর হইয়াছেন বটে, কিন্তু যাত্রাই এক্ষণকার গ্রাম্য উৎসব। তদুপলক্ষে বারইয়ারী, তদুপলক্ষে ভিক্ষা, তদুপলক্ষে চুরি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। যাত্রাকরেরা উপাস্য ব্যক্তি; তাহাদের আনিতে হইলে উপাসনা করিতে হয়।

এই কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, প্রথমতঃ বোধ হইবে যে, বাঙ্গালার আধুনিক যাত্রা অশ্রুতপূর্ব্ব উন্নতি-প্রাপ্ত হইয়াছে, নতুবা এত তাহার আদর কেন? যাত্রা শুনিতে লোকের এতই বা ব্যগ্রতা কেন? বস্তুতঃ আধুনিক যাত্রার সর্ব্বদাই প্রশংসা শুনা যায়। কিন্তু প্রশংসা সকল সময় গুণের পরিচায়ক নহে। অনেক সময় বরং তাহার বিপরীত বুঝায়। যিনি প্রশংসা করেন, তিনি যদি স্বয়ং গুণগ্রাহী হন, তবেই তাঁহার প্রশংসা গুণব্যঞ্জক, নতুবা সন্দেহস্থল।

"অমুক অধিকারী বড় যাত্রা করিয়াছে, মথুরা হইতে শ্রীকৃষ্ণকে আনিবার উপলক্ষে কেমন তামাদি ও নাতকজারী ঘটাইল। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত কথায় নাতকজারী ঘটনা অল্প গুণপনা নহে। পরমানন্দ কি শ্রীদাম-সুবল প্রভৃতি প্রাচীন যাত্রাকরের প্রশংসা কর, কিন্তু তাহারা কি এরূপ নাতকজারী ঘটাইতে পারিত? সাধ্য কি! তাহারা এইরূপ আইন আদালতের কথা কখনও জানিত না।" আধুনিক যাত্রার এই এক জাতীয় প্রশংসা।

"গত রাত্রে দূতী এক চক্র শব্দ লইয়া কি চমৎকার গুণপনা দেখাইল। রথচক্র, রমণী-চক্র, নয়নচক্র, প্রেমচক্র, চক্রীর চক্র এইরূপ চক্র চক্র সাজাইল। এমন যাত্রা কি আর হয়! এ যাত্রা শুনিলে কথা শেখা যায়, অভিধান পাঠের ফল হয়।" এই আর এক জাতীয় প্রশংসা।—

এই সকল প্রশংসা শুনিলে, অনেকেই দুঃখিত হইবেন সন্দেহ নাই। আমাদের [illegible] অপকৃষ্ট, এবং শ্রোতৃগণের রুচি ততোধিক অপকৃষ্ট বলিয়া তাঁহাদে[র] বোধ হইবে। রুচি সম্বন্ধে কতকগুলিন ক[থা] আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এক্ষণে তৎসম্ব[ন্ধে] আর অধিক বলিবার ইচ্ছা নাই। আপাত[তঃ] কেবল যাত্রার অভিনয় সম্বন্ধে দুই এক[টি] কথা বলিবার অভিলাষ। কিন্তু আম[রা] যাত্রাকে উপলক্ষ্য করিয়া যাহা বলিতে[ছি] তাহা এ দেশীয় অন্যান্য নৃত্য-গীত-পদ্ধ[তি] পক্ষেও বর্ত্তিবে।

নৃত্য। যাত্রার প্রসঙ্গ হইলে অগ্রে নৃত্যের কথা মনে পড়ে। সুর, তাল, ল[য়,] মান, বেশবিন্যাস, কথাবার্ত্তা, অঙ্গভঙ্গি, স[ক]লই মনে হয়, কিন্তু নৃত্য সম্বন্ধে কিঞ্চি[ৎ] বিশেষ আছে। এক্ষণকার যাত্রায় নৃত[্য] প্রবল, সকলেই নৃত্য করে। কি মেহতর, [কি] ভিস্তি, কি মালিনী, কি বিদ্যা, সকলেই নৃ[ত্য] করে। কৃষ্ণ নৃত্য করেন, রাধা নৃত্য করে[ন,] রাবণ নৃত্য করেন, সীতা নৃত্য করে[ন,] কৈকেয়ী নৃত্য করেন, বোধ হয়, বৃদ্ধ রা[জা] দশরথও নৃত্য করিতেন, কিন্তু তিনি প্র[ায়] সকল যাত্রার দলে, "বিহালাওয়ালা।" নৃ[ত্য] করিতে গেলে বিহালা বন্ধ হয়, নতুবা তাহ[াতে] ক্রটি হইত না।

যাত্রায় মেহতর নৃত্য করে কেবল নেশ[ার] ভরে। কিন্তু আর সকলে কেন নৃত্য ক[রে] তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ মতান্তর থাকিতে পা[রে।] ভিস্তি নৃত্য করে বুঝি জলের ভরে, মালি[নী] নৃত্য করে বুঝি বয়সের ভরে, বিদ্যা নৃ[ত্য] করে বুঝি যৌবনের ভরে, রাধা নৃত্য করে বুঝি প্রেমের ভরে, রাবণ নৃত্য করেন বু[ঝি] মুণ্ডের ভরে, কিন্তু সীতা, কৈকেয়ী, ভগবৎ হস্তী, জাম্বুবান্, অশ্ব প্রভৃতি কেন নৃত্য ক[রে] কে বলিতে পারে?

কিন্তু এক কথা আছে। পূর্ব্বে বাঙ্গা[লা] অনেক কাঁদিয়াছে; কীর্ত্তনের ছলে অন[বরত] নয়নাশ্রুবর্ষণ করিয়াছে; প্রণয়ভরে, [প্রে]মভরে বাঙ্গালা অনেক কাঁদিয়াছে। সন্ধ্যা-[স্ম]রণের ন্যায় একাকিনী বনে, উপবনে, [illegible] পীড়ায় অনেক কাঁদিয়াছে। [illegible] নিরুপায় হইয়া অপাঙ্গ [illegible] কি [illegible]

বলিতে সাগর-সলিলে মিশাইয়া গিয়াছে। আর সে বাঙ্গালা নাই, বাঙ্গালা এক্ষণে নূতন। বাঙ্গালা এক্ষণে বালক। সেই জন্য এত নৃত্য। বালক আপনিও নৃত্য করে, আবার বৃদ্ধ পিতামহকেও নৃত্য করিতে বলে। বালকের নৃত্য আবশ্যক, আমাদের শিরা, মস্তিষ্ক, মাংসপেশী সকলই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, নৃত্য আবশ্যক।

যে কোন সমাজেই হউক, নৃত্য বলিলে পদদ্বয়ের সঞ্চালনজনিত দেহের মনোহর আন্দোলন বুঝায়, কিন্তু বঙ্গ সমাজে কেবল দেহের মধ্যভাগের সঞ্চালনজনিত দেহের যে ঘৃণিত আন্দোলন, তাহাকেই নৃত্য বলে। কি লজ্জাকর নৃত্য! বাঙ্গালী সভ্য হইয়াছে, এই জন্য এই নৃত্য আপনি দেখে, কন্যাকে মাতাকে দেখায়, বালক বালিকাকে দেখায়, আবার বাহবা দেয়। বাহবা কাহার প্রাপ্য? বোধ হয়, বাহবা আমরাই পাইতে পারি।

"খেমটানাচ"! চমৎকার নৃত্য! গ্রাম্য বাবুদিগের পক্ষে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র। বারইয়ারীর পাণ্ডাদিগের জীবনসর্ব্বস্ব। যে পাণ্ডা নরক হইতে নিজ গ্রামে নর্ত্তকী আনিলেন, তিনি মনে করিলেন, যেন হিমালয় হইতে গঙ্গা আনিয়াছেন, তিনি গ্রামের ভগীরথ জন্মিয়াছেন। এই গ্রাম্য ভগীরথদিগের জন্ম সার্থক। তাঁহাদের অনুকম্পায় গ্রামের অনেকেই চরিতার্থ হইলেন। চরিতার্থ হউন, কিন্তু অনেক ছেলেও ডুবিল।

পূর্ব্বে বাঙ্গালায় খেমটা ছিল না। পূর্ব্বপদ্ধতি অনুসারে অদ্যাপি যে সকল কালিয়দমন যাত্রা আছে, তাহাতে এই নৃত্য প্রচলিত নাই। কোন কোন দলে লোকরঞ্জন করিবার নিমিত্ত এই ঘৃণিত নৃত্য স্বতন্ত্র নর্ত্তক দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু মালিনী কি বিদ্যার ন্যায়, দূতী কি রাধিকা খেমটা নাচেন না। কালিয়দমন যাত্রায় যেরূপ দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয় যে, পূর্ব্বে বাঙ্গালার নৃত্য-প্রণালী স্বতন্ত্র ছিল এবং সে নৃত্য নিতান্ত গাম্ভীর্য্যশূন্য ছিল না, কিন্তু এই আধুনিক খেমটা নাচ কোথা হইতে আসিল? কে আনিল? অথবা তা জিজ্ঞাসা করাই বাহুল্য। যে দেশে তন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, যে দেশে দেবার্চ্চনায় পঞ্চ মকার আবশ্যক, সে দেশে খেমটার জন্ম হইবার অসম্ভাবনা কি? খেমটা বাঙ্গালার নৃত্য; বাইদিগের নৃত্য মহারাষ্ট্রীয়। খেমটা তান্ত্রিক, মহারাষ্ট্রীয় নৃত্য পৌরাণিক। পুরাণের ন্যায় এই নৃত্যের গাম্ভীর্য্য আছে।

খেমটা নাচ, চন্দ্রহার, চাবির শিকল, শান্তিপুরের ধুতি, যাত্রার মেতরাণী, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী এ সকল এক জাতীয়।

আহ্লাদের বিষয় এই যে, যথার্থ ভদ্রলোকের বাটীতে আর "খেমটার নাচ" স্থান পায় না; প্রায় "বারোইয়ারী" তলায় হইয়া থাকে। তাহাও আর অধিক দিন থাকিবে না।

সুর। যে নৃত্য লইয়া বাঙ্গালা উন্মত্ত হইয়াছে, এখনকার সুর সেই নৃত্যের প্রতিপোষক এবং উদ্দীপক। বাঙ্গালার আর পূর্ব্বসুর নাই। যে সুর শুনিলে যেন জন্মান্তরীণ সুখ চকিতের ন্যায় স্মরণপথে আসিয়া হৃদয় কম্পিত করিয়া যাইত, আর সে সুর নাই। যে সুর ধীরে ধীরে তোমার রক্ত স্তম্ভিত করিয়া তোমায় অবশ করিয়া যাইত, এক্ষণে আর সে সুর নাই। যে সুর শুনিলে সামান্য প্রদীপ হইতে নয়ন ফিরাইয়া চন্দ্রালোক প্রতি চাহিতে, এক্ষণে আর সে সুর নাই। যে সুর শুনিলে আতর দূরে নিক্ষেপ করিয়া পদ্মগন্ধ আকাঙ্ক্ষা করিতে, এক্ষণে আর সে সুর নাই। এক্ষণে বাঙ্গালার সুর পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বাঙ্গালার নৃত্যানুযায়ী সুর হইয়াছে।

মনের অনেক প্রকার যন্ত্রণা বাক্যে প্রকাশ হয় না, তাহা কেবল সুরে প্রকাশ হয়। দুঃখ যত গভীর, ততই বাক্যের অতীত। ব্যথিত অন্তঃকরণমধ্যে কিরূপ তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হয়, বাক্যে তাহা দেখিতে পায় না; দেখিতে পাইলেও তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। বাক্য অন্ধ, বাক্য অসম্পূর্ণ। এই জন্য যে গ্রন্থকর্ত্তা কেবল ব্যথিত ব্যক্তিকে কতকগুলা কথা বলিয়াই তাহার গভীর

মর্ম্মপীড়া বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তিনিই নিষ্ফল হইয়াছেন। ব্যথিত ব্যক্তি স্বয়ং আপনার যন্ত্রণা বাক্যে বিবৃত করিতে পারে না। "আমি মরিলাম" "আমি গেলাম" এ সকল কথা স্মৃতি সাধারণ, সর্ব্বদাই শুনা যায়। অজীর্ণ হইলেও লোকে "আমি মলাম" "আমি গেলাম" বলে। গভীর মর্ম্ম-পীড়ার এ ভাষা নহে; তাহা স্বতন্ত্র। কেহ মর্ম্ম পীড়ার কথা অন্যকে বলিতে চাহে না, তাহা কেবল আপনার নিকট আপনি বলিতে ইচ্ছা করে। আপনি বক্তা, আপনি শ্রোতা। কিন্তু সে স্থলে বাক্য ব্যবহার হয় না, কেবল সুর ব্যবহার হয়। সুর যেন তাপিত অন্তরের একমাত্র ভাষা। সন্তানশোকে সন্তপ্ত দুঃখিনী ভূমিতলে মুখ লুকাইয়া ক্রন্দন করে, সে ক্রন্দন কেবল সুর। অনেক সময় সে সুরের সঙ্গে কোন বাক্য সংযোগ থাকে না, অথচ সেই মর্ম্মভেদী সুর শুনিয়া তোমার অঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, তোমার হৃদয় বিস্ফারিত হইল, তুমি সেই সুরের অর্থ বুঝিতে পারিলে; তুমি ধীরে ধীরে নয়নাশ্রু মুছিলে। "আমি মরিলাম" এই ভাব বাক্যে সর্ব্বদা শুনিতেছ, অথচ তাহাতে কর্ণপাতও কর না, কেন? আবার বাক্য প্রয়োগ না করিয়া কেবল সুরে সেই ভাব জানাইলে তোমার অন্তর আর্দ্র হইয়া আইসে, তাহাই বা কেন? বাক্যে যাহা শুনিলে, তাহা অনেক সময় মিথ্যা হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সুরে তাহা কখনই হয় নাই। বাক্য অনেক সময় মৌখিক, সুর সকল সময় আন্তরিক। সুরে যদি তুমি চঞ্চল না হইলে, তবে বুঝিতে হইবে যে, সে সুর উদ্দিষ্টভাবব্যঞ্জক নহে, তাহা বেসুর। আন্তরিক ভাবের এক একটি স্বতন্ত্র সুর আছে। শোকের সুর পৃথক্, হর্ষের সুর পৃথক্। পৃথক্ বলিয়াই পৃথক্ পৃথক্ রাগরাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছিল। আমাদের যাত্রাকয়গণ তাহা অনুধাবন না করিয়া হর্ষ-বিষাদ একই সুরে গাহিয়া থাকে, এই জন্য তাহাদের গীত বেসুরা।

কিন্তু আমাদের রাগ-রাগিণী ভাবব্যঞ্জক বলিয়া রাষ্ট্র নাই। কোন্ রাগিণীর দ্বারা শোক প্রকাশ হইবে, কোন্ রাগিণীর দ্বারা উন্মত্ততা প্রকাশ হইবে, তাহা সংগীত-ব্যবসায়ীরা বলেন না। কিন্তু তাহা না বলুন, কোন রাগ বা রাগিণী তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে গায়িতে পারিলে তাহা স্থির হইত। কিন্তু এক্ষণে কোন রাগ-রাগিণী সম্পূর্ণভাবে শুনিতে পাওয়া যায় না। যখন তাহা সচরাচর শুনিতে পাওয়া যাইত, কিংবদন্তী আছে, তৎকালের সংগীতবিদেরা যে কোন ভাব ইচ্ছা হইত, তৎক্ষণাৎ সুরের দ্বারা শ্রোতার মনোমধ্যে তাহা উদ্দীপন করিতে পারিতেন। কোন কোন সংগীতপ্রিয় ব্যক্তির এতদূর পর্য্যন্ত বিশ্বাস আছে যে, কেবল মনুষ্য-চিত্ত নহে, সুরজ্ঞের নিকট পূর্ব্বে জড়পদার্থ পর্য্যন্ত আজ্ঞাকারী ছিল। মেঘ আসিয়া বৃষ্টি করিত; অগ্নি আসিয়া দগ্ধ করিত; একবার এক সুরজ্ঞ আপনার আহুত অগ্নিতে আপনি পুড়িয়া মরিয়াছিলেন। চমৎকার কথা! ইহার মর্ম্ম অসীম! এই সকল কিংবদন্তী অমূলক হউক, অগ্রাহ্য হউক, হাস্যাস্পদ হউক, কিন্তু সুরের অসাধারণ শক্তির প্রতি লোকের যে বিশ্বাস আছে, এই কিংবদন্তী তাহার পরিচায়ক।

সংগীত সম্বন্ধে যে উন্নতি হইয়াছিল, বোধ হয়, শিক্ষাদোষে এক্ষণে তাহা অনেক লোপ পাইয়াছে। এখনকার সংগীত-ব্যবসায়িগণ কেবল রাগিণীর পর্দ্দা লইয়া বিতণ্ডা করেন; অমুক রাগিণীর "মধ্যমমান" অমুক রাগিণীতে মধ্যম-বর্জ্জিত। তাঁহারা এইরূপে কেবল রাগিণীর পর্দ্দা শিক্ষা করেন, রাগিণী শিক্ষা করেন না। ইষ্টক-নির্ম্মিত অট্টালিকায় কেবল ইষ্টক চিনিয়া ক্ষান্ত হন, অট্টালিকার আকার দেখেন না। পর্দ্দা প্রতি অধিক মনোযোগ হওয়ায় রাগিণীর মূল উদ্দেশ্য ক্রমে অদৃশ্য হইয়াছে। আবার "ডাগরবাণী" "খণ্ডারবাণী" প্রভৃতি "বোল বাণীর" সৃষ্টি হওয়ায় সেই অদৃশ্যতার আরও সাহায্য করিয়াছে। শেষ রাগিণী সঙ্করজাতীয় হইয়া সকল লোপ করিয়াছে। এক রাগিণীর

স্কন্ধের উপর আর এক রাগিণীর মস্তক বসিয়া এক নূতন রাগিণী সৃষ্ট হইল! হর্ষ-ব্যঞ্জক সুরের স্কন্ধের উপর বিষাদব্যঞ্জক সুরের মস্তক বসিল; গুণিগণমধ্যে "বাহবা" পড়িয়া গেল। গণেশের অনুকরণ হইল গণেশ গায়ক, গণেশের স্কন্ধে হস্তীর মুণ্ড।

এক্ষণে বাঙ্গালার সুর প্রায় এইরূপ। রাগিণীর দুইটা পর্দ্দা ও রাগিণীর চারিটী পর্দ্দা লইয়া আমাদের সুর। ইহা আমাদের স্বভাবসিদ্ধ। সকল বিষয়েই আমাদের এই-রূপ। আর্য্যের ব্রহ্মা অনার্য্যের মনসা লইয়া আমাদের দেবতা। মুসলমানের চাপকান, ইংরাজের ট্রাউজার লইয়া আমাদের পোষাক। সংস্কৃত ধাতু এবং পারস্য নাম লইয়া অমাদের বাঙ্গালা ভাষা। সে যাহাই হউক, বাঙ্গালার পূর্ব্বসুর লোপ পাইয়াছে। এক্ষণকার আর প্রায় কোন সুরই আন্তরিক ভাব প্রচারক নহে, এই জন্য যে ভাবের গীত হউক, কোন একটা সুরে গাইলেই হইল। তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই, শ্রোতা ও গায়ক এক্ষণে রুচি সম্বন্ধে তুল্য।

এক্ষণে বাঙ্গালা গীতে যে কয়েকটী সুর ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা সঙ্করজাতি হউক, অসম্পূর্ণ হউক, লঘু হউক, তাহাতে আমাদের স্বভাবের [illegible] ছায়া পাওয়া যায়। আমরা এক্ষণে [illegible]াকাকুল নহি, আমরা নিরানন্দ নহি, আমরা এক্ষণে উল্লাসপ্রিয়। আমাদের সুরেও উল্লাসের ছায়া আছে। উল্লাস আনন্দ নহে, উল্লাসে গাম্ভীর্য্য নাই, আমাদের সুরও সেইরূপ। সুরের নাম পৃথক্ [illegible] আছে। কিন্তু সে সকল সুর প্রায় একজাতীয় হইয়াছে। বাঙ্গালায় আর বড় শোকের সুর নাই। কুচিহ্ন। শোকে [illegible] ঐক্য হয়। আন্তরিক শোক [illegible] ঘটে না; শোক পবিত্র; [illegible] শোক আবশ্যক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের নৃত্যের [illegible] নাই; সুরেরও গাম্ভীর্য্য নাই। [illegible]। আমাদের সুর সামান্য; [illegible] সামান্য। [illegible] সামান্য; যখন তাঁহার মর্ম্মকথা তিনি আত্মায় গাহিয়াছিলেন, তাঁহার মানসিক শক্তি তখনই বুঝা গিয়াছিল। তিনি বুলবুলি হইয়া এক সূক্ষ্ম শাখায় বসিয়া মস্তক হেলাইয়া অর্দ্ধমুদিতনয়নে আত্মা গায়িতেছিলেন। তিনি গরুড়ের গীত শুনেন নাই। গরুড় গীত গায়—সাগর-সন্নিহিত উচ্চ পর্ব্বত-চূড়ায় বসিয়া উচ্চস্বরে গীত গায়, সাগর শিহরিয়া উঠে; দুলিয়া উছলিতে থাকে, সাগরে তরঙ্গ উঠে; মেঘমালা ঝুলিয়া পড়ে। সন্তানদিগকে ক্রোড়ে টানিয়া মায়াদেবী ঊর্দ্ধনেত্রে সেই উচ্চ চূড়ার প্রতি সভয়ে চাহিয়া থাকেন গরুড় প্রতিভা। তাহাই বিষ্ণুকে একবার স্বর্গে, একবার পাতালে লইয়া যাইত। লক্ষ্ণৌয়ের নবাব বুলবুলি। তাঁহার এক সুর। আমরাও হর্ষ-বিষাদ এক সুরে গাই। আমাদের শোক তাপ যদি থাকে, তাহা অতি সামান্য, সেই জন্য আমাদের সুরও সামান্য।

সুর ব্রহ্ম! চমৎকার কথা। যিনি এ কথা বলিয়াছিলেন, তিনি সুর বুঝিয়াছিলেন। মহাদেব গায়ক। আরও চমৎকার কথা। সুর মহামৃত মহাদেবের কণ্ঠের যোগ্য। শ্রোতা কে? মনুষ্য নহে, সিংহ নহে, পর্ব্বত নহে, সাগর নহে। এ সকল সামান্য ক্ষুদ্র। মহাদেবের গীত গর্জ্জিল; দেবলোক, চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক অতিবাহিত করিয়া মহাসুর চলিল। দূরে কোটি কোটি সূর্য্য মহাসুরে প্লাবিত, কম্পিত, মহাসুর তথাপি প্রধাবিত! অনন্ত আকাশে মহাদেবের মহাসুর প্রধাবিত। চিরকাল প্রধাবিত। সময় অনন্ত, আকাশ অনন্ত, সুর অনন্ত, অনন্ত। অনন্তের অর্থ অনুভব হয় না মনুষ্যের সাধ্যাতীত। মহাদেব গায়ক; শ্রোতা অনন্ত মহাদেব কোথায় বসিয়া গায়িতেছেন? হিমালয়ে নহে। হিমালয় ক্ষুদ্রস্থান। তথায় বসিয়া বেদব্যাস, বাল্মীকি গান করুন। হিমালয় মহাদেবের যোগ্য নহে। তথায় ভীষ্মদেব বাস করুন। মহাদেবের স্থান কোথা? প্রতিভাশালী ব্যক্তির অন্তঃকরণ অন্তরে তাঁহার একবার [illegible]।

গীত। সে কথা এক্ষণে যাউক। সুর
ং বাক্যে গীত। সুরে ভাব উদ্দীপন করে,
ক্যসংযোগে তাহা আরও স্পষ্টীকৃত হয়।
র তোমার মন আকর্ষণ করিল, তুমি স্তব্ধ
য়া তাহা শুনিতে লাগিলে, চিত্ত চঞ্চল
ল, নিকটে তোমার শিশু ক্রীড়া করিতে-
ল, তুমি তাহাকে ক্রোড়ে লইলে। সুর
মধুর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; সন্তা-
ক আদর করিয়া থাক, এক্ষণে আরও
দর করিতে ইচ্ছা হইল। এমত সময়
র বাক্য সংযোগ হইল। গায়ক গায়িল—

"জনম অবধি হম রূপ নিহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

তোমার স্নেহ উছলিয়া উঠিল। তুমি
পন মনের কথা আপনি বুঝিতে পারিলে।
ত কৃতকার্য্য হইল।

আমরা অনেকে আপন মনের কথা আপনি
ঝতে পারি না। তাহা কবিরা আমাদের
াইয়া দেন। আমরা কেবল মনের বেগ
ভব করি মাত্র। একজন সামান্য ব্যক্তি
প্রেমাসক্ত হয়, প্রণয়ের অতি অল্প মাধুরী
ক্তি বুঝিতে পারিবে। প্রণয়পাত্রীর
সুখ, তাহার অদর্শনে অসুখ, এই মাত্র
্যক্তি বুঝিতে পারিবে। কিন্তু প্রণয়
। সকলের অন্তরে সেই অগাধ সাগর,
্দিন সাগর উছলিতেছে। প্রেমাসক্ত
তাহার বেগে কখন হর্ষিত, কখন
ত হইতেছে; অথচ সেই সাগরে যে
ক্ষ তরঙ্গমালা উঠিতেছে, পড়িতেছে,
কোনটিই সে ব্যক্তি দেখিতে পাই-
া। তাহারে একটী তরঙ্গ দেখাও;

"দেখিয়া পালটি দেখি
তবু আঁখি তিরপিত নয়।"

ণয়ী প্রণয়াসক্ত হইলেও তৎক্ষণাৎ এই
চিনিতে পারিবে। তাহার প্রণয়পাত্রীকে
াবার অনিমিষ-লোচনে দেখিয়াছে,
দেখিতেছে, তথাপি তাহার নয়নের
নাই। কিন্তু তাহা সে আপনি
[illegible] তাহা জানিতেন। প্রণয়ীকে

এ গয়ের আর একটী নিকটস্থ তরঙ্গ দেখাও।
গাও—

"নবরে নব; নিতই নব,
যখনই হেরি তখনই নব।"

প্রণয়ী মাত্রে এ কথা বুঝিতে পারিবেন।
যিনি প্রণয়পাত্রীকে নিত্য নূতন না দেখিয়া
থাকেন, তিনিও এ কথা বুঝিতে পারিবেন,
কবি তাহা জানিতেন। স্বয়ং কখন প্রণয়া-
সক্ত হইয়া থাকুন বা না থাকুন, কবি প্রণয়ের
সকল ভঙ্গি জানেন, সকলের অন্তর জানেন;
কবি অন্তর্যামী। কবি ব্রহ্মা। কবি সৃষ্টি
করেন। সরমা ব্রহ্মার মানসকন্যা, সীতা
বাল্মীকির মানসকন্যা, ডেসীডিমনা সেক্ষ-
পিয়রের মানসকন্যা।

যিনি অন্তরের কথা জানেন না, যিনি
আশার উন্মত্ততা, নৈরাশ্যের কাতরতা জানেন
না; যিনি স্নেহের কোমলতা, শোকের গভী-
রতা, যুবতীর পবিত্রতা জানেন না, তিনি কবি
নহেন। তিনি গীত বাঁধিবার অনধিকারী
অনধিকারীরাই এক্ষণে আমাদের যাত্রার গীত
বাঁধে। জেলে, মালা, কুমার, কামার প্রভৃতি
অশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে যে কেহ বর্ণের মিল
করিতে পারিল, সেই মনে করিল, আমি গীত
বাঁধিলাম; যাত্রাকর তাহা গান করিয়া ভাবি-
লেন, আমি গীত গায়িলাম। শ্রোতারা তাহা
শুনিয়া মনে করিলেন, আমরা গীত শুনিলাম
বস্তুতঃ কথার বা বর্ণের মিল ব্যতীত আধু-
নিক গীতে আর কিছুই নাই। গীতে কেবল
বর্ণ বাছিয়া এক একটী করিয়া গাঁথা হয়।
"বী" শব্দের পর "ণা" শব্দ গাঁথা গিয়াছে,
অতএব এই দুই শব্দ মধ্যে মধ্যে গাঁথিলে
গাঁথনীর বড় শোভা হইবে। "বীণা" শব্দ
অল্প অল্প ছেদ দিয়া গাঁথা গেল, ছেদ গাঁথা
গেল, গীত অপূর্ব্ব হইল।

"ও বীণা বাজ বীণা হরিনাম বিনা"
ইত্যাদি

গীত শুনিয়া শ্রোতৃগণ ধন্য ধন্য করিলেন,
কেহ বা সিকি দিলেন, কেহ বা [illegible]
দিলেন, কেহ বা পুরাতন বস্ত্র দিলেন।
গায়কের উৎসাহ [illegible] হইল।

যাত্রায় সমস্ত রাত্রি গাহিতে হইবে, অতএব অনেক গীত আবশ্যক। সঙ্গত হউক, আর অসঙ্গত হউক, ভাবপূর্ণ হউক আর না হউক, আবশ্যক হউক আর না হউক, গীত বাঁধিতে হইবে, গায়িতেও হইবে। সুন্দর বর্দ্ধমানের রাজপুরী প্রবেশ কিরূপে করিবেন, যাত্রাওয়ালা এই ভাবে আর্দ্র হইয়া গীত বাঁধিলেন।

"রাজার বাড়ী পাকা কোটা,
চারিদিকে প্রাচীর আঁটা,
বল মাসি কেমন ক'রে যাব।"

এই আশ্চর্য্য গীত শুনিয়া শ্রোতৃবর্গের মধ্যে বাহবা পড়িয়া থাকে। "কপাট আঁটা" থাকিলে পুরে প্রবেশ সুকঠিন, এই ভাবটী তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারিলেন। ভাব অপূর্ব্ব, শ্রোতৃবর্গের রুচিও অপূর্ব্ব।

আধুনিক যাত্রার উদ্দেশ্য চিত্তবৃত্তির পুরিতৃপ্ত দিয়া লোকের পরিতৃপ্তি সাধন করা। যে সকল কবি এক্ষণে গীত বাঁধিতেছেন, তাঁহারা ক্রমে সেই সকল চিত্তবৃত্তিকে ঘৃণিত অপবিত্র করিতেছেন। বিদ্যাসুন্দরের প্রণয় নরকের প্রণয়। কৃষ্ণ-রাধার প্রণয় প্রায় তাহাই দাঁড়াইয়াছে। আধুনিক যাত্রার দোষে কৃষ্ণ-রাধাকে গোয়ালা বলিয়া বোধ হয়, পূর্ব্বে কবির গুণে তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া বোধ হইত।

যাঁহারা আধুনিক যাত্রার নৃত্য-গীত সহ্য করিতে পারেন, তাঁহারা এক প্রকার মহাপুরুষ। আবার যে মহাত্মারা অভিনেতৃগণের [illegible] দেখিয়া বা কথাবার্ত্তা শুনিয়া [illegible] হয়েন, তাঁহাদের ত কথাই নাই। [illegible] রাণী পরিচ্ছদে মেতরাণী। কেলুয়া [illegible] সঙ্গে যে মেতরাণী আইসে, যাত্রার প্রয়োজন হইলে সেই উঠিয়া দাঁড়ায়; [illegible] পর রাণীর পদ আমাদের বর্ত্তমান [illegible] নহে। বোধ হয়, কথায় [illegible] মেতরাণীতে বড় প্রভেদ নাই, [illegible] থাকিলে থাকিতে পারে; [illegible] তাহা বড় জানে না; [illegible] দেখে নাই, আপনাদিগের

পরিবার দেখিয়া রাণীর ভাব-ভঙ্গী অনুভ[ব] করিয়া রাখিয়াছে, প্রয়োজন হইলে আপ[ন] পরিবারের অনুকৃতি সাজাইয়া দেয়। দ[র্শ]কেরা সেই রাণীকে অন্যস্থানে দেখিলে হয় জেলেনী কি মালিনী ভাবিতেন, কিন্তু যাত্রা[য়] তাহাকে রাণী ভিন্ন অন্য ভাবিবার উপা[য়] নাই, তবে মধ্যে মধ্যে কার্য্যগতিকে তাহা[কে] কখন মেতরাণী, কখন খেমটাওয়ালী, কখ[ন] বাজীকর বলিয়া বুঝিয়া লইতে হয়। কি[ন্তু] তাহা পরিচয়ে বুঝিয়া লইতে হয়, পরিচ্ছ[দে] নহে। কোন অবস্থাতেই পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্ত[ন] হয় না। রাণী মেতরাণীর এক পরিচ্ছদ সকল অবস্থাতেই সালুর শাটী বা ঢাকা[ই] শাটী।

রাজার পরিচ্ছদ আরও চমৎকা[র] ছিন্ন ইজার, মলিন চাপকান, আর তৈলা[ক্ত] জরীর টুপি। সেই পরিচ্ছদে [illegible] জমাদার সাজিয়া আসিয়াছিল, আবার সে[ই] পরিচ্ছদে স্বয়ং রাজাও আসিলেন। একজ[ন] ইংরাজ গ্রন্থকার বলিয়াছিলেন যে, পরিচ্ছদ লোকের পরিচায়ক। কে যোদ্ধা, কে পদা[ত]িক, কে জজ, কে শিল্পী, তাহার পরিচ[য়] পরিচ্ছদে পাওয়া যায়। এই কথা স[ত্য] হইতে পারে; কিন্তু আমাদের যাত্রা সম্ব[ন্ধে] ইহা খাটে না। আমাদের যাত্রায় কি রাজ[া] কি দাস সকলেই এক পরিচ্ছদধারী। চাপ[-] কান তাহার মধ্যে প্রধান। বাজীকরে[র] "বনমানুষের হাড়" স্পর্শ মাত্র সকলের প[রি-] বর্ত্তন করে, সেইরূপ যাত্রাকরের চাপক[ান] পরিধান মাত্র, সকলের রূপান্তর ক[রে]। রাজা সাজিতে হইবে, চাপকান আবশ্যক। নৃসিংহদেব সাজিতে হইবে, সেই চাপকান আবশ্যক। হনুমান্ সাজিতে হইবে, আবা[র] সেই চাপকান আবশ্যক। বুঝি চাপকা[ন] পরিলে হনুমানের মত দেখায়।

আমাদের যাত্রাকরেরা ইতরলোক[।] যাত্রাওয়ালা না হইলে তাহারা হয় ত ভূমি কর্ষণ করিত বা নৌকা চালাইত কিংবা ভা[র] বহন করিত, তাহাদের নিকট উৎকৃষ্ট কি[ছু]রই প্রত্যাশা করা যায় না; কিন্তু একবা[র]

কত মার্জ্জিতরুচি কতকগুলি যুবা বাবু
র হইয়াছিলেন। তাঁহারা অপর
রদিগের ছিন্ন মলিন পরিচ্ছদ পরি-
করিয়া মার্জ্জিতরুচির উপদেশানুবর্ত্তী
পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন;
রা আহ্লাদিত-চিত্তে তাহা দেখিতে
মি; পথে শুনিলাম, সীতার বনবাস
নয় হইতেছে, আমাদের আরও আহ্লাদ
ল। যাত্রার স্থানে গিয়া দেখি, মোগলাই
গড়ি মাথায়, আলবার্ট চেন শোভিত,
মা নাকে. হাইকোর্টের উকীলের ন্যায়
কগুলি লোক কথাবার্ত্তা কহিতেছে।
র শুনিলাম, তাহাদের মধ্যেই একজন
ম, একজন লক্ষ্মণ, আর সকলে পারিষদ।
মরা কপালে হাত দিয়া বসিলাম। শিক্ষিত
রা ভাবিয়াছেন, শ্রীরামচন্দ্র হাইকোর্টের
ল সদৃশ ছিলেন। তিনি চসমা নাকে
তেন, মুসলমানদিগের মত পাগড়ি মাথায়
তেন, সাহেবদিগের মত আলবার্ট চেন
তেন। আমাদের অদৃষ্টই মূল!

আর একবার একদল কেরাণীর অভি-
ত যাত্রায় দেখা গিয়াছিল, সীতা রেসমের
ঙ্গা রুমাল [illegible] বাধিয়া নাচিতেছেন।
র্য্যের কিরণ লাগিলে মেছোবাজারের
ল্লিবাসিনীরা যেরূপ ভঙ্গিতে রুমাল মাথায়
দিয়া চিবুকে গিয়ে গ্রন্থি দেয়, সীতা সেইরূপ
রুমাল বাধিয়াছিলেন। আমরা একজন যুবা
বাবুকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি
অনুগ্রহ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, রাত্রে
সূর্য্যকিরণের ভয় নাই, রুমাল সে জন্য
বাধা হয় নাই, তবে ওষ্ঠলোম ঢাকিবার
নিমিত্ত ঐরূপ করিয়া বাধা হইয়াছে।

যেরূপ পরিচ্ছদ, তাহার অনুরূপ কথা-
বার্ত্তা। রাণীই হউন আর মেতরাণীই হউন,
একই পরিচ্ছদ; রাণীই হউন আর মেত-
রাণীই হউন, একইরূপ কথাবার্ত্তা। পর
স্পরের প্রকৃতি স্বতন্ত্র হইলে পরস্পরের
কথা স্বতন্ত্র হইবে, তাহা যাত্রাকরেরা বড়
জানে না; যাত্রাকরেরা কেন, অনেক আধু-
নিক নাটক-প্রণেতারাও তাহা বুঝিতে
পারেন না। যাঁহারা মনে করেন, বুঝেন,
দেখা গিয়াছে, তাঁহারা এই পর্য্যন্ত বুঝেন
যে কথাবার্ত্তা-স্থলে স্বতন্ত্র অবস্থার লোককে
স্বতন্ত্র ভাষা ব্যবহার করান। তাঁহারা
কোন ইতরলোককে কথা কহাইতে হইলে
ইতর ভাষায় কথা কহাইয়া থাকেন, কোন
কোন ভদ্রলোককে কথা কহাইতে হইলে
সাধুভাষা প্রয়োগ করান, কিন্তু যে স্থলে
উভয়েই ভদ্রলোক কি উভয়েই ইতরলোক,
উভয়েই এক প্রকার ভাষা ব্যবহার করে,
সে স্থলে বড় গোলযোগ হয়; ভাষায় মর্ম্মও
এক হইয়া পড়ে।

স্বতন্ত্র প্রকৃতির স্বতন্ত্র গতি, স্বতন্ত্র কথা;
তাহাদের ভাষা এক হইতে পরে, কিন্তু
ভাষার মর্ম্ম স্বতন্ত্র। সেই স্বতন্ত্রতা আমা-
দের দেখাইয়া দিলে, আমরা বুঝিতে পারি,
কিন্তু তাহা স্বয়ং দেখাইতে পারি না। তাহা
কেবল প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা দেখাইয়া
দিতে পারেন।

আমাদের যাত্রাকরেরা প্রতিভাশালী
নহে, তাহাদের নিকট এ সকল নির্ব্বাচনের
প্রত্যাশা করি না। এমত বলি না যে,
শ্রীরামচন্দ্রের মত তাহারা কথা কহিতে
পারিবে বা লক্ষ্মণ কথা কহিলে, তাহাতে
শ্রীরামচন্দ্রের প্রকৃতি একবারে লক্ষ্য হইবে
না। যাত্রায় কি গ্রন্থে বক্তাদিগের প্রকৃতি
রক্ষা করা অতি কঠিন।

এক্ষণে আমাদের যাত্রায় কিরূপ কথা-
বার্ত্তা হইয়া থাকে, দেখা যাউক। প্রকৃতি
প্রভেদ-জ্ঞান দূরে থাকুক, যে কথোপকথন
হইয়া থাকে, তাহা শুনিলে বিরক্ত হইতে
হয়। নিম্নোক্ত উদাহরণে তাহা দেখা
যাইতেছে। শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে
জানকীকে বনে পাঠাইলেন। জানকী
গর্ভা, পদব্রজে কতদূর গমন করিয়া
ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন. বলিলেন, "লক্ষ্মণ
যে আমি চলিতে পারি না।

লক্ষ্মণ। কি বলিলেন মা [illegible]
আর আপনি চলিতে পারেন না?

জানকী। [illegible] লক্ষ্মণ, আর